মানুষ, মানুষ

মানুষ, মানুষ

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৭১ সন
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীদেবদত্ত নন্দী
ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীঅশোক কুমার ঘোষ
নিউ শশী প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৬।

'মেয়েটির নাম আনোয়ারা, ডাক নাম মিতা। সেই নামটাও বোধহয় এক সময় তার স্বামীর মুখে ছিল মিতু। এখন অনেকের মুখে মুখেই মিতু চালু হয়ে গেছে। তাকে যদি কেউ হঠাৎ পাগল মনে করে, তাহলে খুব একটা ভুল হবে না। আসলে তার জীবনীশক্তি সাধারণ মানুষের থেকে এতই বেশি যে অনেক সময় সে নিজেই তা ঠিকঠাক ধারণ করতে পারে না, সে যখন তখন কেঁদে ওঠে, তখন আপাতভাবে কান্নার কোনও কারণই নেই। পুরোনো কোনও কথা মনে পড়ে যায় বোধহয়, আবার এক এক সময় হাসতে শুরু করলে থামতে পারে না কিছুতেই।

তার কাজের লোকেরা জানে, মিতুর মন খুবই নরম আর সরল, অথচ তার রাগ সাংঘাতিক! রাগ ব্যাপারটা কোনও কোনও মানুষের খুব বেশি আর কোনও কোনও মানুষের বেশ কম হয় কেন তা আজও নির্ণয় করা যায়নি। এটা রক্তচাপের ওপরেও নির্ভর করে না।

কেউ কেউ একেবারেই ক্রোধ সংবরণ করতে পারে না, সব যুক্তিবোধ নষ্ট হয়ে যায়, অনেকক্ষণ ধরে রাগে গরগর করে। আর কারুর কারুর রাগ একবার দপ করে জ্বলে উঠেই বাদে একেবারেই নিভে যায়, তারপর শুরু হয় অনুতাপ।

মিতু যখন রাগ করে তখন হাতের সামনে যা পায়, তাই-ই ভাঙে, এমনকী লোকজনের সামনে তার স্বামীকেও চড়-চাপড় মারতে শুরু করে, তখন সে কোনও কথাই শোনে না। তারপর হঠাৎ শুরু করে দেয় কান্না। সামনে যে থাকে, তারই পা ছুঁয়ে ক্ষমা চায়।

এ রকম মেয়েকে নিয়ে ঘর-সংসার করা সহজ কথা নয়। আমরা বাইরের লোক, আমাদের হয়তো এসব দেখতে মজা লাগে, কিন্তু এর স্বামীটির ধৈর্য ও সহ্যশক্তি অসীম হওয়া দরকার। শামীমের চেহারাটা যেমন পাহাড়ের মতন বিরাট, তেমনই শান্ত। সর্বসমক্ষে সে তার স্ত্রীর নানারকম পাগলামি দেখে মৃদু মৃদু হাসে, কখনো দু'একটা চিমটি-কাটা মন্তব্য করে উস্কেও দেয়। দু'জনের মধ্যে যে গভীর ভালোবাসা রয়েছে, তা বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না।

আমি প্রতিবছর অন্তত একবার-দু'বার ঢাকায় যাই। কোনও-না-কোনও আমন্ত্রণে।

সাধারণত হোটেলেই ওঠার কথা, দু'-একবার ঢাকা ক্লাবেও থেকেছি, আর কোনও কোনও বন্ধু ও শুভার্থীর বাড়িতেও আতিথ্য পাই। গাজী শাহাবুদ্দিনদের বাড়িতে আমি সস্ত্রীক থেকেছি বেশ কয়েকবার। এমনও হয়েছে, আমন্ত্রণকারীদের ব্যবস্থাপনায় উঠেছি কোনও হোটেলে, গাজী ও তাঁর স্ত্রী বীথি এসে জোর করে আমাদের ধরে নিয়ে গেছেন নিজেদের বাড়িতে।

হোটেলের বদলে কারুর বাড়িতে আতিথ্য নিলে গৃহকর্ত্রীকে অনেক ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে হয়। দলে দলে ছেলেমেয়েরা আসে দেখা করতে, তাদের চা-নাস্তা পরিবেশন করে যেতে হয় অবিরাম। বীথির এক আশ্চর্য ক্ষমতা আছে, অনেকটা ম্যাজিকের মতন। দুপুরবেলা যারা বসে থাকে, তাদের সে ভাত খেয়ে যেতে অনুরোধ করে। একদিন বেলা দুটোর সময়েও ঠিক এগারোজন নারী-পুরুষ আড্ডা ছেড়ে উঠছিল না। বীথি তাদের সবাইকেই গিয়ে বসতে বলল খাবার টেবিলে। কয়েকজন বলল তারা আগেই খেয়ে এসেছে। তাতে কী, তবু কিছু মুখে দিতেই হবে। টেবিলে প্লেটের পর প্লেট নানারকম সুখাদ্য আসতে লাগল। অত লোকের খাওয়ার পরেও বেশি রইল অনেক কিছু। আমি তাজ্জব হয়ে ভাবতে লাগলাম, বীথি কি আগে থেকেই এতজন মানুষের জন্য রান্না করে রেখেছিল? এই মানুষগুলি না এলে এত খাদ্য নষ্ট হতো? মনে হয়, আরও একডজন মানুষ বেশি হলেও বীথি সবাইকে খাইয়ে দিতে পারত। এ যেন মহাভারতের দ্রৌপদী!

ঢাকায় আমি যে-কদিন থাকি, তার মধ্যে একটি সন্ধে শামীম-আনোয়ারার কাছে যেতেই হয়। না গেলে সে বোধহয় আমার চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যেতেও পারে। শামীম ইতিহাসের অধ্যাপক এবং পড়ুয়া মানুষ। মিতু কিন্তু আমার কোনও লেখাই পড়েনি। সে শুধু জানে, আমি একজন লেখক, অনেক অল্পবয়েসী ছেলেমেয়ে আমার কাছ থেকে সই নেয়।

মিতুর কাছে আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়, আমার জন্ম ফরিদপুরের একটি গ্রামে। তার ঠিক পাশের গ্রামেই মিতুর বাপের বাড়ি। সুতরাং আমি তার খুব নিকট আত্মীয়।

ফরিদপুরের সেই গ্রামের সঙ্গে বহুকাল আমার কোনও সম্পর্ক নেই, জন্মস্থান সম্পর্কে আমার কোনও মোহও নেই। কিন্তু আমাকে নিয়ে মিতুর আদিখ্যেতাও প্রায় পাগলামির পর্যায়ে পড়ে। আমার সামনে বসে অবিরাম সেই গ্রামের গল্প, সেখানকার নদী আর বিলের গল্প করে যায়, আর মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে, আপনার মনে আছে?

আমি শুধু ঘাড় নাড়ি।

গাজী-বীথিদের বাড়িতে যেমন সর্বক্ষণ বহু লোকের সমাগম. এ বাড়িতে তাব ঠিক বিপরীত, মাত্র চারজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর আমন্ত্রণ হয়। শামীম গল্প জমাতে পারে না, চুপচাপ থাকে, সব কথা বলার দায়িত্ব নেয় মিতু।

সে বাড়িতে আমি প্রত্যেকবারই মিতুর কোনও না কোনও রোগের ঘটনা দেখেছি।

ওদের এক বন্ধু আজিজ ইচ্ছে করে মিতুকে রাগায়।

আজিজ একবার খুব নিরীহভাবে আমায় জিজ্ঞেস করেছিল, সুনীলদা, আপনার ছোটবেলার কিছু মনে নাই? আপনার কখনো জুতা চুরি যায়নি? ফরিদপুরের লোকেরা খুব জুতাচোর হয়!

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই মিতু ফোঁস করে উঠে বলল, কী কইলা? কী কইলা?

আজিজ বলল, আমাদের শামীম ভাই যখন প্রথমবার শ্বশুরের গ্রামে গেল, সেবারেই তার এক পাটি জুতা চুরি হয় নাই?

আর যাবে কোথায়? দাপাদাপি শুরু করে মিতু, আজিজের হাত থেকে পানীয়ের গেলাস কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল ছুড়ে। সে গেলাসটা গিয়ে লাগলো দেয়ালের একটা সুদৃশ্য ঘড়িতে। তাতেও ভ্রূক্ষেপ না করে সে শামীমের ঘাড় খামচে ধরে জিজ্ঞেস করতে লাগল, তোমার জুতা চুরি হইছিল না কুকুরে নিয়া গেছিল, বলো, বলো, সত্যি কথাটা বলো!

আমি অবশ্য মিতুর এরকম কোনও রাগের কারণ ঘটাইনি কখনও।

শামীম আর মিতু কলকাতায় বেড়াতে আসেনি এ পর্যন্ত, প্রায়ই প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু তা রাখে না। মিতুর ইচ্ছে আছে খুবই, কিন্তু শামীম সহজাত অলস, সে বিশেষ ঘোরাঘুরি পছন্দ করে না।

একবার শান্তিনিকেতনে একটি সেমিনারে আমন্ত্রণ পেয়েছিল শামীম। তখন মিতুও তার সঙ্গে আসবে। সব ঠিকঠাক। প্লেনের টিকিট কাটা হয়ে গেল, হঠাৎ আগের দিন শামীমের ধুম জ্বর। আসা হল না। জ্বর তো মানুষের হতেই পারে, কিন্তু মিতুর ধারণা, আসতে চায় না বলেই শামীম ইচ্ছে করে জ্বর বাধিয়েছে।

এই নিয়ে সে স্বামীর সঙ্গে কতটা রাগারাগি বা মারামারি করেছে, তা জানি না।

বীথি আর গাজী শাহাবুদ্দিন প্রায়ই আসে কলকাতায়। এ জন্য বীথিকে খুব হিংসে করে মিতু। মিতুর তুলনায় বীথি অনেক রূপসী। সেটাও একটা হিংসের কারণ।

স্বাতী অনেকবার মিতুকে বলেছে, তুমি একলা চলে এলেই তো পারো!

মিতু জিজ্ঞেস করে, একা যাব? কোনওদিন যাইনি। কিছু চিনি না। থাকব কোথায়?

স্বাতী বলেছে, আমাদের বাড়িতে থাকবে। তোমাকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করে নেব।

মিতু বলেছে, যাব, নিশ্চয়ই যাব। একাই যাব! শান্তিনিকেতন দেখতে যাওয়ার কতদিনের শখ আমার।

কিন্তু তার আসা হয়নি। শামীম না এলে সে ঝগড়া করবে কার সঙ্গে।

মাঝখানে এক বছর আমার ঢাকায় যাওয়া হয়নি। অন্যদেশে গিয়ে কয়েকমাস ছিলাম, তাই যোগাযোগও থাকেনি কারুর সঙ্গে।

ফিরে আসার পর, বর্ষাকালের এক বিকেলবেলা একটি চমকপ্রদ ঘটনা ঘটল।

আমরা থাকি দক্ষিণ কলকাতার একটি আকাশচুম্বী বাড়ির দশতলার ফ্ল্যাটে। দক্ষিণদিকের বারান্দায় দাঁড়ালে, সামনে আর কোনও উঁচু বাড়ি নেই, দিগন্ত পর্যন্ত দেখা যায়। একেবারে প্রান্তরেখাটি সবুজ। কোনও বন্ধু জিজ্ঞেস করেছিল, ওই দিকে সুন্দরবন নাকি? আমি বেলাল চৌধুরীকে একবার বলেছিলাম, জানো না, আমার দশতলার বারান্দা থেকে ঢাকা পর্যন্ত দেখা যায়।

খুব মিহি বৃষ্টি পড়ছে, এ রকম বৃষ্টিতে ভিজতে ভালো লাগে।

আমার হাতে কফির কাপ, আমি দেখছি রাস্তায় মানুষের স্রোত। অনেকেই ছাতা মাথায় দেয়নি। একদল বাচ্চা ছেলেমেয়ে ছোটাছুটি করছে মাঝ-রাস্তায়।

হঠাৎ দেখি, একদল লোক একটি মেয়েকে ঘিরে এগিয়ে আসছে আমাদেরই বাড়ির দিকে।

এত ওপর থেকে মানুষদের একটু ছোট দেখায়। আমার মনে হল, জনতায় ঘেরা মহিলাটি যেন চেনাচেনা। অথচ, রাস্তায় কোনও পাগলকে যেমন লোকজন ঘিরে দাঁড়ায়, দৃশ্যটি সেরকম।

আমি স্বাতীকে ডেকে বললাম, স্বাতী, একবার এদিকে এসে দেখো তো! ঐ মেয়েটি কে?

স্বাতী সব সময় চশমা পরে না। আবার চশমা ছাড়া অনেক কিছুই দেখতে পায় না।

একবার উঁকি মেরে ও আবার ভেতরে চলে গেল চশমা আনার জন্য।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওই মেয়েটিকে অনেকটা ঢাকার মিতুর মতন দেখতে না?

স্বাতী বলল, মিতুই তো! ওমা, ওর কী হয়েছে?

এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, মেয়েটি কাঁদছে।

দশতলা থেকে নিচে নামতে কয়েক মুহূর্ত লাগে মাত্র।

ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেলাম। কোনও সন্দেহ নেই, এ মেয়েটি আনোয়ারা মিতুই বটে। কাঁদছে একটি অভিমানী বালিকার মতন।

আমাকে দেখেই দৌড়ে এসে এতটা হাত জড়িয়ে ধরল।

আমাকে এ পাড়ায় অনেকেই চাক্ষুষভাবে চেনে না। নাম জানে হয়তো কয়েকজন। সেরকম মুখচেনাও কেউ নেই এখানে।

আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই একজন যুবক বলল, এই ভদ্রমহিলা শুধু কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন, আমি সুনীলদার বাড়ি যাব! ঠিকানা জানেন না, আর কিছুই বলতে পারেন না। আপনি একে চেনেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ, চিনি। ঠিক আছে, আমি নিয়ে যাচ্ছি!

সেই যুবকটি আবার জানাল, সিগারেটের দোকানদার বলল, এই বড় বাড়িতে একজন সুনীলবাবু থাকে, তাই আমরা এদিকে নিয়ে আসছিলুম। উনি কাঁদছেন কেন? কোনও বিপদ হয়েছে?

মিতু কখন এবং কেন কাঁদে, তা বুঝিয়ে বলা শক্ত। বললাম, আপনাদের ধন্যবাদ। আমি ওপরে নিয়ে যাচ্ছি। ইনি বাংলাদেশ থেকে আসছেন।

জনতাকে গেটের বাইরে রেখে আমরা দু'জনে এসে দাঁড়ালাম লিফ্‌টের সামনে।

চোখের জল মুছে ফেলেছে। ঝলমলে বিস্মিত মুখে মিতু বলল, আপনেরা এত বড় বাড়িতে থাকেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ, আমার এ বাড়িতে মাত্র দু'জনের সংসার।

ঢাকাতে এর থেকেও আরও অনেক বড় এবং বেশি আধুনিক ধরনের ফ্ল্যাট বাড়ি আছে। মিতু কি তার একটাও দেখেনি? দেখুক বা না দেখুক, এই প্রশ্ন তার সারল্যের সঙ্গে মানিয়ে যায়।

এখন তার মুখে ঝলমলে হাসি। বোঝবার কোনও উপায়ই নেই, একটু আগেই সে অঝোরে কাঁদছিল।

বাবারে! খুব জোর বাঁইচ্যা গেছি!—এ কথা বলার সময়েও তার ঠোঁটে হাসি লেগে আছে!

লিফ্‌টে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এরকম হঠাৎ চলে এলে? আগে একটা খবর দাওনি কেন? শামীম কোথায়?

সে আসে নাই।

তুমি একা এসেছ? আগে থেকে খবর দিলে তোমাকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করার ব্যবস্থা করতাম।

কী করে খবর দেব? আমি তো আপনাগো ঠিকানা জানি না। ফোন নাম্বারও জানি না। আমি বিমানেও আসি নাই!

বাকি কাহিনিটি শোনা গেল ওপরে এসে।

তার চেহারাটা খানিকটা বিপর্যস্ত। একটা দামি শাড়ি পরেছে বটে। কিন্তু মাথার চুল উস্কোখুস্কো, মুখখানা ধূলিমলিন।

বীথি শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে তুলনা হয় না বটে, কিন্তু মিতুরও চোখে পড়ার মতন নিজস্ব রূপ আছে। বীথির সৌন্দর্য খানিকটা ক্লাসিকাল ধরনের। মিতু ফর্সা নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ যাকে বলে, হিলহিলে লম্বা, কোমর ও বুকের গড়ন নিখুঁত, পাখির মতন বিস্ময়মাখা দুটি ডাগর চোখ। কোমর ছাড়িয়ে যাওয়া একঢাল চুল।

একটা কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ ছাড়া তার সঙ্গে কোনও মালপত্রও নেই।

প্রথমেই সে বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে এল।

তারপর বলল, আপনাদের বারান্দা থেকে অনেকখানি আকাশ দেখা যায়। একবার

ওই বারান্দায় যাব?

স্বাতী তাকে মৃদু ধমক দিয়ে বলল, পরে বারান্দায় যাবে। চুপটি করে বসো। আগে বলো, তুমি রাস্তায় কাঁদছিলে কেন?

তার কাহিনিটি খুবই বিস্ময়কর।

সে বিমানে আসেনি। এসেছে বাসে, বর্ডার পার হয়ে। যখনকার কথা বলছি, তখন ঢাকা-কলকাতা সরাসরি সৌহার্দ্য বাস চালু হয়নি। বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত বাসে এসে, তারপর খানিকটা পায়ে হেঁটে, এদিক থেকে আবার বাস বা ট্রেনে চাপতে হয়। দু'দিকেরই সীমান্তরক্ষী এবং শুল্ক-কর্মচারীদের হাতে অনেককে হয়রান হতে হয় শুনেছি। সাধারণ মানুষকে নাজেহাল করে যারা আনন্দ পায়, তারাও সাধারণ মানুষ।

কিন্তু আমাদের ঠিকানা না জেনে সেই বনগাঁ থেকে এতদূর এল কী করে?

সীমান্ত পার হবার সময় এদিকে কিংবা ওদিকে তাকে ঝঞ্ঝাটে পড়তে হয়েছিল কি না, সে বিষয়টা সে এড়িয়ে গেল। বারবার বলতে লাগল, না, কিছু হয় নাই।

কান্না শুরু হল বনগাঁয় এসে। সেখানে সে লোকজনদের বলতে লাগল, কলকাতায় সুনীলদার বাসায় কীভাবে যাব?

ঠিকানা জানে না শুনে অনেকেই হেসেছিল।

আমার নাম শুনলেই লোকে আমার বাড়ির সন্ধান দিয়ে দেবে, আমি মোটেই তেমন বিখ্যাত নই। কেউ কেউ বলেছিল, কলকাতা কি একটা গ্রাম যে একজন মানুষের নাম দিয়ে বাড়ির ঠিকানা হয়?

যাই হোক, দয়াপরবশ হয়ে একটি দম্পতি তাকে ট্রেনে সঙ্গে নিয়ে আসে শিয়ালদা স্টেশন পর্যন্ত। এর মধ্যে একটা ব্যাগে সে স্বাতীর জন্য কিছু উপহার দ্রব্য নিয়ে এসেছিল, সেই ব্যাগটি নিয়ে কেউ সরে পড়ে।

শিয়ালদা স্টেশনে নেমে সেই একই ব্যাপার। লোকের কাছে আমার নাম বলে কোনও কাজ হয়নি।

স্বাতী তাকে কোনও একবার বলেছিল, আমাদের বাড়ির কাছেই আছে আদি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়। খুব বড় দোকান, বাংলাদেশ থেকে অনেকেই সেই দোকান থেকে শাড়ি কিনতে আসে।

এবারে সে বুদ্ধি করে সেই দোকানের নাম বলায়, একজন তাকে তুলে দিয়েছিল বাসে। নেমেছে গড়িয়াহাটের মোড়ে।

আদি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়ে ঢুকে জিজ্ঞেস করেছিল আমার কথা। ওই দোকানের একজন মালিক আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনে অবশ্য, কিন্তু সে তখন দোকানে ছিল না। অন্য কর্মচারীরা সেই সময় খদ্দেরদের ভিড় সামলাতে ব্যস্ত। তারা পাত্তা দেয়নি।

তারপর রাস্তায় দাঁড়িয়ে কান্না।

শেষ পর্যন্ত যে পৌঁছেছে আমাদের বাড়িতে, সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। কিন্তু এইভাবে কেউ আসে?

সারল্য ব্যাপারটা আমরা সবাই পছন্দ করি। কিন্তু সেই সারল্য মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে যখন বোকামির পর্যায়ে পড়ে, তখন বেশ রাগ হয়।

মিতুর শরীরে রূপ ও যৌবন আছে, মেয়েদের ওই শরীর লুট করার জন্য দস্যুরা ওঁত পেতে আছে যেখানে-সেখানে। এর মধ্যে এদেশ-ওদেশের বিভেদ নেই। ওর হাতে ও গলায় গয়নাও রয়েছে, অর্থাৎ প্রলোভনের আরও বস্তু। আমাদের বাড়িতে আসবার জন্য ওর কোনও গুরুতর বিপদ হলে আমাদের মনের অবস্থা কী হতো?

আমি ওকে মৃদু ভর্ৎসনা করতে যাচ্ছিলাম, স্বাতী নিষেধ করল চোখ দিয়ে।

মিতুর পিঠে হাত দিয়ে নরম করে বলল, আহা, মেয়েটার খুব টেনশন গেছে। ভালো করে বিশ্রাম নিক। তারপর কাল-পরশু ওকে শান্তিনিকেতন নিয়ে যাব। কাল হবে না। পরশু দশটার ট্রেনে।

মিতু বলল, আমি তো পরশু পর্যন্ত থাকব না। কাল চলে যাব।

এবার আমাদের আবার অবাক হবার পালা। বলে কি মেয়েটা। কালই চলে যাবে। এত অল্প সময়ের জন্য এমন ঝুঁকি নিয়ে আসার কী মানে হয়?

স্বাতী বলল, ধ্যাৎ! কাল আমি তোমাকে মোটেই যেতে দেব না। এক গাল হেসে মিতু বলল, বউদি, কাল আমাকে যেতেই হবে। প্লেনের টিকিট কাটা আছে।

এ কথাটা শুনে আমার খটকা লাগল। এসেছে বাসে, বর্ডার পেরিয়ে। আর ফিরবে প্লেনে, এ রকম তো ভিসা পাওয়া যায় না। যে পথ দিয়ে আসা, সেই পথ দিয়ে ফেরাই নিয়ম।

মিতু বলল, আমি তো ঢাকায় ফিরব না। যাব সৌদি আরব। আপনাদের সাথে শুধু দেখা করতে আসছি।

যাঃ, কী বলছ মিতু? কলকাতা থেকে তো সৌদি আরবের কোনও ফ্লাইট নেই।

আগে তো দুবাই যাব। সেইখান থিকা আবার প্লেন বদল।

তুমি তো ঢাকা থেকেই দুবাই কিংবা সৌদি আরবে সরাসরি যেতে পারতে। এত কষ্ট করতে গেলে কেন?

বাঃ, তাইলে তো আপনাগো সাথে দেখা হইত না!

শুধু আমাদের সঙ্গে একবার দেখা করার জন্য সে এমন ঘোরাপথ নিয়েছে, এটা আমাদের পক্ষে আনন্দের কথা বটে, কিন্তু ঠিক যেন বিশ্বাসযোগ্য নয়!

তুমি সৌদি আরবে যাবে কেন?

এমনিই। বেড়াইতে। অন্য কাজও আছে।

তুমি একা একা অতদূরে যাচ্ছো। শামীম তোমাকে ছেড়ে দিল?

হ্যার কিছু আসে যায় না। আমি বাঁচি কিংবা মরি—

ও, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?

না, না, ঝগড়া হয় নাই। সেসব কিছু না। দুবাইতে আমার ভাই থাকে।

সে তোমাকে সৌদি আরবে নিয়ে যাবে?

না, সে যাবে না। ঐখানেও আমাদের চেনা মানুষ আছে।

আমি স্বাতীকে বললাম, এই মেয়েটির কথা আমার কেমন যেন উল্টোপাল্টা মনে হচ্ছে। তুমি ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলে দেখো তো! সত্যি কী পাগলামি করছে!

সন্ধেবেলা বেরিয়ে গিয়ে আমি বাড়ি ফিরলাম গভীর রাতে। ততক্ষণে মিতু ঘুমিয়ে পড়েছে। স্বাতীরও ঘুমচোখ। কোনও কথাই হল না।

যত রাতেই শুতে যাই, আবার ঠিক সকাল সাতটায় ঘুম ভাঙে। চা ও খবরের কাগজের তৃষ্ণায়। অনেকদিনের অভ্যেস।

আমাদের শুধু স্বামী-স্ত্রীর সংক্ষিপ্ত পরিবার। অতিথি কেউ এলে তাঁকে যতক্ষণ ইচ্ছে ঘুমোতে দেওয়া হয়। বেশির ভাগ দিনই আমি স্বাতীকেও না জাগিয়ে দরজার কাছে এসে খবরের কাগজ খুঁজি। কোনও কোনওদিন হকার আসতে দেরি করে। তখন আমি বারান্দায় গিয়ে উন্মুখভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকি। যেন প্রেমিকার প্রতীক্ষায়।

খবরের কাগজের জন্য এত টানের কোনও মানে হয় না। বেশিরভাগ দিনই তো খারাপ খবর থাকে। শুধু খুনোখুনি আর যুদ্ধ-বিগ্রহ। আর ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা। প্রথম পৃষ্ঠায় যেন চটচটে রক্ত লেগে থাকে।

তবু কাগজ পড়তেই হয়।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই উৎপল এসে পড়ে। চা বানায়। একেকদিন উৎপলই বগলে করে খবরের কাগজগুলো নিয়ে আসে।

বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে আমি সকালটা উপভোগ করি। আজও আকাশ মেঘলা। রোদের তেজ নেই, বাতাস বেশ সুস্বাদু। ছোট ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসছে, আমাদের বাড়ির কাছেই এক বিরাট স্কুল।

বাচ্চা ছেলেদের দিকে তাকিয়ে থাকলে আমার শৈশবের কথা মনে পড়ে না। মনে পড়ে আমার ছেলের ওই বয়েসের কথা। এক একটি শিশুর সঙ্গে আমার ছেলের যেন খুব মিল।

আমার নিজের শৈশব এখন বড় বেশি দূর হয়ে গেছে।

এক কাপ চা নিয়ে এসে স্বাতী একটা মোড়া টেনে বসল আমার পাশে।

ফিস ফিস করে বলল, জানো, কাল অনেকক্ষণ কথা বললুম মিতুর সঙ্গে। আমার খুব চিন্তা হচ্ছে মেয়েটার জন্য। ও কিছু একটা গণ্ডগোল করতে যাচ্ছে। ওর মাথার ঠিক নেই। ও একগাদা গয়না নিয়ে এসেছে নিজের কোমরে একটা পুঁটলি বেঁধে।

সেগুলো আমার কাছে রেখে যেতে চায়। আমার কি রাখা উচিত?

গয়না নিয়ে এসেছে? কেন?

বলল তো, এত গয়না নিয়ে বিদেশে যাওয়া সেফ না।

ততো ঠিকই। কিন্তু এইসব গয়না ঢাকায় রেখে এল না কেন? ব্যাংকে রেখে আসা উচিত ছিল।

সেটাই তো কথা! বারবার জিজ্ঞেস করেছি, শামীমের সঙ্গে ওর ঝগড়া হয়েছে কি না। ও তো না না বলছে। একবার শুধু বলে ফেলল, শামীম নাকি ওর কোন ছাত্রীর সঙ্গে প্রেম করছে।

এই রে! এ তো গণ্ডগোলের ব্যাপার।

ওতো বলছে, সেই মেয়েটা নাকি খুব ভালো। মিতুও তাকে পছন্দ করে, তাই ও কিছুদিন শামীমের থেকে দূরে থেকে দেখতে চায়, শামীম মেয়েটিকে বিয়ে করতে চায় কি না। তাহলে ও মেনে নেবে!

এ তো বেশ জটিল ব্যাপার। মিতু এত সহজে ওর দাবি ছেড়ে দেবে, আগে ওকে দেখে তো তা মনে হয়নি। বরং শামীমকে আঁচড়ে কামড়ে নিজের কাছে ধরে রাখলেই সেটা স্বাভাবিক হত। এর মধ্যে বোধ হয় আরও কিছু গণ্ডগোল আছে।

মিতু বলছে, শামীম অন্য মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, করুক। কিন্তু ওর নিজের গয়না কারুকে দেবে না। তাই সঙ্গে নিয়ে এসেছে!

স্বামীর চেয়েও গয়নার দাম বেশি হল?

ওদের বিয়ে হয়েছে এগারো বছর। কিন্তু এখনও কোনও ছেলেমেয়ে হয়নি। সেটাও একটা অশান্তির কারণ হতে পারে। ওর শাশুড়ি গ্রাম থেকে এসে ওদের সঙ্গে থাকেন মাঝে মাঝে।

সন্তান না হলে শুধু মেয়েরাই দায়ী হবে কেন? পরীক্ষা-টরিক্ষা কিছু করিয়েছে? দত্তক নিতে পারে। কত অনাথ শিশু আছে।

সেসব কিছু বলল না। আর একটা ব্যাপার। দুবাইতে ওর ভাইটাই কেউ নেই। এমনিতে তো মেয়েটা খুব সরল। সাজিয়ে গুছিয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারে না। মুখের রেখায় ধরা পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ও স্বীকার করেছে যে ওসব দেশে ওর কেউ চেনা নেই। ও যাচ্ছে চাকরি করতে।

এই রে! তা হলেও নিশ্চয়ই কোনও র‍্যাকেটে পড়ে গেছে। ওকে আটকাতেই হবে!

এবার স্বাতী হঠাৎ সুর বদল করে বলল, কেন, ওকে আটকাতে হবে কেন? মেয়েরা চাকরি করতে অন্যদেশে যেতে পারে না? আমি যদি তেহরানের সেই চাকরিটা শেষ পর্যন্ত পেতাম, তুমি আমাকে আটকাতে?

আমি হেসে বললাম, তুমি এর মধ্যে নিজেকে টেনে আনছো কেন? তুমি যখন

চাকরির চেষ্টা করেছিলে, তখন ইরানের অবস্থা অন্যরকম ছিল। তখনও খোমেইনি আসেননি। খোমেইনি এসে গিয়ে ফতোয়া জারি করলেন, তুমি একে বিদেশিনী, মুসলমানও নও, তাই আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেলে না! এর মধ্যে আমার আপত্তির কোনও প্রশ্ন নেই। মিতু কী চাকরি করবে?

ও ছ'মাস নার্সিংয়ের ট্রেইনিং নিয়েছে ইতোমধ্যে।

যতদূর জানি, সৌদি আরবে মেয়েদের আব্রু নিয়ে খুব কড়াকড়ি আছে। মেয়েদের ইচ্ছেমতন চলাফেরা করার স্বাধীনতাও নেই। সেখানে মিতু টিকতে পারবে? তাছাড়া, এ দেশ থেকে, বাংলাদেশ থেকে আড়কাঠিরা চাকরির লোভ দেখিয়ে মেয়েদের মধ্যপ্রাচ্যে নিয়ে যায়, তারপর তাদের দিয়ে দাসী-বাঁদির কাজ করায়। এসব তুমি জানো না?

সকলেরই যে সেরকম হবে, তার কী মানে আছে? নার্সের কাজ তো সম্মানের কাজ।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আছে ওর কাছে?

সেকথা জিজ্ঞেস করিনি। কিন্তু গয়নাগুলো কি আমার কাছে রাখা ঠিক হবে? অনেক গয়না, বেশ দাম। পরের জিনিস রাখতে ভয় করে।

আমার মতে মোটেই ঠিক নয়। গয়না-ফয়নার দায়িত্ব তুমি কেন নিতে যাবে? আসল ব্যাপারটা কী হয়েছে, তা জানা দরকার।

তুমি ঢাকায় টেলিফোন করে দেখো না।

শামীমের ফোন নাম্বার আমার কাছে নেই। মিতু ঘুম ভাঙলে জিজ্ঞেস করতে হবে। তার আগে, বেলাল চৌধুরীর কাছ থেকে কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে।

সেই সময়ে, অর্থাৎ আশির দশকে কলকাতার সঙ্গে ঢাকার টেলিফোন সংযোগ তেমন সুগম হয়নি। এক-একদিন হাজার চেষ্টা করেও কোনও লাইন পাওয়া যায় না।

বেলালকে ধরা গেল না। মিতু ইচ্ছে করে শামীমের ভুল নাম্বার দিল কি না, কে জানে, সে নাম্বারে কোনও সাড়াশব্দই হল না।

মিতুর কাছে চাকরিব কোনও নিয়োগপত্র নেই। ওখানে গেলে নাকি সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার সৌদি আরবের ভিসা আছে? দেখি তো পাসপোর্ট।

একেবারে নতুন পাসপোর্ট। সব পৃষ্ঠা সাদা। শুধু মাঝখানের একটা পাতায়, কী ভাষায় জানি না, দু'লাইন কিছু লেখা আছে। হাতের লেখা। তার সঙ্গে কোনও সিলমোহর কিংবা সরকারি ছাপ নেই।

এ আবার কী রকম ভিসা?

আমার মনে পড়ল, একবার ইউরোপ থেকে ফিরছি, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টে আমাদের প্লেনে দুটি মেয়েকে তুলে দেওয়া হল, তাবা অঝোরে কাঁদছে। একজনকে বসানো হল আমারই পাশে। এয়ার হোস্টেসকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ওরা ফিলিপিন্‌সের মেয়ে। চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে কেউ ওদের বেইরুটে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ওদের কাছে ভিসা নেই দেখে এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ ঠিক পরের প্লেনে তুলে দিয়েছে সেটাই নিয়ম। এ প্লেনটা অবশ্য ফিলিপিন্‌সে যাবে না। থাই এয়ারলাইনস, যাত্রা শেষ হবে ব্যাংককে। সেখানেই বা এই মেয়ে দুটি নামবে কী করে, সে দেশেরও তো ভিসা নেই।

আমার' পাশের মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেই চলেছে। এক সময় সে হঠাৎ আমার কোটের হাতা চেপে ধরে খুবই ভাঙাভাঙা ইংরিজিতে যা বলতে লাগল, অতি কষ্টে তার অর্থ উদ্ধার করা যায়। সে বলতে চাইছে, আমি যেন তাকে আমার দেশে নিয়ে যাই, সেখানে সে যে কোনও কাজ করতে রাজি। এমনকি বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়াও। আমি আশ্রয় না দিলে ব্যাংককে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করবে। অনেক অত্যাচার করবে।

আজকাল ভিসা-পাসপোর্টের এমন কড়াকড়ি যে পথের মধ্যে কোনও বিপন্না নারীকে উদ্ধার করার কোনও উপায়ই নেই। ব্যাংককে নেমে আমাকে নিষ্ঠুরের মতন তার হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে পালাতে হয়েছিল।

মিতুকে সে কাহিনি শোনালেও সে বিচলিত হল না।

সে বলল, আমরা বাংলাদেশের সিটিজেন, সৌদি আরবে আমাদের ভিসা লাগে না।

এটা সত্যি কি না আমি জানি না।

তবু আমার মনে হল, এভাবে মিতুর যাওয়াটা একেবারেই ঠিক হচ্ছে না। শামীমের সঙ্গে একবার কথা বলা অবশ্য দরকার। মিতু কি স্বামীকে কিছু না জানিয়ে চলে এসেছে?

রাত্তিরের দিকে তবু টেলিফোনের লাইন পাওয়া সহজ। আজ রাত্তিরে চেষ্টা করতে হবে, মিতুকে বললাম, তুমি আজকের দিনটা অন্তত থেকে যাও। প্লেনের টিকিট বদলাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

মিতু তাতে রাজি নয়। তাকে আজই সন্ধেবেলা যেতে হবে।

কয়েক ঘন্টা ধরে তাকে বোঝাবার চেষ্টা হল। তার জেদ একেবারে তুঙ্গে, সে কোনও যুক্তিই মানবে না।

স্বাতী একবার গয়নার প্রসঙ্গ তুলতেই সে কেঁদে ফেলল।

স্বাতীর হাঁটু চেপে ধরে বলতে লাগল, গয়নাগুলো রাখতেই হবে। ঢাকায় সে বিশ্বাস করে কারুর কাছে রেখে আসতে পারেনি। তার এইসব গয়না যদি নীলোফার

পরে, তা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। তাহলে তাকে আত্মহত্যা করতে হবে।

নীলোফার কে?

ওই তো সেই মেয়েটা, হিস্ট্রিতে ফার্স্ট হইছে, যার জইন্যে শামীম একেবারে পাগল!

অর্থাৎ গয়নাগুলো নিরাপদে রাখার জন্যই মিতু আমাদের বাড়িতে এসেছে। অন্য কোনও টানে নয়।

দুপুরে ঝিঙে-পোস্ত খাওয়ার জন্য মিতু ইচ্ছে প্রকাশ করল। হিন্দুবাড়ির ঝিঙে-পোস্তর মতন রান্না নাকি ঢাকায় হয় না। আরও দু'তিন রকম মাছও রান্না করল স্বাতী, আরবদেশে মাছ পাওয়া যায় কি না কে জানে!

সন্ধেবেলা আমরা দু'জনে মিতুকে পৌঁছে দিতে গেলাম বিমানবন্দরে। আমার অন্য কাজ ছিল, তবু মনটা খাচখচ করছিল, মিতুকে এভাবে যেতে দেওয়ার জন্য খানিকটা অপরাধও বোধ করছিলাম।

কিন্তু একটি ছত্রিশ বছরের রমণীকে কি তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে আটকে রাখা যায়? সে যে কোনও কথাই শুনবে না।

ঢাকায় যতবার গিয়েছি, এই দম্পতিটিকে আমাদের খুবই ভালো লেগেছে। মিতু আর শামীমের মধ্যে নানারকম ঝগড়াঝাঁটির যে খুনসুটি দেখেছি, তা প্রগাঢ় ভালবাসারই লক্ষণ। শামীম শান্তপ্রকৃতির মানুষ, সে যে বিয়ে ভেঙে দিয়ে অন্য নতুন জীবনের ঝুঁকি নেবে, তা ঠিক যেন বিশ্বাস করা যায় না। অবশ্য মানুষের জীবনে অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনাই তো ঘটে। অধিকাংশ মানুষের জীবনই নদীর মতন আঁকাবাঁকা, খালের মতন সরল নয়। কারুর কারুর জীবন আবার পাহাড়ি নদীর মতন, হঠাৎ জলপ্রপাত হয়ে শূন্যে ঝাঁপ দেয়।

বিমানবন্দরগুলোতে শুধু যাত্রী ছাড়া অন্যদের ভেতরে ঢুকতে দেয় না। প্রবেশদ্বারের কাছে গিয়ে সে হঠাৎ দৌড়ে ফিরে এসে কাঁদতে কাঁদতে আমাদের দু'জনের পা ছুঁয়ে কদমবুসি করল। আর কোনও কথা না বলে আবার দৌড়েই ফিরে গেল ভেতরে।

দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, এক জায়গায় আরও জনাদশেক নারী জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মিতু ভিড়ে গেল তাদের মধ্যে।

আবার আমার বুক কেঁপে উঠল।

একা নয়, একটা দলের সঙ্গে যাচ্ছে মিতু। এই মেয়েরা সকলেই নিশ্চয়ই কলকাতায় গয়না জমা রাখতে আসে নি। তবে ঢাকা থেকে প্লেনে না উঠে কলকাতায় এল কেন? নারী-পাচারের কারবার হলে ঢাকায় ধরা পড়ে যেত।

কোনওক্রমে কি মিতুকে এখনও আটকানো যায় না? অসহায় বোধ করতে

লাগলাম, আমার কী ক্ষমতা আছে! সরল মেয়েটা জেদ করে এ কোন্ সর্বনাশের পথে যাচ্ছে? শামীমের ওপরেও রাগ হল খুব।

স্বাতী বলল, আমাদের কল্যাণ এয়ারপোর্টের ম্যানেজার না! সে হয়তো কিছু করতে পারে।

কল্যাণকে এখন কোথায় পাব? ভেতরে তো ঢুকতেই দেবে না।

এই সময় একজন সিকিউরিটি অফিসার বেরিয়ে এসে আমাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। তারপর বলল, আপনি...স্যার, একটা অটোগ্রাফ দেবেন?

এত বছর ধরে লেখালেখি করার এইটুকুই যা সুফল। হঠাৎ হঠাৎ কেউ চিনতে পারে।

দ্রুত সই করতে করতে বললাম, ভাই, এয়ারপোর্ট ম্যানেজারের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই, বিশেষ দরকার।

লোকটি বলল, আসুন আমার সঙ্গে। আপনাকে কে আটকাবে?

সৌভাগ্যবশত কল্যাণকে পাওয়া গেল তার ঘরে। সামনে অনেক লোক, তার দু'হাতে দুটো টেলিফোন।

কল্যাণ বলল, কী ব্যাপার সুনীলদা? আবার কোথায় যাচ্ছেন? কোন্ ফ্লাইট?

অন্য লোকদের অগ্রাহ্য করে বললাম, আমরা কোথাও যাচ্ছি না, শোনো, বিশেষ দরকার...

সংক্ষেপে ঘটনাটা তাকে বুঝিয়ে বললাম।

তারপর বললাম, কল্যাণ, শিগগিরই পুলিশকে বলো ওদের আটকাতে। নিশ্চয়ই গণ্ডগোল আছে।

কল্যাণ বলল, পুলিশের ওপর আমার কন্ট্রোল নেই। এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সিকিউরিটির ব্যাপার। তবু চেষ্টা করে দেখছি—

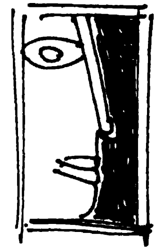
টেলিফোনে সামান্য কথা বলেই কল্যাণ কাঁধ ঝাঁকিয়ে জানাল, রয়াল জর্ডন এয়ারলাইনসের ফ্লাইট এই মুহূর্তে টেক অফ করছে, আর কিছু করার নেই।

আমার মনে হল, সেই পাগলি মেয়েটাকে গভীর জলে বিসর্জন দেওয়া হল!

ফেরার পথে গাড়িতে স্বাতী আর আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ। মিতুর কথাই মনে পড়ছিল। কিন্তু মানুষের স্বার্থচিন্তাই সব সময় প্রবল, কখনও তা অবচেতনে থাকে, কখনও প্রকাশ্যে।

এক সময় স্বাতী বলল, মিতু অতগুলো গয়না আমার কাছে রেখে গেল। সবগুলোই ওর কি না, তা তো আমি জানি না। যদি অন্য কারুর, ধরো, ওদের বাড়িতে যত গয়না সব নিয়ে চলে আসে, তাহলে...আমরা...ধরো, এরপরে কেউ যদি ঢাকা থেকে এসে আমাদের চার্জ করে...

মিতু এরকম একটা অবৈধ, অন্যায় কাজ করে আমাদের বিপদে ফেলে যাবে? বিশ্বাস হয় না। আবার তার ওপর পুরোপুরি বিশ্বাসও রাখতে পারি না।



২

পরদিন সকালেই ডাকাতি হল আমাদের ফ্ল্যাটে।

প্রতিদিন সকাল ঠিক সাতটার সময় উৎপল এসে দরজার বেল দেয়। আমি কিংবা স্বাতী যে কোনও একজন উঠে গিয়ে খুলে দিয়ে আসি দরজা। আসলে বেল শোনার পরই স্বাতীর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়। অর্থাৎ কে যাবে?

পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের কিছুটা অসুবিধে থাকে, রাত-পোশাকের ওপরেও মেয়েদের একটা কিছু জামা চাপাতে হয়, পুরুষরা খালি গায়েও দরজা পর্যন্ত যেতে পারে। তবু অধিকাংশ দিনই স্বাতীই আগে ওঠে, আগের রাতে বেশি পানাহার হলে আমি বেল না-শোনার ভান করি।

তবে পরপর দু'তিন দিন স্বাতী দরজা খুললে তার পরের দিন আমি স্বাতীকে কোনও সুযোগ না দিয়েই তড়াক করে নেমে পড়ি খাট থেকে। এরকম না করলে অন্য কোনও প্রসঙ্গে স্বার্থপরতার অভিযোগ ঘনীভূত হয়ে আসে।

উৎপল বেল দিতেই বুঝে যাই, সাতটা বাজে, ঘড়ির দিকে তাকাতে হয় না।

সেদিন আমারই দরজা খোলার পালা।

খুলে দেখি, উৎপলের বদলে দাঁড়িয়ে আছে অন্য একটা ছেলে। হাতে একতাড়া কাগজ, সে বলল, নিউজ পেপার স্যার।

অন্যদিন কাগজগুলো দরজার বাইরে পড়ে থাকে কিংবা উৎপল নিয়ে আসে তলা থেকে। খবরের কাগজওয়ালাকে আমি কোনওদিন চোখেও দেখিনি।

তবু, ঘুম চোখে কোনও সন্দেহ হল না। হাত বাড়িয়ে কাগজগুলো নিতে যেতেই সেই ছেলেটি আমাকে ঠেলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। তার সঙ্গে আরও তিনজন। সবচেয়ে চোয়াড়ে চেহারার ছেলেটি আমার কপালে ফস করে একটা রিভলভার ঠেকিয়ে বলল, একেবারে টুঁ শব্দটা করবি না শালা!

চারজনেরই বয়েস চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যে, প্যান্ট-শার্ট পরা, মুখ ঢাকারও দরকার মনে করেনি। এই বয়েসের ছেলেরা চট করে মানুষ খুন করে ফেলতে পারে, যেমন

নিজেরাও তুচ্ছ কারণে প্রাণ দেয়।

আমাকে ঠেলতে ঠেলতে ভেতরে এনে রিভলভারধারী বলল, বেডরুম কোনটা?

এদের সঙ্গে কোনও রকম চালাকি করার সাধ আমার নেই। সিনেমার নায়কোচিত কায়দায় এক লাথি মেরে রিভলভারটা ফেলে দেওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব নয়, অন্য দু'জনের হাতে ছুরি আছে।

এই সময় স্বাতী হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

অথচ তার এত তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করার কোনও কারণই নেই সেদিন।

মেয়েদের অনুভূতি অনেক সূক্ষ্ম হয়। অন্যদিনের চেয়ে আলাদা কিছু একটা ব্যাপার হচ্ছে, সে টের পেয়েছিল ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে।

রাত-পোশাকের ওপর শুধু একটা চাদর সে জড়িয়ে নিয়েছে, ডাকাতদের এক ছোকরা লাফিয়ে গিয়ে তার গলার কাছে চেপে ধরল ছুরি।

স্বাতীকে ওরা মেরে ফেলবে, তা আমি ভাবিনি, বরং তখুনি আমার মনে হল, স্বাতীকে নিশ্চয়ই এরা ধর্ষণ করবে। স্বামীকে বেঁধে রেখে তার সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ করতে এই ধরনের ডাকাতরা। বিশেষ আনন্দ পায়।

স্বামী হিসেবে তা কি আমি সহ্য করব? আমার পৌরুষের মর্যাদা তারপর আর এক বিন্দুও অবশিষ্ট থাকবে? আমাকে একটা কিছু করতেই হবে, এমনকী স্বাতীকে বিধবা হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও!

আমি চেঁচিয়ে বললাম, স্বাতী, ওদের আলমারির চাবি দিয়ে দাও। যা নিতে চায় নিক। বাধা দিও না!

আজকাল কারুর বাড়িতেই বেশি ক্যাশ টাকা থাকে না। গয়না-টয়নাও থাকে ব্যাংকের লকারে। খুব দামি জিনিস বলতে দেওয়ালে ঝুলছে যামিনী রায়ের একটি আসল ছবি, আরও কয়েকজন নাম করা শিল্পীর ছবি। যেগুলোর দাম কয়েক লাখ, কিন্তু সেসব ছবির মর্ম কি ওরা বুঝবে?

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ল, আমাদের বাড়িতে কালই আনোয়ারা রেখে গেছে একগাদা গয়না, তার দাম নিশ্চয়ই প্রচুর। পরের জিনিস! সেগুলো নিয়ে গেলে ফেরত দিতে হবে আমাদেরই! ডাকাতগুলো কি সে খবর আগে থেকে জেনে এসেছে?

স্বাতীর মুখেও ঠিক একই আশঙ্কার প্রতিফলন।

ছোকরা চারটির চেয়ে আমার বয়েস দু'গুণেরও বেশি। তবু আমাকে তুই-তোকারি ও শালা এবং অন্যান্য গালাগাল দিতে তাদের বাধে না। অকারণেই তারা বেশি হম্বি-তম্বি করছে। আমি শুধু এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি স্বাতীর দিকে। ভয়-ডর ছাপিয়ে চনমন করছে আমার বাঙাল রক্ত। যদি ওদের কেউ স্বাতীর গায়ে হাত দেয়, তা হলে আমি নিজে মরলেও ওদের একজনকে মারবই! কী করে মারব, তা অবশ্য জানি না।

ভেতরের ঘরে ঢোকার আগেই আবার দরজায় বেল বেজে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল আমার বুক। আর আশঙ্কায় নয়, আশায়। উৎপল এসে গেছে। উৎপল বুদ্ধিমান ছেলে, ব্যাপারটা বুঝে নিয়েই নিশ্চয়ই দারোয়ান, লিফটম্যান, সিকিউরিটির লোকদের ডেকে জড়ো করবে, এই হঠকারী ডাকাত ছোকরাদের আর পালাবার উপায় থাকবে না।

দু'জন ডাকাত দরজার দু'পাশে আড়াল করে দাঁড়াল। তারপর দরজাটা খুলে দিতে উৎপল ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তারা দু'জনে উৎপলের ঘাড় ধরে এক ঝটকায় ফেলে দিল মাটিতে। দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল। এরকম আকস্মিকতায় উৎপল কোনও আওয়াজ করারও সুযোগ পেল না।

আর কোনও আশা নেই!...

আসলে, এরকম কিছুই ঘটেনি।

আমি আবার বলছি, এটা একটা ভোরবেলার আধো-জাগ্রত স্বপ্ন, আমাদের ফ্ল্যাটে সত্যিই কোনও ডাকাত আসেনি।

স্বপ্নটা ভাঙার পর ধড়মড় করে উঠে দেখি, মাত্র পৌনে ছ'টা বাজে। জানালার বাইরে এখনও পুরো দিনের আলো ফোটেনি। কাক ডাকছে। আর একটা চিল।

এরকম অতি নাটকীয় ঘটনা গল্প-উপন্যাসে হয়, আমাদের জীবনে ঘটে না। ডাকাতি অবশ্য অতি বাস্তব ব্যাপার, পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও প্রতি পাঁচ মিনিটে একটি ডাকাতি সংঘটিত হচ্ছে। নানা ধরনের ডাকাতি। কোনওটা হিমালয় পর্বতের সমান, কোনওটা গরিবের ওপর বাটপাড়ি।

ফ্ল্যাট বাড়িগুলোতেও তো মাঝে মাঝে নানা ছলে ডাকাতি হয়, কাগজে পড়ি। আমাদের এ বাড়িটায় এ পর্যন্ত হয়নি। বস্তুত আমি এ পর্যন্ত কোনও ডাকাতকে চাক্ষুষ দেখিনি।

আজকাল তো শুনি ট্রেনে ডাকাতি করা প্রাইভেট টিউশনির উপার্জনের চেয়েও অনেক কম পরিশ্রমের এবং নিরাপদ। গুটিকয়েক দেশে দু'একটা সস্তা বন্দুক-পিস্তল জোগাড় করতে পারলেই টুকটাক ট্রেনে ডাকাতি করতে পারে। কেউ বাধা দেয় না, মন্দ রোজগার হয় না। কোনও ডাকাতদল ধরাও পড়ে না। আমি কত ট্রেনে ঘোরাঘুরি করি, কখনও আমার কামরায় কোনও ডাকাত ওঠে না।

এমনকী বিমান হাইজ্যাকিংও তো অহরহ ঘটে। সারা জীবনে কতবার প্লেনে উঠেছি, খুব শখ একবার একটা প্লেন হাইজ্যাকিং দেখি। সে সৌভাগ্য আমার আজও হল না!

এটা একটা অতি বাজে স্বপ্ন! ঢক ঢক করে অনেকটা জল খেলাম। হিসি করে এসে আরও এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেওয়া যায়।

কিন্তু আর ঘুম এল না। স্বাতী বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে, এই গরমের মধ্যেও ও

একটা চাদর চাপা দেয়।

মিতু অতগুলো গয়না রেখে গেছে। সেই দুশ্চিন্তা থেকেই অবচেতনে সেই স্বপ্নটা তৈরি হয়েছে। গয়না নিয়ে আমি এত মাথা ঘামাচ্ছি কেন? আমি একজন লেখক মানুষ, অনেকে কবি হিসেবেও জানে। আমার পক্ষে তুচ্ছ গয়না-গাঁটি নিয়ে চিন্তা করা কি মানায়? অবচেতনের সঙ্গে লড়াই করাও তো যায় না।

আরও একটা ব্যাপার নিয়ে আত্মবিশ্লেষণ শুরু হল। ওই যে আমি স্বপ্নের মধ্যে বীরপুরুষ সাজবার চেষ্টা করে ভাবলাম, স্বাতীর গায়ে কেউ হাত দিলে কিছুতেই সহ্য করব না। তাকে শেষ করে ফেলব—বাস্তবে সেরকম কোনও পরিস্থিতি এলে সত্যিই কি তা-ই করতাম, না নিজের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতাম আগে? ভাগ্যিস বাস্তবে এরকম কোনও পরিস্থিতিতে পড়িনি, তাই পরীক্ষাও দিতে হয়নি।

সাতটার সময় বেলের টুংটাং হতেই স্বাতী চোখ মেলে তাকাল। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আমি যাচ্ছি, তুমি শুয়ে থাকো।

অন্যদিন বিনা-দ্বিধায় দরজা খুলে দিই। আজ একবার ম্যাজিক আই দিয়ে দেখে নিলাম বাইরে। উৎপল এসেছে কাগজের বান্ডিল নিয়ে।

অন্য দিনেরই মতো আর একটি স্বাভাবিক দিনের শুরু।

স্বপ্নটা দেখার একটা লাভ হল এই, মনে মনে ঠিক করে নিলাম, মিতুর গয়না সম্পর্কে একটা কথাও বলব না স্বাতীকে। আমার অন্য অনেক চিন্তা আছে।

আজকের সব কাগজেই একটা ফ্ল্যাট বাড়ির ডাকাতি ও একটি ট্রেন ডাকাতির ঘটনা ফলাও করে ছাপা হয়েছে প্রথম পৃষ্ঠায়। তাত্ত্বিকভাবে বুঝি, এসবই হচ্ছে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে বঞ্চিত মানুষদের প্রত্যাঘাত। তবে, নিজের গায়ে দু'একটা খোলামকুচি লাগলে তত্ত্ব-ফত্ত্ব সব হাওয়া হয়ে যায়।

দিনের প্রথম টেলিফোনটি পেয়েই চমকে উঠলাম। মুর্শিদাবাদের একটা বইমেলার উদ্বোধনে আমার নাকি যাবার কথা, উদ্যোক্তারা গাড়ি নিয়ে আসছে আধঘণ্টার মধ্যে।

এই রে, মুর্শিদাবাদে যাবার কথা দিলাম কবে? আজ তো দুপুর তিনটেয় সাহিত্য আকাদেমির মিটিং। সন্ধেবেলা রশিদদের বাড়িতে নেমন্তন্ন। গাড়িতে মুর্শিদাবাদ এখন রওনা হলে কালকের আগে ফেরা যাবে না!

আমি টেলিফোনে বলার চেষ্টা করলাম, আজ তো ভাই আমার পক্ষে মুর্শিদাবাদ যাওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। আসলে আগে ভালো করে জানাওনি।

চায়ের কাপ মুখের সামনে ধরে স্বাতী স্থির চোখে চেয়ে আছে আমার দিকে। দু'চোখ ভর্তি ভর্ৎসনা।

খানিকক্ষণ বাক-বিসংবাদের পর ফোন ছেড়ে দিতে হল। কোনও রকম ছাড়াছাড়ি নেই, উদ্যোক্তারা আসবেই।

স্বাতী ঠান্ডা গলায় বলল, গত রবিবার মুর্শিদাবাদ থেকে তিন-চারজন এসেছিল

তোমার মনে নেই? তোমার নামে ছাপানো কার্ডও দিয়ে গেছে। কেন রাজি হয়ে যাও, প্রথমেই না বলে দিতে পার না? একবার রাজি হবার পর না-যাওয়াটা খুব খারাপ। তোমার কথার কোনও দাম নেই?

আমি বললাম, একটা কিছু ব্যবস্থা তো করতেই হবে। আজ মুর্শিদাবাদ যাওয়া অসম্ভব! ওরা এলে বলে দাও, আমি অসুস্থ!

আমি ওসব মিথ্যে কথা বলতে পারব না। তুমি টেলিফোনে কথা বলার সময় দিব্যি সুস্থ ছিলে! ডায়েরিতে সব লিখে রাখ না কেন?

সব যদি ঠিকঠাক করতে পারতাম, তাহলে তো কত উন্নতি করে ফেলতে পারতাম জীবনে!

রশিদের বাড়িতে না গেলে ও এমন চ্যাঁচামেচি শুরু করবে!

তুমি যাবে!

আমি একা যাব?

একা কেন, শক্তি তো যাবেই। নবনীতাও যেতে পারে। ওদের কারুকে ফোন করে সঙ্গে চলে যেও!

তুমি ভুলে যাচ্ছো, আজকের প্রধান উপলক্ষ তোমার একটা গল্পের স্ক্রিপ্ট শোনাবে। শাবানা আজমির আসবার কথা, আর তুমিই থাকবে না? এর চেয়ে মুর্শিদাবাদ যাওয়া তোমার পক্ষে বেশি জরুরি হল?

সেই জন্যে তো মুর্শিদাবাদ যেতে চাইছি না।

তাহলে কথা দিয়েছিলে কেন? কথা দিয়ে কথা না-রাখাটা আমি মোটেই পছন্দই করি না।

একেই বলে উভয় সঙ্কট! আজ সকালটাই খারাপভাবে শুরু হয়েছে। এক একটা দিন এমন হয়। কোনও কিছুই ঠিকঠাক ঘটে না।

এক মিনিট চা শেষ করার নীরবতা।

তারপর স্বাতী আবার বলল, তুমি মুর্শিদাবাদ চলে যাচ্ছো, অথচ কাল আমাদের শান্তিনিকেতন যাবার কথা। টিকিট কাটা আছে। তুমি কক্ষনো আমার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে এক সঙ্গে যেতে চাও না।

আমি তো মুর্শিদাবাদ যাচ্ছি না!

যাচ্ছো না মানে? লোকগুলো একটু পরেই চলে আসবে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। তোমার তো আবার বাথরুমে এক ঘণ্টা সময় লাগে! পুরুষ মানুষ বাথরুমে এত সময় কাটায়!

আমি সারাদিনে একবার বাথরুমে যাই। তোমার মতন সাতবার যাই না। দুপুরবেলা বাথরুমে আয়নার সঙ্গে কথাও বলি না।

আয়না ছাড়া আর কার সঙ্গে কথা বলব? তোমাকে তো বাড়িতে পাওয়াই যায়

না। হয় লেখার টেবিলে, নয় সভা-সমিতি–

ঝড় ওঠার আগে যেমন বিদ্যুৎ চমকায়, এ হচ্ছে ঝগড়া শুরুর অশনি সঙ্কেত। কথাবার্তা অন্যদিকে না ঘোরাতে পারলে আর ঝগড়া আটকানো যাবে না।

দিনের প্রথম সিগারেটটা ধরিয়ে বললাম, মুর্শিদাবাদ থেকে শান্তিনিকেতন যাবার চমৎকার রাস্তা আছে।

স্বাতী ভুরু কুঁচকে বলল, তাতে কী হয়েছে?

তুমিও আমার সঙ্গে চলো মুর্শিদাবাদ! রাত্তিরে থাকব সার্কিট হাউজে। কাল ওরা শান্তিনিকেতনে পৌঁছে দেবে!

যে কোনওরকম বেড়াবার প্রস্তাবে স্বাতী উৎসাহিত হয়ে ওঠে। অন্য কোথাও রাত কাটাতে ও নতুনত্ব পায় এখনও। কিন্তু আজ আর ওর সেই উৎসাহটা ছোঁয়া গেল না।

স্বাতী বলল, তাহলে রশিদের বাড়িতে আমরা যাব না?

পরে আর একদিন যাব। ওই চিত্রনাট্যের ব্যাপারে আমি তো বলেই দিয়েছি। কিছু কিছু বদল করলে আমার আপত্তি নেই। ওটা এখন আমার না শুনলেও চলবে।

রশিদকে আমি কথা দিয়েছি। শাবানা আজমিকে আমার কাছ থেকে দেখার ইচ্ছে আছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গীতাদি আসবেন। শক্তি, নবনীতা, এরকম আড্ডা ছেড়ে মুর্শিদাবাদের সার্কিট হাউজে রাত কাটাবার একটুও ইচ্ছে নেই আমার। তোমাকে যেতেই হবে, তুমি যাও!

আমি এখন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ছি। কেউ আসলে ডেকে তুলতে পারবে না।

ছি ছি ছি! ওরা তোমার নাম অ্যানাউন্স করে দিয়েছে। গাড়ি নিয়ে আসছে নিয়ে যাবার জন্য। সবরকম ব্যবস্থা করে রেখেছে, এরপরও তুমি যাবে না?

এবার আমি লম্বা করে চেঁচিয়ে বললাম, উৎপল। আর একটু চা দাও তো! তুমি আমাকে মুর্শিদাবাদে পাঠাতে চাইছ কেন বলো তো?

স্বাতী অবিশ্বাসের সুরে বলল, আমি তোমাকে জোর করে পাঠাতে চাইছি?

তাছাড়া কী? আমার তো একদিন হঠাৎ অসুখ হতেও পারে! যদি খুব জ্বর হত, তাহলে ওদের কথা দেওয়া সত্ত্বেও কি তুমি আমাকে মুর্শিদাবাদে যেতে দিতে? শরীরের অসুখের বদলে মনের অসুখটারও কি গুরুত্ব নেই? যেতে ইচ্ছে না-করাটাই মনের অসুখ!

উৎপল আবার চা নিয়ে এলে তাকে বললাম, মুর্শিদাবাদে বইমেলায় কী কার্ড দিয়ে গেছে, খুঁজে বের করো।

উৎপল এসব ব্যাপারে খুব সিদ্ধহস্ত। এক মিনিটে কার্ডটা এনে দেখাল। তাতেই হয়ে গেল সমস্যার সমাধান!

সেই কার্ডে রয়েছে একগাদা নাম। একজন মন্ত্রী, একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট,

সভাপতি, প্রধান অতিথি, উদ্বোধক, বিশেষ অতিথি।

কার্ডটা অবহেলার সঙ্গে স্বাতীর সামনে ছুড়ে দিয়ে বললাম, এই দ্যাখো, হরেকেষ্ট পালকে করেছে উদ্বোধক, আর আমি বিশেষ অতিথি! বিশেষ অতিথি মানেই তো ফালতু! এখানে আমার যাওয়া উচিত!

মুহূর্তে নরম হয়ে গেল স্বাতী। বাড়ির মধ্যে নিজের স্বামীকে সম্মান করুক বা না-করুক, বাইরের লোকের কাছে স্বামীর অসম্মান কোনো স্ত্রী-ই সহ্য করে না। স্বাতী বলল, সত্যি, এটা ওদের অন্যায়। সেদিন এমনভাবে বলে গেল, যেন তুমি না গেলে উদ্বোধন অনুষ্ঠানই হবে না। আসল উদ্বোধক তো অন্য একজন রয়েছে দেখছি!

হরেকেষ্ট পালকে স্বাতী একেবারেই পছন্দ করে না। মুখে সে কথা উচ্চারণ করবে না অবশ্য।

দাম্পত্য কলহের সূচনার মেঘটা সরে গিয়ে ফুরে ফুরে হাওয়া বইল। এখন আমি একটা-দুটো মিথ্যে কথা বললেও স্বাতীর আপত্তি নেই। ও নিজেই বলল, সত্যি, এ জন্য অতদূর যাওয়ার কোনও মানে হয় না।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আজ থেকে আমি একটা সিদ্ধান্ত নিলাম। বিশেষ অতিথি হয়ে আর কোনওদিন কোনও উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যাব না!

স্বাতী বলল, সভাপতি-টভাপতি হয়ে যাওয়াটাও এখন থেকে কমাও! ফট করে কারুকে কথা দিয়ে ফেলো না।

মুর্শিদাবাদের বইমেলার উদ্যোক্তাদের ফিরিয়ে দিতে তেমন কিছু অসুবিধে হল না। সময় লাগল মোট দশ মিনিট। কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে না থেকে আমি তাদের কাছে এসে বিনীত কিন্তু কঠিন গলায় বলে দিলাম, ভুল করে আমি আরও এক জায়গায় যাবার কথা দিয়ে ফেলেছি, সুতরাং মুর্শিদাবাদে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কয়েকবার ওরা বলল বটে, চলুন স্যার, না গেলে আমরা ফল্‌স পজিশনে পড়ে যাব স্যার, কিন্তু আমি অনড়। শেষ পর্যন্ত একটা শুভেচ্ছা বাণী লিখে দিতে হল। এসব ধরা-বাঁধা গতের শুভেচ্ছা বাণী লিখতে আমার আড়াই মিনিট লাগে।

তারপরেও একজন কাতরভাবে বলল, যাবেন না স্যার? পোধান অতিথি বোধহয় আসতে পারবেন না। আপনি যদি পোধান অতিথির ভাষণটা দিতেন...

প্রধান শব্দটা উচ্চারণও করতে পারে না। তবু বইমেলা করা চাই। গাড়িটা শুধু আমার একার জন্যে আনেনি, এই গাড়িতেই উদ্বোধক এবং একজন গায়িকা যাবে। সুতরাং ওদের কিছু ক্ষতি হবারও প্রশ্ন নেই।

সেদিন আমি মুর্শিদাবাদ চলে গেলে স্বাতীকে খুবই অসুবিধের মধ্যে পড়তে হত।

দুপুরবেলা খেতে বসেছি, এমন সময় কামাল এসে হাজির।

কামাল এ বাড়িতে যখন তখন আসে, বছরের যে কোনও সময়।

ঢাকা কিংবা মালয়েশিয়া কিংবা টরেন্টো থেকে। সে বলতে গেলে আমাদের পরিবারেরই একজন, তার জন্য এ বাড়িতে ভাত বাঁধা আছে। সে এসেই আমাদের সঙ্গে খেতে বসতে পারে, কখনও কিছু কম পড়ে না।

কামালের সব সময় ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। দরজার সামনে জুতো খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল, চলে গেছে না আছে?

কোনও রকম কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করার আগেই কেউ এ রকম প্রশ্ন করে! কামালের পক্ষে সবই সম্ভব।

আমি বললাম, অনেকেই চলে গেছে। অনেকেই আছে। তুমি কার কথা বলছ?

কামাল বলল, আনোয়ারা?

তার কি এখানে থাকার কথা ছিল?

সে এখানে আসে নাই?

এলেই কি সবাই থাকে?

কামাল ঠিক এ ধরনের কথা শুনতে অভ্যস্ত নয়। সে শুধু বোঝে ঘটনা। আছে না নেই?

তাকে বললাম, বসে পড়ো, খেয়ে নাও!

কামাল কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবল। তারপর খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, আসো, ভিতরে আসো!

এবার দরজা দিয়ে ঢুকল একজন তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছরের যুবক। খেলোয়াড়সুলভ চেহারা, পরনে চিনে-বাদাম রঙের কোট-প্যান্ট, মুখখানা ব্যাজার। সে শুকনো গলায় খুব দ্রুত বলল, আস্‌সামু আলাইকুম!

আমি ডান হাত তুলে বললাম, আলাইকুম আস্‌সালাম!

কামাল বলল, এ হইল শামীমের ছোট ভাই হাবিব। আনোয়ারার খোঁজ করতে আসছে। ভাবলাম, তোমরা নিশ্চয়ই জানবে। কলকাতায় এসে সে অবশ্যই স্বাতীর সঙ্গে দেখা করবে।

শামীম-আনোয়ারাদের বাড়িতে যে-কবার গিয়েছি, কখনো শামীমের কোনও ভাইকে দেখিনি। তার কোনও ভাইয়ের অস্তিত্বের কথাও শুনিনি। হতে পারে কোনও ফুফাতো-চাচাতো ভাই।

. ডাল-বেগুন ভাজার সঙ্গে সবে মাত্র দু'গেরাশ ভাত মুখে দিয়েছি, এখন কথা বলতে গেলে সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। অতিথিদের আপ্যায়ন করার মতো বিশেষ কিছু নেই আজ, আমরা সাধারণত দুপুরে শুধু ডাল-ভাত-মাছের ঝোল খাই। ঢাকায় এদের বাড়িতে বোধহয় প্রতিদিনই আট-দশ পদ থাকে।

তবু আমি ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে বললাম, খাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই? সামান্য যা আছে, আমাদের সঙ্গে বসে খেয়ে নাও!

উৎপল দু'খানা প্লেট এনে পেতে দিয়েছে এরই মধ্যে।

কামাল বসে পড়ে জিজ্ঞেস করল, আনোয়ারা আসে নাই এ বাড়িতে?

স্বাতী বলল, এসেছিল, কালই তো চলে গেল।

কামাল বলল, হাবিব, বসো।

সে ছেলেটি দাঁড়িয়ে থেকেই বলল, আমি কিছু খাব না।

তার ভুরু কোঁচকানো, কপালে দুটি ভাঁজ, মুখখানি খুবই অপ্রসন্ন। সে সারাঘরে চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে বলল, মিতু ভাবী এখানে নাই?

তার মানে কি, সে আমাদের কথা অবিশ্বাস করছে? আমরা মিতুকে লুকিয়ে রেখেছি! ফ্ল্যাটটা সার্চ করে দেখতে চায়?

এ ছেলেটি দেখছি ভদ্রতা-সভ্যতার ধার ধারে না।

স্বাতী একটু কঠোর চোখে তাকাল কামালের দিকে। অর্থাৎ, এরকম লোককে তুমি আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছ কেন?

কামালের আর একটি নাম 'পরোপকারী কামাল'। অন্যের যে কোনও সমস্যায় সে মাথা গলিয়ে অজস্র সময় ব্যয় করে। নিজের টাকাও খরচ করে। মিতুর খোঁজ করার জন্য সে হয়ত নিজের টাকায় প্লেনের টিকিট কেটে চলে এসেছে। অথচ ওই পরিবারের সঙ্গে তার তেমন কিছু ঘনিষ্ঠতা নেই।

হাবিবের ব্যবহারে কামাল খানিকটা অস্বস্তিবোধ করছে। সে বুঝতে পেরেছে, পরে সে স্বাতীর কাছে বকুনি খাবে।

কামাল বলল, ব্যাপারটা হয়েছে কি, আনোয়ারা হঠাৎ চলে আসছে তো, কারুকে কিছু জানায় নাই। শামীমের সঙ্গে অতি তুচ্ছ কারণে ঝগড়া হয়েছে, ওর রাগ তো সাংঘাতিক, অমনি একটা ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে চলে আসছে।

আমি বললাম, হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় ব্যাগ গুছিয়ে ঢাকা থেকে কলকাতায় আসা যায়? পাসপোর্ট লাগে, ভিসা লাগে, তা একদিনে হয়?

কামাল অম্লান বদনে বলল, ঢাকায় সবই হতে পারে। কলকাতায় আর তো কারুরে চেনে না। কোথায় যাবে?

সে তো কলকাতায় থাকার জন্য আসেনি। সে চলে গেল সৌদি আরব। তা-কি একদিনের ঝোঁকের মাথায় হতে পারে?

কামাল স্তম্ভিতভাবে বলল, সৌদি আরব?

হাবিব খাবার টেবিলে বসেনি, অন্য কোনও চেয়ারেও বসেনি, দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়। সে রুক্ষভাবে বলল. সৌদি আরবে যাবে কী করে? সে দেশের ভিসা পাওয়া সহজ নয়।

আমি বললাম, মিতু আমাদের বলেছে, বাংলাদেশীদের সৌদি আরবে যেতে ভিসা লাগে না।

হাবিব বলল, এ-কথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না। ভিসা না থাকলে তাকে প্লেনে উঠতেই দেবে না। সে কইলকাতাতেই কোথাও আছে।

স্বাতীর মুখখানা লাল হয়ে গেছে। এই ধরনের রুক্ষ কথা সে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। আমি উপস্থিত না থাকলে সে হয়তো কেঁদেই ফেলত।

এবারে আমি ছেলেটির দিকে তাকিয়ে খানিকটা ধমকের সুরে বললাম, এ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে আর আলোচনা করে লাভ নেই। আপনারা খোঁজ করে দেখুন।

তারপর কামালের দিকে ফিরে বললাম, তুমি তো জানোই কামাল, খাওয়ার পর আমি কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে বিশ্রাম নিই। বিকেলে আমার একটা মিটিং আছে। তোমার সঙ্গে রাত্তিরে দেখা হবে। তোমরা পাশের ঘরে শুয়ে থাকতে পারো।

হাবিব বলল, চলেন কামাল ভাই, আমরা একটা হোটেলে যাই।

কামাল বলল, চলো, তোমারে এক হোটেলে রেখে আসি। আমি তো এখানেই থাকি।

আমি যে একজন লেখক এবং ছোটখাটো একজন গণ্যমান্য লোক, হাবিব বোধহয় তা জানে না। কিংবা কলকাতার সব মানুষকেই সে ইন্ডিয়ার লোক হিসেবে অপছন্দ করে। মোটকথা, আমার বা স্বাতীর প্রতি সে বিন্দুমাত্র সৌজন্য দেখাবার প্রয়োজন বোধ করল না।

কামাল বলল, হাবিব, তুমি বাইরে দাঁড়াও, আমি আসতেছি। স্বাতীর কাছ থেকে কিছু এখানকার টাকা নিতে হবে।

শোবার ঘরে এসে আমি সবেমাত্র একটা সিগারেট ধরিয়েছি। কামাল এসে আমার পাশে বসে পড়ে বলল, তুমি কিছু মনে কোরো না। হাবিব ছেলেটা এমনিতে খুব ভালো, খুব দিলদরিয়া, এখন ওর ম্যাজাজটা খুব খারাপ হয়ে আছে। ওকে নিয়েই তো শামীমের সাথে আনোয়ারার ঝগড়া, তাই ও নিজেকে রেসপনসিবল ভাবছে। যদি আনোয়াররা কোনও বিপদ হয়...

আমি বললাম, ওকে নিয়ে ঝগড়া? মিতু যে অন্য কথা বলে গেল! শামীম নাকি ওর কোনও এক ছাত্রীর সঙ্গে...

না, না, সেটা বাজে কথা। একেবারে বাজে কথা। শামীম সেই টাইপই না। আসলে হাবিবের সঙ্গে আনোয়ারার একটু বেশি ভাব, তাই লোকে মনে করে, হয়তো কিছুই না, আবার হতেও পারে সিরিয়াস, আনোয়ারার তো বাচ্চা হয় নাই, মানে, মেয়েটা তো ইমোশনাল, আর শামীম এত ভালো মানুষ...

শোনো কামাল, কার সঙ্গে কার অ্যাফেয়ার হয়েছে, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। ওটা ওদের নিজস্ব ব্যাপার। তোমাকে শুধু এইটুকু বলি, মিতু মেয়েটা খুব সম্ভবত গভীর বিপদের মধ্যে পড়েছে। একদল মেয়ের সঙ্গে তাকে আমরা প্লেনে উঠতে দেখেছি। বলল, চাকরি করতে যাচ্ছে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই আমার ফিশি

মনে হল। যারা মেয়ে চালান দেয়, হয়ত সেই র‍্যাকেটে পড়েছে। শুনেছি, সৌদি আরবে এইসব মেয়েদের দিয়ে দাসী-বাঁদির কাজ করায়, নানারকম অত্যাচার করে। অনেকে পাগল হয়ে যায়। তুমি দেখো, তোমাদের দূতাবাসের মাধ্যমে ওর কোনও খোঁজ পাও কি-না। আমরা ওকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ওকে জোর করে আটকে রাখার তো কোনও উপায় ছিল না।

কামাল বলল, সৌদি আরব! ওখানে আমার দু'একজন চেনা আছে। দেখি যদি ওখানে চলে যেতে পারি...

নিজের টাকায় টিকিট কিনে মিতুকে উদ্ধার করার জন্য কামালের পক্ষে সৌদি আরবে চলে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। যদিও মিতুর সঙ্গে তার নিকট সম্পর্কে নেই।

উঠে দাঁড়িয়ে কামাল বলল, দেখি, কী করা যায়।

আমি বললুম, তাই ভাব। এখন কেটে পড়। আমাকে একটু ঘুমোতে দাও!

কামাল বেরিয়ে যেতেই স্বাতী বলল, এই হাবিবের মতন একজন অভদ্র মানুষের সঙ্গে মিতু প্রেম করতে পারে, এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না।

ছেলেটা অন্য সময় হয়তো এরকম অভদ্র নয়। এখন মাথাগরম হয়ে আছে। সবাইকেই শত্রু ভাবছে।

শামীমের মতন এমন চমৎকার মানুষ, তার বউ হয়ে মিতু এর সঙ্গে প্রেম করতে যাবে কোন দুঃখে?

যে-সব বিবাহিতা মেয়েরা পর-পুরুষের সঙ্গে প্রেম করে, তারা সাধারণত স্বামীর ঠিক অপোজিট নেচারের পুরুষেরই প্রেমে পড়ে।

তাই নাকি? তুমি জানলে কী করে?

অবজারভেশন! এটুকু অবজারভেশানের ক্ষমতা না থাকলে লেখক হলাম কী করে? মিলিয়ে দেখো! আর্টিস্টের বউরা প্রেমে পড়ে কোনও ব্যবসায়ীর, খেলোয়াড়ের বউরা প্রেমে পড়ে গায়কের, অফিসারের বউরা প্রেমে পড়ে কোনও বাউন্ডুলে ছেলের, আর লেখকের বউরা প্রেমে পড়ে পুলিশের। যেমন তুমি?

বাজে কথা বোলো না! তোমার থেকে আমার অবজারভেশান ক্ষমতা বেশি। নেহাৎ আমি লিখি না তাই!

একথা ঠিক। মেয়েরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু লক্ষ করে, যা পুরুষদের চোখ এড়িয়ে যায়। দলে দলে মেয়েরা সাহিত্যজগতে এলে অনেক পুরুষ লেখকদের ভাত মারা যেত। দেওরের সঙ্গে বউদির প্রেম তো চিরাচরিত ব্যাপার। সুতরাং মিতুর পক্ষে...তার স্বামী উদাসীন।

যাই বলো, আমার তবু ধারণা, শামীমের মতন ভদ্র, বিদ্বান মানুষের প্রেমে অনেক মেয়েই পড়তে পারে।

আপাতত এটা ত্রিকোণ না চতুর্ভুজ প্রেম, সে আলোচনা থাক।

শোনো, গয়নার ব্যাপারটা কী হবে? ওই হাবিবকে দিয়ে দেব? আমার কাছে রাখতে চাই না।

পাগল নাকি? হাবিবকে তো আমরা চিনিই না। মিতু রেখে গেছে, একমাত্র মিতুকেই ওগুলো ফেরত দেওয়া উচিত, নইলে ব্রিচ অফ ট্রাস্ট হবে।

কামালকে অন্তত জানিয়ে রাখব?

একদম না। কামালকে বলা মানে সমস্ত বিশ্ব-সংসারে রটিয়ে দেওয়া। তুমি গয়নাগুলো আজই ব্যাংকের লকারে রাখার ব্যবস্থা করো। মিতু একদিন না একদিন ফিরে আসবে নিশ্চয়ই।

যদি এর মধ্যে আমি মরে যাই? তখন গয়নাগুলোর কী হবে?

তুমি মরে গেলে? আমার আগে? সে সম্ভাবনা যদিও খুব কম, তবু ধরো যদি সে রকম কিছু হয়, তাহলে, আমাদের তো জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট, তোমার আর মিতুর সব গয়না আমি তুলে নিয়ে বাজারে ঝেড়ে দেব। বেশ কয়েক লাখ টাকা তো হবেই। তখন লেখা-টেখা ছেড়ে দিয়ে আমি হিমালয়ে একটা এয়ার কন্ডিশান্ড আশ্রম বানাব, সাধন সঙ্গিনী রাখব গোটা চারেক।

আ-হা-হা, খুব শখ! গোটা চারেক!

তার মানেই বুঝলে, বিশ্বে কোনও একজনের প্রেমে পড়িনি।

তোমাদের লেখকদের প্রেমের বাছবিচার নেই। যতজন ইচ্ছে..

এর পরেও আর ঘুমোনো গেল না।

কাগজ পড়তে পড়তে চোখ বুজে এসেছে মাত্র, ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন।

রশিদের বাড়িতে যেদিন আমাদের নেমন্তন্ন থাকে, সেদিন রশিদ অন্তত সাতবার ফোন করে মনে করিয়ে দেয়। কোনও প্রয়োজন নেই, ফোন করা ওর বাতিক। তা ছাড়া, সারাদিনে আমি কোথায় কখন থাকব, তা ওর জানা চাই।

আয়ান রশিদ খান কলকাতা পুলিশের একজন বড়কর্তা, সবাই তাকে চেনে। শুধু পুলিশের কাজ ছাড়া অন্য বহু ব্যাপারে তার দারুণ উৎসাহ। যেমন উচ্চাঙ্গ সংগীতের মাধ্যমেই ওস্তাদ আমির খানের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল এক সময়ে। রশিদ নিজে কবিতা লেখে উর্দুতে। বাংলা কবিতাও প্রচুর পড়ে। ফিল্মের ব্যাপারেও একজন বিশেষজ্ঞ, সত্যজিৎ রায় খুব স্নেহ করেন তাকে। ফিল্মের জগতের সবাই তাকে ভালোবাসে। তাছাড়া তার মাছ ধরার শখ এবং তাস খেলার. যে কোনও আড্ডায় সে সকলের শেষে ওঠে। এর মধ্যে পুলিশের কাজ করে কখন?

ইদানীং সে ফিল্ম নিয়ে মেতে উঠেছে, ফিল্মের জগতে ঢুকে পড়বে পুরোপুরি।

চাকরি ছেড়ে সে নিজেই ফিল্ম পরিচালনা করবে, চলে যাবে মুম্বাই। 'দেবদূত অথবা বারো হাটের কানাকড়ি' নামে আমারই একটি গল্প বেছে নিয়েছে, চিত্রনাট্য লিখে দিয়েছে এম এস সাথ্যু। ওমপুরি, নাসিরুদ্দিন শাহ, শাবানা আজমি খুব কম টাকায় অভিনয় করতে রাজি হয়েছে, সেদিন সন্ধেবেলা শাবানা আসছে চিত্রনাট্য শুনতে।

রশিদের বাবা ছিলেন পাঠান, মা বিহারী, কিন্তু রশিদ ভেতো বাঙালি হয়ে গেছে। আমারই মতন সুক্তো আর বেগুনভাজা ভালোবাসে। নিজে রান্নাও করতে পারে। একদিন শুধু ধনেপাতা দিয়ে দুর্দান্ত মাংস রান্না করেছিল।

সাহেবদের মতন ফর্সা রং, অত্যন্ত সুপুরুষ, দীর্ঘকায়, বাইরের লোকের কাছে পদমর্যাদার জন্য যতই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হোক, আমরা জানি, ওর ভেতরে এখনও রয়ে গেছে একটি দুরন্ত শিশু। মাঝে মধ্যে যতই গাম্ভীর্যের ভাব করুক, তবু সেই শিশুটি উঁকি মারে।

রশিদ আজ সন্ধেবেলা কী কী হবে, কে কে আসবে, আমি আর স্বাতী যাতে আটটার আগেই পৌঁছে যাই, সাহিত্য আকাদেমির মিটিং যদি বেশিক্ষণ চলে তাহলে পুলিশ ফোর্স পাঠিয়ে সভা ভেঙে দেবে, এইসব বলার পর জিজ্ঞেস করল, তুমি পাগলা কামালকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলে?

আমি বললাম, কামালকে কি পাঠাতে হয়? ও-তো নিজে নিজেই ইচ্ছে করলে দেশের প্রেসিডেন্টের বেডরুমে ঢুকে পড়তে পারে।

রশিদ বলল, আমি অফিসারদের সঙ্গে জরুরি মিটিং করছিলাম, ও তার মধ্যে ঢুকে পড়ে বড়বড় করে কী সব বলতে লাগল, আমি যত বলি, একটু বাইরে ওয়েট কর, শুনব, তারই মধ্যে ও বলে যেতে লাগল। সুনীলের বাড়ি, স্বাতীর সঙ্গে কথা হয়েছে, কোন একটা মেয়ে ব্রাদার ইন-ল'র সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে, কিছুই বুঝতে পারলুম না।

আমার হাসি পেয়ে গেল। কামালের স্বভাব তো জানি, ও যে কোনও কাহিনি মাঝখান থেকে শুরু করে। পটভূমিকাটা বোঝাবার তর সয় না। কার সঙ্গে কার কী সম্পর্ক, বোঝাই যায় না প্রথমে।

রশিদ আবার বলল, কোনও অ্যাডাল্ট মেয়ে যদি প্রেম করে বাড়ি থেকে পালায়, তাহলে পুলিশ কী করবে বলো তো? আগে কোর্টে যাক।

আমি বললাম, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, অনেক সিরিয়াস ব্যাপার। তোমাকে পরে বুঝিয়ে বলব। তবে, এক্ষুনি তোমাদের কিছু করার নেই। সে অন্য দেশে চলে গেছে।

রশিদ সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, গত মাসে চুঁচড়োয় একটা বিরাট ব্যাংক ডাকাতি হয়েছিল মনে আছে? সব ব্যাটাকে আজ ধরেছি। এর মধ্যে পালের গোদাটার কাছ থেকে আটাশ লাখ টাকা পাওয়া গেছে।

রশিদ পুলিশের কাজ কিছুই করে না বলে আমরা মাঝে মাঝে ওকে খোঁচা মারি, ও তাই এরকম দু'একটা কৃতিত্বের কথা সবিস্তার জানাতে চায়। তাও কৃতিত্ব মানে কী, রশিদ তো নিজে পিস্তল হাতে তাড়া করে ডাকাতদের ধরেনি, বিভাগীয় প্রধান হিসেবে ওর নামটাই কাগজে বেরুবে।

আমি বললাম, গুড ওয়ার্ক। কিপ ইট আপ। আরও অনেক ডাকাত এখনও ধরা না পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সাহিত্য একাদেমির মিটিং তাড়াতাড়ি সেরে ফিরে এলাম বাড়িতে। স্বাতী সাজগোজ করছে। আবার রশিদের টেলিফোন। সুনীল, তোমাদের বাড়িতে বরফ আছে? এক বাকেট যদি নিয়ে আসতে পারো, সুভাষদার খুব বরফ লাগে।

ঠিক আছে। নিয়ে যাচ্ছি।

তোমাকে আব একটা কাজ করতে হবে। শক্তিকে তুমি সামলাবে। আমি তো স্ক্রিপ্টটা পড়ে শোনাব, শক্তি যদি তার মাঝখানে বেশি কথা বলে—

বলুক না। শক্তি পনেরো মিনিটের বেশি চুপ করে বসে থাকতে পারে না।

রশিদ, তুমি কি কামালকে নেমন্তন্ন করেছ?

না তো। করা উচিত ছিল?

তুমি নেমন্তন্ন করো বা নাকরো, কামাল ঠিক পৌঁছে যাবে।

তা আসুক না। কামালকে তো আমরা সবাই পছন্দই করি। একটু পাগল আছে বটে। পৃথিবীতে এরকম পাগল দু'-চারজন থাকা খুব দরকার।

রশিদ ফোন ছেড়ে দিল। আমি নিজের সঙ্গে বাজি ধরলাম। আমরা বেরুবার আগে রশিদ নিশ্চিত ফোন করবে আর একবার।

যে কোনও পার্টিতে কামাল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমিকা নেয়। কামাল কোনওদিন বিড়ি-সিগারেট খায়নি। কিন্তু পকেটে লাইটার রাখে। অন্য কেউ সিগারেট বের করলেই দৌড়ে এসে ধরিয়ে দেয়। জীবনে কখনও মদের গেলাসে চুমুক দেয়নি, কিন্তু অন্যদের গেলাস খালি দেখলেই বোতল এনে ঢেলে দেবে, কার কতটা জল বা সোডা লাগবে তা মনে রাখে। সে নিজে একটা কাচের গেলাশে সামান্য চা কিংবা কফি ঢেলে তাতে অনেকখানি জল মেশায়, সেটা হুইস্কি কিংবা রামের মতন রং হয়, সেই গেলাশ হাতে নিয়ে বসে থাকে। প্রত্যেকটি মেয়েকে কোল্ড ড্রিংক্স দেবে মনে করে। কোল্ড ড্রিংক্স কম পড়লে দৌড়ে কিনে আনবে রাস্তা থেকে।

আমি একদিন কামালকে বলেছিলাম, তোমার আর একটা নাম হওয়া উচিত গিরীশ মহাপাত্র!

উপস্থিত কেউই এ নামের মর্ম বোঝেনি, কামালও না। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি' উপন্যাসের নায়কের এই ছদ্মনাম এখন কেই-ই বা মনে রেখেছে। ছদ্মবেশি সব্যসাচী পুলিশকে বলেছিল, আমি স্যার গাঁজা খাই না। তবে অন্য লোকদের গাঁজার কল্কে

সেজে দিই।

স্বাতী বেরিয়েছে, আবার টেলিফোন।

আমি স্বাতীকে বললাম, নিশ্চয়ই রশিদ। তুমি এবার ধরো।

স্বাতী অবিশ্বাসের সুরে বলল, কী করে জানলে, রশিদ?

ফোন তুলে স্বাতী আমার দিকে ভ্রূভঙ্গি করল? অর্থাৎ নিজের কাছে আমি বাজি জিতে গেছি।

এবার রশিদের ফোন ঠিক সাত মিনিট। শেষ মুহূর্তে তার মনে হয়েছে, তার নিজেরও কামালকে আমন্ত্রণ জানানো উচিত। সে তো আমাদের বাড়িরই লোক, কিন্তু কোথায় কামাল? দুপুরের পর থেকে তার পাত্তা নেই।

আমার বদলে স্বাতীকে পেয়ে রশিদ তার ডাকাত ধরার গৌরবকাহিনিটিও শোনাতে ছাড়েনি।

আমার বাড়ি থেকে রশিদের বাড়ির দূরত্ব বড জোর পাঁচ মিনিটের। তাই ইচ্ছে করেই একটু দেরিতে যাচ্ছি। লিফ্‌ট দিয়ে নিয়ে নামার পর স্বাতী হঠাৎ আমার পায়ের দিকে চেয়ে বলল, এ-কী, প্যান্টের সঙ্গে চটি পরে এসেছ? বাজে দেখাচ্ছে। শাবানা আসছে, কী মনে করবে? যাও, জুতো পরে এস—

আমি লঘু সুরে বললাম, ওগো খুকি, শাবানা আজমির সামনে কি আমার বিশেষ সাজগোজ করার দরকার আছে? রশিদের বাড়িতে সবাই দরজার বাইরে জুতো খোলে। কে চটি পরে এসেছে, কে সু, তা বোঝা যাবে কী করে?

স্বাতী বলল, হ্যাঁ বোঝা যায়। পা দেখলেই বোঝা যায়।

কিছুদিন আগেই সত্যজিৎ রায়ের ছবি 'সতরঞ্চ কি খিলাড়ি' মুক্তি পেয়েছে। এখন বাঙালিদের কাছে শাবানার খ্যাতি খুবই বেশি। কিন্তু আমরা তো এই অভিনেত্রীকে আগে থেকেই চিনি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রায় মেয়ের মতন। এর আগের একটা পার্টিতে শাবানা বাচ্চা মেয়ের মতন সুভাষদার কোলে বসে পড়েছিল।

স্ত্রী সঙ্গে থাকলে জামা-প্যান্ট, চটি কিংবা জুতো নিজস্ব নির্বাচনে পরার স্বাধীনতা আমি হারিয়েছি অনেক দিনই। প্রতিবাদ করে লাভ নেই।

আমাদের আগে অনেকেই পৌঁছে গেছে। এমনকী শাবানাও, সঙ্গে এসেছে জাভেদ আখতার। শক্তি বেশ শান্ত। রশিদ ছটফটিয়ে বলল, এত দেরি করলে তোমরা? আমার লেখাটা পড়তে শুরু করতে পারছি না।

চিত্রনাট্যটি সাথ্যুর রচনা। রশিদ তার সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছে ঠিকই। কিন্তু এখন এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন লেখাটাও ওর। ছবিটা হবে হিন্দিতে, চিত্রনাট্য লেখা ইংরেজিতে, সংলাপ লেখা উর্দু ভাষায়। এ সম্পর্কে আমি কী মতামত দেব?

সবার হাতে গেলাশ ওঠার পর রশিদ একটা ফাইল খুলে বলল, এবার পড়ি? সবাই মাথা নাড়লেও শক্তি বলল, খুব বেশি বড় তো না রে? কতক্ষণ দেরি করবি?

রশিদ বলল, নট মোর দ্যান অ্যান আওয়ার। শক্তি, তুমি এর মধ্যে গেলাস রিফিল করে নিও। আর যদি শুনতে না চাও...

শক্তি বলল, হ্যাঁ, শুনব। ঠিক এক ঘণ্টা।

রশিদ আমাকে বলল, সুনীল, তোমার গল্পের নাম খুব বড়। ফিল্মে চলবে না। আমরা নাম দিয়েছি, খোদা কা বস্তি। বাঙালিরা বস্তি বলতে যা ভাবে, এখানে তার অন্য মানে।

শাবানা আমাকে বলল, দিস নেইম সাউন্ডস গুড, দাদা!

আমি বললাম, ঠিক আছে।

শাবানা বলল, আমরা লোকেশান দেখতে গিয়েছিলাম। কী যেন জায়গাটার নাম?

রশিদ বলল, বসিরহাটের কাছে, স্বরূপনগর।

শাবানা বলল, দাদা, যে মেয়েটিকে নিয়ে আপনি গল্পটা লিখেছেন, তাকে দেখলাম। তার সঙ্গে আমার মিল আছে?

আমি কিছু বলার আগেই রশিদ বলল, খুব মিল। শি হ্যাজ আ টুথি স্মাইল লাইক ইউ।

শাবানার দাঁত সামান্য উঁচু। 'টুথি স্মাইল' শুনে ও হাসল, বিরক্ত হল না।

শক্তি বলল, অত কথার কী দরকার। পড না!

সুভাষ মুখোপাধ্যায় বললেন, হ্যাঁ, পড়। মুসলমান সমাজ সম্পর্কে সুনীল কী লিখেছে। জানতে আমার খুব আগ্রহ হচ্ছে।

রশিদ বলল, এই স্টোরিতে হিন্দু-মুসলমান দু'রকম ক্যারেকটারই আছে।

আমি বললাম, সুভাষদা, মুসলমান সমাজ নিয়ে আমি লিখিনি। সে ক্ষমতা আমার নেই। স্বরূপনগরে কয়েকদিন থাকার সময় একটি মেয়েকে দেখেছিলাম, শি হ্যাপেন্স টু বি আ মুসলমান মেয়ে। কিন্তু তার যা সমস্যা, তা সব সমাজেই হতে পারে।

শক্তি অধৈর্য ভাবে বলল, অত কথার দরকার কী, পড না জিনিসটা!

রশিদের এক হাতে মদের গেলাস, অন্য হাতে সিগারেট। আমাদের সবার চেয়ে বেশি ধূমপান করে রশিদ।

ফাইল খুলে রশিদ বলল, আগে একটু মিউজিকের কথা বলে নিতে পারলে ভালো হয়। আমার ছবিতে মিউজিক দিতে রাজি হয়েছেন ওস্তাদ আলি আকবর খান।

আমি বললাম, বাঃ!

শাবানা বলল, হি ইজ আ নেইম। কিন্তু ওঁকে তো ধরাই মুশকিল, সময় দিতে পারবেন?

রশিদ বলল, উনি আমাকে কথা দিয়েছেন, এই উইন্টারে এসে পুরো ওয়ান উইক কাজ করবেন।

হঠাৎ শক্তি হাত তুলে বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমার একটা কথা মনে পড়েছে,

সুনীল, তুমি একবার ঢাকায় আমজাদ হোসেনকে এই গল্পটার রাইট দিয়ে দিয়েছিলে না? আমজাদ তোমাকে টাকাও দিয়েছিল!

রশিদ আঁতকে উঠে বলল, মাই গুডনেস! সুনীল, তুমি এই গল্পের রাইট অন্য কারুকে বিক্রি করে দিয়েছ? আমরা এত দূর এগিয়েছি।

শাবানা এমনভাবে তাকাল, যেন সিনেমা লাইনে এরকম তো প্রায়ই হয়!

আমি বললাম, আসলে শক্তি তোমার চিত্রনাট্য শুনতে চায় না, তাই বাগড়া দিচ্ছে। ওকে অন্য ঘরে পাঠিয়ে দাও! আমজাদ হোসেন এই গল্পটা নিয়ে ফিল্ম করবে বলে খুবই উৎসাহ দেখিয়েছিল ঠিকই। পরে পিছিয়ে যায়। এই গল্পে একটা রেপ সিন আছে, সেটা বাংলাদেশে নাকি দেখানো সম্ভব নয়। আমজাদের সঙ্গে আমার কোনও চুক্তি হয়নি। আর ওই টাকা দেওয়ার ব্যাপারটা শক্তির সম্পূর্ণ বানানো।

শক্তি খানিকটা দমে গিয়ে মিনমিন করে বলল, একদিন কিছু টাকা বার করে দিল না পকেট থেকে?

আমি বললাম, ওঃ, সেই দিন? বুক পকেট থেকে কিছু টাকা বার করে ফিল্মের গল্প কেনা যায় না, শক্তি। আমজাদ আমাকে একটা একশ' টাকার নোট ভাঙিয়ে দিয়েছিল।

এবার অনেকেই হেসে উঠল।

রশিদ বলল, ওই রেপ সিনটাই তো গল্পের পক্ষে সবচেয়ে ভাইটাল, আমরা চিত্রনাট্যে জায়গাটা বিউটিফুলি হ্যান্ডল করেছি।

সুভাষদা বললেন, অনেক কথা হয়েছে। এবার পড় তো! রশিদ ফাইল খুলে সবে মাত্র এক লাইন পড়েছে, আবার বাধা এল। দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল কামাল, তার সঙ্গে হাবিব।

এখানে যে একটা কিছু পড়াশুনোর ব্যাপার চলছে, কামাল বেচারি তা বুঝবে কী করে? কোনও পার্টিতে সেটা ঠিক স্বাভাবিক নয়।

কামাল বলল, আমরা এসে পড়লাম। রশিদ, আমরা রয়াল জর্ডন এয়ারলাইন্‌সের অফিসে গেছিলাম, ওদের প্যাসেঞ্জার লিস্টে নাম আছে, তুমি যদি একটা টেলিফোন করো—

রশিদ অসহায়ভাবে আমাব দিকে তাকাল।

সুভাষদা ধমক দিয়ে বলললেন, এই কামাল, তুমি আগে বসে পড়ো তো! ওসব কথা পরে হবে! এখন অন্য কাজ হচ্ছে!

কামাল সঙ্গে সঙ্গে বলল, ও আচ্ছা! পরে হবে! বসো হাবিব।

ঘুরে ঢুকেই হাবিব এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তার মুখখানা গনগন করছে রাগে। সে ঠেলে ঠুলে বসে পড়ল ঠিক আমার পাশে। তার ক্রোধের আঁচ লাগছে আমার গায়ে।

রশিদ আবার পড়তে শুরু করতেই বাধা এল অন্য দিক দিয়ে।

রশিদের ছোট মেয়ে মাস্তুন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, বাবা, তোমার টেলিফোন। চিফ মিনিস্টারের সেক্রেটারি।

সঙ্গে সঙ্গে ধড়ফড় করে উঠে যেতে হল রশিদকে।

আমার এই গল্পটায় গ্রহণ লেগেছে। আজ আর চিত্রনাট্য পড়া হবে বলে মনে হয় না। এর আগেও আরও দু'জন এই গল্প নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেও এগোতে পারেনি।

শক্তি নিজে নেবার আগে সুভাষদার গেলাসে পানীয় ঢেলে দিতে দিতে বলল, চাকরি ছেড়ে সিনেমা করার কোনও মানে হয়! রশিদটা কী যে পাগলামি করছে!

হাবিব আমার একটা হাত চেপে ধরে ফিসফিস করে বলল, আমার বড় ভাইয়ের সঙ্গে নীলোফারের অ্যাফেয়ার হয়েছে, এ কথা আপনি বলেছেন? এত বড় একটা মিথ্যে কথা আপনি কী করে বললেন?

এবার আমার সত্যিকারের বিরক্তি বোধ হল। কামাল এ কাকে নিয়ে এসেছে? নীলোফারকে আমি চিনিই না। এই ধরনের কথা বলা কি আমাকে মানায়? আনোয়ারাই স্বাতীর কাছে এই কথা বলে গেছে।

এর উত্তর দিতেই আমার ইচ্ছে হল না।

আমার চুপ করে থাকায় আরও রেগে গিয়ে হাবিব আমার দিকে কটমট করে তাকাল। এবার বোধহয় সে আমার মুখে একটা ঘুঁসিই মেরে দেবে।

৩



চিত্রনাট্যটি সেদিন আর পড়া হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রীর জরুরী ডাক পেয়ে রশিদকে তক্ষুনি বেরিয়ে যেতে হল। কখন ফিরতে পারবে তার ঠিক নেই। পুলিশের চাকরি, চব্বিশ ঘণ্টার।

রশিদের বাড়িতে রশিদকে বাদ দিয়েই চলতে লাগল পার্টি। ওর স্ত্রী নাসিম বড়ই নরম প্রকৃতির সে, কিছুই সামলাতে পারে না, শক্তি সব দায়িত্ব নিয়ে নিল। এবং শক্তিই আমাকে বাঁচিয়ে দিল একটা অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে।

হাবিব নামে ছেলেটি আমার হাত চেপে ধরেছে দেখে শক্তি বেশ অবাক হয়ে বলল, এই ছোকরা, তুমি সুনীলের গায়ে হাত দিয়েছ কেন? জানো না, সুনীল পুরুষমানুষদের স্পর্শ একদম সহ্য করতে পারে না? ওর অ্যালার্জি হয়!

কয়েকজন হেসে উঠল। কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। অল্প বয়েসে, শক্তি এবং অন্য বন্ধুদের কেউ কেউ রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার কাঁধে হাত দিলে আমি তক্ষুনি ঝেড়ে ফেলতাম। আমার বিবমিষা হত।

হাবিব বোধহয় হাসতে জানেই না। তাছাড়া তার মেজাজ টং হয়ে আছে।

সে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে শক্তির দিকে রক্তচক্ষে তাকিয়ে বলল, আপনে আমারে ছোকরা বললেন কেন?

দু'এক পাত্র পেটে পড়লেই শক্তির গলার আওয়াজে খানিকটা হুংকারের ভাব আসে। সে আবার বলল, ছোকরাকে ছোকরা বলব না তো কি বুড়ো বলব, না কচি-কাঁচা।

হাবিব তেড়ে উঠে বলব, নো, ইউ হ্যাভ নো রাইট।

কামাল তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে হাবিবকে জড়িয়ে ধরে বলল, এই, আসো আসো, তুমি কী খাবে বলো?

হাবিব তবু বলল, এনার সাথে আমার পরিচয় হয় নাই। তবু ছোকরা বলে ডাকবেন কেন?

কামাল বলল, এনাকে চেনো না? ইনি কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়!

যতদূর মনে হয়, কবি বা লেখকজাতীয় প্রাণীদের প্রতি হাবিবের খুবই অবজ্ঞার ভাব আছে।

সে মুখ কুঁচকে বলল, তাই বলে ইনি আমাকে ইনসাল্ট করবেন, কোন অধিকারে?

শক্তি বলল, ইনসাল্ট আবার কোথায় করলুম রে বাবা! তুমি আমাকে যত ইচ্ছে বুড়ো বলো না!

কামাল হাবিবকে টেনে নিয়ে গেল। আমিও এই সুযোগে অন্যদিকে গিয়ে দাঁড়ালাম।

শাবানা আজমি ভালো বাংলা বোঝে না। সে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, শক্তিদা, তুমি সুনীলদার অ্যালার্জি নিয়ে কী বললে?

শক্তি পুরুষের স্পর্শ ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতেই শাবানা উঁচু গলায় হেসে উঠল। সেই হাসিতে আবার যোগ দিল অনেকেই।

সুভাষদা বললেন, সুনীলের গায়ে একটি মেয়ে হাত রাখুক একবার। তাহলে পুরুষের স্পর্শের দোষ কেটে যাবে। স্বাতী, তুমি ওকে ছুঁয়ে দাও না।

স্বাতী বলল, নিজের বউ ছুঁলে হবে না! অন্য কোন মেয়ে...

একজন অল্পচেনা নারী আমার মাথায় একটা চাঁটি মেরে বলল, এই তো আমি ছুঁয়ে দিলাম!

কামাল প্রাণপণে হাবিবকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। সত্যি কথা বলতে কী, ছেলেটির প্রতি আমার এখন বেশ মায়া হল। আনোয়ারার ব্যাপারে ছেলেটি এতই উত্তেজিত হয়ে আছে যে কাণ্ডজ্ঞানবোধ চলে গেছে। এটা যেন নিজের ভাবির জন্য শুধু উদ্বেগ নয়, তার চেয়েও আরও বেশি কিছু।

একটু পরে কামাল আমার কাছে হাবিবকে টেনে এনে বলল, তুমি সুনীলের কাছে মাফ চাও!

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, না, না, মাফ-টাফ চাইতে হবে না। হাবিবকে দেখলেই তো বোঝা যায়, ও বেশ বুদ্ধিমান ছেলে। হাবিব, তুমি একটু মেজাজটা শান্ত করো। শুধু শুধু রাগারাগি করে লাভ নেই। আনোয়ার ব্যাপারে আমরা সবাই যথাসাধ্য সাহায্য কববার চেষ্টা করব।

কামাল বলল, আমরা এয়ারপোর্টে গেছিলাম। রয়াল জর্ডন এয়ারলাইনস অফিসে...

আমি বললাম, সে যে কাল প্লেনে উঠে চলে গেছে, তা তো আমি আর স্বাতী নিজের চোখেই দেখেছি। তাকে আটকাবার কোনও উপায় ছিল না। তবে, সে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় চলে আসেনি। তোমরা এবার চেষ্টা করো, তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরিয়ে আনা যায়।

হাবিব চাপা গলায় বলল, এর মধ্যে নীলোফারের নাম জড়ানো হইতেছে কেন?

হঠাৎ আমার মনে হল, এনাফ ইজ এনাফ! আনোয়ারার জন্য আমার মন খারাপ লাগছে ঠিকই। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে আর বেশি জড়িয়ে থাকতে যাব কেন? আমার কি অন্য কাজ নেই! আমি আর কিছু সাহায্যও করতে পারব না। এবার ওদের ব্যাপার ওরা বুঝে নিক।

শুধু গয়নার ব্যাপারটা রয়ে গেল। সেটা আনোয়ারাকেই ফেরত দিতে হবে। কিংবা শামীম নিজে এসে যদি চায়, তার হাতেও তুলে দেওয়া যেতে পারে। আর কারুকে দেওয়া যুক্তিসংগত নয়।

তবু, লেখকরাও তো পাঠকদেরই মতন, কোনও একটা কাহিনির মধ্যে ঢুকে পড়লে শেষটা না জানলে কৌতূহল জেগেই থাকে।

কামাল আর হাবিব ফিরে গেল পরের দিন।

আমি লেখালেখির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেও ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়তে লাগল আনোয়ারার মুখ। এবং বারবার মনে হল, আনোয়ারার দেশত্যাগের কারণ ঠিক ত্রিভুজ-প্রণয়-সংকট নয়, সম্ভবত সেটা চতুর্ভুজ। এই হাবিব ছেলেটি খুব সম্ভবত নীলোফার নামে মেয়েটির প্রেমিক। নীলোফারের সঙ্গে তার বড় ভাইয়ের নাম জড়ানো হয়েছে বলেই হাবিবের অমন তিরিক্ষি মেজাজ। আবার কামাল ইঙ্গিত দিয়েছিল যে আনোয়ারার সঙ্গেই তার দেবরের একটা অম্লমধুর সম্পর্ক আছে। তাহলে ব্যাপারটা তো আরও জটিল।

তা হোক না। আমি এখন লিখে চলেছি ঊনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় এক ছড়ানো কাহিনি, তার মধ্যে বাংলাদেশের এই চরিত্রগুলো মাথায় ঢুকিয়ে রাখা ঠিক নয়।

দু'দিন বাদে একটি বাংলা কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় একটি খবরে আমার দৃষ্টি আটকে গেল।

বারাসাতের কাছে একটি গ্রামে নারীপাচারচক্রের একটি বড় দল ধরা পড়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে এগারোটি মেয়েকে। গ্রেফতার হয়েছে তিনজন। সেই তিনজনের মধ্যেও দু'জন মহিলা। এই উদ্ধার অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন গোয়েন্দা বিভাগের ডিআইজি আয়ান রশিদ খান।

ডাকাত ধরে অন্যরা, কৃতিত্ব নেয় রশিদ। এবার সে স্বয়ং অভিযানে গেছে? পুলিশের কাজে তাহলে মন দিয়েছে দেখা যাচ্ছে। সরকারি উঁচু মহলের ধারণা, রশিদ সবসময়ে আর্ট-কালচার নিয়ে মেতে থাকে, পুলিশের কাজে অযোগ্য। তবু তার প্রমোশন হয়ে চলেছে নিজস্ব নিয়মে।

রশিদ আগে যখন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার ছিল, তখন বসত লালবাজারে। বেশ কয়েকবার তার অফিসে আড্ডা মারতে গেছি। সেটি একটি বিশাল কক্ষ, ঐতিহাসিকও বটে। দেওয়ালে বহু প্রাক্তন ডিসি-ডিডির ছবি,

তার মধ্যে রয়েছে ব্রিটিশ আমলের কুখ্যাত টেগার্ট সাহেব। আরও এমন অনেকের, যাঁরা পরবর্তীকালে বিখ্যাত হয়েছেন।

মনে আছে, একবার মুম্বাইয়ের তরুণ চিত্র পরিচালক সৈয়দ মীর্জা সেই অফিসে গিয়েছিল, আমিও তখন উপস্থিত ছিলাম। সেই সময়ে, 'অ্যালবার্ট পিন্টো কা গুস্‌সা কিঁউ আতা হ্যায়' এই নামে একটা নতুন ধরনের ফিল্ম বানিয়ে সৈয়দ মীর্জার খুব নাম হয়েছিল। নাসিরুদ্দিন, শাবানা, ওম পুরীরাও তখন নতুন। মুম্বাইয়ের চলচ্চিত্র জগতের এই নতুন দঙ্গলের অনেকের সঙ্গে রশিদের খুব ভাব।

সৈয়দ মীর্জা খানিকটা চ্যাংড়া ধরনের। সে রশিদের অফিসঘরে বসে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়ালের ছবিগুলো দেখতে দেখতে বলেছিল, 'বাবাঃ, এত বড় বড় সব লোক এখানে কাজ করত? ইয়ে নোকরি আপকো কেইসে মিলা?'

প্রমোশন হয়ে রশিদ এখন বেঙ্গল পুলিশে এসেছে। ওর অফিস আলিপুরের ভবানী ভবনে। সেখানে আমার যাওয়া হয়নি।

সন্ধের সময় রশিদের সঙ্গে দেখা হল এক পার্টিতে। উপলক্ষ গান বাজনা, আসল আকর্ষণ পান-ভোজন। ব্যারিস্টার ইন্দ্রনীল চৌধুরী অনেক টাকা রোজগার করেছেন, এখন একজন সংগীত-রসিক হিসেবে প্রসিদ্ধ হতে চান। প্রায়ই কোনও গায়ক-গায়িকাকে ডেকে এনে আসর জমান, আর আমন্ত্রিতদের জন্য থাকে অঢেল স্কচ। সেকালের জমিদারদের নতুন সংস্করণ।

একজন রূপসী মহিলা রবীন্দ্রসংগীত গাইছেন।

আমি জানি, রশিদ রবীন্দ্রসংগীত একেবারেই পছন্দ করে না। তার শ্রবণযন্ত্র শুধু ক্লাসিকাল গান-বাজনার জন্য তৈরি। উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিল্পীরা অনেকেই রবীন্দ্রসংগীতকে পাত্তা দেয় না। কারণ তারা ভাষার মাধুর্য কিছুই বোঝে না। রশিদের বাড়িতে একবার ওস্তাদ আমীর খান রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড শুনে বলেছিলেন, লেকিন ইস মে সংগীত কাঁহা?

শক্তি আবার শুধু রবীন্দ্রসংগীতেরই ভক্ত। তাকে রাগাবার জন্য রশিদ বলে, স্যার আর এন টেগোর বড় কবি হতে পারেন, কিন্তু গানগুলোও শুধুই কবিতা!

রশিদ ইচ্ছে করে রবীন্দ্রনাথ বলে না, বলে স্যার আর এন টেগোর! যদিও একসময় ও ছিল বীরভূম জেলার এসপি, প্রায়ই যেতে হত শান্তিনিকেতনে। তখন সেখানে গিয়ে বলত, গুরুদেব! গানের আসরে বসে থাকত ভক্তিভাব নিয়ে।

ব্যারিস্টার সাহেবের বাড়ির দোতলার হলঘরে গান চলছে, পাশের ঘরটি বার। ক্রমশ দ্বিতীয় ঘরেই ভিড় বাড়ছে।

কোনও গানের আসরের মাঝপথে আমি উঠে যাই না। তাছাড়া গায়িকাটির সুন্দর মুখশ্রীর মতো গলার আওয়াজও মিষ্টি। চোখ আর কান দুটোই তৃপ্তি পাচ্ছে। শুধু এক সময় রশিদ এসে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল পাশের ঘরে।

এখানে একটি শ্বেতাঙ্গিনী তরুণীকে ঘিরে আছে অনেকে। সে এসেছে হাঙ্গেরি থেকে। ইংরেজি জানে, সম্রাট অশোকের শিলালিপি সম্পর্কে গবেষণা করতে এসেছে। শ্বেতাঙ্গিনীদের সম্পর্কে আমাদের দুর্বলতা নির্লজ্জভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর দু'একটা কথা বলে বুঝতে পারলাম, সে এমন কিছু বিদুষী নয়। একজন ছাত্রী। অশোকের শিলালিপি সম্পর্কে এতদূর এসে গবেষণা করার কী আছে! সবই তো বইতে পাওয়া যায়। তবু তাকে এতগুলো পুরুষ ঘিরে ধরেছে কেন?

আমি সরে গেলাম জানালার কাছে।

পুরনো আমলের বাড়ি, বাইরে অনেকখানি বাগান। আজকাল শহরের মধ্যে এরকম বাগানসমৃদ্ধ বাড়ি ভেঙে মালটি-স্টোরিড হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

দু'হাতে দুটি হুইস্কির গ্লাস এনে রশিদ বলল, ভদ্রমহিলা যে গানটি গাইছেন, আজি এ আনন্দসন্ধ্যা, তাতে পূরবীর সুর লাগছে বুঝতে পারছ? খাঁটি পূরবী হবে এই রকম–

সে নিচু গলায় পূরবী রাগিণীর একটা খেয়ালের সুর ধরলো। রশিদ গান-বাজনা যেমন বোঝে, তেমনি সব রাগ-রাগিণীর স-র-গ-ম জানে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার গলায় সুর কম। একটু বাদেই বেসুরো হয়ে যায়।

তাকে থামাবার জন্য আমি বললাম, আজকের কাগজে তোমার নাম ছাপা হয়েছে। ভুল করে ছেপেছে, তাই না...? বারাসাত না বসিরহাটের গ্রামে তুমি নিজে নিশ্চয়ই যাওনি!

রশিদ বলল, ইয়েস স্যার, আই পার্সোনালি লেড দা রেইড। তুমি নিশ্চয়ই বাংলা কাগজ পড়েছ। স্টেট্সম্যানে অনেকখানি, ডিটেইলড স্টোরি বেরিয়েছে। তুমি কী ভাব, ইয়ার? আমি কোনও কাজ করি না?

আমি বললাম, তাই তো দেখছি। হঠাৎ তোমার কাজে মন গেছে।

রশিদ বলল, শোনো, আমি অর্ডিনারি পুলিশম্যানদের মতো রুটিনওয়ার্ক অ্যাটেন্ড করি না। কিন্তু মাঝে মাঝে একটা-দুটো যা কাজ করে দিই, তাতেই সেনসেশান পড়ে যায়। সেদিন কখন বেরিয়েছি জানো বাড়ি থেকে? রাত সাড়ে তিনটে!

এবার আমার সত্যি অবাক হবার পালা। রশিদের রাতপাখির স্বভাব। দেড়টা-দুটোর আগে কখনও ঘুমোতে যায় না। জাগে সকাল নটার পর। অনেকদিন সকাল আটটায় রশিদকে ফোন করে শুনতে হয়েছে, সাহেব এখনও জাগেননি।

আমি বললাম, তুমি রাত সাড়ে তিনটেয়? তার মানে বাড়িতে একটুও ঘুমোওনি? রশিদ বলল, একজ্যাক্টলি! ঘুমোলে আর ওঠা যেত না। আর ও ব্যাটাদের বাড়ি ভোরের আগে ঘিরে ফেলতে হয়। দিনের আলো ফুটলেই খবর পেয়ে যায়। এর আগে একবার ফুড়ুত করে উড়ে গিয়েছিল!

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে রশিদ বলল, তুমি গ্রামটা চেনো, সুনীল। তুমি যে-গল্পটা

লিখেছ, খুদা কা বস্তি, যে-গ্রামটার ব্যাকগ্রাউন্ডে, তুমি ফিরোজদেব যে-গ্রামে গিয়ে অনেকদিন ছিলে, কী যেন গ্রামটার নাম?

আমি বললাম, স্বরূপনগর।

রশিদ বলল, ইয়েস, ইয়েস, যে-গ্রামটায় আমরা শাবানাকে নিয়ে লোকেশান দেখতে গিয়েছিলাম, তার ঠিক পাশের গ্রামটার নাম মুগবেড়িয়া, সেটাই তো। সে-গ্রামে একটা বিশাল বটগাছ আছে। দুশো-তিনশো বছরের পুরনো, একটা ভাঙা শিবমন্দির, তুমি সেটা দেখতে যাওনি।

আমি বললাম, হ্যাঁ, গিয়েছিলাম তো! খুব ভালো লেগেছিল, গ্রামটা বেশ সুন্দর। বেশ খাঁটি গ্রাম গ্রাম, লোকগুলো ভালো, খুব শান্তিপূর্ণ! সেখানে এমন কাণ্ড হয়?

রশিদ বলল, ওসব ফাসাড! যেসব গ্রামকে মনে হয় খুব পিসফুল, সেখানেই ক্রিমিনালদের ডেরা হয়, যাতে কেউ সন্দেহ না করে। ওখানে একটা বিরাট গ্যাং অপারেট করছে, আমরা মাত্র কয়েকজনকে ধরেছি। টিপ অব দ্য আইসবার্গ বলতে পারো।

আচ্ছা, রশিদ, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তুমি যাদের অ্যারেস্ট করেছ, তাদের মধ্যে দু'জন মহিলা? মহিলারা মেয়েপাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকে কী করে? মেয়ে হয়ে মেয়েদের এমন সর্বনাশ করে?

তুমি একটা অদ্ভুত কথা বললে! পুরুষরা যদি পুরুষদের খুন করতে পারে, বাচ্চা ছেলেকে পর্যন্ত মেরে ফেলতে পারে, তাহলে মেয়েরা পারবে না কেন? মেয়েরা কি আলাদা ধরনের কোনও জীব? মেয়েরা মেয়েদের সর্বনাশ করে না? শাশুড়িরা বউদের পুড়িয়ে মারে না? ক্রিমিনালদের মধ্যে পুরুষ আর মেয়ের কোনও তফাত নেই। শুধু মোডাস অপারেন্ডি আলাদা। তুমি এক কাজ করতে পারো, সুনীল। কাল দুপুর আড়াইটের সময় আমি ওই দুই মেয়েছেলেকে জেরা করব। তুমি এসে আমার অফিসে বসে থাক, দেখ, ওদের অবজারভ করো।

তুমি জেরা করার সময় আমি বসে থাকব? বাইরের লোক হয়ে! সেটা কি অ্যালাউড?

অ্যালাউড নয়। কিন্তু আমি চাইলে, ইয়েস ইউ ক্যান কাম, আমার বন্ধু হিসেবে, গুলি মারো ফর্মালিটিজ। তবে, তুমি চুপ করে বসে থাকবে, তুমি কোনও প্রশ্ন করতে পারবে না। শুধু অবজারভ করবে!

এইরে, কাল দুপুরে? কাল সকালের প্লেনে যে আমাকে শিলচর যেতে হবে! তোমার অফিসে ব্যাপারটা দেখতে পারলে ভালোই লাগত!

শিলচরে আবার কী আছে?

'প্রকৃতি-পরিবেশ' নামে একটা সংস্থার সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়েছি। ওদের একটা সেমিনার আছে। দু'দিন বাদে ফিরব।

যাও, তাহলে ওইসবই করো। প্রকৃতি-পরিবেশ না ছাই! এদিকে যে মাফিয়ারা জঙ্গল কেটে সাফ করে দিচ্ছে, তা তোমরা কতটুকু জানো?

মাফিয়ারা আবার জঙ্গলও কাটে? সত্যিই এটা আমার জানা ছিল না।

দ্যাখো সুনীল, আমরা মোটামুটি মিডল ক্লাসের লোকেরা এক ধরনের জীবন কাটাচ্ছি। আর্ট-কালচার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। এর আড়ালে যে কত রকম জঘন্য কাণ্ড-কারখানা ঘটে চলেছে, তা আমরা কিছুই জানি না। যাক গে, চলো, আমরা আরও মদ খাই। এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই।

রশিদের পাল্লায় পড়ে এরপরে এত মদ্যপান হল যে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত দেড়টা বেজে গেল। তারপর ভর্ৎসনা।

স্বাতী গানের আসরে যায়নি। ওর এক বোনের বাড়িতে গিয়েছিল। তারপর জেগে বসেছিল আমার জন্য।

এরকম পরিবেশে আমি শুধু ফুরফুর করে হাসি। স্বাতীর অভিযোগের উত্তর দিতে গেলে বিরাট ঝগড়া শুরু হয়ে যেতে পারে। স্বামী-স্ত্রী ঝগড়ায় একটু একটু আয়ু নষ্ট হয়।

রশিদের পাল্লায় পড়ার ছুতোটা স্বাতী মানতে চায়নি। আমি কি বাচ্চা ছেলে? বেশি রাত পর্যন্ত হুল্লোড় করার ঝোঁক আমারও ছিল নিশ্চয়ই। শেষের দিকটা আমার ভালো মনেই নেই।

শিলচরের ফ্লাইট সকাল সাড়ে সাতটায়।

স্বাতী ডেকে দিল না। আমিও জাগিনি। ঘুম ভাঙল আটটার সময়।

শিলচরে যেতে না পারার জন্য অনুশোচনা কিংবা অপরাধবোধ থাকলেও গুপ্তভাবে খুশিও বোধ করছিলাম। এর আগে কতবার শিলচর গেছি। এবার আমি না গেলেও সেমিনার ঠিকই ঠিকই চলবে। এখন থেকে সভা-সমিতি কমিয়ে দিতে হবে।

দাঁত মাজতে মাজতে মনে হল, আজ আমার শিলচরে থাকার কথা ছিল। যাইনি, তার মানে সারাদিন ছুটি। তাহলে আজ লিখতে না বসলেও চলে। তাহলে আজ কী করা যায়? স্বাতীকে নিয়ে কোলাঘাট বেড়িয়ে আসব? ওখানে একটা ছোট হোটেলে দুর্দান্ত ইলিশ মাছের ঝোল পাওয়া যায়। তারপর রূপনারাণ নদীতে নৌকো করে কিছুক্ষণ বিহার করলে স্বাতীর মেজাজ নিশ্চিত শান্ত হবে।

তারপর মনে পড়ল, দুপুরবেলা রশিদ ওর অফিসে যেতে বলেছিল।

খোঁয়াড়ি ভাঙার জন্য পরপর চা খাচ্ছি। আর খবরের কাগজ পড়ছি, এর মধ্যেই রশিদ ফোন করল স্বাতীকে।

রশিদের মজা এই, আমি ফোন ধরলে শুধু আমার সঙ্গেই কথা বলে। স্বাতীর নামও উচ্চারণ করে না। আর স্বাতী ফোন ধরলে, ওর সঙ্গেই গল্প করে তিরিশ-চল্লিশ

মিনিট। স্বাতীর সঙ্গে ওর বেশ একটা মাখো-মাখো ভাব আছে।

আজ ফোন ধরেছে স্বাতী।

আমি লম্বা করে কাগজ পড়তে পড়তে ছেঁড়া ছেঁড়া কথা শুনছি ওদের।

এক সময় স্বাতী বলল, আমার কর্তাটিকে তুমি কাল এত মদ খাইয়েছ যে সে আজ ভোরে শিলচরের ফ্লাইট মিস করেছে। সকাল থেকে লিখতেও বসেনি। শুধু কাগজই পড়ে যাচ্ছে।

আমি হাত দিয়ে ইশারা করে বললুম, আমাকে ফোন দিও না। আমি বাথরুমে।

আমি টেলিফোন যন্ত্রটি এক-দু'মিনিটের বেশি কানে রাখতে ভালোবাসি না। রশিদ ঘণ্টার পর ঘণ্টা চালিয়ে যেতে ভালোবাসে। বিশেষত সকালের দিকে।

আমি এক একটা সকালে একটাও কথা বলা পছন্দ করি না।

লিখি না, কিন্তু শুধু চুপ করে বসে থাকতেই ভালো লাগে। তখন নিজের সঙ্গে সংলাপ চলে। মানুষের তো নিজের সঙ্গে কথা বলার জন্যও সময়ের দরকার।

ভবানী ভবন লালবাজারের মতন অত পুরনো নয়। এর নামকরণ হয়েছে স্বাধীনতা-সংগ্রামী শহীদ ভবানী ভট্টাচার্যের নামে। অবশ্য সে-কথা এখন আর ক'জন মনে রেখেছে!

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দেখা হয়ে গেল লাচ্চুদার সঙ্গে।

লাচ্চুদা, অর্থাৎ রথীন ভট্টাচার্য রশিদের বস। শিগ্‌গিরই তিনি রিটায়ার করবেন। পুলিশ মহলে লাচ্চুদা শেক্সপিয়ার-বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত। শেক্সপিয়ার থেকে তিনি অনর্গল মুখস্থ বলতে পারেন। একজন ইংরেজ সাংবাদিক লাচ্চুদার সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন, কলকাতার এই একজন পুলিশ অফিসার অনেক ইংরেজ পণ্ডিতের চেয়েও শেক্সপিয়ার ভালো জানেন, সেই জন্যই কলকাতার চোর-ডাকাতরা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়।

লাচ্চুদাকে দেখলে পুলিশ বলে বোঝার কোনও উপায় নেই, মনে হয় অধ্যাপক। বড় পোস্টের পুলিশ অফিসাররা আজকাল গোঁফও রাখে না।

লাচ্চুদা ধরেই নিলেন, আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। খানিকটা বকুনির সুরে বললেন, কী ব্যাপার? তুমি টেলিফোন করে আসনি কেন? আর একমিনিট পরে এলে আমাকে পেতে না।

আমি বললাম, এই দিকেই এসেছিলাম, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। তাই ভাবলাম, একবার দেখা করে যাই। আপনি বেরিয়ে যাচ্ছেন?

লাচ্চুদা বললেন, হ্যাঁ। এখনও লাঞ্চ খাওয়া হয়নি। চল আমার সঙ্গে, ক্যালকাটা ক্লাবে লাঞ্চ খেয়ে নেবে।

আমি তো দুপুরে খেয়ে বেরিয়েছি। পেট ভর্তি।

আমার সঙ্গে বসবে চলো। খাবার খেও না, বিয়ার খাবে।

না লাচ্চুদা, আমি দিনের বেলা ড্রিংক করা বন্ধ করে দিয়েছি।

সে কি? কবে শুনব, শক্তি কোল্‌ড ড্রিংকস খাচ্ছে রাত্তির বেলা! বাঘে ঘাস খাচ্ছে। চলো, চলো!

না লাচ্চুদা, আমি বরং রশিদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে যাই।

রশিদ? সে কোনওদিন লাঞ্চ আওয়ারের পর অফিসে থাকে? তুমি পাগল হয়েছ? নেহাৎ চিফ মিনিস্টার ওকে স্নেহ করে, তাই ওর চাকরিটা এখনও বজায় আছে!

আজকাল রশিদ খুব কাজ করছে শুনছি!

হ্যাঁ, কাজ করছে। তবে পুলিশের কাজ না। ওর মাথায় গজ গজ করছে সিনেমা।

একটু থমকে গিয়ে লাচ্চুদা বললেন, ও হ্যাঁ, আজ রশিদকে ওর ঘরে দেখলাম যেন একটু আগে। আজ একটা ক্রিমিনাল গ্যাংকে ইন্টারভিউ করার কথা আছে। তুমি ওর ঘরে গিয়ে বোসো। আমি লাঞ্চ খেয়ে ফিরে আসছি তাড়াতাড়ি।

দু'তিন ধাপ সিঁড়ি দিয়ে নেমে লাচ্চুদা আবার বললেন, সুনীল, তুমি তো মাঝে মাঝেই বাংলাদেশে যাও, আমাকে একবার নিয়ে যেতে পার না? মরার আগে অন্তত একবার বিক্রমপুরে আমাদের দেশের বাড়িটা দেখে যেতে চাই।

আমি হাসলাম। লাচ্চুদা কি ছেলেমানুষ যে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে? যে-কেউ তো ভিসা নিয়ে বাংলাদেশ ঘুরে আসতে পারে। শেক্‌সপিয়ারের মতন, বিক্রমপুরও লাচ্চুদার অবসেশান। চল্লিশ বছর আগে ছেড়ে-আসা নিজের গ্রাম সম্পর্কে প্রায় প্রতিদিনই কিছু-না-কিছু বলবেনই। সে-গ্রামের গাছপালার বর্ণনাও আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে।

ওপরে এসে একজনের কাছ থেকে রশিদের ঘরটার হদিস জেনে নিলাম।

সে-ঘরের বাইরে একজন পাহারাদার আছে। আমাকে একটা কাগজে নাম লিখে দিতে হল।

এ ঘরখানি তেমন সুসজ্জিত নয়। তবে টেবিলটি মস্ত বড়। সে-টেবিলে অন্তত দু'তিনজন লোক শুয়ে থাকতে পারে। চেয়ারগুলো চামড়ার গদিতে মোড়া। একটা ফুলদানিতে টাটকা ফুল।

রশিদ একটা ফাইল পড়ছে মনোযোগ দিয়ে।

আমাকে দেখে মুখ তুলে শুধু বলল, একটু বোসো।

আবার সে ফাইলে চোখ বোলাল।

দরজার ঠিক পাশে মেঝেতে উবু হয়ে বসে আছে দু'জন স্ত্রীলোক। একজন বেশ গাঁট্টাগোট্টা, অন্যজন শালিক পাখির মতো। সাধারণ শাড়ি-পরা।

আমার বেশ অস্বস্তি হল। ঘরে এতগুলো চেয়ার, ওদের মেঝেতে বসিয়ে রাখা হয়েছে কেন? এটা অন্যায়। হয়ত ওরা শিক্ষিত-ভদ্রঘরের মেয়ে নয়, তবু নারী তো বটে!

রশিদ একবার ফাইল থেকে মুখ তুলতেই আমি চোখের ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলাম,

ওরা কারা?

রশিদ ইংরেজিতে বলল, কাল তো ওদের দু'জনকেই ধরা হয়েছে। তুমি ওদের দিকে তাকিয়ো না। ওদের জেরা করা হবে, তবে আরও পনেরো-কুড়ি মিনিট পরে।

অতক্ষণ বসিয়ে রাখবে? কেন?

এটাই নিয়ম। ওরা ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলার জন্য তৈরি হয়ে আসে। প্রথম দিকে খুব স্মার্ট ভাব দেখায়। ওদের টাকা-পয়সার জোর আছে। ক্ষমতাও কম নয়। কিন্তু ওদের কুকুর-বেড়ালের মতো ট্রিট করলে আস্তে আস্তে মনের জোর কমে যায়। আমরা তো মেয়ে ক্রিমিনালদের মারি না। টর্চারও করি না। সাইকোলজিক্যাল প্রেসার দিতে হয়। চা খাবে তো?

বেয়ারা আসবার পর রশিদ বেশ জোরে জোরে বলল, দু'কাপ ভালো দেখে চা নিয়ে এসো। সঙ্গে বিস্কিট আনবে। আমার সিগারেটও ফুরিয়ে গেছে।

শালিক চেহারার স্ত্রীলোকটি বলল, সাহেব, আমরা অনেকক্ষণ বসে আছি। আমরা একটু চা খেতে পারি না? আমার আবার চায়ের নেশা।

রশিদ আমাকে ইংরেজিতে বলল, কী রকম স্মার্ট দেখলে?

তারপর সেই স্ত্রীলোকটির উদ্দেশে বলল, তোমার চায়ের নেশা? পান-দোক্তার নেশা নেই? বাংলা মদ? ওসব ফাঁসির আগে খেও। তখন যা চাইবে, দেব। এখন চুপ করে বসে থাকো।

ফাইলটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এই দ্যাখো, ওদের নাম। মোটা মেয়েটার নাম মতিবিবি। আর রোগাটার নাম শেফালি। ক্রিমিনালদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানদের কোনও ভেদ নেই। ওদের সঙ্গে যে পুরুষটা ধরা পড়েছে, সেটার নাম ছোটলাট, আসল নাম পরান দাস। ছোটলাট নামটা খুব কমন, প্রায় অনেক দলেই একটা করে ছোটলাট থাকে। বড়লাটটার পাত্তা পাওয়া যায় না। পালের গোদা যেটা, পালিয়েছে। সেটা আবার বিহারী মুসলিম।

যে-সব মেয়েকে তোমরা উদ্ধার করেছ, তারা কোথাকার?

এগারো জনের মধ্যে চারজন বাংলাদেশের, আর বাকিরা নেপালি মেয়ে।

আগেও কাগজে পড়েছি, এইসব র‍্যাকেটে যেসব মেয়ে ধরা পড়ে, তারা বাংলাদেশ কিংবা নেপালের। কেন, এদিকে কি গরিব মেয়ের অভাব আছে।

না, এদিকেও গরিব মেয়ে আছে লক্ষ লক্ষ। তাদেরও অনেককে পাচার করা হয়। কিন্তু তাদের এনে কলকাতা কিংবা ওয়েস্ট বেঙ্গলে একদিনও রাখা হয় না। তাদের সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মুম্বাই কিংবা পাঞ্জাবে। বাংলাদেশ আর নেপালের মেয়েদের এখানে রাখে কারণ বাড়ি থেকে দূরে চলে এসে, তারা ভয়ে ভয়ে থাকে, কারুর সঙ্গে কথা বলারও সাহস পায় না। অচেনা জায়গায় পালিয়ে যেতেও চায় না।

চা ও দু'তিনরকম বিস্কিট এল।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত অন্যদের না দিয়ে কিছু খেতে কি ভালো লাগে? উপায় নেই। এখানে রশিদের নির্দেশ মানতেই হবে।

চুমুক দিতে দিতে রশিদ বলল, তোমরা গল্প-উপন্যাস লেখার সময় এইসব ক্রিমিনালকে বড্ড রোমান্টিসাইজ করো। যেন শুধু অবস্থার চাপে পড়েই ওরা ক্রিমিনাল হয়েছে। ভেতরে ভেতরে মানবিকতা এখনও রয়ে গেছে। সেসব কিছু না। এদের মন বলে কিছু আছে কি-না সন্দেহ। এরা এদের কাজটাকে মনে করে ব্যবসা। সেই ব্যবসায়ে যতদূর সম্ভব লাভ করার জন্য এরা কোনও নিষ্ঠুরতাতেই পিছু-পা হয় না। দেখেছ, এদের মুখে নারীসুলভ লালিত্য একটুও নেই।

কিছুক্ষণ পরে ঘড়ি দেখে রশিদ বলল, এইবার শুরু করা যায়। তুমি ঘুরে বোসো সুনীল। ইচ্ছে করলে নোট নিতে পার।

নোট-টোট নেওয়া আমার স্বভাব নয়। মাথার মধ্যে যেটুকু থাকে, সেটুকুই কাজে লাগাই। তাছাড়া আমি এখানে আমার লেখার উপাদান সংগ্রহ করতে আসিনি। এসেছি অন্য কৌতূহলে।

রশিদ বলল, মতিবিবি, এগিয়ে বোসো। তোমার আসল নাম কী?

মতিবিবি বলল, আমার অন্য নাম নেই!

রশিদ বলল, প্রথম থেকেই মিথ্যে কথা শুরু করলে? তোমার নাম শরিফন। জানো তো, আমি মুসলমান। এখানে এই যে আর এক সাহেব বসে আছেন, ইনি এক মৌলবি সাহেবের ছেলে। আমরা আমাদের জাতের লোকদের সাহায্য করি। তুমি যদি আমার কাছে সত্যি কথা বলো, ঠিক ঠিক উত্তর দাও, তাহলে তোমার যাতে শাস্তি না হয়, তা আমি দেখব! কতদিন ধরে এই কারবার চালাচ্ছ?

মতিবিবি নিরীহ মুখ করে বলল, কী কারবার সাহেব?

এই মেয়েমানুষ চালান দেওয়ার কারবার?

সে সম্পর্কে তো আমি কিছুই জানি না।

তোমাদের বাড়ি থেকে যে মেয়েগুলোকে উদ্ধার করা হল, তারা কোথা থেকে এল?

তাও জানি না সাহেব। আমি হোটেল চালাই। লোকেরা এসে থাকে. আবার চলে যায়।

তাই বুঝি? তোমার হোটেলে শুধু মেয়েরা থাকে?

পুরুষরাও থাকে। যে টাকা দেয়, সে-ই থাকতে পারে।

এই মেয়েরা নিজের ইচ্ছেতে আসে? কেউ নিয়ে আসে না?

অনেক সময় অন্য লোক নিয়ে আসে। কে কাকে নিয়ে আসে, তা আমি জানতে চাই না। তাহলে হোটেল চলে না!

বটে! যারা নিয়ে আসে, তাদের তুমি চেনো না?

দু'একজনের মুখ চেনা হয়ে গেছে। আর কিছু জানি না।

অন্য মেয়েটি এবার বলে উঠল, আমি ওই হোটেলে শুধু রান্না করি। আমাকে কেন ধরে এনেছেন স্যার!

রশিদ তাকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, চোপ! তুমি একটা কথাও বলবে না। তোমার তো ফাঁসি হবেই!

আবার মতিবিবির দিকে ফিরে রশিদ নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, তোমার হোটেল থেকে মেয়েগুলোকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়, তাও তুমি জানো না?

মতিবিবি বলল, না সাহেব!

একটি মেয়ে কিছুই খেতে চাইছিল না। দু'তিনদিন কিছু না খেয়ে শুধু কেঁদেছে। তুমি তার পাছায় গরম খুন্তির ছ্যাঁকা দিয়েছিলে। হোটেল চালাতে গেলে বুঝি এইসবও করতে হয়?

কে বলল, আমি ছ্যাঁকা দিয়েছি? একদম ঝুট বাৎ! এইসা কভি নেই কিয়া। আমি কোনওদিন খুন্তি হাতেই নিই না!

তোমার ডেরা থেকে দুটো মেয়েকে মজঃফরপুর চালান দেওয়া হয়েছিল। তুমি তাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলে।

ইয়ে ভি ঝুট বাৎ! আমি কোনওদিন মজঃফরপুরে যাইনি।

আলবাৎ গিয়েছিলে! সেই মেয়েদুটোকে উদ্ধার করা হয়েছে। তারা জবানবন্দি দিয়েছে। আমাদের ধর্মে এইসব নোংরা কাজ করলে হাবিয়া দোজখে যেতে হয় জানো না?

আমি কোনও নোংরা কাজ করি না, সাহেব। গরিব মানুষ, রোজা রাখি। ঘরে বসে নামাজ পড়ি।

একটা বালিশের খোলের মধ্যে বালি ভরা আছে। সেটা দিয়ে মেয়েদের মারো! যখন তারা কাঁদে। রাত্তিরে।

আমি কখনও মেয়েদের গায়ে হাত তুলি না। মায়ের দিব্যি!

কোন মা? মা কালী, না তোমার নিজের মা? তোমাদের ছোটলাট কালীপুজো করে!

ও হারামি কী করে তা আমি জানব কী করে?

ছোটলাট তোমার কে হয়?

কেউ না। ম্যানেজার।

ও আর তুমি এক ঘরে থাকো?

কভি নেহি, সাহেব। সন্‌ঝের পর ওর সঙ্গে আমার দেখাই হয় না!

তবে মদ খাও কার সঙ্গে বসে? বড়লাট আসে?

এইরকম চলল অনেকক্ষণ। মতিবিবি কিছুতেই মচকাবে না। রশিদ এক-একটা

অভিযোগ আনছে। তাতে সে একটুও চমকে উঠছে না পর্যন্ত। মুখের একটাও রেখা কাঁপে না। সব অভিযোগ সে অস্বীকার করে যাচ্ছে। সে জানে, আদালতে এগুলো প্রমাণ করতে হবে।

সিগারেট ধরাবার জন্য রশিদ একটু থামতেই আমি নিম্নস্বরে বললাম, রশিদ, তোমাকে আনোয়ারার কথা বলেছিলাম। বাংলাদেশের এক অধ্যাপকের স্ত্রী। আমার যতদূর ধারণা, এইরকম একটা গ্যাং-ই তাকে সৌদি আরবে চালান করেছে। এদের কাছ থেকে আনোয়ারার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে না?

রশিদ বলল, দেখতে হবে। তবে এদের দৌড় বম্বে পর্যন্ত। সেখান থেকে আর একটা দল মেয়েদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে বিদেশে চালান দেয়।

আমি বললাম, আনোয়ারা আমাদের বাড়িতে ছিল। কিন্তু এয়ারপোর্টে দেখেছি, আরও কিছু মেয়ে গেল ওর সঙ্গে। তারা নিশ্চয়ই এরকম কোনও ডেরাতেই ছিল।

রশিদ বলল, একবার যখন ধরেছি, আমি শেষ না দেখে ছাড়ব না। ওই আনোয়ারা আগে দুবাই গেছে বললে না? রয়াল জর্ডন এয়ারলাইনস! ইদানীং রয়াল জর্ডন তো বম্বেতেও স্টপওভার দিচ্ছে। ওকে যদি বম্বেতে নামিয়ে দিয়ে থাকে? দাঁড়াও, দেখছি, দেখছি!

আবার সে জেরা শুরু করার একটু পরেই লাচ্ছুদা এসে উপস্থিত হলেন। নিজে জেরায় অংশ না নিয়ে সিগারেট টানতে লাগলেন চুপচাপ।

হঠাৎ একসময়ে আপন মনে বলে উঠলেন,

It is but foolery ; but it is such a kind of gain-giving, as would perhaps trouble a woman....

নিশ্চয়ই শেক্সপিয়ার। কোন নাটকের বুঝতে পারলাম না। হ্যামলেট হলেও হতে পারে।

তারপর বললেন, রশিদ, এ অতি শক্ত বাদাম! ফাটাতে পারবে না। বরং এক কাজ করো, যে-মেয়েগুলোকে উদ্ধার করা হয়েছে, তাদের একজনকে ডাকো। নেপালি না, ওর ভাষা বুঝব না। বাংলাদেশি মেয়েকে আনো।

মেয়েগুলোকে উদ্ধারশ্রমে পাঠানো হবে। আপাতত এ বাড়িতেই বসিয়ে রাখা হয়েছে। আর্দালি একজনকে এই ঘরে নিয়ে এল।

মেয়েটির বয়েস পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে। মলিন চেহারা, একটা সস্তা ডুরে তাঁতের শাড়ি-পরা। মাজামাজা গায়ের রং, স্বাস্থ্যও ভালো নয়। চোখদু'টিতে বাংলার পলিমাটির আভা যেন লেগে আছে।

লাচ্ছুদা যদিও রশিদের ওপরওয়ালা, তবু বিনীতভাবে বললেন, রশিদ, আমি যদি এই মেয়েটিকে কিছু কোশ্চেন করি, তুমি কিছু মনে করবে?

রশিদ বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার, আপনিই বলুন। আমি তো আপনার কাছ থেকেই

শিখেছি।

লাচ্চুদা খুবই নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী মা?

মেয়েটি কিছু উত্তর দিল না।

লাচ্চুদা আবার বললেন, এসো, তুমি এই চেয়ারটায় বোসো। তোমার আর কোনও ভয় নেই। বলো, তোমার নামটা বলো!

আরো দু'তিনবার অভয় দেবার পর মেয়েটি একটি চেয়ারে আধখানা বসে মুখ নিচু করে কী যেন নাম বলল মিনমিন করে। আমি বা লাচ্চুদা তা বুঝতে পারলাম না। রশিদ বলল, নাম বলছে ইফফাত আরা।

লাচ্চুদা বললেন, ইফফাত! কমন নাম। একজন গায়িকা আছে না? মা, ইফফাত, তোমার বাড়ি কোথায়? কোন গ্রামে?

মেয়েটি এবারেও অস্পষ্ট করে বলল, মাওয়া।

লাচ্চুদা বললেন, কী বললে, মাওয়া? সে আবার কোথায়? কোন জেলায়?

এ ব্যাপারে রশিদের চেয়ে আমার জ্ঞান বেশি।

আমি বললাম, মাওয়া তো আপনাদের বিক্রমপুরের পাশ দিয়েই যেতে হয়। ওখানে ফেরিঘাট আছে। পদ্মা পার হাওয়া যায়।

লাচ্চুদা বললেন, কী জানি, আমাদের সময় ছিল না।

তারপর সোজা হয়ে বসে বললেন, বিক্রমপুরের মেয়ে। তার মানে তো আমার আত্মীয়। আমার এলাকার মেয়েকে কুপথে এনেছে, এদের সবকটাকে শূলে চড়াতে হবে! রশিদ, এদের পালের গোদাটাকে যেমন করে পারো ধরো!

আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মা, তুমি সেখানে কী করতে? শাদি হয়েছে?

মেয়েটি প্রথমে দু'দিকে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ শাদি হয়নি। তারপর বলল, সেখানে আমার আব্বুর একটি পান-বিড়ির দোকান আছে।

লাচ্চুদা বললেন, বেশ। তুমি সেই দোকানে বসতে? এদের পাল্লায় পড়লে কী করে? নিজের জায়গা ছেড়ে এলে কেন?

মেয়েটি চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল।

লাচ্চুদা আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, সকলেরই তো প্রায় একই গল্প। দারিদ্র্য, অসুখী পরিবার, ক্ষীণ আশার হাতছানি আর তারপর দেওয়ালি পোকার মতো আলোতে ঝাঁপিয়ে পড়া।

মেয়েটিকে একটুক্ষণ কাঁদতে দিয়ে তারপর লাচ্চুদা জিজ্ঞেস করলেন, ক'দিন ধরে এখানে এনেছে?

মেয়েটি বলল, পাঁচদিন। না, সাতদিন।

লাচ্চুদা বললেন, দিন গুণতেও ভুলে গেছে। ঠিক মতন খেতে-টেতে দেয়? ভাত না রুটি?

মেয়েটি বলল, ভাত।

লাচ্চুদা বললেন, যাক, ভাত দেয়। রুটি! আমি তো এখনও রুটি খেতে পারি না। আর কী দেয় ভাতের সঙ্গে?

মেয়েটি বলল, একটা সবজি, ট্যাড়শ কিংবা কদু।

লাচ্চুদা বললেন, রশিদ ব্যাটা নিশ্চয়ই কদু মানে জানে না। কদু মানে লাউ। তা মন্দ না। আর কী দেয়?

আর কিছু না!

আর কিছু না? শুধু ভাত আর একটা তরকারি?

একদিন নাইরকোলের বড়া দিছিল।

নারকোলের বড়া খুব ভালো জিনিস। ডাল দেয়নি?

না।

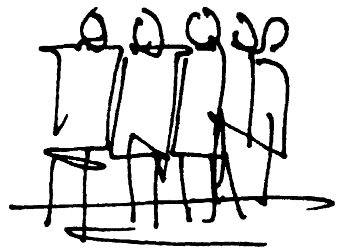
একদিনও ডাল দেয়নি?

না।

লাচ্চুদা হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে বলতে লাগলেন, ডাল দেয়নি? এমন চশমখোর! বাংলাদেশের মানুষ ডাল ছাড়া খেতে পারে? এরা দু'বার ডাল খায়। মাছ-মাংস না হয় না দিক, তা বলে ডাল দেবে না? এগুলো কি মানুষ! এই রশিদ, একজন লেডি পুলিশকে ডাকো না। ওই মাগীটাকে কয়েকটা থাবড়া মারুক। আমারই হাত নিশপিশ করছে! সামান্য একটু ডালও দেয়নি। এমন নৃশংস!

ডাল নিয়ে লাচ্চুদার বাড়াবাড়ি দেখে আমাদের হাসি সামলানো মুশকিল হল।

এরই মধ্যে আমার মাথায় ঘুরতে থাকল, রয়াল জর্ডন এখন মুম্বাইতে থামে। আনোয়ারাকে যদি সেখানে নামিয়ে রেখে থাকে, তাহলে তাকে উদ্ধার করা খুব একটা অসাধ্য হবে না।



৪

কয়েকদিনের মধ্যেই মেয়ে-পাচারকারীদের সম্পর্কে আমার অনেক কিছু জানা হয়ে গেল। কয়েকজনকে দেখলামও স্বচক্ষে।

সাধারণ চোর-ডাকাতদের সঙ্গে এদের কোনও মিল নেই। এরা ছুরি-ছোরা, বন্দুক-পিস্তলের কারবার করে না। সঙ্গে কোনও অস্ত্রই রাখে না বলতে গেলে। সমাজের নানাস্তরে এরা অন্যপরিচয়ে মিশে থাকে। সামান্য বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই এরা আস্তানা বদল করে, কখনো দুঃসাহসিক কোনও কাণ্ড করার ঝুঁকি নেয় না। চোর-ডাকাত কিংবা খুনি কিংবা রাজনৈতিক মাস্তানদের সঙ্গেও এরা সংশ্রব রাখে না বলে এদের চেনা খুব শক্ত।

পুলিশের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ভালো। নিচুস্তরের পুলিশরা এদের কাছ থেকে নিয়মিত ঘুষ খায়, চুপচাপ থাকে। অনেক ডাকাতের দল বা পেশাদার খুনিকেও পুলিশ চেনে, তাদের কাছ থেকেও ঘুষ খায়, কিন্তু মাঝে মাঝে দায়ে পড়ে তাদের গ্রেফতারও করতে হয়। কারণ, ডাকাতি বা খুন নিয়ে হইচই হয় খুব, খবরের কাগজে প্রথম পাতায় হেডলাইন হয়, সাধারণ মানুষও বিক্ষোভ দেখায়। তাই ওপর মহলের চাপে পুলিশকে কিছুটা তৎপরতা দেখাতেই হয়। সেই তুলনায় নারী-পাচার হয় প্রায় নিঃশব্দে। বহু যুগ ধরে এই কারবার চলে আসছে, কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজ তা নিয়ে খুব একটা মাথায় ঘামায় না। মাঝে মাঝে সামান্য তরঙ্গ ওঠে, অচিরেই তা মিলিয়ে যায়। যারা ধরা পড়ে, প্রমাণ-অভাবে আদালতে তাদের শাস্তি হয় না। নিচের তলার পুলিশরা ইচ্ছে করেই দুর্বল কেস সাজায়। এই মতিবিবি আগে দু'বার ধরা পড়েও ছাড়া পেয়ে গেছে। জেলখানাগুলোতে নারী-পাচারকারীর সংখ্যা প্রায় শূন্য বলা যেতে পারে।

রাজনৈতিক দল কিংবা বিমা কোম্পানির মতন এক-একটি নারী-পাচারকারী দলের বহু এজেন্ট ছড়ানো থাকে সারা দেশে। তাদের মধ্যে পুরুষ যেমন আছে, মেয়েও কম নেই। এরা ঘুরে ঘুরে খবর নেয়, কোথায় রয়েছে কত অসহায় মেয়ে। এর জন্য বেশি তৎপরতাও প্রয়োজন হয় না। আমাদের মতন গরিব দেশে অসহায় মেয়ের

সংখ্যাই তো বেশি। অধিকাংশ সংসারেই কন্যাসন্তান অবাঞ্ছিত। মেয়ে একটু ডাগর হলেই তার বিয়ের চিন্তায় গরিব ঘরের বাবা-মায়ের ঘুম ঘুচে যায়। মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে, নাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, এই সংস্কার আমাদের সমাজে বদ্ধমূল। যারা দু'বেলা খেতে পায় না, তাদেরও আছে কলঙ্কের ভয়!

এক সময় কলেজ স্ট্রিট কফি হাউজের সামনে দু'তিনটি বাচ্চা মেয়েকে ভিক্ষে করতে দেখতাম। তার মধ্যে একটি মেয়েকে দেখে চমকে চমকে উঠেছি। এককালের হলিউডের বিখ্যাত অভিনেত্রী অড্রে হেপবার্নের সঙ্গে তার মুখের আশ্চর্য মিল, ঠিক যেন সেই মুখটি বসানো। অড্রে হেপবার্ন আমার প্রিয় নায়িকা ছিল, গ্রেগরি পেকের সঙ্গে তার *রোমান হলিডে* ছবিটি অলটাইম ক্লাসিকের পর্যায়ে পড়ে। সেই ভিখারিনি বালিকাটির বয়েস বড়জোর নয়-দশ, এত সরল মুখখানি আর সুরেলা রিনরিনে গলা যে তাকে দেখলেই গাল টিপে আদর করতে ইচ্ছে করত।

একদিন মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, তোর নাম কী রে!

সে বলেছি, আইমা।

অন্য একটি মেয়ে, সে হয়তো এক বছরের বড়, দেখতে তেমন ভালো নয়, সে কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা দুই বোন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে জেনেছিলাম, ওরা সারাদিন ভিক্ষে করে, আর সন্ধের পর শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে শুয়ে থাকে। সেখানে ওদের ভিক্ষের সব টাকা এক মাসিকে দিয়ে দিতে হয়। না দিলে কেড়ে নেয় আর মারে। সেখানে ওরা খেতে পায় দু'বেলা।

আইমা নামটা শুনে আমার খটকা লেগেছিল। এরকম নাম কখনও আগে শুনিনি। কোনও নামের ভগ্নাংশ? তা মেয়েটি জানে না। ওর দিদির নাম রহিমা; হয়ত মুসলমান বাড়ির মেয়ে। অবশ্য, যারা সারাদিন ভিক্ষে করে আর রাত্তিরে রেলস্টেশনে শুয়ে থাকে, কোনও ধর্মকর্মের সঙ্গে সম্পর্কই নেই, তারা আবার হিন্দু কিংবা মুসলমান কী? তবু, এদেশে জন্মপরিচয় কিছুতেই মুছে ফেলা যায় না।

শিয়ালদা স্টেশনে থাকে, কিন্তু ওরা এল কোথা থেকে? স্টেশনে তো আর জন্মায়নি!

আইমা কথাই বলতে চায় না, শুধু বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে থাকে। সেই তুলনায় রহিমা কিছুটা টরটরে। সে বলল, ওদের জন্ম অনেক দূরের এক গ্রামে। রেলে চেপে এসেছে সেখান থেকে।

কত দূর বা কোন জেলায় সে গ্রাম, তা জানে না। ওরা ছিল এগারোটি ভাই-বোন। কিছুদিন আগে ওদের মা মারা যাবার পর বাবা ওদের দু'বোনকে নিয়ে একসঙ্গে ট্রেনে চেপে বেড়াতে এসেছিল। তারপর দু'জনকেই শিয়ালদা স্টেশনে ছেড়ে দিয়ে ওদের জনক অদৃশ্য হয়ে যায়। ওদের অন্য বোনেরা কোথায় ছড়িয়ে ছিটকিয়ে গেছে, তাও ওরা জানে না।

কয়েকমাস পরেই আইমা ও রহিমাকে আর দেখা যায়নি। একদিন কয়েকজন বন্ধু মিলে রাত্তিরবেলা শিয়ালদা স্টেশনেও খুঁজতে গিয়েছিলাম ঝোঁকের মাথায়। সেখানে বেশ কয়েকটি ভিখিরিগোষ্ঠী মৌরসিপাট্টা গেড়ে আছে. সেখানে ওই মেয়েদুটি নেই। সম্ভবত তাদের শরীরে নারীত্বের চিহ্ন ফুটে উঠতে না উঠতেই কোনও অন্ধকার জগৎ তাদের টেনে নিয়ে গেছে।

আইমাকে নিয়ে আমি আগে একবার লিখেছি। তবু এতদিন পরেও সে আমার মন থেকে মুছে যায়নি। যখনই অড্রে হেপবার্নের কোনও পুরোনো ছবি দেখি, সেই ভিখারিনি বালিকাটির কথা আমার মনে পড়ে, একটু একটু ব্যথার অনুভূতি হয়।

এখন কিছু কিছু সংস্থা পথশিশুদের নিয়ে নানারকম কাজ করছে। তাদের লেখাপড়া শেখানো ও কিছু কিছু জীবিকার ব্যবস্থা হচ্ছে, তাদের নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা করে ওষুধও দেওয়া হয়। আইমারা সে-সুযোগ পায়নি।

সন্তোষকুমার ঘোষের একটি মর্মস্পর্শী ছোটগল্প আছে, 'রাণু যদি না হতো'। রাণু একটি সুশ্রী, সদ্য যুবতী, তার বাপ-মায়ের খুব আদরের। কিন্তু রাণু জানে না, তার জন্মের আগে তার বাবা-মা দু'জনেই সন্তান চাননি, গর্ভনিরোধের সবরকম ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, তবু কোনওক্রমে শিশুকন্যাটি জন্মে যায়। অর্থাৎ সেই সময় ওই দুর্ঘনাটি না ঘটলে পৃথিবীতে এই সুন্দরী, নিখাদ যুবতীটির কোনও অস্তিত্বই থাকত না। এই কথাটা এখন রাণুকে জানিয়ে দিলে কেমন হয়?

প্রিয়ব্রত সান্যালের বাড়িতে আমি যতবার যাই, ওই গল্পটির কথা বারবার মনে পড়ে। সামান্য ভাড়াবাড়িতে থাকেন, পরিবারটি তেমন সচ্ছল নয়। ওঁদের দু'টি মেয়ে। তার মধ্যে একেবারে ছোট মেয়েটিকে সবসময় পুরুষের মতোই প্যান্ট-শার্ট পরিয়ে রাখা হয়, মাথায় চুলও ছাঁটা। ছেলে-সাজা এ মেয়েটি তার বাবা-মায়ের ব্যর্থ সাধের প্রতীক।

প্রথম দু'টি কন্যাসন্তান জন্মাবার পর প্রিয়ব্রতদা ভেবেছিলেন, তৃতীয়টি নিশ্চয়ই ছেলে হবে। হল না। চতুর্থবারেও সেই আশা। আবার ব্যর্থ হল আশা। ষষ্ঠবারের পর ক্ষান্ত দিতেই হল। অর্থাৎ শেষের দিকের চারটি মেয়েই অবাঞ্ছিত। সেই মেয়েরা কিন্তু এখন বেশ স্বাস্থ্যবতী হয়ে সারাবাড়ি ঘুরে বেড়ায়। তারা জানে না, তারা নিজেদের অধিকারে আসেনি।

পুত্রসন্তানের জন্য এই ব্যাকুলতা অতি বিশ্রী ব্যাপার। এই আধুনিককালে মেয়েরা তো সব ব্যাপারেই ছেলেদের সমান হতে পারে, যদি সুযোগ পায়। তারা লেখাপড়া শিখে চাকরি-বাকরি কিংবা জীবিকার ব্যবস্থা করে নিতে পারে, শেষ বয়েসে ছেলের তুলনায় মেয়েরাই বাবা-মাকে দেখবে আশা করা যায়। তবু বাবা-মায়েরা এটা মানতে চায় না। তাদের ধারণা, ছেলে না জন্মালে বংশরক্ষা করা যায় না। এই বংশরক্ষা কিংবা রক্তের সম্পর্ক ইত্যাদিও কুসংস্কার। বংশরক্ষা করতেই বা হবে কেন?

রবীন্দ্রনাথ কিংবা শেক্সপিয়ারের কোনও বংশধর নেই, কত মহাপুরুষও তো নিঃসন্তান, তাতে পৃথিবীর কী ক্ষতি হয়েছে? আবার অনেক মহাপুরুষ কিংবা সৎ, ভদ্র মানুষেরও বংশধর হয় অতি কুলাঙ্গার। এ তো আমরা প্রায়ই দেখি। অনেক গুণধর ছেলে, নিজের বউয়ের প্ররোচনায় বৃদ্ধ বাবা-মাকে কষ্ট দেয়। এ উদাহরণ তো অসংখ্য! তবু বংশরক্ষার এত মায়া।

রশিদের সঙ্গে সেদিনই বিকেলে রয়াল জর্ডন এয়ারলাইন্স অফিসে গিয়ে একটা অদ্ভুত ঘটনা জানা গেল। তাদের কলকাতার ফ্লাইট মুম্বাইতে গিয়ে কিছুক্ষণ থামে বটে, কিন্তু সেখানে কোনও যাত্রী নামে না কিংবা নতুন যাত্রীও তোলা হয় না। সেরকম নিয়ম নেই। শুধু তেল ভরে নেয় বিমানে। কিন্তু সেই বিশেষ দিনটিতে মুম্বাই পৌঁছোবার পর বিমানটি আর ছাড়েনি। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য বিমানটিকে বসিয়ে দেওয়া হয় আঠারো ঘণ্টার জন্য, নামিয়ে দেওয়া হয় সব প্যাসেঞ্জারকে। পরদিন পুরোনো যাত্রীরা সবাই আবার ফিরে এসেছিল কিনা, তা এখানকার অফিস বলতে পারবে না। এরকম ক্ষেত্রে কিছু লোক যাত্রা বাতিল করতেই পারে।

অর্থাৎ আনোয়ারাকে মুম্বাই নামিয়ে নেওয়া হয়েছে কিংবা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সৌদি আরবে, তা জানা গেল না।

রশিদ অবশ্য অফিসে ফিরে এসে মুম্বাই পুলিশকে জানাল সব ঘটনা। তারা 'দেখছি' 'দেখছি' বলে ফোন ছেড়ে দিল। বিশেষ গুরুত্ব দিল না।

আমি রশিদকে বললাম, তুমি নিজে একবার মুম্বাই যেতে পার না? তোমরা তো এনকোয়ারির জন্য দিল্লি, মুম্বাই, এমনকি কাশ্মীরেও যাও, কাগজে দেখি। এই তো ক'দিন আগে পাঞ্জাবের পুলিশ কলকাতায় এসে একজন ক্রিমিনালকে ধরে নিয়ে গেল!

রশিদ বলল, কী মুশকিল, আমার অফিস আমাকে না পাঠালে আমি যাব কী করে? নিজের ইচ্ছেতে যাওয়া যায়? তাছাড়া, তোমরা তো এখানে কোনও থানায় এফ আই আর করোনি!

এখন করে দেব? তুমি বলে দাও, কী করে করতে হবে?

আরে ইয়ার, তুমি এফ আই আর করবার কে? হাউ ইউ আর রিলেটেড উইথ হার? মহিলার স্বামী কিংবা ভাই-টাই যদি করে... তাছাড়া ব্যাপারটা অরিজিনেট করেছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশ সরকার আমাদের অনুরোধ জানালে আমরা এনকোয়ারি স্টার্ট করতে পারি। তাছাড়া তো আমরা কিছু করতে পারি না!

অনেক নিয়মকানুনের ঝামেলা আছে?

অফ কোর্স! তাছাড়া তুমি বলেছ, সে মহিলা নিজের ইচ্ছেতে গেছেন। তিনি আবার প্রাপ্তা, নো, প্রাপ্তবয়স্কা! দেখো. কীরকম বাংলা বলছি! প্রাপ্তবয়স্কা! তাকে

টাচ করা যাবে না! তিনি যদি বলেন, সৌদি আরবে যাচ্ছি, আমার ইচ্ছে হয়েছে, আপনাদের তাতে কী?

কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না! তাকে ভুল বোঝানো হয়েছে। সেও রাগের চোটে, ঝোঁকের মাথায়... কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে সে একটা র‍্যাকেটের মধ্যে পড়েছে।

শোনো সুনীল, তোমরা ভাববিলাসী, তোমরা ফ্যাক্ট অব লাইফ অনেক কিছুই জানো না। অধিকাংশ মেয়েই স্বেচ্ছায় যায়। লোভের বশে, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায়। সেইজন্যই তো মেয়ে-পাচারের কারবারটা এমন রমরমিয়ে চলে। তাদের বাবা-মায়েরাও অনেক সময়ই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। মেয়েটা গেছে তো গেছে, আপদ গেছে। মেয়ে চুরি হলেও থানায় রিপোর্ট করে না। তুমি একটা জিনিস লক্ষ করনি? খবরের কাগজে যে নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন বেরোয়, সবই তো ছেলেদের জন্য! কোনও মেয়ের নামে বিজ্ঞাপন দেখেছ? খুবই রেয়ার! মেয়েরা কি বাড়ি ছেড়ে যায় না! প্রচুর, প্রচুর! তারপর ধরো, একটা ছেলে বাড়ি থেকে পালাল, আবার ফিরে এল ছ'মাস কী এক বছর পরে, তার কত আদর-যত্ন হবে, তাকে দুধ-ভাত খাওয়াবে! কোনও মেয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে ছ'মাস বাদে ফিরে এলে কী হবে? তাকে বাড়িতে ঢুকতেই দেওয়া হবে না! মারতে মারতে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হবে! এই হচ্ছে আমাদের সোসাইটির আসল চেহারা। মেয়েটিকে আলটিমেটলি স্ট্রেট যেতে হবে কোনও ব্রথেলে!

গরিবদের মধ্যে এরকম হয় ঠিকই। কিন্তু এ মেয়েটি বিবাহিত ও ভদ্র পরিবারের, তার স্বামী হিস্ট্রির প্রফেসর, খুবই উদারমনস্ক। এমনিতে হ্যাপি ফ্যামিলি, হয়তো দু'একবার ঝগড়া হয়েছে, সব ফ্যামিলিতেই হয়, মেয়েটি একটু বেশি রাগী, ভেবেছে, সৌদি আরবে গিয়ে অনেক টাকা রোজগার করে ফিরে এসে স্বামীকে জব্দ করবে। পুরোটাই ইলিউশান!

মহিলার কত যেন বয়েস বলেছিলে?

খুব বেশি না। বত্রিশ-তেত্রিশ।

দেখতে ভালো?

হ্যাঁ, বেশ ভালোই তো। সুন্দরীই বলতে পারো।

হুঁ, বাংলাদেশের এক মহিলার ব্যাপারে তুমি এত ইনভল্‌ভড হয়ে পড়ছ কেন? কোনও অ্যাফেয়ার-ট্যাফেয়ার হয়েছে নাকি?

আমি হাসলুম।

এরকম প্রশ্ন উঠবেই। একটি নিখোঁজ বাচ্চা ছেলে কিংবা অসুস্থ বৃদ্ধের ব্যাপার হলে সবাই সহানুভূতি দেখাবে। কিন্তু কোনও যুবতীকে নিয়ে উদ্বেগ দেখালে অনেকেরই মনে হবে, আমার নিজস্ব কোনও গভীর কারণ আছে।

কারণ কি সত্যিই নেই, না আছে? একটি শিশু কিংবা একটি বৃদ্ধ হলে কি এতটা

সময় ব্যয় করতাম? খবরের কাগজে কোনও অচেনা তরুণীর গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার খবর পড়লে যতটা দুঃখিত বোধ করি, কোনও যুবকের সেরকম ঘটনায় মনে ততটা দাগ কাটে না। এটাই প্রকৃতির খেলা।

সৌদি আরবে গিয়ে আনোয়ারার কোন ধরনের বিপদের কথা আমি ভাবছি? অন্য পুরুষরা তার শরীর নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, এটাই তো প্রধান উদ্বেগের বিষয়! এটা কি এক ধরনের ঈর্ষা নয়? আনোয়ারার সঙ্গে আমার কোনও অ্যাফেয়ার হয়নি, সে প্রশ্নই ওঠে না, তবু এই সুপ্ত ঈর্ষাবোধ কাজ করছে আমার মনে। এটাও প্রকৃতির খেলা।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, চলি এবার রশিদ!

রশিদ বলল, আমার কথায় রাগ করলে নাকি! আরে বাবা, আমি তো জানিই, মোসলমান মেয়েদের সম্পর্কে হিন্দুদের মধ্যে একটু ছুঁকছুঁকুনির ভাব আছে। মনে করে, ইজিলি অ্যাভেইলেব্‌ল!

আর হিন্দু মেয়েদের সম্পর্কে মুসলমানদের সেরকম কোনও ভাব নেই, তাই তো?

নেই মানে? ডাব্‌ল! ডাব্‌ল ছুঁকছুঁকুনি! যেমন আমার।

এরপর রশিদ হাসতে শুরু করল। তার সেই বিখ্যাত হাসি। সারা শরীরটা কাঁপে, আর থামতেই চায় না। অতবড় জোয়ান পুরুষটিকে এরকম হাসির সময় মনে হয়, একেবারে যেন একটি শিশু!

এই সময় ওর কাঁধে চাপড় মেরে থামাতে হয়।

হাসি থামলে রশিদ বলল, কোথায় যাব? দাঁড়াও না, সন্দীপন ব্যাটাকে ডাকি। তারপর পার্ক স্ট্রিটে গিয়ে বসব!

আমি বললুম, না, আজ আর হবে না। আজ এক জায়গায় কবিতা পড়তে যেতে হবে।

রশিদ বলল, তোমরা বাংলা কবিরা হ্যাংলার মতন যেখানে-সেখানে কবিতা পড়তে যাও কেন? বিনা পয়সায়? রানিগঞ্জে একটা উর্দু পোয়েট্রি ফেস্টিভ্যালে গিয়েছিলাম গত মাসে, আমাকে দু'হাজার টাকা দিয়েছে! তোমাদের কী দেয়, ঠান্ডা সিঙাড়া আর ভাঁড়ের চা!

আমি বললুম, আজকাল আর সিঙাড়াও দেয় না। শুধু চা। তুমি এতক্ষণ অফিসে বসে আছ। তোমার যে আবার প্রমোশান হয়ে যাবে, তখন আরও বিপদে পড়বে!

রশিদ বলল, ধুর, আমি তো এ চাকরি ছেড়েই দিচ্ছি। এই শীতকালেই আমার ছবির শুটিং শুরু করব। সামনের বছর কান ফেস্টিভ্যালে আমার ছবি যাবে। ক্যামেরায় কে থাকছে জানো? কে কে মহাজন, মৃণালদার সব ছবি যে করে। আমার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে, রাজি আছে। গ্রেট ক্যামেরাম্যান।

সিনেমার কথা শুরু করলে অনেকক্ষণ চলবে। ওর উৎসাহে খানিকটা জল ঢেলে

দিয়ে আমি বললুম, তোমার তো ক্যামেরাম্যান ঠিক হয়ে গেছে। নায়ক-নায়িকা, সব কাস্টিং রেডি। শুধু একটা সামান্য জিনিস বাকি আছে। ফিনান্স! টাকাটা কে দেবে?

খানিকটা চুপসে গিয়ে রশিদ বলল, হয়ে যাবে। টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে!

দু'জনেই বেরুলাম এক সঙ্গে। রশিদ ওর গাড়িতে আমাকে রবীন্দ্র সদন পর্যন্ত লিফ্‌ট দিল।

এক-এক সময় এমন কিছু ঘটনা ঘটে, যা অল্পসময়ে খুব সাধারণ মনে হলেও সেই বিশেষ সময়ে মনে হয়, সব ঘটনার মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। যেন একটা নির্দিষ্ট ছক মেনে ঘটে যাচ্ছে। উপন্যাসের মতন।

মাঝে মাঝে আমাকে দিল্লি যেতে হয়, সাহিত্য আকাদেমির আমন্ত্রণে। আসাম, উড়িষ্যাতেও যাই। বিহার থেকে কখনও ডাকে না। মুম্বাই যাওয়া হয় কদাচিৎ। শেষ গেছি চার বছর আগে।

বাড়িতে এসে একটা চওড়া খামের চিঠি পেলাম। জাতীয় চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্ষদের আমন্ত্রণ। দু'বছর আগে ওরা সাতটি ভারতীয় ভাষায় চিত্রনাট্য প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছিল। এতদিন বাদে তার ফলাফল ঘোষিত হবে। তার মধ্যে বাংলা চিত্রনাট্যগুলোর বিচারক হবার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে। যেতে হবে মুম্বাই। প্লেনভাড়া, হোটেলভাড়া সব দেবে। মোট একচল্লিশটি বাংলা চিত্রনাট্যের বিচার করতে হবে পাঁচদিনে। দু'বছর ফেলে রেখে এখন পাঁচদিনের মধ্যে দেখে দিতে হবে তাড়াহুড়ো করে।

ঠিক এই সময়ে মুম্বাই যাওয়ার আমন্ত্রণ কি কাকতালীয় বলা যায়?

স্বাতীকে জিজ্ঞেস করলাম, যাবে নাকি মুম্বাই বেড়াতে? হোটেলের খরচ লাগবে না। ওরা আমাকে কিছু ফি দেবে, তাতে তোমার প্লেন ভাড়াটা হয়ে যাবে।

বেড়াবার নাম শুনলে স্বাতী সবসময় নেচে ওঠে। কিন্তু এখন হতাশভাবে বলল, যাব, এই সাতাশ তারিখ? ওরা আর একটু পরে ডাকতে পারল না!

সাতাশ তারিখে ওর এক মাসির মেয়ের বিয়ে। সেই বিয়ের সময় ওকে থাকতেই হবে!

সারা ভারত চলচ্চিত্র পুরস্কারে আমি বারদুয়েক জুরি হয়েছি। প্রথমবারে বেশ উৎসাহের সঙ্গে গেলেও দ্বিতীয়বার ভালো লাগেনি। খুবই বিরক্তিকর কাজ। প্রতিদিন সাত-আট ঘণ্টা ধরে পরপর ফিল্ম দেখে যেতে হয়, বিভিন্ন ভাষার। চোখ টনটন করে। হিন্দি আর ইংরিজি ছাড়া অন্য ভাষায় ছবির সাব-টাইট্‌ল পড়তে হয়। আগে এক প্রস্থ প্রাথমিক নির্বাচন হয়ে গেলেও যেসব ছবি বিবেচ্য হয়, তারও অধিকাংশই অখাদ্য! মনে হয়, শুধু শুধু সময় নষ্ট!

গত বছর আমি জুরি হবার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলুম।

এবারেও মুম্বাই শহরে গিয়ে হোটেলের ঘরে বসে বসে একচল্লিশখানা চিত্রনাট্য পড়ার কাজটা মোটেই সুখকর নয়। এবারেও প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম, কিন্তু ক'দিন ধরে মুম্বাই শহরের কথা আমার বারবার মনে পড়ছে। এসে গেল অপ্রত্যাশিত সুযোগ। এরকম একটা উপলক্ষ না থাকলে মুম্বাই যাওয়া হতো না।

মুম্বাই শহরের কেন্দ্রস্থলে, চার্চগেটের কাছে আকবর হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। এগারোতলার ওপরে ঘর, জানলা দিয়ে সুদূরে চোখ চলে যায়। কিন্তু সমুদ্র দেখা যায় না।

এ শহরে আমার কিছু পরিচিত মানুষজন আছে। তাদের মধ্যে একটি মারাঠি দম্পতি আমাকে খুবই ভালোবাসে। স্বামীর নাম বলবন্ত, সে বাংলা জানে না, কিন্তু চমৎকার রবীন্দ্রসংগীত গায়। শুধু গায় না, তার বাড়িতে শনি-রবিবার গানের ক্লাস হয়, সেখানে বলবন্ত বাঙালি ছেলেমেয়েদেরও রবীন্দ্রসংগীত শেখায়। সে বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারে না। কিন্তু গানের উচ্চারণ নিখুঁত। তার স্ত্রী নলিনী জন্মসূত্রে গুজরাতি, সে বাংলা শিখেছে বাংলা সাহিত্য ভালোবেসে। গুজরাতিদের মধ্যে অনেকেরই বাংলাপ্রীতি আছে। গুজরাতের প্রখ্যাত কবি উমাশঙ্কর যোশী বাংলা বলতেন মাতৃভাষার মতন। নলিনী বাংলা কবিতা গুজরাতিতে অনুবাদ করে।

আমার ওপর এই দম্পতিটির এমনি অধিকারবোধ যে এর আগে আমি যে ক'বার মুম্বাই এসেছি, ওরা উপস্থিত থেকেছে এয়ারপোর্টে। কোনও হোটেলে থাকার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট থাকলেও ওরা জোর করে নিয়ে গেছে নিজেদের বাড়িতে। ওরা নিরামিষাশী হলেও আমার জন্য দোকান থেকে আনিয়েছে চিংড়ি মাছ আর কষা মাংস।

আকস্মিক হৃদরোগে বলবন্ত চলে গেছে এক বছর আগে।

এখানে আসার আগে কলকাতা থেকে ফোন করে নলিনীকে আমি জানিয়েছিলাম। নলিনী জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি আমাদের বাড়িতেই থাকবেন তো? সব ব্যবস্থা করে রাখব। আপনার কোনও অসুবিধে হবে না।

আমি বলেছিলাম, না, কিছু মনে কোরো না। কাজের জন্য আমাকে হোটেলেই থাকতে হবে। এন এফ ডি সি-র লোকেরা দেখা করতে আসবে। তোমার বাড়িতে আমি এমনিই চা খেতে যাব!

নলিনী হতাশভাবে বলেছিল, আপনি আমাদেব বাড়ি থাকবেন না? বলবন্তের আত্মা খুশি হতো।

আমি যে আত্মা-টাত্মা কিছু মানি না, তা এক সদ্য বিধবাকে বলা যায় না। ওদের বাড়িতে অনেক ঘর আছে ঠিকই। তবু ওখানে আমার রাত্রিবাস করা এখন ঠিক শোভন নয়।

নলিনীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছি, চা খেতে তো যাবই। তোমার মেয়ে কেমন আছে? তুমি দারুণ হালুয়া বানাও, সেটা খাওয়াতে হবে কিন্তু।

আর আছে আমার বাল্যবন্ধু সুনন্দ গুহঠাকুরতা। যার ডাক নাম বুঢ়্ঢা। তাকে অবশ্য আগে কিছু জানানো হয়নি।

পৌঁছেছি শেষ বিকেলে। একটু পরেই এন এফ ডি সি-র লোক এসে তিন বান্ডিল চিত্রনাট্য দিয়ে গেল। একটা-দুটো শুধু উলটে-পালটে দেখলাম। কাল থেকে কাজ শুরু হবে। সন্ধের পর আর লেখাপড়া করি না। এটা আমার বহুদিনের অভ্যেস।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ নামে প্রখ্যাত পণ্ডিত বলেছিলেন, সূর্যাস্তের পর লেখাপড়ার কাজ করা উচিত নয়, তখন মানুষের মেধা একটু একটু করে ঘুমিয়ে পড়ে। আমি তাঁর নির্দেশ মেনে চলি, কিন্তু পুরোটা মানি না। অর্থাৎ গল্প-উপন্যাস বা গদ্যজাতীয় রচনা সন্ধের পর লিখি না কখনও। কিন্তু এক-একদিন মাঝরাত্রে, এমনকি হঠাৎ জেগে উঠেও কবিতা লিখে ফেলি। কবিতা লেখার সময় মেধা ঘুমন্ত থাকলেও চলে, শুধু আবেগ ও অনুভূতি তীক্ষ্ণ থাকা দরকার। আবেগ প্রবল নাহলে কবিতা লিখতেই বা যাব কেন?

সন্ধেবেলা কী করা যায়? হোটেলের ঘরে একা বসে থাকার কোনও মানে হয় না। মুম্বাই শহরে প্রচুর বেড়াবার জায়গা। সবচেয়ে বড় কথা, এ শহরের একেবারে গায়েই রয়েছে একখানা সমুদ্র। কলকাতা শহরের পাশে রয়েছে গঙ্গা নদী, এতবড় একখানা নদী পাওয়াও ভাগ্যের কথা, কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে গঙ্গার কোনও যোগ নেই। অনেকদিন দেখাই হয় না। কিন্তু মুম্বাই শহরে ঘুরতে-ফিরতেই সমুদ্র চোখে পড়ে। সমুদ্রের ধার দিয়ে অনেকটা হাঁটা যায়। মালাবার হিলস থেকে, আলো জ্বলে ওঠার পর, শহরের দৃশ্য অপূর্ব। ঠিক যেন এক বিশাল বৈদূর্যমণির নেকলেস।

বেরুবার উদ্যোগ করতে গিয়ে, মনে হল, মুম্বাইতে এসেছি, আর বুঢ়্ঢাকে জানাব না?

এখন আর ওকে অফিসে পাওয়া যাবে না, বাড়িতে ফোন করতে হবে।

ফোনটা তোলার পর বুকটা দুরু-দুরু করতে লাগল। কে ফোন ধরে, বুঢ়্ঢা না ওর বউ? ওর বউকে আমি ভয় পাই।

নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্ত্রীকে যদি ভয় পেতে হয়, তবে সেটা বড় দুঃখের কথা। বন্ধুপত্নীর সঙ্গে ইয়ার্কি-ঠাট্টা-মজা হবে, এটাই তো স্বাভবিক। বুঢ়্ঢা স্বাতীর সঙ্গে সেরকমই ব্যবহার করে। কিন্তু ওর স্ত্রী সাবিত্রীর সঙ্গে আমি সহজ হতে পারি না।

একটা ভুল বিয়ে যে মানুষের জীবনের গতি কতটা ঘুরিয়ে দিতে পারে, বুঢ়্ঢার জীবনই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

বুঢ়্ঢার জীবনে কিছুরই অভাব ছিল না। যেমন ফর্সা রং, তেমনই সুঠাম গড়ন শরীরের, প্রথম যৌবনে বন্ধুরা কেউ কেউ তাকে বলত, গ্রিক গড, কেউ বলত, আমাদের রাজকুমার। লেখাপড়াতেও ব্রিলিয়ান্ট, প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে,

অসাধারণ তার স্মৃতিশক্তি। অত্যন্ত সচ্ছল এবং সংস্কৃতিমান পরিবারের সন্তান, ভদ্র এবং বিনীত। ক্লাসিক্যাল গান শিখতে শুরু করে কয়েক বছরেই সব রাগ-রাগিণী আয়ত্ত করে ফেলল, অনেকটা ফৈয়াজ খাঁ-র মতন দরাজ গলা। ভাষাশেখার ঝোঁকে শিখে ফেলল দশ-বারোটা ভাষা। শুধু একটাই ছিল বুঢ়্ঢার অযোগ্যতা। মেয়েদের সঙ্গে মিশতে জানত না। অথচ ইচ্ছা ছিল প্রবল। আমিই দু-তিনটে মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছি, তাদের সামনে মিনমিন করেছে, কিংবা চুপ করে চেয়ে থেকেছে অন্যদিকে। আমার খুবই প্রিয় বন্ধু, আমার *অর্ধেক জীবন*-এ ওর সম্পর্কে অনেকটা লিখেছি।

বুঢ়্ঢা সিগনেট প্রেসের বাড়ির ছেলে। ঢাকার বিখ্যাত গুহঠাকুরতা পরিবারের সবাই উচ্চশিক্ষিত। ওর বাবা ছিলেন সারা ভারতের সর্বকনিষ্ঠ পিএইচ ডি, তারপর অক্সফোর্ডেরও ডক্টরেট। ওর মা-ও খুব বিদুষী, জওহরলাল নেহরুর বোন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ছিলেন ওর মায়ের সহপাঠিনী। ওর মা নীলিমা দেবীই শুরু করেছিলেন সিগনেট প্রেস, বাংলা ভাষায় তখন হয়ে উঠেছিল শ্রেষ্ঠ প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান এবং ওর জামাইবাবু দিলীপকুমার গুপ্তই বাংলা বইয়ের প্রকাশনায় ছাপা, বাঁধাই, মলাট ইত্যাদিতে এনেছিলেন আধুনিকতা, বলতে গেলে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। এখনকার সব প্রকাশক তাঁর কাছে ঋণী।

বুঢ়্ঢা সিগনেট প্রেসের এক-চতুর্থাংশের মালিক হয়ে দোকানে বসতে শুরু করেছিল। তখন আমরা সেখানে অবিরাম আড্ডা দিতাম। বুঢ়্ঢা সিগনেট প্রেসকে আরও অনেক বড় করতে পারত, কিন্তু কেউ কেউ বলতে লাগল, কলেজ স্ট্রিটের দোকানে রোজ বসে থেকে ওর প্রতিভার অপচয় হচ্ছে। অন্য কিছু উপার্জনের পথে গিয়েও ও অবসর-সময়ে প্রকাশনার কাজ দেখলেই তো পারে।

বুঢ়্ঢা জলের মতন ফরাসি ভাষা বলতে পারত, তাই ও খুব সহজেই কাজ পেয়ে গেল এয়ার ফ্রান্স নামে বিমান-সংস্থায়। কলকাতায় তখন এরকম অনেক আন্তর্জাতিক বিমান-পদবী ছিল। সেখান সে জীবনে প্রথম, একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ের প্রেমে পড়ল, কিংবা সেই মেয়েটিই ওকে প্রেমে পড়াল। সব বড় বড় অফিসেরই স্টেনোগ্রাফার কিংবা অফিসারদের সেক্রেটারি হতো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। অবিলম্বে সেই মেয়েটিকে বিয়ে করে ফেলল বুঢ়্ঢা।

অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েকে বিয়ে করলে আপত্তির কী আছে? কিচ্ছু না। বিয়ে হল খুব ধুমধাম করে। মেয়েটির নাম স্যালি বা ওইরকম কিছু, বুঢ়্ঢাদের বাড়ি থেকে নতুন নাম দেওয়া হল সাবিত্রী। অনেক হিন্দু বাড়িতেই বিয়ের পর মেয়েদের নতুন নাম হতো। ঠাকুরবাড়ি থেকে এই প্রথা চালু হয়। সাবিত্রীরা রোমান ক্যাথলিক, তাই সব নিয়ম মেনে বিয়ে হল গির্জায়। তারপর বুঢ়্ঢাদের বাড়িতে হিন্দুমতে শুধু বউ-ভাত। সেই দিনটায় নতুন বউ বেনারসী শাড়ি আর একগাদা গয়না পরে, কপালে

চন্দনের ফোঁটা এঁকে লাজুক মুখে বসে থাকে, আর অতিথিরা এসে তার হাতে উপহার দেয়।

হঠাৎ একসময় দেখলুম, নতুন বউ সিগারেট খাচ্ছে।

মেয়েদের সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই, বরং পছন্দই করি। যার ইচ্ছে খাবে, যার ইচ্ছে নেই সে খাবে না। এর মধ্যে ছেলে আর মেয়ের বৈষম্য আনতে হবে কেন? তবে সবকিছুরই একটা সাংস্কৃতিক দিক আছে। নতুন বউয়ের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট দেখে আমি পর্যন্ত চমকে উঠেছিলাম। কালচার শক বলতেই হবে। অতক্ষণ পুতুল সেজে বসে থাকতে বিরক্ত লাগে ঠিকই, তাছাড়া যার সিগারেট টানা অভ্যেস, তার একসময় গলা শুকোবেই। একটু উঠে গিয়ে বাথরুমে সিগারেট ধরালেই পারত।

আসলে সাবিত্রীরা ঠিক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান নয়। দু-তিন পুরুষের বাঙালি ক্রিশ্চান। কিন্তু ওরা বাঙালিত্ব মুছে দিয়ে পুরোপুরি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানই হতে চেয়েছিল, যদিও ওর বাবা-কাকারা ফর্সা নয়। ওরা বাংলা ভাষা ও বাঙালির পোশাক ত্যাগ করেছিল। সাবিত্রীও বাংলা বলে না। যদিও ওদের বাড়ি হাওড়ায়, পুরো বাঙালি পল্লীতে।

বুঢ়চাদের বাড়ি আবার বাঙালি সংস্কৃতির কেন্দ্র। জীবনানন্দ দাশ থেকে সত্যজিৎ রায়, নীহাররঞ্জন রায় থেকে আবু সয়ীদ আইয়ুব, এইসব মহীরুহসদৃশ বাঙালিরা আসেন সে-বাড়িতে। আমার মনে আছে, আমাদের বিয়ের সময় বুঢ়চাদের বাড়ি থেকে উপহার পাঠানো হয়েছিল পুরো বাঙালি কায়দায়, একটা বড় কাঁসার থালার ওপর সাজানো একটি খিরের তৈরি মাছ, দুটি বই *বাংলার* ব্রতকথা এবং *মৈমন সিংহ গীতিকা*, এবং একটি লক্ষ্মীর ঝাঁপি।

এ-বাড়িতে এসে সাবিত্রী এই বাঙালি-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে পুরোপুরি বিদ্রোহ করে বসল। সে মেমসাহেব হয়ে থাকতে চায়। কিছুদিনের মধ্যেই অতবড় বাড়ি ছেড়ে এই দম্পতি উঠে গেল বেকবাগানের এক ফ্ল্যাটে।

সেখানে ছুটির দিনে আড্ডা দিতে যেতাম আমরা কয়েকজন। বুঢ়চার ব্রিজ খেলার নেশা ছিল, ও নিজেই ডাকাডাকি করতো। কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, সাবিত্রী তার স্বামীর এই বাঙালি বন্ধুদের পছন্দ করছে না। ঠিক খারাপ ব্যবহার যে করত, তা নয়, তবু কিছু একটা বোঝা যায়। কিছুতেই বাংলা বলবে না আমাদের সঙ্গে। যেখানে মানুষের শৈশবের অনেকগুলো বছর কাটে, সেখানকার ভাষা সব মানুষ শিখে যেতে বাধ্য। হাওড়ার মেয়ে বাংলা জানে না, এটা হতেই পারে না। সে বুঢ়চাকে ভালোবেসেছে, কিন্তু বাংলাকে ভালোবাসতে পারেনি।

বুঢ়চা বেচারি শাক-চচ্চড়ি, মাছের ঝোল খেতে ভালোবাসতো। সেসব উঠে গেল তাদের নতুন সংসারে। সুপ আর স্যান্ডউইচ। বুঢ়চা মাঝে মাঝে অফিসফেরত চলে আসে আমাদের কারও বাড়িতে, প্রাণ যা চায় তাই খায়, বাড়ি ফিরতে দেরি করে,

তাতে সাবিত্রী চটে যায়। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সাবিত্রী ঠিক করল, স্বামীকে সে এই বাঙালি-পরিবেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে। সে নিজে একটা চাকরি ঠিক করে নিল মুম্বাইতে। তারপর বুঢ়াকে বাধ্য করল চাকরি বদলাতে। ওরা চলে গেল মুম্বাই।

বুঢ়া যেহেতু অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী, তাই স্ত্রীর ওপর নিজের মতামত চাপিয়ে দিতে চায়নি। বরং ওর সব ইচ্ছেই মেনে নিয়েছে। বছরকয়েক পরে শুরু হল দ্বন্দ্ব। তার মধ্যে ওদের দুটি ছেলেমেয়ে জন্মে গেছে। বুঢ়া কখনও কখনও সাবিত্রীকে ছেড়ে চলে আসার কথা ভাবলেও ছেলেমেয়েদের প্রতি তার খুব স্নেহ। ক্যাথলিকদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্ভব নয়। সুতরাং সাবিত্রী বুঢ়াকে ডিভোর্সও দেবে না, ছেলেমেয়েদেরও ছাড়বে না।

সাবিত্রী মেয়েটি মোটেই খারাপ নয়, তার অনেক গুণ আছে। দ্বন্দ্বটা কালচারের। খ্রিস্টান হিসেবে সে পশ্চিমী সংস্কৃতির অনুরক্ত, বাংলার সংস্কৃতি সে মেনে নিতে পারে না। বুঢ়া আবার ইংরেজিতে খুব দক্ষ হলেও পারিবারিক সূত্রে মনেপ্রাণে বাঙালি। কলকাতায় থাকলে যে হতে পারত সংস্কৃতি-জগতের একজন উল্লেখযোগ্য পুরুষ, হতে পারত বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান অধ্যাপক, প্রকাশনা-জগতের কর্ণধার, সে হয়ে বসল মুম্বাই শহরের এক অফিসার। কেউ তাকে চেনে না। আগে দু'বার মুম্বাই এসে বুঢ়াকে দেখেই বুঝেছিলাম, কী অসুখী মানুষটা! চেহারাও খুব খারাপ হয়ে গেছে। অমন গৌরবর্ণ মুখে কালো কালো ছাপ। তার সংসারে অভাবের ছায়া। এখন আর যোগাযোগ নেই-ই বলতে গেলে।

যা ভয় পেয়েছিলাম তাই। সাবিত্রী ধরেছে ফোন।

সঙ্গে সঙ্গে ভাবলুম, কথা না বলে রেখে দেব নাকি? তারপরে মনে হল, এত ভয় কীসের? ও তো আমার সঙ্গে কখনও ঝগড়া করেনি কিংবা খারাপ কথা কিছু বলেনি। শুধু অন্তরঙ্গ হতে অস্বীকার করেছে। না-ই বা হল অন্তরঙ্গতা। তা বলে আমি আমার বন্ধুকে হারাব কেন?

ইংরেজিতে বললুম, গুড ইভনিং সাবিত্রী। আমি সুনীল, কলকাতা থেকে এসেছি, চিনতে পারছ?

গলায় যথেষ্ট উষ্ণতা এনে সাবিত্রী বলল, সুনীল! কেন তোমায় চিনতে পারব না। তুমি কোথায়, এয়ারপোর্টে? আমাদের বাড়ি আসছ?

না, তোমাদের বাড়িতে এখন যাওয়া হবে না। আকবর হোটেলে উঠেছি। তোমাদের বাড়িতে পরে একবার যাব। এখন শুধু জাস্ট হ্যালো বলার জন্য—

সাবিত্রী বলল, আকবর হোটেল? ওহ্ মাই, মাই! কোনওদিন ওই হোটেলে যাইনি। তুমি এখন খুব রিচ ম্যান হয়ে উঠেছ তাই না।

আমি নিজের পয়সায় থাকছি না। একটা কাজে এসেছি।

ঠিক কী কাজের জন্য এসেছি, তা সাবিত্রী শুনতে চাইল না। বাংলা ভাষায়

লেখালেখি করে কেউ পাঁচতারা হোটেলে উঠতে পারে, এটা ওর কাছে ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। অন্য কিছু একটা ভেবে নিল বোধহয়। আবার বলল, কতদিন থাকবে? ওই হোটেলে আমাদের একদিন লাঞ্চ খাওয়াও। ওখানকার বিফ ভিন্ডালু খুব বিখ্যাত শুনেছি।

হ্যাঁ। নিশ্চয়ই খাওয়াব। এসো একদিন। তোমার স্বামীরত্নটি কি অফিস থেকে বাড়ি ফিরেছে?

ফিরেছে। তুমি কথা বলবে? ধরো, দেখছি!

একটুক্ষণ পরে আবার বলল, সুনন্দ তো বাথরুমে ঢুকে বসে আছে। কতক্ষণ লাগবে কে জানে! তুমি পরে আবার ফোন করে চান্স নিও।

মিথ্যে কথা বলল নাকি? বুঢ্ঢার সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দিতে চায় না! কে জানে! আমার ফোন নম্বরও নিল না। সাধারণত লোকে সেটাই জানতে চায়।

মিনিট পাঁচেক পরেই ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন। এখনই আমাকে কে ফোন করতে পারে?

রিসিভার তুলতেই, বুঢ্ঢার কণ্ঠস্বর। সুনীল, তুই কখন এসে পৌঁছোলি?

আমি বললুম, এই তো মিনিট চল্লিশেক আগে। তুই এখানকার ফোন নম্বর জানলি কী করে?

আকবর হোটেলে উঠেছিস শুনলাম। সেখানকার নম্বর জোগাড় করা কী আর শক্ত! রিসেপশনে তোর ঘরের নাম্বার জেনে নিলনাম। বল, তোর প্রোগ্রামটা কী?

আমি এন এফ ডি সি-র একটা কাজে এসেছি। কয়েকদিন থাকতে হবে।

এন এফ ডি সি মানেটা কী? আজকাল এ বি সি ডি দিয়ে এত নাম হয়, কোনটা কী, বোঝাই যায় না।

ন্যাশনাল ফিল্‌ম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশান। আমি ওদের একটা স্ক্রিপ্ট কমপিটিশানের জাজ হয়েছি। প্রচুর খাটাখাটনির ব্যাপার আছে। তুই কাল সন্ধেবেলা ফ্রি আছিস? একবার আসতে পারবি? তাহলে কিছুক্ষণ আড্ডা দিতে পারব। ফর ওল্‌ড টাইম্‌স সেক!

বুঢ্ঢা বলল, কাল? এক মিনিট ধর তো। আমার নোট বইটা একটু দেখে নিই।

তারপর শুনতে পেলাম, হাঁক দিয়ে বলছে, গৌর, গৌর, আমার নোট বইটা নিয়ে আয় তো। আর সিগারেটের প্যাকেটটা দে!

বুঢ্ঢা ওর ছেলেমেয়ের বাংলা নাম রেখেছে, গৌর আর গৌরী। আমি অনেক ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করছি, বুঢ্ঢা তার চেয়ে বাংলা বলছে বেশি।

মিনিটকয়েক বাদে বুঢ্ঢা বলল, সুনীল, তাই আমাকে কাল আসতে বললি কেন রে? আজ বুঝি তুই খুব ব্যস্ত!

আমি আমতা আমতা করে বললুম, না, আজও সেরকম কিছু করার নেই।

বুঢ়ঢা হুংকার দিয়ে বলল, তাহলে আজ কেন আসতে বলছিস না, শালা!

আমি লজ্জা পেয়ে গেলুম। এমন একটা সময় ছিল, যখন এই প্রাণের বন্ধুটির সঙ্গে প্রতিদিন দেখা না হলে ভাত হজম হতো না। আর আজ আমি সেই বন্ধুর সঙ্গে ফর্মাল ব্যবহার করছি। জীবন এমনই বিচিত্র।

আসলে, অবচেতনে একটা ভয় কাজ করছিল। বুঢ়ঢাকে আজই আসতে বললে ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফিরতে রাত করলে সাবিত্রী সব দোষটা আমার কাঁধে চাপাবে, ভেবেছি। কাল অফিসফেরত সাবিত্রীকে না জানিয়েই চলে আসতে পারে।

আমি অনুতপ্ত গলায় বললুম, না রে, বুঢ়ঢা। আমি ভাবছিলাম, তুই-ই হয়তো ব্যস্ত থাকবি। এখন যদি আসতে পারিস, আমি হাজার কাজ থাকলেও সব ফেলে তোর জন্য বসে থাকব!

বুঢ়ঢা বলল, গুড! আমি এক্ষুনি বেরুচ্ছি। ইস্ট আন্ধেরি থেকে ট্রেনে যেতে বড়জোর আধ ঘণ্টা লাগবে। আটটার মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি। তোর কাছে বোতল-টোতল আছে? নইলে, এক বোতল হুইস্কি আনিয়ে রাখ। রুম সার্ভিসে বড্ড বেশি পয়সা নেয়।

বড়লোকের ছেলে ছিল বুঢ়ঢা। দারুণ দিলদরিয়া। এক সময় সে-ই সবসময় আমার মতন বন্ধুকে খাওয়াত। আমার জীবনের প্রথম মদ্যপানের দীক্ষাও দিয়েছিল বুঢ়ঢা। তাও যে-সে জায়গায় নয়, গ্র্যান্ড হোটেলে।

এখন দিনকাল বদলে গেছে। সাধারণত এইরকম সময়ে বাইরে থেকে এলে কোনও বন্ধু বলে, আমি একটা বোতল নিয়ে আসছি।

আমার সুটকেসে এক লিটার একটা হুইস্কির বোতল আছে অবশ্য। বুঢ়ঢা আমাদের এত বেশি খাইয়েছে যে, কোনওদিন তার ঋণ সিকিমাত্র শোধ হবে না।

ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেল বুঢ়ঢা। আমি ততক্ষণ টিভিতে এটা-সেটা দেখছিলাম। স্থানীয় খবরে এক ঝলক দেখা গেল, এখানকার পুলিশ কয়েক জায়গায় হানা দিয়ে একদল নাবালিকাকে উদ্ধার করেছে। তাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আনা হয়েছে অসৎ কাজের জন্য। গ্রেফতার করা হয়েছে মোহন সিং নামে মেয়ে-পাচারকারীদের এক পাণ্ডাকে। তার মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা।

বুঢ়ঢার চেহারা আরও খারাপ হয়ে গেছে। এককালে সে পোশাকের ব্যাপারে খুব সৌখিন ছিল ; এখন সাদামাটা জামা-প্যান্ট। মাথার চুল একটু পাতলা হয়ে গেছে।

ঘরে ঢুকেই বুঢ়ঢা জিজ্ঞেস করল, তুই সিনেমার ব্যাপারে কী করে ঢুকলি রে? ছবি পবিচালনা করছিস?

আমি বললুম, না, না, ওসব না। কয়েকখানা ছবির চিত্রনাট্য লিখেছি শখ করে। তার মধ্যে দু'একটা পুরস্কার পেয়ে গেছে বাই চান্স। তাই এ লাইনের অনেকে চেনে।

বুঢ়ঢা বলল, তোর গল্পেরও তো ছবি হয়। মানিকদা একটা করেছিলেন। হিন্দিতে

হয়েছে কিছু?

একটিমাত্র। তাও কমার্শিয়াল ছবি নয়। কিন্তু প্রাইজ পেয়েছে। সেটার নাম *শোধ*।

নাম শুনিনি। এখানে রিলিজ করেছিল?

ঠিক জানি না। রিলিজ করলেও এক সপ্তাহের মধ্যেই উঠে গেছে হয়তো। হিন্দি ছবি। কিন্তু তাতে একটাও গান নেই। নাচ নেই। মারদাঙ্গা নেই।

গেলাসে হুইস্কি ঢালার পর বুঢ়া প্রবল তৃষ্ণার্তের মতন বড় একটা চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। সস্তা দামের সিগারেট।

তারপর বলল, তুই আর কয়েকদিন পরে এলে আর দেখা হতো না। আগামী সপ্তাহেই আমরা আফ্রিকায় চলে যাচ্ছি। নতুন চাকরি নিয়ে।

আফ্রিকা? কোথায়?

সিয়েরা লিওন! মুম্বাইতে খুব খরচ। ওখানে খুব বড়ো বাংলো দেবে, গাড়ি, ছেলেমেয়েদের পড়ার খরচ ফ্রি। সাবিত্রীর খুব পছন্দ হয়েছে। বাবুর্চি-আয়া রাখা হবে, তারা সবসময় সাবিত্রীকে মেমসাহেব, মেমসাহেব বলে সেলাম দেবে–

আর এক চুমুকে গেলাস শেষ করে বুঢ়া বলল, কলকাতায় আমার প্রাণ পড়ে আছে, সুনীল। কলকাতাতেই যখন থাকতে পারলাম না, তখন দেশ ছেড়ে চলে গেলেই বা ক্ষতি কী? আমার কাছে আর সব জায়গাই সমান!

তুই কলকাতায় ফিরে যেতে পারিস না, বুঢ়া। চাকরি করবার দরকার কী, তোদের ব্যবসাটা যদি দেখতিস, ওটা তো ছিল সোনার খনি। হতাশার নিশ্বাস ফেলে ও বলল, নাঃ, তা আর সম্ভব নয়। মা আর নেই। কলকাতার সঙ্গে আমার সব সম্পর্কও ছিঁড়ে গেছে।

এর মধ্যে আর ক'টা ভাষা শিখলি?

উনিশ-কুড়িটা হবে সব মিলিয়ে। ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে শক্ত ভাষা কোনটা জানিস? হাঙ্গেরিয়ান। সেটাও আমি লিখতে-পড়তে পারি।

এতগুলো ভাষা শিখেছিস, আমাদের সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউ এত ভাষা জানে না। তুই ইচ্ছে করলেই কত বড় লিঙ্গুইস্ট হতে পারতিস!

বুঢ়া একটা সিগারেট শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ধরিয়ে বলল, 'আমি রবো নিষ্ফলের হতাশের দলে'। এমনিই শিখেছি, শখে। গানও তো শিখেছিলাম। আর গাই না!

খানিকক্ষণ নানান গল্পের পর ওকে জিজ্ঞেস করলুম, বুঢ়া তুই এখানকার পুলিশের কোনও অফিসারকে চিনিস?

ও বলল, পুলিশ! কেন, তোর কিছু চুরি-টুরি গেছে?

না সেজন্য নয়। একটা ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে চাই।

কী ব্যাপার, আগে আমাকে বল!

বাংলাদেশের একটি মেয়েকে আমি খুব পছন্দ করি। আমার প্রেমিকাও বলতে পারিস। সে একটা র‍্যাকেটে পড়েছে। চাকরির লোভ দেখিয়ে ওকে সৌদি আরবে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে একটা দল। খুব সম্ভব, ওকে মুম্বাইয়ে প্লেন থেকে নামিয়েও নিতে পারে। সেই ব্যাপারে খোঁজ নিতে চাই।

বাংলাদেশের কিছু কিছু মেয়ে কী দারুণ সুন্দর হয়। মনে হয়, ওদের কারুর একটু ছোঁয়া পেলে জীবনটা ধন্য হয়ে যেত! তুই শালা খুব লাকি!

একটি মেয়ের প্রসঙ্গ তুললে সে আমার প্রেমিকা কি না, এ প্রশ্ন উঠতই। সেইজন্য আগে থেকে ওই কৌতূহলটা মিটিয়ে রাখা ভালো।

আবার প্রশ্ন করলাম, তুই পুলিশের কারুকে চিনিস!

অফকোর্স চিনি। আমার কাজের জন্য প্রায়ই পুলিশের কাছে যেতে হয়। আমি জানি, এই শহরটায় মেয়ে-পাচার আর ব্রথেলের ব্যবসা কী ঢালাওভাবে চলে। হাজার হাজার মেয়েকে আফ্রিকা আর আরব দেশে পাঠায়। বাচ্চা ছেলেদেরও পাঠায়। কেন জানিস? উটের পিঠে চাপিয়ে দৌড় করানোর খেলার জন্য। অধিকাংশ বাচ্চাই সেই সময় মারা যায়। সেইজন্য নিজের দেশের বাচ্চাদের নিয়ে ওই খেলা ওরা খেলে না! বাংলাদেশ কিংবা ভারতের মতন গরিব দেশ থেকে আড়কাঠির মারফত বাচ্চাদের ধরে নিয়ে যায়! অনেক সময় বাবা-মায়ের কাছ থেকে কিনেও নেয়। মানুষ যে কত নিষ্ঠুর হতে পারে!

যারা এইসব বাচ্চাদের মৃত্যুর মুখে পাঠায়, তাদের নিজেদের ছেলেমেয়ে থাকে না?

তা থাকে কি না জানি না। কিন্তু বিবেক বলে কিছু যে থাকে না, তা বোঝা যায়! পৃথিবীতে কত পার্সেন্ট মানুষের বিবেক আছে বলত!

যাদের আছে, তারাও মাঝে-মধ্যে বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। তখন যুদ্ধ বাধায়, কিংবা ধর্মীয় দাঙ্গা, হাজার হাজার মানুষ খুন হয়।

তুই পুলিশ অফিসারের কথা জিজ্ঞেস করছিলি। হ্যাঁ, চিনি কয়েকজনকে। ও, তাদের মধ্যে একজন তো বাঙালি। অমল লাহিড়িকে মনে আছে তো, সে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। ডি আই জি র‍্যাঙ্কের। তার নাম রাহুল মুখোপাধ্যায়। সাধারণত মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়রা বাংলার বাইরে এসে মুখার্জি, ব্যানার্জি, গাঙ্গুলি হয়ে যায়। এ কিন্তু মুখার্জি লেখে না, লেখে মুখোপাধ্যায়। ওর সহকর্মীরা সংক্ষেপ করে নিয়ে বলে উপাধ্যায়বাবু। আমাকে কী বলে জানিস? গুহঠাকুরতা এত বড় নাম বলতে পারে না। শুধু বলে ঠাকুর সাহাব! ঠিক আছে, চলে গা!

ওই রাহুল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কী করে যোগাযোগ করা যায়?

ফোন করা যেতে পারে। এখনই কর না! ও আমাদের থেকে বয়সে ছোট।

বুঢ়ঢা গড়গড করে লোকটির ফোন নাম্বার বলে দিল একটু চোখ বুজে। এই

হচ্ছে ওর স্মৃতিশক্তি। পৃথিবীর কারুর ফোন নাম্বার ও লিখে রাখে না। একবার শুনলেই মনের কম্পিউটারে স্থায়ী হয়ে যায়।

সেই নাম্বারে ফোন করে রাহুলকে পাওয়া গেল না বটে, তবে কেউ একজন অন্য একটা নাম্বার দিয়ে বলল, ওখানে ফোন করুন।

দ্বিতীয় জায়গায় ব্যক্তিটিকে ধরা গেল। বুঢ়ো প্রথমে রিসিভারটা নিয়ে বলল, রাহুল, আমি গুহঠাকুরতা বলছি। একটা বিশেষ ব্যাপারে, তুমি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে চেনো? আমার বিশেষ বন্ধু। সে তোমার সঙ্গে একটা দরকারে কথা বলতে চায়।

ওদিক থেকে গলা শুনতে পেলাম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মানে, যিনি লেখক? তিনি আপনার বন্ধু? মুম্বাইতে এসেছেন!

হ্যাঁ, আমার পাশে বসে আছে। নাও, একটু কথা বলো।

আমি রিসিভারটি নিয়ে বললুম, নমস্কার। আপনাকে একটু বিরক্ত করছি, বিশেষ প্রয়োজনে।

সে বলল, মোটেই বিরক্ত করেননি। আমাকে আপনি বলবেন না, তুমি বলুন। আমি এক সময় নীললোহিতের লেখার খুব ভক্ত ছিলাম।

এখন আর নেই, তাই তো? আমি জানি, আমার ভক্তসংখ্যা দিন দিন হু হু করে কমে যাচ্ছে।

সে হাসতে হাসতে বলল, না, না, তা নয়। এখন বই পড়ার বিশেষ সময়ও পাই না। তাছাড়া এখানে বাংলা বই তো তেমন পাওয়াও যায় না চট করে। আমি আপনার সম্পর্কে অনেক কিছু জানি। আমাদের পুলিশ লাইনেও তো আপনার আর শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনেক বন্ধু আছে।

হ্যাঁ, রশিদ খান, রথীন ভট্টাচার্য, তুষার তালুকদার, তাইয়েব খান, এদের সঙ্গে নিয়মিত আড্ডা দিই।

তুষার তালুকদার তো আই পি এস-এ আমারই এক ব্যাচের। রশিদ খানের সঙ্গেও আমার ভালো পরিচয় আছে। কী কারণে আমাকে স্মরণ করেছেন বলুন।

একটি মহিলা সম্পর্কে কিছু খোঁজ-খবর নিতে হবে।

এরপর আমি ঘটনাটি তাকে সবিস্তারে জানালুম।

সব শুনে রাহুল বলল, হয়তো আপনারা অকারণে বেশি দুশ্চিন্তা করছেন। সৌদি আরবে যাওয়া মানেই তো বিপদের মুখে পড়া নয়। আমি সেদেশে গেছি দু'বার। অনেকটা ফিউডাল হলেও মোটামুটি একটা সমাজব্যবস্থা তো আছে। যে ভদ্রমহিলার কথা বলছেন, তিনি যদি খানিকটা লেখাপড়া জানেন, তাহলে ওখানে গিয়ে একটা ভদ্রগোছের চাকরিও পেয়ে যেতে পারে। মাইনে ভালো। অনেক মেয়ে নার্সের ট্রেনিং নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে কাজ করে। আবার একথাও ঠিক, র‍্যাকেটিয়াররা ভালো চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে অনেক মেয়েকে নিয়ে যায়, তারা আলটিমেটলি ওখানে

বড় বড় শেখদের বাড়িতে ঝি-চাকরানির কাজ করে। তাদের ওপর নানারকম অত্যাচার করা হয়, ইনক্লুডিং সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করা খুব কঠিন।

আমি বললুম, একদিন সৌদি আরবের ফ্লাইটে গণ্ডগোল ছিল। এমন কি হতে পারে যে তাকে মুম্বাইতেই নামিয়ে নেওয়া হয়েছে! তারপর এখানে কাজে লাগানো হচ্ছে!

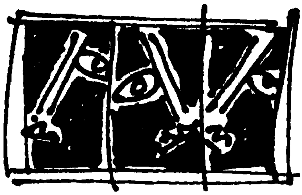
রাহুল বলল, সে-সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কালকেই তো অনেকগুলো জায়গায় রেইড করে প্রায় তিন ডজন মেয়েকে রাউন্ড আপ করা হয়েছে। তাদের রাখা হয়েছে উদ্ধারাশ্রমে। কয়েকজন পালের গোদা ধরাও পড়েছে। আপনার চেনা মহিলার কী নাম বললেন? আনোয়ারা! যতদূর মনে হচ্ছে, ভিকটিমদের মধ্যে এই নামের একজন আছে। একবার চেক করে দেখা যেতে পারে।

আমি কি যেতে পারি?

অবশ্যই পারেন। আপনার হোটেলের নাম্বার আমি লিখে নিচ্ছি। কাল দুপুরে যে-কোনো সময়ে আপনার সঙ্গে আমি যোগাযোগ করব। চেষ্টা করব, নিজেই যেতে। একদিন আমাদের বাড়িতে খেতে আসতে হবে কিন্তু।

ফোন ছেড়ে দেবার পর আমি বললুম, ভাগ্যিস, এখানে একজন বাঙালি পুলিশ অফিসারকে পাওয়া গেল, যে আমাকে চেনে। নইলে কি আর কেউ পাত্তা দিত!

বুঢ়ঢা বলল, কাল আমিও তোর সঙ্গে যাব। তোর বাংলাদেশি প্রেমিকাকে আমি একবার দেখতে চাই।



৫

পুলিশের একজন বড়কর্তা হয়েও আমাদের লাচ্চুদা যেমন শেক্সপিয়ার নিয়ে বিভোর হয়ে থাকেন, রশিদ যেমন স্বপ্ন দেখে সিনেমার পরিচালক হবার, এখানকার এই রাহুল মুখোপাধ্যায়েরও বিশেষ উৎসাহ ফিল্মের জগৎ নিয়ে। পরিচালনা কিংবা অভিনয়ের কথা ভাবে না, কিন্তু বিদেশি ও এ-দেশি চলচ্চিত্র-বিষয়ে অনেক খুঁটিনাটি খবর রাখে। ফিল্ম বাফ্ যাকে বলে। এর মধ্যে দু'খানা বইও লিখে ফেলেছে, এখন সে লেখা শুরু করেছে রাজ কাপুরের জীবনী। রাজ কাপুরের এক ভাই শশী কাপুর তাকে এই বই লেখার ভার দিয়েছে। রাহুলের আসার কথা দুপুর তিনটের সময়। তবে অনেক আগে, এগারোটার সময় বুঢ়ঢা এসে হাজির, অর্থাৎ অফিস ডুব মেরেছে। তখন আমি প্রতিযোগিতার চিত্রনাট্যগুলো পড়তে শুরু করেছি, বুঢ়ঢাকে দেখে একটু চিন্তায় পড়ে গেলুম। বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দেব, না কাজ সারব? কাজটাও তো শেষ করতে হবে পাঁচদিনের মধ্যে।

বুঢ়ঢা অবশ্য নিজেই বলল, তুই কাজ করে নে। আমি বসছি। এ চাকরিটা তো ছেড়েই দিচ্ছি, তাই আজ আর অফিসে বসতে ইচ্ছে হল না। এর মধ্যে ক'খানা চিত্রনাট্য দেখা হল?

মোট একচল্লিশটা খাতা। প্রথমেই আমি সবকটা নাম দেখে নিয়েছি, বেশ বিস্মিতও হয়েছি। এইসব প্রতিযোগিতায় নতুন লেখকরাই যোগ দেয়। কফি হাউজে কিংবা অনেক চায়ের দোকানে বহু অল্পবয়েসি ছেলে সিনেমার আলোচনায় মেতে থাকে, আর্ট ফিল্ম বানাবার আকাঙ্ক্ষা বুকে পুষে রাখে, নন্দন-চত্বরে ঘোরাঘুরি করে, কিন্তু কখনও কোনও সুযোগই পায় না। সেইসব উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের মধ্য থেকে সত্যিকারের প্রতিভাবানদের খুঁজে বার করাই এই প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য। তবে, আমি আগেই লক্ষ করেছি, ফিল্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপার নিয়ে যারা গলা ফাটায়, তারা অনেকেই কিছু লিখতে পারে না। ভালো চিত্রনাট্য যে সার্থক চলচ্চিত্রের আসল মেরুদণ্ড, সেটাই বোঝে না অনেকে। সুতরাং আমি ঠিকই করে নিয়েছি, সবগুলো খাতা পুরো পড়বার দরকার নেই। যেগুলো দু'চার পাতা পড়েই বোঝা যাবে যে একেবারেই দুর্বল,

সেগুলো অনায়াসে বাতিল করে দেওয়া যাবে।

আমি অবাক হয়েছি অন্য কারণে। এর মধ্যে পাঁচজন পরিচালকও লেখা পাঠিয়েছেন, যাঁরা বেশ পরিচিত, মধ্যবয়স্ক, কিছু সফল ছবিও তাঁরা তৈরি করেছেন। তাঁরা নেমে পড়েছেন শিং ভেঙে বাছুরের দলে! কারণটা অবশ্য বোঝা যায় এবং তা খুবই করুণ। বাংলা ছবির বাজার এখন খুবই খারাপ। পশ্চিম বাংলার ছবি বাংলাদেশে দেখানো হয় না, আগে কিছু কিছু ছবি বিহার, ওড়িশা, আসামে চলত, এখন প্রাদেশিকার সংকীর্ণতায় তাও বন্ধ, পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ সিনেমা হলগুলোতেও চলে সস্তা নাচ-গানের হিন্দি ছবির দাপট!

এই মোটামুটি খ্যাতিমান পরিচালকের হাতে কোনও কাজ নেই। একবার যারা সিনেমার সঙ্গে জড়িয়ে যায়, তারা কাজ না পেলেও অন্য কোনও জীবিকায় আর যেতে পারেন না। প্রোডিউসারদের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ান। কারুর কারুর অন্ন-বস্ত্র জোটানোও সমস্যা হয়ে পড়ে। তাই এই পাঁচজন চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। তিনটি পুরস্কার আছে, এক লক্ষ, পঁচাত্তর হাজার ও পঞ্চাশ হাজার, আর প্রথমটির চলচ্চিত্র হিসেবে প্রযোজনার দায়িত্ব নেবে এন এফ ডি সি। সেটাই আসল প্রলোভন।

সেই পাঁচজনের খাতাই আমি পড়তে শুরু করেছি আগে।

বুঢ্ঢা বলল, আমি যে-কোনও একটা খাতা দেখতে পারি?

আমি বললুম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখ না। তাতে আমার সাহায্যই হবে। একদম বাজেগুলো বাতিল করে দিবি!

একটা খাতা নিয়ে দু'পাতা পড়তে না পড়তেই বুঢ্ঢা চেঁচিয়ে বলল, একী রে, সুনীল! এ ভদ্রলোকের নায়িকার নাম পূর্ণিমা, প্রথম থেকেই লিখে যাচ্ছে পূর্ণীমা! মীনাক্ষী বানান লিখেছে এক জায়গায় মিনাক্ষি, আর একবার মীনাক্ষি।

আমি হেসে বললুম, চিত্রনাট্যকারকে যে ভালো বানান জানতে হবে, তার কোনও মানে নেই। ওগুলো শুধরে নেওয়া যায়। আসলে দেখতে হবে, সংলাপ আর কাহিনির বাঁধুনি কী রকম! ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ বোঝে কি-না।

বুঢ্ঢা বলল, এক জায়গায় লিখেছে, এই যে দ্যাখ, একটা সংলাপে, 'আপনার অবর্তমানে কয়েকটা দিন আমি এ ঘরে থাকব।' এখানে 'অবর্তমানে' লেখাটা কি ঠিক হয়েছে? না 'অনুপস্থিতিতে' হবে? 'অবর্তমানে' মানে মৃত্যুর পরে না?

বুঢ্ঢা, তুই পড়েছিস ইংলিশ মিডিয়ামে মিশনারি স্কুলে। তুই বাংলা ভাষার এত খুঁটিনাটি জানলি কী করে?

বাঃ, বাংলা যার মাতৃভাষা, সে ভাষাটা ভালো করে জানবে না?

হায়রে, তোর এই কথা যদি সবাই বুঝত, তাহলে আর দুঃখ থাকত না।

আমি কাজ থামিয়ে চেয়ে রইলুম বুঢ্ঢার দিকে।

সত্যিই, বাংলা ভাষার জন্য যে-মানুষটার এত ভালোবাসা, সে সব ছেড়েছুড়ে চলে যাচ্ছে আফ্রিকা। সেখানে বাংলা ভাষা তার সঙ্গী হতে পারবে না। বাংলা বইও চোখে দেখতে পাবে না। বাংলা সংস্কৃতি থেকে নির্বাসিত হয়ে থাকবে।

বাছাই করার ব্যাপারে বুঢ়ঢার সাহায্য আমার কাজে লাগল খানিকটা। একটা বাজার পর ও মিনমিন করে বলল, এবার একটু বিয়ার পান করলে হয় না?

আমি সাধারণত দিনের বেলা মদ্যপান করি না। তবে, প্রবাসে নিয়ম নাস্তি। তাছাড়া পুরোনো বন্ধুর অনুরোধ। রুম সার্ভিসে অর্ডার দিলাম বিয়ারের। ঘণ্টাখানেক পরে মধ্যাহ্নভোজও সেরে নিলাম ঘরে বসে।

রাহুল মুখোপাধ্যায় পৌঁছে গেল কাঁটায় কাঁটায় তিনটের সময়।

পুলিশের ওপর দিকের অফিসাররা প্রায় সবাই বেশ সুপুরুষ হয়। সাধারণত এরা আসে উচ্চবিত্ত পরিবার থেকে, চেহারায় তার ছাপ থাকে।

রাহুল মুখোপাধ্যায়ও দীর্ঘদেহী, সুঠাম গঠন, মুখখানি বেশ সুশ্রী। সেনাবাহিনীর অফিসারদের গোঁফ রাখা বাধ্যতামূলক, পুলিশদের সে বালাই নেই, আমার চেনা সব পুলিশ-কর্তারই গোঁফ কামানো। রাহুলের কমনীয় মুখখানি দেখলে পুলিশ বলে মনে করার কোনও কারণ নেই, অনায়াসেই সে সিনেমার অভিনেতা হতে পারত।

আমি বাধা দেবার আগেই সে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ফেলল।

তারপর হাসিমুখে বলল, কী আশ্চর্য ব্যাপার, আপনি মুম্বাইতে এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। অথচ, আমি কিছুদিন ধরে ভাবছিলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যই একবার কলকাতায় যেতে হবে। আপনার একটা ইন্টারভিউ নেওয়া দরকার। রাজ কাপুর-বিষয়ে।

বুঢ়ঢা অবাক হয়ে বলল, রাজ কাপুর-বিষয়ে? সুনীল, তুই কি রাজ কাপুরকে চিনতি না-কি?

আমি দু'দিকে মাথা নেড়ে বললুম, না। কোনওদিন পরিচয় হয়নি। হিন্দি সিনেমাও আমি খুব কম দেখি। রাজ কাপুরের একটাই ফিল্ম দেখেছি, বহুকাল আগেকার, *আওয়ারা*।

রাহুল বলল, রাজ কাপুরের সঙ্গে আপনার যে পরিচয় ছিল না, তাও আমি জানি। কিন্তু আপনি রাজ কাপুরের জীবনের একটা চরম মুহূর্তে সাক্ষী ছিলেন। তাই না?

আমি বললুম, তা অবশ্য ঠিক।

রাহুল বলল, আমি সেই সময়টার ডিটেইল বর্ণনা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই। আমার খুব কাজে লাগবে। তবে এখন নয়, আপনি দু'একদিন আছেন তো। আমি টেপরেকর্ডার নিয়ে আসব। তার আগে কাজের কথা হোক।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, উদ্ধার-আশ্রমের সেই মহিলাকে আজই দেখতে যেতে পারব তো?

রাহুল বলল, হ্যাঁ, আজই, তবে একটা অসুবিধে হয়েছে। আপনাকে কথা দেবার পর আমার এক সহকর্মী মনে করিয়ে দিল যে সম্প্রতি একটা কোর্ট অর্ডার হয়েছে। মেয়েদের উদ্ধার-আশ্রমের মধ্যে পুরুষরা ঢুকতে পারবে না। এমনকী পুলিশ অফিসারদেরও কোনও কাজ থাকলে সঙ্গে কোনও মহিলা সমাজকর্মীকে নিয়ে যেতে হবে। তাও শুধু বিকেল পাঁচটা থেকে সাতটার মধ্যে।

বুঢ়্ঢা বলল, এইসব উদ্ধার-আশ্রম নিয়েও তো অনেক স্ক্যান্ডাল আছে। গত মাসেই তো একটা আশ্রমের একটি অল্পবয়েসি মেয়ে গর্ভবতী হয়ে পড়েছিল, কাগজে পড়েছি!

রাহুল বলল, হ্যাঁ, তারপরেই এরকম কোর্ট অর্ডার হয়েছে। আমি ব্যবস্থা করে এসেছি। উর্মিলা চন্দ্রভারকর নামে একজন মহিলা এখানে একটা এন জি ও চালান, সোস্যাল অ্যাকটিভিস্ট হিসেবে তাঁর খুব নাম আছে, তাঁকে বলেছি, তিনি আমাদের সঙ্গে যাবেন। গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি, ঠিক সাড়ে চারটের সময় তিনি এখানে আসবেন। আমরা একসঙ্গে বেরুব।

আমি বললুম, সাড়ে চারটের তো দেরি আছে। তুমি বোসো।

চেয়ারে বসে রাহুল বলল, আপনার ক্যান্ডিডেটের নাম তো আনোয়ারা? আমি লিস্ট চেক করেছি। ওই নামে একজন আছে। বয়েস পঁয়তিরিশের কাছাকাছি। একটা ব্রথেল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি অনবরত কাঁদছিলেন। কোনও কথারই উত্তর দিতে পারেননি ভালো করে।

বাঙালি?

এই ব্যাচে যতজনকে উদ্ধার করা হয়েছে, তারা সবাই এসেছে পশ্চিম বাংলা থেকে। আপনি বলেছেন, আপনার চেনা মেয়েটি বাংলাদেশের। কিন্তু কলকাতা থেকে আনা হয়েছে বলে এখানে পশ্চিম বাংলার বলেই ধরা হয়েছে।

বুঢ়্ঢা জিজ্ঞেস করল, সুনীল যদি মেয়েটিকে আইডেন্টিফাই করে, তাহলে কি তোমরা মেয়েটিকে ছেড়ে দেবে?

রাহুল বলল, দু'চারদিন সময় লাগবে। কোর্টে প্রোডিউস করতে হবে। তার খুব অসুবিধে হবে না। এইসব উদ্ধার আশ্রমগুলোতে এমনিতেই জায়গার অভাব।

ব্রথেল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে শুনে আমার মনটা দমে গেল। এর মধ্যেই কি অত্যাচার করা হয়েছে আনোয়ারার ওপরে? অত সরল, সুন্দর একটা মেয়ে!

রাহুল বুঢ়্ঢাকে জিজ্ঞেস করল, মিস্টার গুহঠাকুরতা, আপনি নাকি ইনসিওরেন্সের চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন?

বুঢ়্ঢা বলল, হ্যাঁ। আফ্রিকায় চলে যাচ্ছি, ভালো চান্স পেয়ে।

রাহুল বলল, আমাদের খুব অসুবিধে হবে। মাঝে মাঝে আপনার সাহায্য পেতাম।

আমার দিকে ফিরে বলল, জানেন, সুনীলদা, একবার আমরা এক স্মাগলারকে

ধরেছিলাম, ব্যাটা এক গ্যাংলিডার, জাতে গ্রিক। গ্রিক ভাষা ছাড়া আব কোনও ভাষাই জানে না। তাকে জেরা করা যাচ্ছিল না, আমরা তো কেউ ওই ভাষা জানি না। এখানে গ্রিক অর্থোডক্স চার্চের এক ফাদার গ্রিক, কিন্তু তিনি খুব অসুস্থ, আর পুলিশ দফতরে তিনি জেরায় সাহায্য করতেও আসবেন না। তখন কে যেন আপনার এই বন্ধুর নাম বলল। কী আশ্চর্য ব্যাপার, ইনি সেই লোকটার সঙ্গে জলের মতন গ্রিক ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। অত শক্ত ভাষা—

বুড়ো বাধা দিয়ে বলল, এমন কিছু শক্ত না। একটু চেষ্টা করলেই শেখা যায়।

রাহুল বলল, আপনি ওই ভাষাটা শিখেছিলেন কেন? আপনার চাকরিতে কোনও কাজে লাগে?

বুড়ো বলল, ইনসিওরেন্সের চাকরিতে আবার গ্রিক ভাষা কী কাজে লাগে? এমনিই শিখেছিলাম, শখ হয়েছিল!

কথা ঘুরিয়ে বুড়ো বলল, সুনীল, তুই রাজ কাপুরকে চিনতিস না। অথচ একটা বিশেষ মুহূর্তে ওর কাছে উপস্থিত ছিলি, ব্যাপারটা কী রে? জানাতে খুব কৌতূহল হচ্ছে।

আমি বললুম, ব্যাপারটা ঘটেছিল বছর পাঁচেক আগে।

রাহুল বলল, ঠিক চার বছর তিন মাসে আগে।

আমি বললুম, তা হবে। সেটা আমার জীবনে একটা স্মরণীয় দিন। সেদিন আমি দিল্লিতে ভারতের প্রেসিডেন্টের পাশের চেয়ারে বসেছিলুম। ভেবে দ্যাখ, কী কাণ্ড, আমি পূর্ববঙ্গের রিফিউজি পরিবারের ছেলে, ছাত্রবয়েস কাটিয়েছি উত্তর কলকাতার ঘিঞ্জি পাড়ায় ভাড়া বাড়িতে, সেই আমিই বসাব সুযোগ পেয়েছি দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির পাশে।

বুড়ো জিজ্ঞেস করল, তুই যেবারে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেলি?

রাহুল বলল, উনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন এর অনেক আগেই।

আমি বললুম, সাহিত্য পুরস্কার হলে আর রাজ কাপুরকে দেখব কী করে? সেটি ছিল জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার উৎসব। সেবার আমি ছিলুম, বুক কমিটির প্রধান বিচারক। বুক কমিটি মানে সারা ভারতে সিনেমা বিষয়ে যত বই লেখা হয়, তারও শ্রেষ্ঠ বইটির একটি পুরস্কার আছে। এইসব উৎসবে সিনেমা জগতের বহু তারকা আসে। রাজ কাপুর তখন জীবন্তপ্রবাদতুল্য। সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে দেখেছি, সেখানে রাজ কাপুর দারুণ জনপ্রিয়, চীনেও *আওয়ারা* ছবিটা বারবার দেখানো হয়। সে যাইহোক, রাজ কাপুর এসেছেন, কোনও ছবির জন্য নয়, তাঁর সারাজীবনের কীর্তির স্বীকৃতি হিসেবে দেওয়া হবে একটি বিশেষ পুরস্কার, লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট যাকে বলে। রাষ্ট্রপতি এক এক করে পুরস্কার প্রাপকদের নাম ধরে ডাকছেন, তাঁরা মঞ্চের ওপর উঠে এসে পুরস্কার নিচ্ছেন রাষ্ট্রপতির হাত থেকে, আমার আর

একজনের দায়িত্ব তাঁদের গলায় মালা পরিয়ে দেওয়া। প্রথমদিকে সহ-অভিনেতা, সহ-অভিনেত্রী ইত্যাদিদের ডাকা হয়... রাজকাপুর বসে আছেন আমাদের ঠিক সামনেই, তাঁর পাশে খুব সম্ভবত বৈজয়ন্তীমালা আর নার্গিস।

রাহুল বলল, না, নার্গিস ছিলেন না। সেবারে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছিলেন দক্ষিণ ভারতের কমল হাসান।

আমি বললুম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদের রীতি-অনুযায়ী সাদা রঙের লুঙ্গি পরে পুরস্কার নিতে এসেছিল...যাইহোক, সংক্ষেপে বলছি, তারপর তো রাজ কাপুরের নাম ডাকা হল, রাজ কাপুর চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে লাগলেন, একটু একটু করে উঠছেন, স্লো মোশানে দেখার মতন, সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগেই আবার বসে পড়লেন ঝপ করে। সারা অডিটোরিয়ামে একটা ভয়ের শব্দ হল। রাজ কাপুর আর উঠতে পারছেন না। ...আমরা বসে আছি স্টেজের ওপর, প্রোটোকল হচ্ছে, রাষ্ট্রপতি কখনও স্টেজ থেকে নিচে নামেন না, তিনি প্রোটোকল ভেঙে নিজে নিচে নেমে গেলেন রাজ কাপুরের হাতে পুরস্কার তুলে দেবার জন্য, আমরাও কয়েকজন গেলুম তাঁর সঙ্গে। রাজ কাপুর কেমন যেন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। তাঁর গলায় মালাটি পরিয়ে দেওয়া মাত্র যেন তিনি সেই ফুলের ভারও সহ্য করতে পারলেন না, অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তখনই তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হল। আমি হাত লাগিয়েছিলাম, অর্থাৎ রাজ কাপুরের সঙ্গে আমার পরিচয় না হলেও আমি তাঁকে ছুঁয়েছি। পরের দিনই—

রাহুল বলল, না, তিনদিন পর তাঁর শেষ নিশ্বাস পড়ে। এর মধ্যে তাঁর আর জ্ঞান ফেরেনি। কয়েকদিন আগে থেকেই তাঁর শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল, ওই অবস্থায় ডাক্তাররা তাঁকে প্লেনে চাপতে বারণ করেছিলেন, তবু তিনি মুম্বাই থেকে উড়ে গেলেন দিল্লিতে জীবনের শেষ পুরস্কারটা সশরীরে গ্রহণ করার জন্য।

বুড়ো বলল, তোর এরকম অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাই না?

আমি বললুম, হয়েছে কিছু কিছু। মজার অভিজ্ঞতাও আছে। একদিন আমি ইন্দিরা গান্ধীকে দৌড়োতে দেখেছি। ভেবে দ্যাখ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী, তাও একজন মহিলা, কলকাতার রাজভবনের অলিন্দ দিয়ে ছুটছেন তাড়াতাড়ি গাড়িতে ওঠার জন্য।

রাহুল বলল, এ-ঘটনাটা আমি জানি। আপনি তো একবার লিখেছেন।

বুড়ো বলল, আমি সেটি পড়িনি। কী হয়েছিল?

আমি বললুম, উনিশশো একাত্তর সালের তেসরা ডিসেম্বর। পূর্ব পাকিস্তানে তখন স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য মুক্তিযুদ্ধ চলছে। ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় এসে রাজভবনে লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে এক আলোচনাসভায় বসেছেন। উনি নিজের হাতে চা বানিয়ে পরিবেশন করছেন আমাদের, কার কতটা দুধ বা চিনি লাগবে জেনে নিচ্ছেন—

রাহুল বলল, সুচিত্রা সেনও ছিলেন আপনাদের সঙ্গে।

আমি বললুম, হ্যাঁ, উত্তমকুমার, মৃণাল সেন... এর মধ্যে জেনারেল আরোরা (তখন চিনতাম না, পরে জেনেছি) এসে প্রধানমন্ত্রীর একেবারে কাছে এসে ফিসফিস করে বললেন কী যেন। ইন্দিরা গান্ধী কোনও উত্তেজনা না দেখিয়ে শুনলেন, তারপর আমাদের বললেন, আজ আলোচনা শেষ হল না, আবার একদিন হবে, আজ জরুরি কাজে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে এখুনি। ধীর পায়ে তিনি হল ঘরটা পেরিয়ে গেলেন, একবার পেছন ফিরে দু'হাত তুলে নমস্কার জানালেন সকলকে, তারপরই দৌড়োতে আরম্ভ করলেন। পরে শুনেছি, প্রায় নাকি লাফিয়ে উনি উঠে পড়েছিলেন একটা গাড়িতে, পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নিজে যাকে বলে ব্রেক নেক স্পিডে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এয়ারপোর্টে, সেখান থেকে এয়ারফোর্সের প্লেনে তক্ষুনি রওনা হয়েছিলেন দিল্লির দিকে। তার মানে, ইন্দিরা গান্ধী যখন আমাদের সঙ্গে গল্প করছিলেন, সেই সময়েই অমৃতসরে বোমাবর্ষণ শুরু করেছে পাকিস্তান। অর্থাৎ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে ভারত-পাকিস্তানে। সেই সময় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে রাজধানী দিল্লিতে থাকা বিশেষ দরকার।

গল্পে গল্পে তরতরিয়ে সময় কেটে গেল।

এক সময় হোটেলের রিসেপশান থেকে ফোন এলো, রাহুলের গাড়ি এসে গেছে।

রাহুল বলল, চলুন।

উর্মিলা চন্দ্রভারকর ছোট্টখাট্টো মহিলা, সালোয়ার-কামিজ পরার জন্য বয়েসটাও কম দেখায়। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, মাথার চুল প্রায় পুরুষদের মতন ছাঁটা। তবে, ইনি যে খুব তেজি, তা বোঝা গেল খানিকটা পরে।

গাড়িতে ওঠার পর আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল রাহুল।

তিনি প্রথমে বুঢ়াকে বললেন, আপনি থাকেন মুম্বাই? বাঙালি। আপনি কতদিন আছেন এ শহরে? কী করেন?

বুঢ়া সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিল।

উর্মিলা এবার ওকে জিজ্ঞেস করলেন, উদ্ধারাশ্রমে যে-মেয়েটির সঙ্গে আমরা দেখা করতে যাচ্ছি, সে কি আপনার কেউ হয়?

না।

তাকে আপনি চেনেন? কখনও দেখেছেন?

না।

তাহলে আপনি যাচ্ছেন কেন?

আমার এই বন্ধুর সঙ্গে যাচ্ছি। যদি কোনও কিছু সাহায্য করতে পারি।

এটা ঠিক নিয়মসম্মত হচ্ছে না। আশ্রম-কর্তৃপক্ষ আপনাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে নাও পারে। আপনাকে তাহলে গাড়িতে বসে থাকতে হবে।

এবারে আমার দিকে ফিরে উর্মিলা বললেন, শুনলাম তো, আপনি একজন লেখক। দেখা করতে যাচ্ছেন কেন? ওকে নিয়ে গল্প লিখবেন বলে?

আমি হেসে বললুম, গল্প লেখা বা না লেখা তো পরের কথা। আপাতত আমি ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আমি ওকে চিনি।

কী করে চিনলেন?

ঢাকাতে আমার এক বন্ধুর স্ত্রী।

শুধু তাই? আপনার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই?

আছে।

কী সম্পর্ক?

আমি ওকে ভালোবাসি।

প্রায় মিনিটখানেক আমার দিকে তীব্র চোখে তাকিয়ে উর্মিলা আবার বললেন, আপনার বন্ধুর স্ত্রী, আবার আপনি বলছেন, তাকে ভালোবাসেন?

আমি হালকাভাবেই বললুম, বিশ্বসংসারে এই ব্যাপারটি এই প্রথম ঘটছে না। বন্ধুর স্ত্রীকে কেউ ভালোবাসতে পারে না? মামার স্ত্রীকেও ভালোবাসা যায়। তা নিয়ে বিখ্যাত কাব্য হয়।

মামার স্ত্রী?

রাধা শ্রীকৃষ্ণের মামিমা নয়?

মিস্টার গঙ্গোপাধ্যায়, এটা হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার নয়। কঠোর বাস্তব অন্যরকম। হাজার হাজার মেয়ে বিক্রি হচ্ছে শুধু শরীরের মাংসের জন্য। প্রেম-ভালোবাসা সব মিথ্যে কথা। পুরুষরা সবাই স্বার্থপর। আপনার মতন পুরুষরাই সারা পৃথিবী জুড়ে নারী-মাংসের ব্যবসা চালাচ্ছে।

আমি বললুম, আমাদের মতন পুরুষরাই এই নৃশংস ব্যবসা চালাচ্ছে, তা একেবারে ঠিক কথা। তবে কিছু কিছু নারীও এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকে।

মেয়েটার সঙ্গে যে আপনার পরিচয় আছে, তার প্রমাণ কী?

এ প্রমাণ তো হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যায় না। মহিলাটি আশা করি আমাকে চিনতে পারবেন। তারপর আমাদের কথাবার্তা শুনেই বোঝা যাবে, কতটা পরিচয় আছে।

রাহুল বলল, অনেক সময় ওরা লজ্জায় কিংবা আতঙ্কে প্রথম প্রথম মুখ খুলতেই চায় না। আপনাকে চিনলেও যে কথা বলবে, তার কোনও গ্যারান্টি নেই।

উর্মিলা বললেন, এর আগে এরকম কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। মিথ্যে পরিচয় দিয়ে কেউ কেউ এখান থেকে মেয়েদের বার করে নিয়ে গেছে, তারপর তাকে আবার চালান করে দিয়েছে অন্যদেশে। এইসব ক্রিমিনালরা যে কতরকম ছদ্মবেশ ধরে আসে। এক-একজনকে তো দেখলে মনে হয়, দারুণ ভদ্রলোক, উচ্চশিক্ষিত! পুরুষরা

কতরকম ছদ্মবেশ ধরতেই যে জানে!

বুঢ়্ঢা বলল, মহাশয়া, আপনি প্রথম থেকেই আমাদের অবিশ্বাস করছেন।

উর্মিলা তীব্রভাবে উত্তর দিলেন, আপনাদের প্রথম থেকেই বিশ্বাস করার কোনও কারণ আছে কি? আপনাদের সত্যিকারের কী মতলব, তা আমি বুঝব কী করে? আমাদের প্রথম থেকেই খুব সাবধানে থাকতে হয়।

এই মহিলার সঙ্গে তর্কাতর্কি করে কোনও লাভ নেই বলে আমি বুঢ়্ঢাকে চুপ করে থাকার ইঙ্গিত দিলুম। তারপর কথা ঘোরাবার জন্য উর্মিলাকে বললুম, আপনি কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত? মানে, কী ধরনের সামাজিক কাজ করেন?

উর্মিলা বললেন, 'স্বয়ম্ভর' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের আমি পরিচালিকা। মহিলাদের স্বাধীনভাবে উপার্জন ও আত্মনির্ভর হবার জন্য আমরা নানারকমের প্রশিক্ষণ দিই। আমাদের প্রতিষ্ঠানে এখন একশো সাতান্নজন মেয়ে রয়েছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই স্বামী-পরিত্যক্তা। মেয়েদের জীবনের প্রথম এবং প্রধান ভুল কী জানেন? বিয়ে করা। বিয়ে করা মানেই একটি হিংস্র পুরুষের খপ্পরে পড়া। পুরুষগুলো তাদের বউদের শরীর-স্বাস্থ্য নিঙড়ে, চুষে অল্পদিনের মধ্যেই শেষ করে তারপর আখের ছিবড়ের মতন ছুড়ে ফেলে দেয়!

পুরুষদের পক্ষ নিয়ে কিছু বলার বদলে আমি আবার জিজ্ঞেস করলুম, বাঃ, আপনারা ভালো কাজ করছেন, আপনাদের চলে কী করে? বিদেশি সাহায্য নেন?

মহিলাটি তেজের সঙ্গে বললেন, এক পয়সাও নিই না! কেন নেব, আমরা কি ভিখিরি? নিজের দেশের গরিব দুস্থ মানুষের সেবা করার জন্য বিদেশিদের কাছে হাত পাততে হবে কেন? তাতে আমাদের দেশের কোনও মানসম্মান থাকে? আমাদের দেশে টাকার অভাব আছে? কিছু কিছু পরিবারের হাতে অঢেল টাকা!

তা ঠিক!

আমরা গোটা মহারাষ্ট্রে একশোটি পরিবার ঠিক করেছি। তারা প্রতিমাসে এক হাজার টাকা করে চাঁদা দেয়। এক হাজার টাকা দেওয়া ওদের পক্ষে কিছুই না। এক-একদিন হোটেল-রেস্তোরাঁয় খেয়ে ওরা এর চেয়ে অনেক বেশি টাকা খরচ করে। এইসব পরিবারের তালিকা আমরা জোগাড় করেছি ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে। আমার নিজের বোন এখন ইনকাম ট্যাক্সের জয়েন্ট কমিশনার।

আপনার সেই বোনও নিশ্চয়ই বিয়ে করেননি?

তার মানে?

আপনি কোনও পুরুষকে বিয়ে করবেন না, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। সেই জন্যই জানতে চাইলাম।

আমরা পাঁচ বোন। আমরা কেউই বিয়ে করিনি। আপনি হঠাৎ এই ব্যক্তিগত ব্যাপার জানতে চাইলেন কেন?

এমনিই, মানে কিছু না ভেবেই...মানে, আপনারা এইভাবে টাকা সংগ্রহ করছেন, এটা খুবই অভিনব। আশা করি, এরকম ফ্যামিলির সংখ্যা আরও বাড়বে।

প্রতিমাসেই বাড়ছে। যারা ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেয়, আমার বোন তাদের চেপে ধরে। কিছুদিন আগে এক ব্যবসায়ী আমাদের প্রতিষ্ঠানকে পঁয়ষট্টি লাখ টাকা ডোনেশান দিয়েছে। আর একজন একটা জমি দিয়েছে।

বুঢ়ঢা বলল, তার মানে আপনার বোন খুব অনেস্ট। নিজে ঘুষ নেন না, সেই টাকাটা আপনাদের মতন একটা ভালো কাজে দান করতে বাধ্য করান। যদিও টাকাটা সরকারি তহবিলে জমা পড়ার কথা।

রাহুল তাড়াতাড়ি মুখ বাড়িয়ে বলল, আমরা যে উদ্ধারাশ্রমে যাচ্ছি, সেটা অবশ্য সরকারি টাকায় চলে। প্রায় এসে গেছি।

বুঢ়ঢা বলল, এ তো ইস্ট আন্ধেরি, আমার বাড়ির কাছেই। এই আশ্রমটার নাম কি জিজাবাই হোম ফর দ্য ডেস্টিটিউট উইমেন?

হ্যাঁ।

ওরে বাবা, ওটা তো চিনি। ও-জায়গাটা সম্পর্কে স্ক্যান্ডালের শেষ নেই। প্রায়ই কিছু না কিছু শোনা যায়। ভালো করে খেতে দেয় না, মারধর করা হয়, রাত্তিরবেলা লোক ঢুকে পড়ে, মাস দু'এক আগে একটি মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল, অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মাঝে মাঝেই ওখান থেকে মেয়েরা পালায়। হিউম্যান রাইটস কমিশন থেকেই এইসব রিপোর্ট বেরিয়েছে।

উর্মিলা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, সরকারি বলেই এই অবস্থা!

ওঁকে সূক্ষ্ম খোঁচা দিয়ে বুঢ়ঢা বলল, আমি যতদূর জানি, ওই হোমে যে এগারোজন কর্মচারী আছে তার মধ্যে দু'জন দারোয়ান ছাড়া আর সবাই মহিলা। মহিলারাই তো চালাচ্ছেন, তবু...

উর্মিলা জোর দিয়ে বললেন, না মহিলারা চালাচ্ছেন না। আড়াল থেকে কিছু পুরুষ কলকাঠি নেড়ে চালাচ্ছেন ওই মহিলাদের। জেনে রাখবেন, পৃথিবীতে যেখানে যত কিছু অন্যায় কাজ হচ্ছে, তার কোনও কোনওটির সামনের দিকে কিছু কিছু মহিলা থাকলেও সবসময়ে আড়ালে থাকে পুরুষরা।

আমার মনে পড়ল ফরাসি প্রবচনটি। শেরসে লা ফাম্! শেরসে লা ফাম্। অর্থাৎ মেয়েটিকে নিয়ে এসো, মেয়েটিকে নিয়ে এসো! যে-কোনও ঘটনা ঘটলেই ফরাসিরা মনে করে, তার আড়ালে কোনও মেয়ে থাকবেই! সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছেন, একজন রাজমিস্ত্রি প্যারিস শহরে একটা বাড়ির জানালা রং করছিল. দেয়ালের গায়ে ভারা বেঁধে দাঁড়িয়ে। সেখান থেকে সে হঠাৎ পা পিছলে পড়ে মারা যায়। তাতে মামলা হয় কোম্পানির মালিকের কাছে ক্ষতিপূরণ চেয়ে। বিচারক ঘটনার বিবরণ শুনেই বললেন, শেরসে লা ফাম্। শেরসে লা ফাম্। সবাই অবাক! এর মধ্যে কোনও

মেয়ে আসবে কী করে? পরে তদন্ত করে জানা গেল, উঁচুতলার একটি ঘরের মধ্যে একটি সুন্দরী মেয়ে জামাটামা বদলাচ্ছিল, লুকিয়ে তাকে দেখতে গিয়েই অন্যমনস্ক হয়ে মিস্ত্রিটির পতন এবং মৃত্যু!

এ-কথা উর্মিলাকে বলতে গেলে উনি নিশ্চয়ই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবেন। আমি মুখ ফিরিয়ে একটা সিগারেট ধরালুম।

বুড়ো বলল, সুনীল, এই ধরনের হোমগুলোকে বাংলায় যে উদ্ধারাশ্রম বলা হয়, সেটি কি ঠিক? আশ্রম শব্দটার ধর্মীয় গন্ধ আছে। তাছাড়া, আশ্রম শুনলেই প্রাচীনকালের যে শুদ্ধ, শান্ত, পরিচ্ছন্ন পরিবেশের কথা মনে পড়ে, তার সঙ্গে তো এসব জায়গার কোনও মিলই নেই। শুধু নোংরামিতে ভরা। 'উদ্ধার বাড়ি' কিংবা শুধু 'আশ্রয়' বললে কেমন হয়?

রাহুল বলল, একটা ব্যাপার ভেবে দেখুন। সবদেশেই কিছু কিছু ক্রিমিনাল থাকে। তাদের সামলানো আমাদের কাজ। কিন্তু সাধারণ, সংসারী মানুষ যখন অসৎ কাজ করে, তখন তাদের ধরা কত শক্ত। এইসব হোমে যারা চাকরি করছে, তারা তো মোটামুটি লেখাপড়া জানে, এসেছে ভদ্রপরিবার থেকে। তবু, এইসব অসহায় মেয়েদের বরাদ্দ খাদ্য থেকে চুরি করে, এদের ওপর অত্যাচার করে, একটু দয়ামায়া নেই, কিছু কিছু মেয়েকে এরাই তো জেনেশুনে ক্রিমিনালদের হাতে তুলে দেয়। সাধারণ মানুষেরও যদি বিবেকবুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়...।

আমি বললুম, সকলেই নিশ্চয়ই এরকম নয়। কেউ কেউ তো নিঃস্বার্থভাবে এদের সেবাও করে। এই যে মিজ চন্দ্রভারকরকেই দ্যাখো। একেবারে সিনিক হয়ে যেও না। মানুষের ওপর বিশ্বাস হারালে নিজেকেও আর বিশ্বাস করা যায় না।

গাড়িটা এসে থামল একটা গেটের সামনে।

বেশ বড় বাড়ি, উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা কমপাউন্ড। দেখলে জেলখানা মনে হয়।

গেটটা বন্ধ, তার পাশে একজন লাঠি-হাতে দারোয়ান এই বিকেলবেলাতেই ঘুমোচ্ছে। বেশ গাঢ় ঘুম, এতগুলো লোকের পায়ের শব্দেও জাগল না। ডাকাডাকি করতে হল।

বেশ কিছুক্ষণ জেরা করার পর সে আমাদের ঢুকতে দিল ভেতরে। একটুখানি হেঁটে যাবার পর আর একটি বন্ধ দরজা। চারদিকে তাকালে মনে হয়, জেলখানার মতনই বেশ নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা। তবু এখান থেকে মেয়েরা পালায়।

সেই দরজাটা খোলার আগেই আমার মনে হল, আমরা এখানে বৃথাই এসেছি। আনোয়ারাকে এখানে পাওয়া যাবে না।

এরকম আমার হয়। কোনও একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কিংবা কোনও কিছু সূত্র ধরে কোথাও গেলে, ঠিক শেষ মুহূর্তে মনের মধ্যে ছলকে ওঠে ফলাফল। পাওয়া যাবে

কী যাবে না! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিলে যায়। এটা আমার ইনসটিংকট না বিশেষ ক্ষমতা, তা কে জানে!

আমার সব উৎসাহ চলে গেল।

সেই দরজা খুলে দিল এক পরিচারিকা, তারপর এলেন মহিলা সুপার। তিনি আবার এক প্রস্থ জেরা করলেন।

বুঢ়ঢা সঙ্গেই এসেছে, তার সম্পর্কে অবশ্য কোনও প্রশ্ন উঠল না।

উর্মিলা বললেন, শুধু আনোয়ারা নামের মেয়েটিকে এখানে একা আনা চলবে না। পাঁচটি মেয়েকে আনতে হবে। তাদের মধ্যে কোনজন আনোয়ারা, আমরা চিনতে পারব কি-না তা দেখা হবে। যদি চিনতে পারি, তাহলে তার সঙ্গে প্রথম কথা বলবেন উর্মিলা।

একটু বাদে পাঁচটি মেয়েকে এনে দাঁড় করানো হল দরজার সামনে। তাদের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই আমি বললুম, দুঃখিত, আমি যে-আনোয়ারাকে চিনি, সে এর মধ্যে নেই।

মহিলা-সুপার একটি মেয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে কিছু বলতে যেতেই উর্মিলা বাধা দিয়ে বললেন, দাঁড়ান, ওরা নিজেরাই নিজেদের নাম বলুক।

ওরা পরপর বলল, সুধা চামেলি, লক্ষ্মী, আনোয়ারা, মাসুদা।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, আনোয়ারা নামে আর কেউ এখানে আছে?

সুপার জানালেন, না নেই। অন্য মেয়েরা বয়েসেও ছোট, আঠারো থেকে পঁচিশের মধ্যে।

আমি দু'দিকে মাথা নাড়লুম। এখানে কোনও আশা নেই।

উর্মিলা আনোয়ারাকে কিছু জেরা করতে গেল, কিন্তু মেয়েটি হিন্দি বা ইংরেজি কিছুই বোঝে না। মেয়েটির গায়ের রং ময়লা, একটা নীলচে শাড়ি পরা, বেশ রোগা, চোখদুটো ফোলা ফোলা। তবে সে এখন কাঁদছে না।

রাহুল বাংলায় তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করল। এর বাড়ি মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে, এক যুবকের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সে-যুবকটি তাকে মুম্বাই এনে বিক্রি করে দিয়েছে মাত্র কয়েকদিন আগে।

এরকম কাহিনি আর কতবার শুনব?

আমি রাহুলকে বললুম, তাহলে ওঠা যাক। সরি, তোমাদের শুধু শুধু ট্রাব্‌ল দেওয়া হল।

সুপারকে নমস্কার জানিয়ে আমরা উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ আনোয়ারা নামের সেই মেয়েটি দৌড়ে এসে বুঢ়ঢার হাত জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠল, ও দাদা, আমাদের বাঁচান। আমারে বাড়ি পৌঁছাইয়া দ্যান। এহানে আমি বাঁচুম না! আমারে দয়া করেন।

সুপার জোরে চেঁচিয়ে উঠতেই দু'জন পরিচারিকা ছুটে এসে সেই আনোয়ারাকে চেপে ধরল, তারপর টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল ভেতরে। সে তখনও চ্যাঁচাচ্ছে ; ও দাদা, আমারে দয়া করেন, আমারে বাঁচান!

আমরা আর কোনও কথা না বলে বেরিয়ে এলাম বাইরে।

গাড়িতে ওঠার আগে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বুঢ্ঢা ভারী গলায় বলল, সুনীল, আমরা একজন আনোয়ারার খোঁজ করতে এসেছিলাম। এ মেয়েটি সে নয়। কিন্তু এই মেয়েটিও তো একটি অসহায় মেয়ে। এই পরিবেশ থেকে উদ্ধার পেতে চায়। বাঁচতে চায়। সেই আনোয়ারাকে আমরা উদ্ধার করতাম, তাহলে একেই বা সাহায্য করব না কেন?

আমি চুপ করে রইলুম।

৬



এরপর বুঢ়া আমাদের একটা নৈতিক দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে দিল। এক আনোয়ারাকে খুঁজতে এসেছি, তাকে না পেলে অন্য আনোয়ারাকে সাহায্য করা হবে না কেন? সেও তো একইরকম অসহায়। সে এসে বুঢ়ার হাত জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিল।

শ্রীমতী চন্দ্রভারকরও সমর্থন করলেন ওকে। তিনি জোর দিয়ে বললেন, আপনারা বেঙ্গলি, আপনাদের উচিত এই বেঙ্গলি মেয়েদের পুনর্বাসনে সাহায্য করা। এখানকার উদ্ধার-আশ্রমে বেচারিরা কত কষ্টে আছে, এখানকার ভাষা বোঝে না, বাঙালি খানা পায় না।

ভদ্রমহিলাকে নামিয়ে দেওয়া হল তাঁর বাড়িতে। রাহুল আমাদের নিয়ে এল তার ক্লাবে।

ছিমছাম, সুন্দরভাবে সাজানো ক্লাব। ভিড় বেশি নেই। আমরা বসলাম কোণের দিকে একটা টেবিলে। দুঃখের বিষয়, এখান থেকে সমুদ্র দেখা যায় না। মুম্বাইতে এসে আমার এখনও সমুদ্র-দর্শন হয়নি।

জল আমাকে সবসময় টানে। যে-কোনো জায়গায় গেলেই কাছাকাছি নদী বা সমুদ্র না দেখলে আমার শান্তি হয় না। স্নান করতেও ইচ্ছে হয়। অ্যালেন গিন্‌সবার্গ আমাকে বলেছিল, জীবনে যত নদী দেখবে, প্রত্যেকটাতে একবার অন্তত অবগাহন করে নেবে। তাতে প্রত্যেক নদীর স্মৃতি তোমার গায়ে লেগে থাকবে।

বেয়ারা আসবার পর রাহুল আমাকে বলল, আমি ড্রিংক করি না। কিন্তু আপনারা অবশ্যই নেবেন। আপনারা অর্ডার দিন।

বুঢ়া বলল, তুমি পুলিশের চাকরি করো, আর মদ খাও না, এ তো অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। তাহলে ঘুষের যে-টাকা পাও, তা খরচ হয় কী করে?

রাহুল মুচকি হেসে বলল, আমার এমন দুর্ভাগ্য, এ-পর্যন্ত আমাকে কেউ ঘুষ অফারই করেনি। এমনকী, ঘুষ প্রত্যাখ্যান করার যে-আনন্দ সেটাও পাওয়া হল না।

আমি বললাম, এ দেখছি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

রাহুল বলল, সব পুলিশই যে দৈত্য, সে-ধারণাটাও ঠিক নয়। কিছু লোক যেমন

অন্যায়ভাবে টাকা রোজগার করে, দু'হাতে ওড়ায়, তাতেই আনন্দ পায় : আবার এমন মানুষও আছে, যারা ব্যক্তিগতভাবে সৎ থেকে যে-গর্ব অনুভব করে, তা ওই আনন্দের চেয়েও বেশি। আমাদের সার্ভিসে আমি এ-রকম কিছু মানুষ দেখেছি।

বুঢ্ঢা বলল, যারা ঘুষ নেয় না, তারা কি মন দিয়ে কাজ করে, না ফাঁকিবাজ? সাধারণত ঘুষখোররা কাজ করে বেশি।

আমি বললাম, আমার এক বন্ধু আছে, সে খুব সৎ। সে কলকাতা করপোরেশনে যে-বিভাগে কাজ করে, সেখানে একেবারে ঘুষের রাজত্ব। আমার বন্ধুটি কিন্তু কাজও করে না, ঘুষও নেয় না। তার সহকর্মীরা খুব আগ্রহের সঙ্গে তার সব কাজ করে দেয়। এ-রকম সততটার কতখানি মূল্য আছে?

রাহুল বলল, এটা জটিল প্রশ্ন। তবে, এ-ব্যাপারে কোনও সাধারণ নিয়ম নেই। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তফাত হয়ে যায়।

বুঢ্ঢা বলল, মুম্বাইয়ের এত বড় পুলিশবাহিনী, অথচ এ-শহরেই ক্রাইম সবচেয়ে বেশি। বিশেষত স্মাগলিং আর নারী-পাচারের সীমা-পরিসীমা নেই। মাঝে মাঝে লোক দেখানো রেইড করো তোমরা। আসল কালপ্রিটরা কেউ ধরা পড়ে না।

আলোচনা অন্যদিকে ঘুরে গেল।

গোটা দু'এক হুইস্কি পান করার পর বুঢ্ঢা বলল, মেয়েটা দৌড়ে এসে আমার হাত ধরে কাঁদতে লাগল, আমি নিষ্ঠুরের মতন হাত ছাড়িয়ে নিলাম, এটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। সুনীল, একটা কিছু তোদের করা উচিত। ওই উদ্ধার-আশ্রমে থাকলে ওর জীবনটা বরবাদ হয়ে যাবে। ওকে ওর বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না?

আমি এবার একটু ধমক দিয়ে বললাম, দ্যাখ বুঢ্ঢা, তুই কাল না পরশু আফ্রিকায় চলে যাবি! সব দায়িত্ব বুঝি আমাদের? এ-রকম বড় বড় কথা সবাই বলতে পারে!

বুঢ্ঢা বলল, ঠিক আছে, আমি আফ্রিকায় যাব না। চাকরি ছেড়ে দেব। চল, কাল থেকেই লেগে পড়ি। অন্তত একটা মেয়েকেও যদি সুস্থ জীবন ফিরিয়ে দেওয়া যায়।

আমি বললাম, তুই অ্যালকোহলের ঝোঁকে এ-কথা বলছিস। তুই মোটেই চাকরি ছাড়তে পারবি না। আফ্রিকায় যাওয়াও বন্ধ হবে না! কাল সকালে মাথা ঠান্ডা হলে এইসব মহৎ ইচ্ছে উবে যাবে! আমরা সোশ্যাল অ্যাকটিভিস্ট নই। আমাদের প্রত্যেকেরই অন্য কাজ আছে। আনোয়ারার মতন হাজার হাজার মেয়ে মাংস-ব্যবসায়ীদের শিকার হয়েছে, অসহায় অবস্থার মধ্যে আছে। আমরা শুধু সহানুভূতি জানাতে পারি। কিন্তু নিজেদের কাজকর্ম সব ছেড়েছুড়ে তাদের উদ্ধারের জন্য মেতে উঠতে পারব?

রাহুল বলল, এ এক বিরাট র‍্যাকেট। আপনারা দু'একজন মিলে চেষ্টা করলেও কিছুই বন্ধ করতে পারবেন না। বরং বেশি বাড়াবাড়ি করলে আপনারাই খুন হয়ে

যেতে পারেন।

সে-কথা গ্রাহ্য না করে বুড়ো আমার দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে বলল, তুই শালা তাহলে অন্য একজন আনোয়ারাকে নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছিলি কেন? সে তোর প্রেমিকা বলে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, সেটাই তো স্বাভাবিক। খবরের কাগজে তো আমরা এ-রকম কত কেস হিস্ট্রি পড়ি, তাতে কি উত্তেজিত হয়ে উঠি? নিজের কোনও আপনজন বা প্রিয়জনের বিপদ হলেই আমরা ছটফট করি। তবে, এবার সত্যি কথাটা বলি। সেই আনোয়ারা মোটেই আমার প্রেমিকা নয়। মেয়েটা ঠিক প্রেম করার টাইপও নয়। সরল, সাদাসিধে। আসলে কলকাতায় সে আমাদের বাড়িতে এসেছিল, আমার স্ত্রীর কাছে একগাদা গয়না রেখে গেছে, তারপর প্রায় আমাদের চোখের সামনেই এই ভয়ংকর ফাঁদে পা দিয়েছে, সেইজন্য আমার মনে একটা অপরাধবোধ আছে।

রাহুল বলল, আমার মনে হয়, আপনার চেনা সেই মহিলাকে সৌদি আরবেই নিয়ে গেছে। ওখানে বিক্রি করলে টাকা অনেক বেশি পাওয়া যায়। শুধু শুধু মুম্বাইতে নামিয়ে নেবে কেন?

আমাদের পাশের টেবিলে এসে বসল দুটি রমণী ও তিনজন পুরুষ। সবারই বয়েস তিরিশের কাছাকাছি। মেয়েদুটি এমন উগ্র পারফিউম মেখেছে, ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নাকে লাগল সেই গন্ধের ঝাপটা। তাদের পোশাকও খুবই খোলামেলা।

আমি নিচু গলায় রাহুলকে জিজ্ঞেস করলাম, ছেলেগুলোর ঠোঁট কী রকম লালচে লালচে দেখাচ্ছে কেন? কেমন যেন অস্বাভাবিক।

রাহুল বলল, আপনি জানেন না? এখন অনেক ছেলেও ঠোঁটে লিপস্টিক মাখে হালকা করে। এটা ফ্যাশন হয়েছে। আর দেখুন, ওদের একজনের কানে দুল, তাও এক কানে।

বুড়ো বলল, হোমো। রিসেন্টলি, এদেরও উৎপাত বেড়েছে খুব।

রাহুল বলল, কানে দুল পরলেও সবাই কিন্তু হোমো হয় না। ওটাও একটা ছদ্মবেশ। মনে করুন, একজন লোক কোনও মেয়েকে ধর্ষণ করেছে, তারপর ধরা পড়ার ভয়ে সে কানে দুল পরে ঘুরে বেড়ায়। যাতে মনে হয়, মেয়েদের সম্পর্কে তার কোনও আগ্রহই নেই। সত্যিকারের হোমোরা কিন্তু শান্তিপ্রিয়ই হয়।

রাহুল প্রচুর খাবারের অর্ডার দিয়ে চলেছে, হুইস্কিও আসছে আমাদের গেলাশ শেষ হতে না হতেই। আমার থেকে বয়েসে ছোট যদি কেউ আমার জন্য পয়সা খরচ করে, তাতে আমার খুব অস্বস্তি হয়।

কমলকুমার মজুমদারকে দেখেছি, যখন তাঁর বেশ আর্থিক দুরবস্থা চলছে, সেই সময়েও আমাদের সঙ্গে কোথাও পানাহার করতে গেলে, জোর করে নিজে সব পয়সা দিতেন। তিনি কখনও পার্স ব্যবহার করেননি। টাকা রাখতেন বইয়ের ভাঁজে।

সবসময় তাঁর হাতে একটা-না-একটা ফরাসি কবিতার বই থাকত। সেই বইয়ের পাতা উলটে উলটে ম্যাজিকের মতন এক-একটা কুড়ি টাকা বা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে আনতেন।

কমলদা আরও বলতেন, অল্পবয়েসিরা মদের দাম দিলে সে-মদের স্বাদ ফিকে হয়ে যায়।

এখানে আমি দাম দিতে চাইলেও রাহুল কিছুতেই রাজি হবে না। সুতরাং খানিক বাদেই আমি বললাম, চল, এবার ওঠা যাক। কাল সকাল থেকেই আমাকে আবার কাজে বসতে হবে।

রাহুল বলল, না, না, আর একটু বসুন।

বুঢ়া বোধহয় আমার মনোভাবটা বুঝতে পারল। এককালে সেও দারুণ পয়সা খরচ করত।

সে বলল, আমি ভাই কালকেই দেশ ছেড়ে বহুদূরে চলে যাচ্ছি। আজ আমি তোমাদের একটু খাওয়াতে চাই। এরপরে যা অর্ডার হবে, আমি দাম দেব।

রাহুল আপত্তি করলেও বুঢ়া কিছুতেই শুনল না। পরপর অর্ডার দিয়ে যেতে লাগল।

যখন আমরা উঠলাম, তখন অনেক রাত এবং যথেষ্ট নেশা হয়ে গেছে।

বুঢ়া তখনও থামতে চায় না। বলল, চল, আর এক জায়গায় যাই। আমার চেনা একটা বার আছে, মাঝরাত পর্যন্ত খোলা থাকে।

আমি জোর দিয়ে বললাম, না! আর থাক!

বাইরে এসে বুঢ়া হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে আমার একটা হাত চেপে ধরে কাতর গলায় বলল, সুনীল, তুই আমাকে ধরে রাখতে পারিস না? আমি যেতে চাই না আফ্রিকায়। তুই আমাকে জোর করে কলকাতায় নিয়ে চল।

আমি চুপ করে রইলাম। বুঢ়ার বউ-ছেলেমেয়ে আছে, তাদের নিরাপত্তা ও সুখ-শান্তি, ইচ্ছে-অনিচ্ছে আছে, সেসব ভুলে গিয়ে আমি কী করে বুঢ়াকে কলকাতায় নিয়ে যাব?

রাহুল ওর গাড়িটা ডাকতে গেল।

আমি আর বুঢ়া কিছুক্ষণ নীরব। তারপর আমি বললাম, দ্যাখ, হয়তো আফ্রিকায় গিয়ে তোর খুব ভালোও লেগে যেতে পারে।

বুঢ়া বলল, না!

তারপর আবার দৃঢ় গলায় বলল, তোর সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হবে না।

আমি বললাম, যাঃ! যারা বিদেশে চাকরি করতে যায়, তারা কি মাঝে মাঝে দেশে আসে না? তুই আসবার আগে একটা খবর দিবি, আমি নিজেই তোর সঙ্গে

দেখা করব।

বুঢ্ঢা আবার বলল, না, দেখা হবে না!

রাহুলের গাড়িতে লিফ্‌ট নিতে চাইল না বুঢ্ঢা। হঠাৎ একটা ট্যাক্সি ডেকে তাতে ওঠে পড়ল।

সত্যিই সে-ই আমার বুঢ্ঢার সঙ্গে শেষ দেখা।

পরে খবর পেয়েছিলাম, তার ক্যানসার হয়েছে। মানসিক বিষাদের জন্যও মানুষের ক্যানসার হতে পারে না?

সেই রাত্রে শেষ দেখার সময়, আমাদের অল্পবয়সের হিরো, আমাদের রাজকুমার, বুঢ্ঢার তীব্র বিষাদমাখা মুখখানার ছবি কিছুতেই ভুলতে পারি না।

মুম্বাই থেকে কাজ সেরে কলকাতার প্লেনে চাপার আগে আমার সমুদ্র-দর্শনও হল না। সময় পাইনি।

ফেরার কয়েকদিন পরেই যেতে হল শান্তিনিকেতনে। আমার লেখালিখির চাপ পড়ে গেছে। কলকাতায় সভা-সমিতির উপদ্রব এত বেড়েছে যে, নিরিবিলি সময় পাবার উপায় নেই। আসলে আমাদের মাথার ওপর যেসব বয়স্ক লেখকরা ছিলেন, তাঁরা অনেকেই চলে গেছেন, তাই টানাটানি হয় আমাদের নিয়ে।

শান্তিনিকেতনের বাড়িতে আমি টেলিফোন বা টিভি, কিছুই রাখব না ঠিক করেছিলাম। বেশ কয়েক বছর সেভাবেই চালিয়ে এসেছি। তারপর গত বছরে স্বাতীর হঠাৎ মনে হয়েছে, কোনও বিপদ-আপদ হলে কারুকে খবর দেওয়া যাবে কী করে? আমরা থাকি প্রায় মাঠের মধ্যে, খুবই নির্জন জায়গায়। সুতরাং টেলিফোন দরকার।

আজকাল তো চাইলেই টেলিফোন পাওয়া যায়। এবং নম্বরটাও গোপন রাখার উপায় নেই। কী করে যেন অনেক অনেক লোকও নম্বরটা জেনে যায়।

টিভি অবশ্য এখনও কেনা হয়নি।

তবে মাঝে মাঝেই কাগজ দেখতে দেখতে স্বাতী আফসোসের সুরে বলে ওঠে, ইস্, আজ একটা ডাস্টিন হফ্‌ম্যানের সিনেমা ছিল! কিংবা, আজ হিস্ট্রি চ্যানেলে ক্লিওপেট্রা!

অর্থাৎ টিভিও এলো বলে!

এখানে আমি লেখার বদলে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকি। পাশের ছোট পুকুরটার দিকে চেয়ে। কতরকম পাখি আসে। বক ও মাছরাঙার প্রতিযোগিতা দেখতে বেশ মজা লাগে।

এক একদিন আমার বাল্যকালের পূর্ববঙ্গীয় অভ্যেসে একটা ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বসি। বক ও মাছরাঙারা সেদিন আমার ওপর খুব বিরক্ত হয়।

প্রথম যে-দিন হ্যাঁচকা টান দিয়ে একটা আমেরিকান-পোনামাছ তুললাম, সেদিন

কী উত্তেজনা। প্রায় তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছর পর আমার মৎস্য-শিকার!

প্রায় তখুনি সাগরময় ঘোষ এসে সাইকেল-রিকশা থেকে নামলেন।

তিনি মাছটা দেখে উল্লাসের সঙ্গে বললেন, এক্ষুনি মাছটাকে ভাজতে বল, ভদকা দিয়ে খাই। এ-দেশের কোনও হোটেলই এত টাটকা মাছ খাওয়াতে পারবে না।

এক-একদিন অবশ্য মাছ ধরার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় বসে থাকতে হয়। মাছেরা সেইসব দিন বোধহয় উপোস করে, টোপের ধারেকাছে ঘেঁষে না।

লেখার থেকে না-লেখার সময় আমি বেশি উপভোগ করি। তখনই মাথার মধ্যে লেখার অনেক উপাদান তৈরি হয়।

আনোয়ারার প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা আর আলোচনা করি না। যদিও ভুলে যাইনি মোটেই। কিন্তু আমাদের সাধ্যের সীমারেখা টানা হয়ে গেছে। ওর গয়নাগুলো স্বাতী জমা রেখে দিয়েছে ব্যাংকের লকারে। সুতরাং ডাকাতি হয়ে যাবার ভয় নেই।

এর মধ্যে একদিন কামাল টেলিফোন করেছিল।

কামালকে সুকুমার রায়ের ভাষায় বলা যায় গেছোবাবা। সে যে কখন মালয়েশিয়া কিংবা কখন ক্যানাডায় থাকবে, তার কোনও ঠিক নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সে যখন-তখন আমাদের টেলিফোন করে। কোনও কারণ থাকে না, এমনিই। কখনও এক মাসের মধ্যে কামালের টেলিফোন না পেলে আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। কী হল কামালের? ঠিক পরের দিনই ফোন বাজার পর কামালের গলা শুনতে পাই। এটা শুধু টেলিফোন না, টেলিপ্যাথি।

শান্তিনিকেতনেও কামাল টেলিফোন করে অনেক কথার মধ্যে জানিয়ে দিল, তার এক আমেরিকান বন্ধু শিগগিরই সৌদি আরবে যাচ্ছে, তাকে সে আনোয়ারার খোঁজ নিতে বলবে।

একদিন মাছধরায় বিফল মনোরথ হয়ে ছিপ গুটিয়ে ফিরেছি দুপুরে। টেলিফোন বাজল।

কামাল নয়, শান্তিনিকেতনেরই এক বন্ধু, ইন্দ্রনাথ। তার বইয়ের দোকান আছে।

ইন্দ্রনাথ বলল, ভাই, আমার দোকানে দু'জন বাংলাদেশি মহিলা এসেছেন, তোমার খোঁজ করছিলেন। কলকাতা থেকে শুনে এসেছেন, তুমি এখন এখানে। তোমার বাড়িতে পাঠাতে পারি?

গরমকালে আমি বাড়ির মধ্যে সবসময় খালি গায়ে থাকি। কোনও অতিথি এলে জামা পরতেই হয়। কোনও মহিলা এলে তো জামার সঙ্গে চুল আঁচড়ানোও আবশ্যিক।

কোনও মহিলা দেখা করতে চাইলে না বলে দেব, এমন বেরসিক পাষণ্ড আমি এখনও হইনি।

ইন্দ্রনাথকে বললাম, এই ভরদুপুরে নয় ভাই, বিকেলের দিকে আসতে বলে দাও।

দুপুর থেকেই ঘনিয়ে এসেছে মেঘ।

দিবানিদ্রা থেকে ওঠার পরই শুনতে পেলাম বজ্রগর্জন, তার পরেই বৃষ্টি। শান্তিনিকেতনে বৃষ্টির তেজ সবসময়েই কলকাতার চেয়ে বেশি হয়। সুতরাং বাংলাদেশি মহিলাদুটি আজ আর আসতে পারবেন না, বোঝাই গেল।

বৃষ্টির দিনে বারান্দায় বসে অনেকক্ষণ ধরে চা খাওয়া এখানকার বিশেষ বিলাসিতা। কলকাতায় এমন চোখ ভরে বৃষ্টি দেখার সুযোগ কম। সেখানে থাকি দশতলায় ওপরে। বৃষ্টি দেখতে পাই বটে, কিন্তু শব্দ শুনতে পাই না।

বৃষ্টির মধ্যেই একটা সাইকেল-রিকশা থামল আমাদের গেটের সামনে। দুটি যুবতী মেয়ে তার থেকে নেমে হেঁটে আসতে লাগল ধীর পায়ে।

গেট থেকে বারান্দা পর্যন্ত আসতেই বেশ ভিজে গেল ওরা। দৌড়ে এলে কম ভিজত, কিন্তু আমাদের সামনে দৌড়ে আসাটা বোধহয় সম্ভ্রমপূর্ণ নয়।

দু'জনেরই বয়েস তিরিশের কম। শাড়ি-পরা, গায়ের রং ফর্সা, মুখের ভাব দেখলেই বোঝা যায় উঁচু পরিবারের কন্যা এবং যথেষ্ট লেখাপড়া জানে। দু'জনেই বেশ সুশ্রী। তবে একজনের চোখ দর্শনীয়ভাবে টানাটানা। অনেকটা যামিনী রায়ের আঁকা রাধাকৃষ্ণ ছবির রাধার মতন।

সেই রাধা-চক্ষু মেয়েটি নম্রস্বরে বলল, অসময়ে এসে আপনাদের বিরক্ত করলাম।

আমি বললাম, আমাদের অসময় কেন হবে? তবে আপনারা এত ভিজলেন, একটু অপেক্ষা করে এলে পারতেন।

স্বাতী তাড়াতাড়ি ভেতর থেকে তোয়ালে নিয়ে এল ওদের মাথা মুছবার জন্য।

শাড়ি বদলে নেবে কি না তাও জিজ্ঞেস করল। ওরা কুণ্ঠিতভাবে বলল, তার দরকার নেই।

ওদের জন্য চায়ের অর্ডার দেওয়া হল।

রাধা-চক্ষু মেয়েটিই আবার বলল, আমরা আসলে হেঁটে আসছিলাম, এতটা দূর বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, বেড়াতে বেড়াতে, দেখতে দেখতে আসব। এদিককার বাড়িগুলো খুব সুন্দর, হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেল। কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই, তাই ভিজে গেলাম, তারপর একটা রিকশা পেয়ে—

অন্য মেয়েটি বলল, আসার সময় দেখি, রাস্তার ওপর দুটা আম পড়ে আছে। মজার ব্যাপার। আগে কখনও দেখিনি।

আমি বললাম, ঝড়ে পড়ে গেছে। তোমরা বুঝি গ্রামে থাকোনি কখনও?

ওরা বলল, না।

বাংলাদেশ শুনলেই আমাদের গ্রামবাংলার কথা মনে পড়ে। সেখানে ঝড়ের আম কুড়োনো অতি স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু ঢাকায় যারা জন্মেছে, বড় হয়েছে, তারা এসব দেখবে কী করে?

এর আগে একবার একটি বাংলাদেশি পরিবার আমাদের এখানে এসে থেকেছিল

কয়েকটা দিন। ওদের একটা দশ-এগারো বছরের ছেলে বাগানে জোনাকিদের উড়াউড়ি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। ঢাকার ছেলে, আগে কখনও জোনাকি দেখেনি।

প্রথম মেয়েটি বলল, আমার নাম নীলোফার আর এই আমার বন্ধুর নাম করবী।

এই নাম আমার কানে কোনও পরিচয়ের ধ্বনি দিল না।

বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। শুধুই দেখা করার জন্য। কেউ কেউ বই-টই সই করায়। তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশের খবরাখবর নিতে আমার ভালো লাগে।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কি ছাত্রী?

নীলোফার বলল, আমার বন্ধু একটা স্কুলে গান শেখায়। আমি এখন চাকরি খুঁজছি।

করবী বলল, নীলু এই মাসেই পিএইচ ডি করেছে।

নীলু বলল, আমি শামীম স্যারের অ্যান্ডারে রিসার্চ করেছি। ওনাকে তো আপনি চেনেন?

আমি বললাম, শামীম, মানে ইতিহাসের অধ্যাপক?

নীলু সম্মতি জানাল।

আমি আর স্বাতী চকিতে একবার দৃষ্টিবিনিময় করলাম।

এই নীলু তাহলে আমাদের পরিচিত একটি কাহিনির অন্যতম নায়িকা। একটি চতুর্ভুজ প্রেম-কাহিনির একটি বাহু।

একাধিক পুরুষের এমন স্নিগ্ধ স্বভাবের রূপসীর প্রেমে পড়া খুবই স্বাভাবিক। এর কণ্ঠস্বরটি পর্যন্ত খুবই মার্জিত এবং মিষ্টি।

নীলু বলল, আমরা শান্তিনিকেতনে বেড়াতে এসেছি। আগে কখনও আসিনি এখানে।

স্বাতী বলল, এই বর্ষাকালটা শান্তিনিকেতনে খুবই সুন্দর। তবে খুব বেশি ঘোরাফেরা করা যায় না। তোমরা কোথায় উঠেছ?

পূর্বপল্লী গেস্ট হাউজে।

বৃষ্টি থামবার লক্ষণ নেই। তোমরা এখানেই খেয়ে নাও। রাত্তিতে এখানে থেকে যেতেও পারো। আমাদের একটা একস্ট্রা ঘর আছে।

করবী বলল, না, না, আমাদের ফিরতেই হবে। আমাদের সঙ্গে আমার আম্মুও এসেছেন। পায়ে হঠাৎ একটা ব্যথা হয়েছে বলে বের হতে চান নাই।

আমি মনে মনে ঠিক করলাম, আনোয়ারার প্রসঙ্গ ওরা নিজে থেকে যদি না তোলে, তাহলে আমি কিছু বলব না।

কেউ নতুন আলাপ করতে এলে যা হয়, এলোমেলো টুকিটাকি কথা। আমি একটা সিগারেট ধরাতেই নীলু বলল, আপনি এখনও স্মোক করেন? ছেড়ে দিন, আজ

থেকেই ছেড়ে দিন।

এ-রকম অনুরোধ আমি অনেকের কাছ থেকেই শুনেছি। শুনতে বেশ ভালো লাগে, প্রত্যেকবার মনে হয়, সত্যিই আমার ছেড়ে দেওয়া উচিত, তবু কিছু একটা রহস্যময় কারণে ছাড়া হয় না। নাঃ, রহস্যময়টয় কিছু না। স্রেফ মনের জোরের অভাব।

এ-মেয়েটির অনুরোধের মধ্যে বেশ আন্তরিকতা আছে।

আমি মাত্র দু'টান-দেওয়া প্রায় আস্ত সিগারেটটা সামনের বাগানে ছুড়ে দিয়ে বললাম, এই তো ছেড়ে দিলাম তোমার কথা শুনে।

স্বাতী বলল, আবার তুমি বাগানে ফেলছ? বাজে অভ্যেস! জানি তো, এরা চলে গেলেই আবার খাবে!

করবী স্বাতীকে জিজ্ঞেস করল, ভাবি, আপনি কিছু বলেন না?

স্বাতী বলল, আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি!

নীলু বলল, তবু আমাদের কথা শুনে উনি জ্বলন্ত সিগারেটটা ফেলে দিয়ে আমাদের কথার মান দিলেন। এটাই আমাদের বড় পাওনা।

এই সামান্য ঘটনাতেই যেন অনেকটা অন্তরঙ্গতা হয়ে গেল।

এরপর নীলোফার অপ্রত্যাশিতভাবে বলল, আনোয়ারা ভাবি রাগ করে বিদেশে চলে গেলেন, অথচ আমারই তো যাবার কথা!

আমি বললাম, তোমার যাবার কথা? কোথায়?

সে বলল, আমি ঢাকা ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছিলাম। লন্ডনে আমার বড়ভাই থাকে। সেখানে আমি একটা কাজও পেয়ে যেতে পারি। আমি কারুর সংসার ভাঙতে তো চাই না।

করবী বলল, শামীভাই ওর জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলেন।

নীলোফার মাথা নিচু করে রইল। তার শরীরটা কাঁপছে। বোঝা গেল, সে কাঁদছে নিঃশব্দে।

হঠাৎ বদলে গেল পরিবেশ। এতক্ষণ হালকা চালে কথাবার্তা হচ্ছিল, এর মধ্যে এসে পড়ল কান্না।

আমার একটা বাজে দোষ আছে। অন্য কারুকে কাঁদতে দেখলে আমারও কান্না এসে যায়।

স্বাতী নীলোফারের পিঠে সান্ত্বনার হাত রাখল।

একটু পরে নীলোফার মাথা তুলে আঁচলে মুখ মুছল।

ধরা গলায় বলল, আমি খুব দুঃখিত। আপনাদের কাছে এসে... সময় নষ্ট করা... আমি চেয়েছিলাম আপনাদের সব কথা জানাতে... কিন্তু পারছি না... আমরা এখন যাই বরং...

স্বাতী বলল, বোসো, বোসো।

যারা ধূমপায়ী, এ-রকম আবেগের মুহূর্তে তাদের সিগারেট ধরাবার খুবই ইচ্ছে হয়। কিন্তু একটু আগে আমি সিগারেট ছুড়ে ফেলেছি, এখনি আর একটা ধরালে খুবই নির্লজ্জতা হবে। নিজেকে দমন করতে হল।

করবী বলল, শামীমভাই আনোয়ারা ভাবিকে তালাক দিয়ে নীলুকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন।

নীলোফার বলল, আমি কিছুতেই রাজি হইনি। আমি তো আনোয়ারা ভাবিকে খুবই ভালোবাসি। এত সরল, সুন্দর মানুষ, উনিও আমাকে খুব পছন্দ করতেন। বাড়িতে গেলেই জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিতেন। তাঁর আমি ক্ষতি করতে পারি? মানুষ কি এত নিমকহারাম হয়!

করবী বলল, একটা সংসার ভেঙে সেই পুরুষকে বিয়ে করলে কোনও মেয়ে শেষ পর্যন্ত সুখী হতে পারে না। তাছাড়া আনোয়ারা ভাবির তো কোনও দোষ নাই।

নীলোফার বলল, আমি শামীম ভাইকে বলে দিয়েছিলাম, আমি বিদেশে চলে যাব, আর কোনও যোগাযোগ থাকবে না। উনি কখনও বিদেশে যেতে চান না:

আমি বললাম, হাবিব নামে একটি ছেলে এসে খুব রাগারাগি করছিল, তার কী ভূমিকা বলো তো?

করবী বিরক্তির মুখভঙ্গি করে বলল, ওটা একটা খোদার খাসি!

স্বাতী জিজ্ঞেস করল, তার মানে কী?

আমি বললাম, আল্লার ষাঁড় বলে একটা কথা আছে জানো? প্রায় সেরকমই।

করবী বলল, ওই হারামজাদা যে কত মাইয়ার সাথে প্রেম করছে, তার ঠিক নাই! এমনকী আমার সাথেও চেষ্টা করছিল। সে হঠাৎ একদিন নীলুর কাছে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিল। একেবারে সরাসরি। তার দাবি, সে নীলুরে বিয়ে করলে তার বড় ভাইয়ের সংসার ভাঙবে না। তার বড়ভাই নীলুর উপর থিকা মন উঠিয়ে নেবে। একেবারে জোর জুলুম করার অবস্থা। নীলুর তো বাড়ি থিকা বাইরাইনোই বন্ধ হয়ে গেল। রাস্তাঘাটে ধরে। এখন অবশ্য সে জেলে আটক।

—জেলে?

—সেটা অইন্য ব্যাপার। গোঁয়ার তো। শামীমভাইয়ের সঙ্গে নীলুর অ্যাফেয়ার নিয়া একজন ঠাট্টা করেছিল, তাই হাবিব তাকে এমন মেরেছে যে তার একটা চক্ষু নষ্ট হয়ে গেছে। তাতে জেল হবে না?

—শামীমের এখন কী অবস্থা?

—খুবই মুষড়াইয়া পড়ছেন। মানুষটা তো ভালো। আনোয়ারা ভাবি ওইভাবে চলে যাবার পর খুব রিগ্রেট করতেছেন। কারুর সাথে কথা বলেন না। দ্যাখেন দেখি, কী হয়ে গেল ফ্যামিলিটা। আনোয়ারা ভাবি যদি আর-কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতেন, তাহলেই সবকিছু মিটে যেত।

নীলোফার বলল, আমি নিজে আনোয়ারা ভাবিকে গিয়ে সব বুঝিয়ে বলব ঠিক করেছিলাম। হাবিবের উৎপাতে কিছুদিন ও-বাড়িতে যাওয়া যাচ্ছিল না। ভাবি যে বিদেশে চলে যাওয়ার জন্য তলে তলে তৈরি হচ্ছেন, তা কেউই বুঝতে পারেনি!

করবী বলল, ইস্, কত অভিমান নিয়ে চলে গেছেন। উনি তো শামীম ভাইকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। এমনিতে রাগ দেখাতেন বটে।

আমি বললাম, আনোয়ারার উচিত ছিল একদিন ওর স্বামীটিকে ধরে খুব মারধর দেওয়া। এটা স্ত্রী-শক্তির যুগ।

নীলোফার বলল, আনোয়ারা ভাবির যদি কোনও বিপদ হয় বিদেশে গিয়ে, তাহলে আমি কোনও দিন নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না। আমিই তো দায়ী!

করবী বলল, তুই কেন দায়ী হবি?

নীলোফার স্বাতীর দিকে ফিরে বলল, আপনি কি মনে করেন, আমি দায়ী না?

স্বাতী বলল, দ্যাখো, আমি তো তোমাকে আগে দেখিনি। আনোয়াররা আর শামীমকে চিনি। আমার মনে হতো, ওরা আইডিয়াল কাপ্ল। শামীমকে মনে হতো অতি মাটির মানুষ। ওদের দু'জনের ভালোবাসা কত গভীর তা বোঝা যেত! এখন বুঝতে পারছি, আমারই বোঝার ভুল। শামীম যে আনোয়ারকে ছেড়ে দেবার কথা ভেবেছিল, বাবাঃ, মানুষ-চেনা কত শক্ত! না, তোমার কোনও দোষ নেই।

নীলোফার আমার দিকে তাকিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই আমি বললাম, আমার কিন্তু মনে হয়, তুমি অনেকটা দায়ী!

নীলোফার ব্যথাতুর গলায় বলল, বিশ্বাস করুন, আমি কিন্তু ওঁকে কোনওদিন কোনও ইঙ্গিত দিইনি। ওঁকে শ্রদ্ধা করেছি।

আমি বললাম, সেজন্য নয়। কারণটা হচ্ছে, তুমি কেন তোমার মতন? আমার যদি বয়েস কম হতো, আর তোমার মতন রূপসী আর মধুর স্বভাবের মেয়ে যদি আমার ছাত্রী হতো, তাহলে আমি নির্ঘাৎ তোমার প্রেমে পড়তাম!

স্বাতী আমাকে কিল মারার জন্য হাত তুলে বলল, দেখেছ, দেখেছ, পুরুষমানুষ কেমন হয়?

আমি কৃত্রিম ভয়ে খানিকটা সরে গিয়ে বললাম, আমার কথাটার মধ্যে দুটো যদি আছে। যদি আমার বয়েস কম হতো, যদি ওর মতন ছাত্রী পেতাম, আর একটাও যদি বাদ গেছে, যদি অবিবাহিত হতাম!

স্বাতী বলল, মোটেই না। তুমি এখনও ওরকম করতে পারো।

আমি বললাম, এটা আমার সম্পর্কে একটা কমপ্লিমেন্ট। এই বয়েসেও প্রেমে পড়তে পারি। আর আগে যা বললাম, সেটা এই মেয়েটার প্রতি একটা কমপ্লিমেন্ট। ওর মন খারাপ হয়ে আছে, তাই ওকে একটা কমপ্লিমেন্ট দিলাম। আসলে মেয়েরা তো কখনও প্রেমে পড়ে না। পুরুষরাই শুধু প্রেম করে বেড়ায়!



৭

বাকি সন্ধেটা আমাদের কাটল অন্যরকমভাবে।

বৃষ্টির বিরাম নেই, বাতাস এমন ঠান্ডা হয়ে গেছে যে গায়ে একটা চাদর দিলে যেন ভালো হয়।

কথার স্রোত এদিক-সেদিক যেতে যেতে একসময় শুরু হল গান। নীলোফার নামের তরুণীটি শুধু রূপসী এবং বিদুষী, তাই-ই নয়, সে খুব ভালো গানও করে। এক-একজনের গুণের অন্ত থাকে না। হিন্দিতে একটা কথা আছে, খোদা যিস্‌কো দেতা, ছপ্পর ফাড়কে দেতা।

নীলোফারের তুলনায় করবী খানিকটা নিষ্প্রভ। সে কথা বেশি বলে।

নীলোফারের সঙ্গে আমি প্রখ্যাত গায়িকা ইফ্‌ফাত আরা দেওয়ানের যেন খানিকটা মিল খুঁজে পাই। ইফ্‌ফাত আরাকে দশ-বারো বছর আগে প্রথম যেমন দেখেছিলাম। নীলোফারও কথা বলে খুব মৃদু গলায়।

নীলোফার শোনাল অতুলপ্রসাদের তিনখানা গান। এইসব গানই আমি অনেকবার অনেকের কণ্ঠে শুনেছি, তবু এক এক সময় মনে হয়, এমনটি আর আগে কখনও শুনিনি। নীলোফারের গলায় 'আমি বাঁধিনু তোমার তীরে তরণী আমার' গানটা শুনতে শুনতে সে-রকমই মনে হল।

নীলোফার আগেই বলেছে যে, ও ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করবে আর কলেজে পড়াবে ঠিক করেছে। কিন্তু এরকম একটি গুণী তরুণীকে পারফরমিং আর্টসের জগতের লোকেরা পেলে অনেক লাভবান হতো।

সে-রকম কোনও সম্ভাবনা আছে কি না, আমি একবার এই প্রশ্ন করতেই নীলোফার প্রবলভাবে মাথা নেড়ে জানাল, সে শুধু পড়াশুনো নিয়েই থাকতে চায়। গান তার অবসরের সঙ্গী।

ওদের রিকশাওয়ালাটি আপত্তি জানাচ্ছিল দেরি হবার জন্য। তাকে ছেড়ে দেওয়া হল।

শান্তিনিকেতনের অনেক বাড়িতেই কেয়ারটেকাররা সাইকেল-রিকশাও চালায়।

আমাদের পাড়াতেই আছে কয়েকজন। তাদের একজনকে খবর দেওয়া হল, বৃষ্টি থামলে সে ওদের নিয়ে পৌঁছে দেবে।

ওরা দু'জন রাত্রে এখানে থাকতে চায় না। ওদের না খাইয়ে ছাড়ল না স্বাতী।

নীলোফার আর করবীর সঙ্গে পরের দিনও আমার দেখা হল ইন্দ্রনাথের দোকানে। সকালে ও সন্ধ্যায় সেখানে বেশ আড্ডা বসে, আমি মাঝে মাঝে যাই। বই ছাড়া নানারকম গান-বাজনার ক্যাসেটও পাওয়া যায়। ওরা ক্যাসেট কিনতে এসেছিল।

আমার অনুরোধে ওরা আড্ডার মধ্যে বসল খানিকক্ষণ।

তারপর দোকান থেকে বেরিয়ে আমরা কিছু পথ হাঁটলাম একসঙ্গে। তারপর ওরা দু'জন চলে গেল পূর্বপল্লী গেস্ট হাউজের দিকে।

এর মধ্যে আনোয়ারা-শামীমদের নিয়ে আর একটি কথাও হল না। নীলোফারের প্রতি আমার অনেকখানি মুগ্ধতার সঙ্গে কিছুটা ক্ষোভও মিশেছিল। সামান্য একটু মর্মজ্বালা। নীলোফার খুব সম্ভবত আমার একটি লেখাও পড়েনি, অন্তত সে-রকম কিছু উল্লেখ করেনি। ইফ্ফাত আরাও আলাপের পর আমাকে বলেছিল, সে আমার নাম শুনেছে বটে, কিন্তু পড়েনি কিছুই।... সুন্দরী মেয়েরা আমার লেখা পড়ে না!

লেখক হওয়ার এ-ই এক জ্বালা। নিজের লেখা সম্পর্কে সচেতনতা কিছুতেই কোনও সময় মুছে ফেলা যায় না। কেউ সামনাসামনি প্রশংসা করলে অস্বস্তি হয়, আবার কেউ কোনও কিছুই না বললে খানিকটা অভিমান পেয়ে বসে।

নীলোফাররা আমাদের কলকাতার বাড়িতেও দেখা করতে আসবে বলেছিল, কিন্তু আসেনি।

আমাকে ওরা বাংলাদেশে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, কিন্তু সে-রকম কোনও উপলক্ষ ঘটল না কিছুদিনের জন্য।

কলকাতায় ফেরার পর অন্য একটি মর্মান্তিক ঘটনায় আমাকে কিছুটা জড়িয়ে পড়তে হল।

আমাদের আনন্দবাজার পত্রিক'র লাইব্রেরিয়ানের নাম নকুল চ্যাটার্জি। বেশ লেখাপড়া-জানা বুদ্ধিমান মানুষ, সুরসিক, আড্ডাবাজ। সে আবার জ্যোতিষও জানে, হাত দেখে, কোষ্ঠী বিচার করে, টপাটপ লোকের ভবিষ্যৎ বলে দেয়। আমাদের কোম্পানির মালিকরা, অনেক রাজনৈতিক নেতারাও নতুন কিছু করার আগে তার পরামর্শ নেয়।

নকুল বিবাহিত, তার একটি কিশোরী মেয়ে আছে, তার স্ত্রী পৈত্রিক সম্পত্তি হিসেবে একটা বাড়ি পেয়েছে, সেখানেই থাকে। নকুলের উপার্জনও ভালো, সুতরাং তাকে একজন আপাতত সার্থক ও সুখী মানুষ বলা যায়।

আমি হাত-দেখা ফাত-দেখায় বিশ্বাস করি না। ভবিষ্যৎ জানার জন্যও বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। এইসব নিয়ে নকুলকে ঠাট্টা করলে সে-ও হেসে বলত, এসব যারা বিশ্বাস

করে, তাদের ক্ষেত্রে অনেক কিছু মেলে। যারা অবিশ্বাসী, তাদের কিছুই মেলে না।

আমরা কখনও ইতিহাসভিত্তিক কিছু লিখতে চাইলে নকুল রেফারেন্স দিয়ে বই-টই জোগাড়ে সাহায্য করত। আমি সে-সময়ে রাধা-কৃষ্ণকে নিয়ে একটি উপন্যাস লিখছিলাম, ভক্তিরস ও অলৌকিকতাবর্জিত গ্রাম্য প্রেমের কাহিনি, নকুল অনেক বইপত্র দিয়েছিল আমাকে। এক-এক সময় বলত, আমি যে আপনার জন্য এত খাটছি, তার বদলে আমাকে কী দেবেন? বলেছিলাম, কী চাও বলো? নকুল বলেছিল, একদিন ভালো করে খাওয়াতে হবে। আমি বলেছিলাম, এ আর বেশি কথা কী, নিশ্চয়ই খাওয়াব।

তারপর আর দু'এক মাস দেখা হয়নি।

একদিন বিকেলের দিকে অফিসে গেছি, গাড়ি থেকে নেমেই দেখি, গেটের পাশে যে পান-সিগারেটের দোকান, সেখানে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নকুল। জ্যোতিষগিরি করলেও সে ধুতি-টুতি পরে না। প্যান্ট-শার্টের সঙ্গে টাই পরা, চোখদুটি লালচে, চুল উসকোখুসকো।

দেখেই মনে হল, সে অনেকটা নেশা করে ফেলেছে এর মধ্যে।

নকুল বিয়ার পান করতে ভালোবাসে, আমার সঙ্গে সন্ধের পর দু'একটি পানশালায় তার সঙ্গে দেখাও হয়েছে কয়েকবার। কিন্তু বিকেলের মধ্যেই তাকে এমন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আগে কখনও দেখিনি।

নকুল খপ করে আমার একহাত চেপে ধরে বলল, এই যে সুনীলদা, আপনি আমাকে একদিন খাওয়াবেন প্রমিজ করেছিলেন। খুব ফাঁকি দিচ্ছেন। চলুন, আজ আমাকে খাওয়াতে হবে!

আমি বললাম, সত্যি, এর মধ্যে অনেকদিন দেখা হয়নি। খাওয়াব নিশ্চয়ই। কিন্তু আজ নয়, আজ আমার কাজ আছে।

নকুল জড়ানো গলায় বলল, আজই খাওয়াতে হবে। গুলি মারুন কাজ! চলুন। চলুন!

খাওয়ানো মানে তো শুধু খাদ্য নয়, পানাহার। দু'তিন ঘণ্টা বসতেই হবে। সেদিন আমার সত্যিই খুব জরুরি কাজ ছিল, 'বুধসন্ধ্যা'র মিটিং, অন্যরা আমার জন্য অপেক্ষা করবে। অফিসে একটি লেখা জমা দিয়েই চলে যাবার কথা।

নকুলকে বললুম, আজ নয় ভাই, কাল তোমাকে নিশ্চয়ই খাওয়াব, যত ইচ্ছে, কথা দিচ্ছি, কাল ঠিক এই সময়ে আসব।

নকুল অভিমানের সঙ্গে বলল, আমার আজই ইচ্ছে হচ্ছে, আপনি আমার সঙ্গে বসবেন না?

সে বারবার পীড়াপীড়ি করলেও একসময় জোর করে হাত ছাড়িয়ে চলে যেতে হল আমাকে।

পরের দিন ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে এসেছি।

কাল যে-পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল, সেই দোকানদারটি অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর সে বলল, আপনি শুনেছেন তো স্যার?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী?

দোকানদারটি বলল, কাল আপনার সঙ্গে অত কথা হল তো, আজ দুপুরে নকুলবাবু আত্মহত্যা করেছেন।

আমি প্রায় আর্তনাদের মতো বললাম, অ্যাঁ? বলো কী?

দোকানদারটি বলল, ভেতরে যান, ডেডবডি এখনও রয়েছে।

ঘটনাটি একেবারে অতি নাটকীয়।

যথাসময়ে অফিসে এসে, লাইব্রেরিতে বসেছে নকুল। কয়েকজনের সঙ্গে গল্প করতে করতে কফি খেয়েছে। নেশা-টেশা কিছু করেনি, পরিষ্কার চোখ, অন্যদিনেরই মতন।

লাইব্রেরিতে অন্য কয়েকজন কর্মচারী আছে। সবসময়েই কয়েকজন পড়ুয়া বসে থাকে বিভিন্ন টেবিলে। হঠাৎ একজন দেখল, নকুল শুয়ে পড়েছে টেবিলে মাথা দিয়ে।

সে কাছে এসে দেখল, নকুলের শরীরে প্রাণ নেই।

তার পকেটে পাওয়া গেল সুইসাইড নোট। সে আর্সেনিক বিষ এনে কফিতে মিশিয়ে পান করেছে স্বেচ্ছায়। তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

একজন মানুষ, যে অভাবী নয়, বেকার নয়, ব্যর্থ প্রেমিক নয়, কাজের জায়গায় অশান্তি হয়নি, সে কেন আত্মহত্যা করল, তা জানার জন্য সকলেরই কৌতূহল হবে। যেন অন্তরালে আছে এক রহস্য-কাহিনি।

আমি সে-কাহিনির মধ্যে যেতে চাই না। সেই সময় আমার খুব আত্মগ্লানি হল।

কাল বিকেলে নকুল আমার কাছে অনেক অনুনয়-বিনয় করে কিছু খেতে চেয়েছিল। আমি রাজি হইনি। আজ সে আমাকে কথা রাখার সুযোগই দিল না, চলে গেল তার আগেই।

সে আমাকে সারাজীবনের মতো ঋণী রেখে গেল।

অফিসের বাইরে, সেই পানের দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াতেই আমার মনে হল, নকুলের আত্মা যেন বলছে, আপনি কথা রাখেননি, কথা রাখেননি। কেউ কথা রাখে না!

আত্মা?

আমি একটা হার্ডকোর নাস্তিক। ঈশ্বর, পরলোক, আত্মার অস্তিত্ব এসব কিছুতেই বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। তবু আমারও মনে হল, নকুলের আত্মা কিছু বলছে? এ কি জন্ম-সংস্কার? ধুৎ!

বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে ভূত-টুত কিছু গ্রাহ্য করি না, তবু তো কোথাও নির্জন অন্ধকারে হঠাৎ গা ছমছম করে ওঠে, এটাও তো সত্যি?

তখনই হঠাৎ মনে হল, অনেকদিন তো রশিদ খানের সঙ্গে দেখা হয়নি। সে কি আমার ওপর রাগ করে আছে?

রশিদ প্রায় প্রতিদিনই আমাকে ফোন করে। আমার তেমন ফোন করার অভ্যেস নেই, তা ও জানে, সেইজন্য বলে, তোমাকে ফোন করতে হবে না। আমি তোমাকে জ্বালাব। সপ্তাহে অন্তত দু'তিন দিন আমরা সারা সন্ধে একসঙ্গে কাটাই। ওর বাড়ি কিংবা আমার বাড়ি।

কিন্তু দু'তিন সপ্তাহের মধ্যে রশিদের কোনও পাত্তা নেই, আমিও খোঁজ নিইনি, কিন্তু উচিত ছিল।

শেষ যখন দেখা হয়েছিল, তখন রশিদকে খুব বকুনি দিয়েছিলাম। সেজন্য কি ও রাগ করে থাকতে পারে? ওর সঙ্গে তো আমার সে-রকম সম্পর্ক নয়।

রশিদের একটা দোষ আছে। মদ্যপানের সঙ্গীদের ব্যাপারে ওর কোনও বাছ-বিচার নেই। আমি আবার ও-ব্যাপারে বেশ খুঁতখুঁতে। একেবারে অচেনা লোকের সামনে আমি গেলাস হাতে নিতে চাই না। আমার মুখেও কোনো কথা ফোটে না।

সপ্তাহতিনেক আগে, রাত প্রায় ন'টা, আমি আমির খানের ক্যাসেট শুনতে শুনতে একটি কবিতা লেখার চেষ্টা করছিলাম, এমন সময় দরজায় বেল বেজে উঠল।

স্বাতী গেছে থিয়েটার দেখতে। উৎপল নেই, দরজা খোলার কেউ নেই। উৎকৃষ্ট সঙ্গীত ও কবিতা লেখার মেজাজের সময় এইরকম ব্যাঘাত হলে কি মেজাজ ঠিক থাকি? এখন কারুর আসারও কথা নেই। স্বাতী আর উৎপলের কাছে চাবি আছে।

তিনবার বেল বাজার পর উঠতেই হল।

দরজা খুলতেই দেখি হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে রশিদ, তার সঙ্গে একটি সুদর্শন যুবক। তার হাতে একটা মদের বোতল। কাগজ-টাগজ দিয়ে মোড়াও নয়।

রশিদ বলল, বাড়িতে আর কেউ নেই? চলো, বসি। থোড়া দারু পিয়েঙ্গে।

হঠাৎ আমার খুব রাগ হয়ে গেল। সাধারণত লোকে আমাকে শান্ত স্বভাবের মানুষ বলেই জানে। কারুর সঙ্গে পারতপক্ষে খারাপ ব্যবহার করি না। কিন্তু আসলে তো বাঙাল, এক এক সময় মাথায় রাগ চড়ে যায়।

আমি ঝাঁঝালো গলায় বললাম, দারু পিয়েঙ্গে মানে? যখন-তখন একটা বোতল নিয়ে এসে বসবে, এটা কি শুঁড়িখানা নাকি? আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনও দাম নেই?

রশিদ তবু আমাকে শান্ত করার জন্য মোলায়েম গলায় বলল, তুমি তো সন্ধের পর কোনও কাজ করো না। একটা বোতল শেষ করতে আর কতক্ষণ লাগবে?

ওর সঙ্গের যুবকটি কোনও কথা বলছে না।

আমি বললুম, না, স্যরি। আমি ব্যস্ত আছি।

দরজা বন্ধ করে দিলাম ওদের মুখের ওপর।

এর ফলে হল কী, কবিতা লেখার বারোটা বেজে গেল। মাথায় রাগ থাকলে সারা পৃথিবীতে কেউ এক লাইনও কবিতা লিখতে পারে না। মাঠে মারা গেল একটা কবিতা।

পরদিন সকালে যখন রশিদ ফোন করল, তখনও আমার রাগ পুরোপুরি যায়নি।

রশিদ বলল, শোনো কাল তোমাকে টেলিফোন না করে হঠাৎ গেছি। ভেবেছিলাম...

আমি বললাম, রশিদ, তুমি একা যখন-তখন আসতে পার। ইউ আর ওয়েলকাম, তোমাকে আমি ইচ্ছে করলে কিছুক্ষণ বসিয়ে রেখে অন্য কাজও করতে পারি। কিন্তু কোনও অচেনা লোককে নিয়ে ওরকম ভাবে কখনও আসবে না।

ও তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিল, হি ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং পার্সন।

যতই ইন্টারেস্টিং হোক, কেউ মদের বোতল নিয়ে আমার সঙ্গে প্রথম আলাপ করতে আসবে, এটা আমি মোটেই পছন্দ করি না।

তুমি কাল কিসে ব্যস্ত ছিলে? স্বাতী বাড়িতে ছিল না, অন্য কোনও মেয়ে-টেয়ে এসেছিল?

সেটা যদি হয়ও তাহলে অল দা মোর রিজ্‌ন ফর ইউ নট টু ডিসটার্ব!

রেগে গেলেই বাঙালির মুখে ইংরেজি ফোটে। আরও কিছুক্ষণ এই রকম কথা হয়েছিল। তারপর চলে গেলাম শান্তিনিকেতনে, রশিদের সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি।

নকুলের মৃতদেহটি দেখার পর আমার মনে হল, নকুলের কাছে আর কোনওদিন ক্ষমা চাওয়া হবে না। কিন্তু রশিদের কাছে আজই ক্ষমা চাইতে হবে।

তখনও মোবাইল ফোনের যুগ আসেনি। রাস্তাঘাট থেকে ফোন করার অনেক অসুবিধে। সোজা চলে এলাম রশিদের বাড়িতে। যেতে যেতে সন্ধে হয়ে গেল।

রশিদ অফিস থেকে বাড়ি ফেরেনি।

কোনও কোনওদিন রশিদ অফিস থেকে সন্ধের পর বাড়িতেই আসে না, অন্য কোথাও আড্ডা দিয়ে ফেরে মাঝরাত্তিরে।

নাসিম বলল, আজ তাড়াতাড়ি ফিরবে বলেছে। তুমি বোসো না! তুমি কি চা খাবে? রশিদ মোদ-টোদ কোথায় রাখে আমি জানি না। আলমারিতে তালা দেয়া।

আমি বললাম, মোদ-টোদ দরকার নেই। তুমি চা-ই খাওয়াও। আজ কি কাবাব-টাবাব রান্না হয়েছে নাকি?

নাসিম হেসে বলল, না! রশিদ এখুন খুব মাছ খাচ্ছে। মাছ ভালোবেসেছে। তোমাদের সঙ্গে মিক্স করে খুব বাঙালি হচ্ছে!

আমি বললাম, আমার বউও তো বাঙালি। কিন্তু সে মাছ ভালোবাসে না, মাংস বেশি পছন্দ করে।

রবীন্দ্রসংগীত গুনগুন করতে করতে ঘরে ঢুকল রশিদের এক মামা।

এঁর নামটি কখনও জানা হয়নি। আমরা সবাই ওঁকে মামা বলেই ডাকি। রানীগঞ্জের লোক, বাংলা জানেন না। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। মাথার সব চুল লাল। আমাদের সঙ্গে কথা বলেন হিন্দি-উর্দু মিলিয়ে। বেশ ভালো গান করেন ইনি। উর্দু গজল, কলকাতায় এসে রবীন্দ্রসংগীত শিখছেন। বাংলা তো পড়তে পারেন না, উর্দুতে লিখে রবীন্দ্রসংগীত মুখস্থ করে ফেলেছেন কয়েকখানা।

আমাদের দেখলেই গানের উচ্চারণ শুদ্ধ করে নেন।

মামা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, দেখো তো ইয়ে প্রোনানসিয়েশান ঠিক হ্যায়? 'রিদয়ের একূল-ওকূল দু'কূল ভেসে যায়, হ্যায় সোজ্‌নি, উথ্‌লে নোয়ন বারি...'।

অবাঙালিদের মুখে বাংলা শুনলেই যেন বাঙালিদের কানে সুধাবর্ষণ করে, উচ্চারণের এদিক-ওদিক হলে কিছু আসে যায় না।

আমি বললাম, বাঃ চমৎকার। সুরটা একেবারে ঠিক আছে। হৃদয়কে অনেক বাঙালিও রিদয় বলে। তবে হ্যায় নয়, হায়। বলুন হায়, হায়, হায়...।

রশিদের দুটি ফুটফুটে মেয়ে বাবলি আর মাস্তুন মামাবাবুর গান শুনলেই হাসতে শুরু করে। ওরা এখানেই জন্মেছে, এখানেই স্কুলে যায়। তাই বাংলা আর উর্দু দুটো ভাষাই ঠিকঠাক জানে।

মামা বললেন, হামি দো-চারঠো রবীন্দর সংগীত শিখ লেতা হুঁ, কিঁউ কি, ম্যায় এক দফে বাংগ্‌লা দেশ যানে মাংতা। উ লোগ তো বাংগ্‌লা গানা বাদ আউর কুছ শুন্‌তা নেহি!

এই বাক্যটিতে 'উ লোগ' কথাটার মধ্যে রয়েছে অবজ্ঞার ভাব।

আমি আগেও কয়েকবার লক্ষ করেছি, রশিদের বাড়িতে যে কিছু কিছু অবাঙালি মুসলমান আসে, তারা পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের জন্ম মোটেই সমর্থন করে না। মাঝে মাঝে খুব উগ্রভাবে বাংলাদেশের মানুষদের সম্পর্কে গাল-মন্দ করে। কেন পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের জন্ম হল, তা তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করে না। যে-দু'একজন আমাকে চিনতে পারে, তারা অন্যদের গা টিপে আমার সামনে এ-আলোচনা বন্ধ করতে বলে।

আমি অবশ্য ওদের সঙ্গে কখনও তর্ক করা দূরে থাক, একটা মন্তব্যও করি না, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সিগারেট টানি। ধর্মীয় উগ্রতা কিংবা অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে যে কোনও কাজ হয় না, তা আমি অনেকদিন আগেই জেনে গেছি।

একদিন ওইরকম একজন নেশার ঝোঁকে বাংলাদেশের মানুষদের বারবার শালা লোগ, শালা লোগ বলছিল বলে আমি নিঃশব্দে সেখান থেকে উঠে পড়ছিলাম, রশিদ

আমার হাত ধরে টেনে বসাল।

রশিদ অবশ্য ব্যতিক্রম। সে সবমানুষকেই মানুষ হিসেবে বিচার করে, ধর্ম কিংবা জাত দিয়ে নয়। বাংলাদেশের মানুষদের অনেককেই সে বিশেষ পছন্দ করে। পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক শোষণ, সাধারণ মানুষদের ওপর সামরিক শাসকদের অত্যাচার, মাতৃভাষার অধিকার হরণ, এই সবের বিরুদ্ধে যখন সেখানকার সংগ্রাম শুরু করে, তার প্রথম থেকেই রশিদ সমর্থক। সে-সময় তার বাড়িতে অনেককে আশ্রয় দিয়েছে।

রশিদ সে-রাতে আমার হাত ধরে টেনে বসিয়ে সেই উগ্র ব্যক্তিটিকে বলেছিল, হোয়াই ডোন্‌ট ইউ গো টু পাকিস্তান? গো, গো। মেরা কোঠি মে আউর কভি নেহি আনা!

আমি রশিদকে বলেছিলাম, না, না ওভাবে বলো না। যে-কোনও ব্যাপারে সমালোচনা করার ব্যক্তি-স্বাধীনতা তো সবারই আছে। বাংলাদেশকেও সমালোচনা করতে পারে, কিন্তু ভাষাটা ভদ্রসমাজের উপযুক্ত হওয়া দরকার।

এতে সে-লোকটি আমার ওপর আরও রেগে উঠেছিল। আমি তাকে ভদ্রতা শেখাচ্ছি? সে খানদানি বংশের লোক, অযোধ্যার নবাবের বংশধর, বাঙালিরা ভদ্রতার কী জানে?

শেষ পর্যন্ত সবাই মিলে তাকে শান্ত করেছিল।

মামাকে রবীন্দ্রসংগীতের উচ্চারণ শেখানোর উৎসাহই আমার চলে গেল। তবে, একটু পরেই রশিদ এসে উপস্থিত। পুরোদস্তুর সুট পরা, হাতে ব্যাগ, চুল একেবারে পাট করা, চোখ একটুও লাল নয়। একটুও নেশা করেনি বোঝা যায়।

সন্ধের পর রশিদকে এরকম সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক আমি বহুদিন দেখিনি।

আমাকে দেখে রশিদ খানিকটা অবাক হলেও কৌতুকহাস্যে বলল, সুনীল এসেছ? আজ তুমি একটা দারুণ সারপ্রাইজ পাবে।

সে-ব্যাপারে কৌতূহল না দেখিয়ে আমি বললাম, রশিদ, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

এবার সে-নিজেই হকচকিয়ে গিয়ে বলল, কেন? কী ব্যাপার!

সেদিন তুমি একজনকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলে। আমি তোমাদের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি।

ও, দ্যাট ইভনিং, আমারই উচিত হয়নি ওভাবে একজনকে নিয়ে যাওয়া!

তাহলেও ওভাবে তোমাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া, ইট ওয়াজ ভেরি রুড, আমি রিয়েলি সরি, আমি ক্ষমা চাইছি।

ধ্যাৎ! ওসব ছোড়ো তো ইয়ার।

তুমি আমার ওপর রেগে আছ, তাই তিন সপ্তাহে একবারও ফোন করনি!

আরে, তার পরের দিনই তো আমি দিল্লি চলে গেলাম অফিসের কাজে। তারপর ফিরেছি, পাঁচদিন আগে, তোমাকে ফোন করার ইচ্ছে হয়েছে খুব। তবু ফোন করিনি, কেন জান? সেটাই তো সারপ্রাইজ।

কী সারপ্রাইজ?

আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। দশদিন একটুও খাইনি। নট আ ড্রপ। আমাকে অনেক ফ্রেশ দেখাচ্ছে না? রোজ সকালে এক্সারসাইজ করছি। দেখো, দেখো আমার ভুঁড়ি কমে গেছে। তাই না?

আমি হতবাক। বলে কী! সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠছে নাকি?

রশিদ বলে চলল, বাড়িতে ড্রিংক্সের বোতলও রাখছি না। পরশু দিন সয়িদ মির্জা আমায় ফোন করেছিল, কী একটা সেমিনারে এসেছে কলকাতায়। সন্ধেবেলা আমার বাড়িতে এসে আড্ডা দিতে চায়। আমি যে-ই বললাম, আসতে পার, অবশ্যই, কিন্তু চা খেতে হবে, ড্রিংক্স সার্ভ করতে পারব না। অমনি ও বলল, দূর শালা, এখন চা খেতে কে যাবে তোর বাড়িতে? আমার কি বন্ধুর অভাব আছে? এইবার বুঝলে, আমি কেন তোমায় ফোন করিনি?

আমি তবু চুপ।

রশিদ ব্যাখ্যা দিয়ে বলল, ফোন করে তোমাকে বাড়িতে ডাকতে পারব না। তুমি ডাকলে যেতে পারব না। অন্যরা যেখানে ড্রিংক করে, আমি সেখানে বসতেও চাই না। কী, তুমি কিছু বলছ না, বিশ্বাস হচ্ছে না? নাসিমকে জিজ্ঞেস কর।

এবার আমি বললাম, বিশ্বাস করব না কেন? কিন্তু ভয়ে আমার বুক কাঁপছে।

সে কী, কেন?

তোমার মতন লোকের মদ ছাড়ার প্রতিজ্ঞা অত্যন্ত বিপজ্জনক। শক্তিকে দেখিনি? শক্তি মাঝে মাঝেই বলে, আর কোনওদিন খাব না। তিন-চারদিন খায় না। তারপর কী কাণ্ডই শুরু করে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, যে-ক'দিন খায়নি, সবই পুষিয়ে নেয়। তোমারও সেই অবস্থা হবে। একেবারে ছেড়ে দেবার দরকার কী বাবা? দয়া করে দিনের বেলা খাওয়া বন্ধ করো, সেটাই যথেষ্ট!

না, না, তুমি বুঝছ না। কত পড়াশুনো বাকি আছে। আই ওয়ান্ট টু ক্যাচ আপ। এবার আমি আর কিছুতেই ধরছি না। অন্তত ছ'মাস এরকম চালিয়ে যাব।

ঠিক আছে, গুড লাক!

তোমাকেও কিন্তু আমি আজ সার্ভ করব না। তবু তুমি কি বসতে চাও, না এক্ষুনি চলে যাবে?

আধঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিট তো বসতেই পারি। আমি এখনও অ্যালকোহলিক হয়ে যাইনি। সে-রাতে আমার বাড়িতে তুমি কাকে নিয়ে গিয়েছিলে বলো তো?

পিনাকী চ্যাটার্জি, তুমি ওর নাম শোনোনি ; ও তোমার লেখা-টেখার...তোমার

সঙ্গে খুব আলাপ করতে চেয়েছিল।

পিনাকী চ্যাটার্জি মানে ডিউক-পিনাকী?

ইয়েস, অফকোর্স! সে আমার খুব বন্ধু।

কয়েক বছর আগে ডিউক আর পিনাকী নামে দু'জন যুবককে নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে খবরের কাগজে। এরা দুঃসাহসী বাঙালি অভিযাত্রী। সাধারণ ডিঙি নৌকো নিয়ে আন্দামানের উদ্দেশে ভেসে পড়েছিল সমুদ্রে। বঙ্গোপসাগর তেমন কিছু বড় নয়, কিন্তু দুটি কারণে বিশ্ববিখ্যাত। ঝড় এবং চিংড়িমাছ!

আমি নিজে একবার জাহাজে চেপে আন্দামান গিয়েছিলাম। মোট চারদিন লাগে, তৃতীয়দিন সকালে শুরু হল ঝড়। আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল শরৎচন্দ্রের *শ্রীকান্ত* উপন্যাসে এক খালাসির উক্তি : কর্তা, কাপ্তেন কইছে, ছাইক্লোন হতি পারে! এই সেই সাইক্লোন। সে কী তার রুদ্ররূপ! এর তুলনায় আমাদের স্থলভূমির ঝড়-টড় নস্যি। কিছুই দেখা যায় না। আজকাল জাহাজ-টাহাজ সহজে ডোবে না, তবে আমাদের জাহাজটা সেখানে নোঙর করে থেকে রইল চব্বিশ ঘণ্টা।

সেই ঝঞ্ঝাসঙ্কুল সমুদ্র সাধারণ নৌকো নিয়ে যদি কেউ পাড়ি দিতে চায়, তাকে তো বিশেষ কৃতিত্ব দিতে হবেই। প্রতিদিন ছাপা হতো তাদের প্রগ্রেস রিপোর্ট। হেলিকপ্টার নিয়ে ছবি তোলা হতো।

শেষ পর্যন্ত ওরা আন্দামান পৌঁছতে পেরেছিল কি না, তা আমার মনে নেই। পৌঁছনো-না পৌঁছনো খুব বড় কথা নয়, কিন্তু অতখানি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যে বেরিয়ে পড়েছিল, তার জন্যই তারা স্মরণীয়।

ডিউকের পরে কী হল জানি না, তবে পিনাকী চ্যাটার্জির কথা মাঝে মাঝেই শোনা যায়। সে একজন দারুণ সাঁতারু, বন্দুক-পিস্তল চালাতে জানে, আবার ভালো আবৃত্তি করে, একটা কলেজে পড়ায়। সে একবার নির্বাচনেও প্রার্থী হয়ে দাঁড়াল। বোধহয় নির্দল হিসেবে, জিততে পারেনি, তবু তাকে নিয়ে প্রতিদিন খবর বেরুত।

সেই পিনাকী চ্যাটার্জির মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া আমার মোটেই ঠিক হয়নি। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য ভেতরে বসানো উচিত ছিল। গণ্ডগোলটার জন্য দায়ী একটা কবিতা?

সেদিন যদি আমার মাথায় হঠাৎ কবিতা লেখার বাই না চাপতো, তাহলে হয়তো আমি রশিদদের দেখে খুশিই হতাম।

কিংবা স্বাতী যদি সেদিন থিয়েটারে না যেত, তাহলে সে-ই দরজা খুলত। স্বাতী রশিদকে বেশ পছন্দ করে, সে খাতির করেই ওদের এনে বসাত ভেতরে। ওরা গল্প করত, আমার কিছুক্ষণ পরে যোগ দিলেও কোনও ক্ষতি ছিল না। ততক্ষণে কবিতাটা লেখা হয়ে গেলে, আমার মেজাজ ফুরফুরে হয়ে যেত, ওদের বোতলটা সরিয়ে রাখতে বলে আমি নিজেই একটা উৎকৃষ্ট মদ্য উপহার দিতাম।

সামান্য কার্যকারণের জন্য কত কিছু বদলে যায়। মানুষের জীবনেও তার প্রভাব পড়ে। সেইজন্যই এসব বিস্তারিতভাবে লিখছি।

রশিদকে বললাম, আমার সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও ছেলেটির কার্যকলাপ আমার ভালো লাগে। ওরকম প্রাণবন্ত ছটফটে মানুষদের আমার খুব পছন্দ। আমি ওর কাছে সেদিনের জন্য ক্ষমা চাইতে চাই!

রশিদ বলল, ক্ষমা-টমা চাইতে হবে না। আমি ওকে বুঝিয়ে বলেছি। একজন লেখককে যখন-তখন বিরক্ত করা উচিত নয় তো বটেই!

তাহলে, ওকে একদিন আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসো। ভালোভাবে আলাপ করব।

এখন তো হবে না।

কেন, পিনাকী কলকাতায় নেই?

আছে। কিন্তু আমি তো নিয়ে যেতে পারব না। আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, পিনাকী তো ছাড়েনি। ও ড্রিংক করতে বেশ ভালোবাসে। তোমরা দু'জনে বসে ড্রিংক করবে, আর আমি চুপ করে বসে থাকব, সেটা সম্ভব নয়।

আরে কী মুশকিল! কোনো ছুটির দিনে সকালবেলাতেও তো নিয়ে আসতে পার। চা খেতে খেতে কি মানুষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করা যায় না?

আচ্ছা সে দেখা যাবে!

না, বেশি দেরি কোরো না। কারণ...

আমাদের লাইব্রেরিয়ান নকুলের বেমক্কা আত্মহত্যার জন্য আমার মনে একটা কাঁটা বিঁধে আছে। সেটা কারুকে বলা দরকার। রশিদকেই বলে ফেললাম সবটা।

শুনে-টুনে রশিদ বলল, তোমার একটা কবিতা আছে না, 'কেউ কথা রাখে নি'? দেখ, তোমার জীবনেই সেটা ঘটে যাচ্ছে। সব মানুষের জীবনেই বোধহয় ঘটে। একটু বসো, জামা-টামা বদলে আসি, তারপর তোমাকে আজ আমার কয়েকটা কবিতা শোনাব। এখন খুব লিখছি।

আমি বললাম, একটু দাঁড়াও। আজ তুমি পুরোপুরি সোবার আছ, তোমার কাছে একটা ব্যাপারে পরামর্শ চাই। বাংলাদেশের আনোয়ারা নামের একটা মেয়ের কথা তোমাকে বলেছিলাম, মনে আছে?

রশিদ বলল, মনে থাকবে না কেন? আমার মেমারি খুব ভালো। ওই যে সৌদি আরবে চলে গিয়েছিল? তার কোনও খোঁজ পাওয়া গেছে?

না। কিন্তু একটা ব্যাপার আমি আর স্বাতী এ-পর্যন্ত কাউকে বলিনি। ঢাকা থেকে চলে আসার সময় মেয়েটি একগাদা গয়না নিয়ে এসেছিল। সেগুলো সে বিদেশে নিয়ে যেতে চায়নি, রেখে গেছে স্বাতীর কাছে।

মেয়েটি তো ওয়াইজ কাজই করেছে। বিদেশে নিয়ে গেলে নির্ঘাৎ সব গয়না খোয়া যেত, ঢাকাতে রেখে এলেও অন্য কেউ সরিয়ে ফেলতে পারত। তোমাদের

কাছে সেফ্ থাকবে।

কিন্তু আমরা কতদিন রাখব? মেয়েটি যদি আর না ফেরে? এতদিনে কোনও খবরও পাওয়া গেল না। এক-একবার ভাবছি, ওর হাজব্যান্ডের কাছে পাঠিয়ে দেব কি না!

কখনও দিও না। রেখে দাও! এইসব মেয়েরা দু'তিন বছর পর সাধারণত ফিরে আসে। এদের রূপ-যৌবন অনেকটা শুষে নিয়ে ওরাই একসময় ছুড়ে ফেলে দেয়। তখন এই গয়নাগুলো মেয়েটার অনেক কাজে লাগবে। ফিরে আসার পর বিবাহিতা মেয়েদের স্বামীর সঙ্গে নানারকম গণ্ডগোল হয়, অনেক স্বামী আর অ্যাকসেপ্ট করে না। সেই অসহায় অবস্থায় যদি টাকা না থাকে, তাহলে মেয়েটির বিপদের শেষ থাকে না। রেখে দাও!

গয়নাগুলো যে আমাদের কাছে আছে, তুমি তার সাক্ষী রইলে রশিদ। তাহলে আর আমরা কোনওদিন অস্বীকার করতে পারব না।

ধ্যাৎ, যতসব বাজে কথা। মেয়ে-পাচারচক্র আমরা কিছুতেই বন্ধ করতে পারছি না, এটা আমাদের এক চরম ব্যর্থতা। এই দলের একটি পাণ্ডাকে আমরা ধরেছিলাম, তার নাম কল্‌মা, আসলে কলিমুদ্দিন। সে-ব্যাটা আমাদের এখানে আর বাংলাদেশে, দু'জায়গাতেই অপারেট করে। কল্‌মাটা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনই বুদ্ধি ধরে। মুশকিল কী জানো, ওকে অ্যারেস্ট করলেও ধরে রাখা যায় না। ওর ক্রাইমগুলো প্রমাণ করা শক্ত, কেউ ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে সাহস করে না। কোর্টে প্রোডিউস করলে বেল পেয়ে যায়। এবার আমি ঠিক করেছি, ব্যাটাকে ধরতে পারলে আর কেস-ফেস না, সোজা গুলি করে মেরে ফেলব। ভোরবেলা নিয়ে যাব ময়দানে, গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে বলব, পালা। যা পালা! ও দৌড়োতে শুরু করলেই পেছন থেকে গুলিতে ফুঁড়ে দেব ওকে!

রশিদ, তুমি নিজের হাতে কারুকে কখনও গুলি করে মেরেছ?

আরে, তুমি ভাব কী? আই পি এস-এর ট্রেনিং নিয়েছি না? চোখ বুজে গুলি চালাতে পারি।

গুলি চালাতে পার, কিন্তু এ-পর্যন্ত কারুকে গুলি করে মেরেছ কি?

অফকোর্স মেরেছি। অনেকবার।

—বাজে কথা। যে-হাত গুলি চালিয়ে মানুষ খুন করতে পারে, সে-হাত কখনও কবিতা লিখতে পারে না। আমি জানি, নক্‌শাল আমলে তুমি বীরভূমে এস পি ছিলে, বীরভূম তখন নকশালদের ডেন, কিন্তু তুমি নক্‌শালদের খুন করার বদলে কয়েকজনকে গোপনে আশ্রয় দিয়েছ!

এই রে, তুমি কী বলছ সুনীল? আমার চাকরি খেয়ে দেবে দেখছি। খবরদার, এইসব কথা তুমি প্রকাশ্যে কখনও বলতে যেও না, লিখবেও না। তোমার কাছে আজ আমি সত্যি কথাটা স্বীকার করছি, সার্ভিসে আসার পর আমি কোনও লোককে

গুলি করে মেরে ফেলা তো দূরের কথা, কারুকে একটা চড়ও মারিনি। আমি পারি না। ভায়োলেন্স আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। ক্রিমিনালদের যখন টর্চার করা হয়, আমি সেখানে থাকি না কখনও। আমার কলিগরা সবাই জানে!

তাহলে তুমি পুলিশের চাকরি নিলে কেন? ভালো ছাত্র ছিলে, প্রফেসার হতে পারতে, কমার্শিয়াল হাউজেও ভালো কাজ পেতে পারতে।

শোনো, ব্যাপারটা তাহলে খুলে বলতে হয়। আমি আই পি এস পরীক্ষা দিয়েছি, আমার বাড়ির লোক আর আমাদের কমিউনিটির লোকদের প্রেশারে। ইন্ডিয়াতে আমরা মাইনরিটি কমিউনিটি। সব দেশেই মাইনরিটি কমিউনিটির নানারকম কমপ্লেক্স থাকে। বিশেষত তারা ভাবে, কোনও গণ্ডগোল হলে পুলিশ তাদের সাহায্য করবে না। এরকম তো হয়ও বটে, দাঙ্গা-টাঙ্গার সময় পুলিশ অনেক ক্ষেত্রে বায়াসড হয়। বাংলাদেশে হিন্দুরা যেমন মনে করে, পুলিশের কাছে সুবিচার পাবে না। তবে, আই মাস্ট সে, ইন্ডিয়াতে অবস্থাটা অনেকটা বেটার। এখানে মুসলমানরা প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত হয়, জাকির হোসেন, ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ হয়েছেন, আমাদের নেবারিং কান্ট্রিতে যা কল্পনাও করা যায় না। যাই হোক, আমাদের কমিউনিটির লোকেরা মনে করে, মুসলমান ছেলেরা যদি পুলিশ সার্ভিসে যায়, তাহলে তারা অন্য মুসলমানদের সাহায্য করতে পারবে। সেইজন্য তুমি দেখবে, অন্য সব সার্ভিসের তুলনায় পুলিশ সার্ভিসে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি। আমি যদিও ঠিক পুলিশ হবার যোগ্য নই, তবু ঠেলেঠুলে আমাকে পরীক্ষা দেওয়ানো হয়েছিল। প্রমোশানও পেয়ে গেছি অনেকগুলো।

এত মদ না খেলে তুমি অনায়াসে পুলিশ কমিশনারও হতে পারতে কলকাতার।

আমাদের কমিউনিটির কিছু লোক কী বলে জান? আমি মুসলমান বলেই আমাকে কমিশনার করা হল না, প্রমোশান দিয়ে ওপরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আরে লাচ্ছুদারও তো এই একই ব্যাপার! আমার চেয়ে সিনিয়র, তিনি তো আর মুসলমান নন, ওঁকেও পুলিশ কমিশনার করা হয়নি। ওঁর দোষ, স্বভাবে নরম, শেক্সপিয়ার পড়ে আর বেশি মদ খায়। ঠিক করেছে, আমাদের দু'জনের কেউই পুলিশ কমিশনারের অত দায়িত্বে সামলাতে পারতাম না।

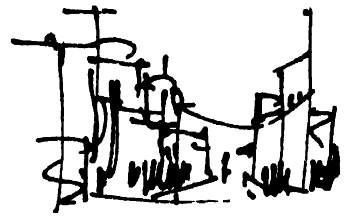
এরপর রশিদ পোশাক বদলে এসে নিয়ে এল কবিতার খাতা।

চশমা নাকে দিলে ওকে অন্যরকম দেখায়, কবিতা পড়ার সময় গলার আওয়াজও বদলে যায়। রিডিং গ্লাস লেগে থাকে নাকের ডগায়, ঠিক যেন এক পণ্ডিতমশাই।

সামনে গেলাশ নেই, মদের বোতল নেই, এ এক অন্য রশিদ। পড়ে যাচ্ছে একটার পর একটা কবিতা।

বিমল আনন্দে কেটে গেল সন্ধেটা।

৮



দিল্লি থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের এক মুখপাত্র টেলিফোন করলেন সকালবেলা। অতি আকর্ষণীয় প্রস্তাব।

বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন হবে পরের সপ্তাহেই। সেজন্য বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যবেক্ষকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সার্ক-অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর একটা কোটা আছে। ভারত থেকে পাঠানো হবে দশজনকে। আমি সেই দশের অন্যতম হতে রাজি আছি কি না।

অরাজি হবার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বাংলাদেশে যাবার যে-কোনো সুযোগ পেলেই আনন্দে মনটা নেচে ওঠে। যেন একটা অদৃশ্য চুম্বক আমায় টানে। দুঃখের বিষয়, সেই টানটা ইদানীং ক্রমশ আলগা হয়ে আসছে। এ-ধরনের সরকারিদলের প্রতিনিধি হলে প্রচুর খাতির-যত্ন পাওয়া যায়।

সারা ভারত থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষদের বেছে নেওয়া হয়েছে। সাংবাদিক, খেলোয়াড়, চিত্রতারকা, লেখক, বিজ্ঞানী। শুধু রাজনৈতিক নেতারা একবারে বাদ। পশ্চিম বাংলা থেকে একমাত্র আমি, কিন্তু মজার ব্যাপার, দশজনের মধ্যে তিনজনই বাঙালি! দিল্লির নিখিল চক্রবর্তী প্রখ্যাত সাংবাদিক, সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে খ্যাতিমান আশিস নন্দী, তিনিও দিল্লির। খেলোয়াড় হিসেবে পতৌদি নবাব, শর্মিলা ঠাকুরের স্বামী হিসেবে তিনিও তো বাংলার জামাইবাবু! তাছাড়া, সেইসময় আনন্দবাজার গোষ্ঠীর একটি ইংরেজি খেলার পত্রিকার সম্পাদক পতৌদি, অর্থাৎ তিনি আমার সহকর্মীও বটে। বিমানে আমরা পাশাপাশি সিটে বসে পৌঁছোলাম ঢাকায়। কোনও নবাবের সঙ্গে এত ঘেঁষাঘেঁষি করে বসার অভিজ্ঞতা আমার আগে কখনও হয়নি।

পতৌদি অত্যন্ত সুপুরুষ, কিন্তু মুখখানা খুব কঠোর মনে হয়। হয়তো তার একটা কারণ, তাঁর একটা চোখ পাথরের।

আমার সঙ্গে দু-একটা কথা বলার সময় তাকাচ্ছিলেন পাশ ফিরে। মাঝে মাঝে হাসছিলেন, তখনই লক্ষ করলাম, ওঁর একটা চোখ স্থির। মানুষ যখন হাসে, তখন তার চোখও হাসে, এরকম মানুষের একচোখে হাসি, অন্য চোখে নীরবতা। আমার

খুব মায়া হয়েছিল।

ঢাকা বিমানবন্দরে সাধারণ নির্গমন পথের বদলে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল পেছনদিকে ভি আই পি এনক্লোজারে, সেখানে ফাইলপত্তর নিয়ে বসে আছেন অনেক কর্তাব্যক্তি। এখন ঠিক হবে, কোন পর্যবেক্ষক কোন জেলায় যাবে।

আমাকে জিজ্ঞেস করতেই, আমি প্রায় কিছু না ভেবেই বললুম, বরিশাল।

ওঁরা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। ওঁদের মধ্যে দু-চারজন বোধহয় জানেন যে, আমার জন্মস্থান ফরিদপুর তথা মাদারিপুরে। সেখানে আমার ঘোরাঘুরি করার আগ্রহ হওয়াই তো স্বাভাবিক।

একজন জিজ্ঞেস করলেন, কেন, বরিশালই বলছেন কেন? বিশেষ কোনও কারণ আছে?

আমি বললুম, না। তবে বরিশাল জেলায় আমি কখনও যাইনি, সেটাই একটা কারণ হতে পারে!

বিমানবন্দর থেকে গাড়ির মিছিল করে আমাদের আনা হল এক পাঁচতারা হোটেলে।

পতৌদি আমাকে চুপি চুপি বললেন, আমি কোনো জেলায়-টেলায় যাব না। আমি হোটেলে ঘুমোব।

প্রত্যেক অন্যদেশীয় পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে থাকবেন বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। আমি সঙ্গী হিসেবে পেলুম ইমদাদুল হক মিলনকে, তাতে আমার আনন্দের অবধি রইল না। মিলন আমার ছোটভাইয়ের মতন, আমি তার রচনার খুব অনুরাগী। মিলনের মতন পড়ুয়াও আমি খুব কম দেখেছি। বাংলা সাহিত্যের সব খুঁটিনাটি খবর সে রাখে। অপরিচিত কোনও ব্যক্তিকে সঙ্গী হিসেবে পেলে তাঁর সঙ্গে ভাব জমানো আমার পক্ষে মুশকিল হতো।

সেবারে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে বেশ অভিনবত্ব ছিল। আগের সরকারকে পদত্যাগ করিয়ে এক অস্থায়ী সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে। এতে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার সম্ভাবনা প্রবল। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এই ব্যবস্থা নেই, ভারতেও নেই, তবে ভারতে নির্বাচন কমিশনের হাতে প্রচুর ক্ষমতা। মন্ত্রী-টন্ত্রিরাও তাদের ভয় পায়। একবার এলাহাবাদের আদালতের নির্দেশে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনের ফলাফল বানচাল হয়ে গিয়েছিল, তিনি পদত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন।

মিলন আর আমার জন্যে দেওয়া হল একটি আলাদা বাতানুকূল গাড়ি। সেই গাড়িতে সোজা একেবারে বরিশাল। পথে অবশ্য কয়েকটি ফেরি পার হতে হয়েছিল, মাদারিপুরের পাশ দিয়ে যাবার সময় অনেককাল পরে দেখলুম আমার বাল্যকালের প্রিয় নদী আড়িয়ালখাঁ।

বরিশালে গিয়ে নির্বাচনের পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে বেশি সময় দেবার বদলে জীবনানন্দ দাশের বাড়ি দেখা, ধানসিঁড়ি নদীর অনুসন্ধানেই মেতে উঠেছিলুম বেশি।

এই পর্বটি নিয়ে আমি অন্য একটি রচনা লিখেছি। সুতরাং এখানে আর পুনরুক্তি করতে চাই না।

ঢাকায় হোটেলে থাকার সময়, বরিশাল যাবার আগে ও পরে, নিরাপত্তার ঘেরাটোপের জন্য বাইরে বেরুনো হয়নি। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগ করারও সুযোগ ঘটেনি। মিলনের সঙ্গেই কেটেছে অনেকটা সময়।

এই ধরনের সরকারি কাজে প্রচুর কাগজপত্র, ডোসিয়ের ফাইল, বুকলেট ইত্যাদি পেতে ও পড়তে হয়। সই করতে হয় অনেক জায়গায়। আমার মতে, প্রায় সবই অপ্রয়োজনীয়। সরকারি কাজে প্রচুর কাগজের অপচয় হয়। বলাই বাহুল্য, আমি অন্যের অগোচরে সে-সবকিছুই ফেলে দিই না পড়ে। পৃথিবীতে কত ভালো ভালো বই পড়া এখনও বাকি রয়ে গেছে। খামোখা সরকারি কাগজ পড়ে সময় নষ্ট করতে যাব কেন?

মাঝে মাঝে দরজায় নক করে অতি সুদর্শন ছেলেমেয়েরা এইসব কাগজপত্র দিয়ে যায় কিংবা কিছুতে সই করায়। নির্বাচনের কাজেই অল্পস্থায়ী হিসেবে এদের নিয়োগ করা হয়েছে। তাদেরই একজন আমার চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিল।

এরা সবাই এসে আমাকে সম্বোধন করে মিস্টার গঙ্গোপাধ্যায়। আমার গায়ে যেন ছ্যাঁকা লাগে। কলকাতায় কোনো বাঙালি আমাকে মিস্টার বললে দুই ধমক লাগাতুম। এখানে এরা সমস্ত বিদেশিকেই যেমন পদবি ধরে ইংরেজিতে সম্বোধন করে, আমার বেলাতেও সেই একই নিয়ম!

ঢাকা বিমানবন্দরে এর আগে একবার বেশ মজার অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

এখানকার কাস্টমস ও ইমিগ্রেশান ফর্মের একদিকে থাকে ইংরেজি, অন্যদিকে বাংলা। স্বাভাবিকভাবেই আমি বাংলাতেই সবকিছু লিখে দিলুম। সংশ্লিষ্ট অফিসারটি কাগজটি উল্টে-পাল্টে দেখে বলে দিলেন, এটা তো চলবে না। আপনাকে ইংরিজিতে লেখতে হবে।

কেন?

বাংলায় লিখবে শুধু বাংলাদেশিরা। বিদেশিদের লিখতে হবে ইংরিজিতে। এটাই নিয়ম!

বাংলাদেশে এসে কারুর মুখে এই বিদেশি শব্দটা শুনলে এখনও আমার মর্মপীড়া হয়। এটা আমার দুর্বলতা অবশ্যই। এটাই তো বাস্তব সত্য।

কিন্তু বিদেশি হোক বা যে-ই হোক, বাংলা জানলে কেন বাংলায় লেখা যাবে না? ব্যাপারটা তো একই।

ধরা যাক ক্লিনটন সিলির কথা, যে জীবনানন্দ দাশের একটি চমৎকার জীবনী লিখেছে। অনেক মাস কাটিয়ে গেছে ঢাকা ও কলকাতায়, অনেক বাঙালি শিক্ষিত মানুষের চেয়েও তার বাংলাজ্ঞান বেশি। সে ঢাকায় এলে বাংলায় ফর্ম ভর্তি করতে পারবে না?

কী অদ্ভুত সরকারি নিয়ম! কিংবা কী অদ্ভুত সেই নিয়মের প্রয়োগ!

যাই হোক, এক সন্ধেবেলা দরজায় বেল শুনে আমি দেখি, এক তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটি ফাইল, সে আমাকে কিছু একটা সই করাতে চায়। এ-ও আমাকে মিস্টার গঙ্গোপাধ্যায় বলে সম্বোধন করেছে।

সই করতে করতে হঠাৎ আমার মনে হল, এ-মেয়েটিকে কী আমি আগে দেখিনি? চেনা মনে হচ্ছে কেন?

ফাইলটা ধরে আছে তার যে-হাত, সেই হাতের আঙুল দুধে-আলতা রঙের। এবার ভালো করে দেখলুম তার মুখ।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, নীলোফার?

সে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

তারপর ফাইলটা নিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল।

তবে কি আমার ভুল হল? না মাত্র কয়েক মাস আগেই তো গিয়েছিল শান্তিনিকেতনে আমাদের বাড়িতে। এরকম একজন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলার পরেও তাকে ভুলে যাবার মতন ভীমরতি আমার এখনও হয়নি!

তাহলে কী নীলোফার আমাকে চিনতে পারেনি?

আমার চেহারাটা মনে রাখবার মতন নয় ঠিকই। একটা ছাতার সঙ্গে অন্য একটা ছাতার যেমন তফাত বোঝা যায় না। সেইরকম অন্য হাজার মানুষের সঙ্গে আমার কোনো তফাত নেই। কিন্তু আমার নামটা তো ও দেখেছে।

ঠিক বিস্ময় নয়, খুবই অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম দরজার কাছেই।

কয়েক মিনিট বাদেই লম্বা করিডোর দিয়ে হেঁটে এল সেই মেয়েটি। আমার দিকে সে তাকালও না।

এসব ক্ষেত্রে, মেয়েটিকে ডাকতে হলে এক্সকিউজ মি বলে কথা শুরু করতে হয়। কিন্তু এত রক্ত দিয়ে, কত অসহনীয় কষ্টের দিন অতিক্রম করে বাংলাদেশের মানুষ বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে, সেখানে বাংলা ভাষার অমর্যাদা করা হবে!

আমি স্পষ্ট করে ডাকলুম, নীলোফার, শোনো।

মেয়েটি থমকে দাঁড়াল।

আমি বললুম, তুমি যদি যমজ বোন না হও, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই নীলোফার! তুমি আমায় চিনতে পারছ না?

নীলোফার নতমুখে, ধীর গলায় বলল, বিদেশি অতিথিদের কারুর সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত কথা বলার নিয়ম নাই।

বিদেশিদের হোটেলের ঘরের মধ্যে গিয়ে দরজা বন্ধ করে কথাবার্তা বলার ব্যাপারে নিষেধ থাকতেই পারে। আমি তো ওকে ঘরের মধ্যে ডাকিনি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কোনও চেনা মানুষের সঙ্গে দু-একটা কথা বলার কী আপত্তি থাকতে পারে?

আমরা তো সভ্য মানুষ।

বলতে ইচ্ছে করে, এসব নিয়মের মুখে আমি লাথি মারি!

কিন্তু বলা তো যায় না! সবাই মনে করে, আমি এখন একজন প্রবীণ লেখক। সবসময়ে সহবৎ মেরে চলা উচিত।

আমি বললুম, ঠিক আছে!

এর পরবর্তী দুদিন নীলোফারকে আমি কয়েকবার দেখেছি দূর থেকে। সেও আমাকে চেনার কোনও ইঙ্গিত দেয়নি। আমিও আর কথা বলার চেষ্টা করিনি তার সঙ্গে!

কোনও সুন্দরী মেয়ে সম্পর্কে জীবনে আর কখনও আমি মনের মধ্যে এমন বিরক্তির ভাব পোষণ করিনি।

বরিশালে একজন তরুণ সরকারি অফিসার আমাকে যথারীতি মিস্টার গঙ্গোপাধ্যায় সম্বোধন করে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছিল। আমরা উঠেছিলুম একটা সাধারণ হোটেলে, একদিন সন্ধেবেলা মিলন আর আমি নিভৃত আড্ডায় বসেছি, তারমধ্যে সেই ছেলেটি এসে পড়ল। কোনও কাজের ছুতোও নেই, এমনিই। একটু পরে সে বলেছিল, স্যার, এখন তো আর আমি সরকারি ডিউটিতে নেই, আপনাকে সুনীলদা বলতে পারি? আমিও কবিতা লিখি।

সে কবিতা লেখে এবং আমার লেখা-টেখাও কিছু পড়েছে। সেজন্যই তার আলাদা আবেগ ছিল। সে মিলনেরও খুব ভক্ত।

নীলোফার কবিতা লেখে না, আমার কোনও লেখাই সে সম্ভবত পড়েনি। তাই আমার সম্পর্কে তার আলাদা কোনও আবেগও নেই।

শুধু মনের মধ্যে একটা কৌতূহল খচখচ করছিল। শামীমের সঙ্গে এখনও কি নীলোফারের কোনো সম্পর্ক আছে? আনোয়ারা এখানে নেই, শামীমের গোঁয়ার ভাইটি জেলে। এখন নীলোফারের সঙ্গে শামীমের মেলামেশার কোনো বাধা থাকারই কথা নয়। যদি না মানসিক বাধা থাকে।

শান্তিনিকেতনে নীলোফার তার বিবেকের বাধার কথাই বলেছিল। কিন্তু বিবেকের সংকল্পও সবসময়ে অটল থাকে না। অনেক সময় বদলে যায়। বন্যায় কত বড় বড় মজবুত বাঁধ ভেঙে উড়ে যায়। বিবেকের বাঁধ সেই তুলনায় অনেক কমজোরি।

বিশেষত যদি শরীরের টান আসে।

কী জানি!

বীথি আর গাজী শাহাবুদ্দিনদের বাড়িতে প্রতিবারই যাই, সেখানে থেকেছিও কয়েকবার। এবার দেখা করাই হল না। নিশ্চয়ই পরে ওরা খুব রাগারাগি করবে। ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সঙ্গে থেকে আমাকে হাজিরা দিতে হল কয়েকটি সরকারি মিটিং আর পার্টিতে, কলকাতায় ফিরতেও হল সেই দলের সঙ্গে।

এবারেও ফেরার সময় পতৌদি আমার পাশে।

অন্য সবাই বলাবলি করছে যে, বাংলাদেশের নির্বাচন এবার যথেষ্ট নিরপেক্ষভাবেই পরিচালিত হয়েছে, হিংসাত্মক ঘটনাও ঘটেছে কম। পতৌদির এসব ব্যাপারে যেন কোনও আগ্রহই নেই।

একবার তিনি আমাকে বললেন, বাংলাদেশ ইজ এ বিউটিফুল কান্ট্রি। আই ফেল্ট সো স্যাড ফর দিজ পিপ্‌ল!

এই বাক্যদুটির কোনও সরল ব্যাখ্যা হয় না। কী ভেবে উনি বললেন, আমি তার অর্থ জিজ্ঞেস করিনি।

হঠাৎ আমার মনে হল, পতৌদি কি কখনও কাঁদেন? সব মানুষকেই জীবনে কখনও-না-কখনও কাঁদতেই হয়। তখন কি ওঁর শুধু একচোখ দিয়ে জল পড়ে? ভাবলেই কেমন যেন শিরশির করে গা, একচোখ শুকনো, অন্য চোখে অশ্রুধারা!

প্লেনের মধ্যে দেখা হল বটু আর কাজলের সঙ্গে। বটু অর্থাৎ মাহমুদুল হক, জীবন আমার বোন আর কালো বরফ নামে ওর দুটি উপন্যাস পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। বন্ধু-বান্ধব সবাই ওকে বটু বলেই ডাকে। আমি যেমন পূর্ববঙ্গে জন্মে, পালিত হয়েছি পশ্চিমবঙ্গে, বটুও জন্মেছে পশ্চিমবঙ্গে, এখন বাংলাদেশের মানুষ। বটুর কথা ও ভাষায় এখনও পশ্চিমবঙ্গের ছাপ স্পষ্ট। কাজল সেই তুলনায় একেবারে অবিমিশ্র বাঙাল। ওরা আসছে কলকাতায় বেড়াতে, সম্ভব হলে আজমির শরিফও ঘুরে আসবে। আমার ধারণা ছিল, বটুর তেমন ধর্মভাব নেই, ওর বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা শুনে মুগ্ধ হয়েছি। যারা সব বিষয় নিয়েই হাস্য পরিহাস করতে পারে, তাদের মধ্যে কি কোনও বিষয়ে গোঁড়ামি থাকা সম্ভব?

কলকাতা থেকে প্লেনে শিলিগুড়ি যেতে যতটা সময় লাগে, তার চেয়েও কম সময়ে ঢাকা থেকে পৌঁছনো যায় কলকাতায়। কলকাতায় পৌঁছে আমি হয়ে গেলুম স্বদেশি, আর বটু হয়ে গেল বিদেশি। যদিও এই এয়ারপোর্ট থেকে খুব কাছেই বারাসাতে বটুর জন্ম। আমরা দাঁড়ালুম আলাদা লাইনে।

সুটকেস-উদ্ধারের জন্য আমরা যখন গোলচক্করে দাঁড়িয়েছি, তখন কাজল ফিসফিস করে বলল, সুনীলদা, শোনছেন তো, বীণা কী করছে?

বটু ধমক দিয়ে বলল, চুপ করো। সুনীলদা সবই জানে! বাংলাদেশের কোনও খবর কি সুনীলদার অজানা থাকে নাকি?

আমি বললুম, বীণা কে? আমি তো চিনি না।

বটু বলল, ইমতিয়াজকে তুমি চেনো না? ইমতিয়াজ, পাবলিশার গতবছর তার বাড়িতে বিরাট পার্টি দিয়েছিল, তুমি ছিলে, আমিও ছিলাম, বেলাল, রফিক, সেখানে বীণা গান গাইল, তোমার মনে নেই?

আমি বললুম, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, কিন্তু মেয়েটির নামটা খেয়াল নেই। কী করেছে বীণা?

বটু বলল, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হলে যা হয়। আগে মেয়েরা এ চরম অবস্থায় পড়লে হয় আত্মহত্যা করত, নাহয় অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে ভেগে যেত। এখন নতুন একটা ফ্যাশান হয়েছে। এখন আরব কান্ট্রিতে চাকরি করতে চলে যায়। গরিব ঘরের অসহায় বোকা-সোকা মেয়েরা আড়কাঠিদের পাল্লায় পড়ে চালান হয়ে যায়, বিক্রি হয়ে যায়, আর মাঝারি ঘরের বউরা নিজে থেকে গিয়ে ফাঁদে পড়ে। তাছাড়া বাজারে যে রটে গেছে, শামীমের বউ আনোয়ারা, ওদের তো তুমি ভালোই চেনো, সেই আনোয়ারা নাকি সৌদি আরবে গিয়ে ভালো চাকরি পেয়ে অনেক টাকা রোজগার করছে!

কাজল চোখ বড় বড় করে বলল, দুই হাজার ডলার পাঠাইছে অর বড় বুইন নাসরিনরে!

আমি বললুম, সত্যি?

বটু বলল, সত্যি না মিথ্যে কে জানে? নাসরিনকে কেউ কি জিজ্ঞেস করতে গেছে? গুজবও হতে পারে। জানো তো, গুজব তৈরি করার ব্যাপারে বাঙালির ব্রেইন কত উর্বর!

আমি বললুম, যদি কথাটা সত্যি হয়, তাহলে তো আনোয়ারার খুব ভালো খবর বলতে হবে। দু হাজার ডলার মানে, সে বেশ ভালোই কাজ পেয়েছে, ভালো আছে!

কাজল বলল, আমিও তাইলে আরব দ্যাশে চলে যাব। জানেন তো সুনীলদা, অর সাথে আমার যখন-তখন ঝগড়া হয়। এবার নিজে রোজগার করব।

বটু বলল, ঝগড়া? সে তো তুমি একাই করো। আমি কোনও কথা বলি? দুজনে একসঙ্গে না চ্যাঁচালে ঝগড়া হয়?

আমি বটুর পিঠে চাপড় মেরে বললুম, শোনো শোনো, একটু-আধটু ঝগড়া করতে শেখো। মাঝে মাঝে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া না হলে প্রেমও টেকে না। ঝগড়ার পর ভাব, নিমপাতার ঝোলের পর পায়েসের মতন!

বটু হঠাৎ হাসতে শুরু করে দিল। এমনই জোরে জোরে হাসি যে, আশেপাশের লোক তাকাল তার দিকে।

কাজল তার মুখে হাতচাপা দেবার চেষ্টা করে ফিসফিস করে বলল, এই, এই, পাগল হইলা নাকি?

বটু হা-হা করতে করতেই বলল, সুনীলদা আর স্বাতীদি ঝগড়া করছে। এই দৃশ্যটা ভাবতেই আমার...স্বাতীদি...হা-হা-হা।

মালপত্র এসে গেছে। বাইরে এসে আমরা আলাদা ট্যাক্সিতে।

আমার মনটা বেশ খুশি খুশি হয়ে উঠল।

হঠাৎই একটা সুসংবাদ পাওয়া গেল আনোয়ারা সম্পর্কে। সে যথেষ্ট টাকা উপার্জন করে তার বোনকে কিছু পাঠাচ্ছে।

কিন্তু সে একটা চিঠি লেখে না কেন আমাদের? সৌদি আরব থেকে কি চিঠি লেখা নিষেধ?

বাড়িতে এসে স্বাতীকে খবরটা দিতেই সে বলল, আমি জানতুম, আমি মনে মনে ঠিক জানতুম, আনোয়ারার কোনও বিপদ হতে পারে না। ওর মতন এমন সৎ আর তেজী মেয়ে...। যারা অন্যায় করে, তারাও খাঁটি সৎ মানুষদের ভয় পায়।

এ-বক্তব্য অবশ্য আমার পক্ষে মেনে নেওয়া শক্ত।

পৃথিবীতে অন্যায়কারীর সংখ্যা কম, সৎ মানুষই বেশি। তবু যে-কোনও যুদ্ধ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সৎ আর সাধারণ মানুষদেরই তো প্রাণ যায়!

পরদিন গেলুম আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে।

মা থাকেন বাগুইহাটিতে। তাঁর নিজস্ব বাড়িতে, একা। ঠিক একা নন, কাছেই এক বাড়িতে থাকে আমার মেজভাইরা। আর আমার মায়ের বাড়ির পাশাপাশি বাড়িগুলোতে থাকেন আমার কয়েক মামা, মাসিমা আর মাসি, পিসিরা। অর্থাৎ একটা ছোটখাটো ফরিদপুর কলোনি বলা যায়।

আমার মায়ের বাপের বাড়ি বরিশালে। যদিও তিনি সেখানে কখনও যাননি। মায়ের বিয়ের আগের বছরগুলো কেটেছে তাঁর মামাবাড়ি আমগ্রামে।

আমি বাংলাদেশ ঘুরে এলেই মামা-মামি-মাসি-পিসিরা ভিড় করে মায়ের ঘরে চলে আসে গল্প শুনতে। এঁদের সকলেরই জন্ম পূর্ববাংলায়, দেশভাগের পর আর কখনও যাওয়া হয়নি ওদিকে। কিন্তু স্মৃতিতে ওখানকার মানুষজন, গাছপালা, পুকুর, এমনকী আকাশ পর্যন্ত জীবন্ত!

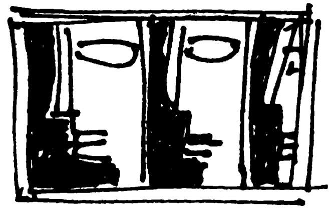
ওঁদের ছেলেবেলায় ওইসব অঞ্চলে পাকারাস্তা প্রায় ছিলই না, নৌকোই ছিল প্রধান ভরসা। আমি নিজেও বাল্যকালে কলকাতা থেকে দেশের বাড়িতে যাবার সময় প্রথমে ট্রেনে খুলনা, তারপর স্টিমারে চরমুগুরিয়া, সেখান থেকে নৌকোয় একেবারে মামাবাড়ির ঘাটে। অন্য গাড়ি-টাড়ির কোনও ব্যাপারই ছিল না।

এবার আমি সরাসরি ঢাকা থেকে গাড়ি চেপে, মাদারিপুরের পাশ দিয়ে, আড়িয়ালখাঁ পেরিয়ে ঢাকা পৌঁছে গেছি শুনে বিস্ময়ে সেই বুড়িদের চোখ কপালে ওঠার জোগাড়!

বিশেষত বরিশাল ছিল নদী-নালা-পরিবৃত স্থান, স্টিমার বা নৌকো ছাড়া পৌঁছবার উপায় ছিল না। সেই বরিশালে আমি গেছি গাড়িতে? সত্যি?

শুনতে শুনতে সেই বুড়িদের চোখে যেন ঘোর নেমে আসে। যেন তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন, তাঁদের বাল্যের সেই জল-কাদার দেশ যেন এখন স্বর্গভূমির মতন? কিন্তু একবার তা স্বচক্ষে দেখে আসা আর তাঁদের ভাগ্যে নেই।

এক পিসি তাঁর পুরনো স্নেহমাখা হাত আমার গায়ে বুলোতে লাগলেন। যেন আমাকে ছুঁয়েই তিনি তাঁর জন্মভূমির বাতাসের স্পর্শ নিতে চান।



৯

বটু আর কাজলের সঙ্গে আমি একবার নতুন বাবার আশ্রমে গিয়েছিলাম। নারায়ণগঞ্জ থেকে বাসে উঠেছিলাম, খুবই ভিড়ে ঠাসা বাস, গন্তব্যস্থানটির নাম মনে নেই। সরাইল হতে পারে কি?

কেন গিয়েছিলাম? নিছক কৌতূহল। বটুর মতন একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এবং প্রতিভাবান লেখক, সে কী করে একজন ধর্মগুরুর ভক্ত হয়, এটা আমার বোধগম্য হচ্ছিল না। তাহলে কি সেই ধর্মগুরুটির কোনও অলৌকিক শক্তি আছে? অলৌকিক শক্তি বলেই কি কিছু আছে?

বাস থেকে নেমে একটু দূরে গেলেই সেই বাবার ডেরা। আশ্রমের বদলে আখড়াও বলা যেতে পারে। সেটা অনেকখানি ছড়ানো, ছোট ছোট ঘর, উঠোন, আবার ঘর। আবার উঠোন, অনেক ভক্তও রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আমাদের নিয়ে যাওয়া হল একেবারের ভেতরের দিকের একটা ঘরে।

মানুষটির বয়েস কম নয়, পঁয়ষট্টি-সত্তরের কাছাকাছি, ছিপছিপে মেদহীন শরীর। একটা লুঙ্গি গিঁট দিয়ে পরা, খালি গা, শ্যামবর্ণ। ভক্তরা সেই ঘরে এসে তাঁর পা ছুঁয়ে কদমবুসি করছে, তিনি তাদের মাথায় হাত ছুঁইয়ে অনুচ্চস্বরে বলছেন কিছু। আর মাঝে মাঝে ওপরের দিকে তাকিয়ে হুংকারের মতন বলছেন, আমি ওই! আমি ওই!

আগে আমি নিজে বাবা-মা এবং নিতান্ত গুরুজন ছাড়া আর কারুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করার ঘোর বিরোধী ছিলাম। কোনও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে অন্যরা প্রণাম করছে, আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকতাম তেড়িয়ার মতন। এখন অনেকটা নরম হয়েছি, এখন মনে হয়, আলাদাভাবে দ্রষ্টব্য না হয়ে কোনওমতে একটা পেন্নাম ঠুকে দিলে ক্ষতি কী?

আমি তাঁর পদস্পর্শ করার পর তিনি আমার পরিচয় জানতে চাইলেন।

আমার নাম শুনলে মনে হয় হিন্দু, তাই তিনি আমার সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ে কিছু বলতে লাগলেন। আমি তাতে যোগ দিতে খুব-একটা উৎসাহ বোধ করলাম

না। হিন্দু দেব-দেবী বা ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে আমার আগ্রহ একেবারেই অ্যাকাডেমিক। রামায়ণ-মহাভারত, বেদ-উপনিষদ, বাইবেল, কোরান, হাদিস, বিষাদসিন্ধু একাধিক বার পড়েছি, শুধুই সাহিত্যরস খোঁজার জন্যে, পেয়েছিও অনেক। আমার মনে বিন্দুমাত্র ভক্তিভাব নেই। রাধা আর কৃষ্ণ আমার কাছে কাব্যের নায়িকা আর নায়ক, তার বেশি কিছু নয়। ইনি অবশ্য কাব্যের ধার ধারেননি!

জনে জনে সকলের সঙ্গেই কিছু কিছু কথা বলছিলেন, মাঝে মাঝে হঠাৎ থেমে গিয়ে তিনি বলছিলেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও, দাউদকান্দিতে খুব ঝড় উঠেছে, একটা নৌকা খুব বিপদে পড়েছে, দেখি যদি কিছু করা যায়।

তিনি ঊর্ধ্বনেত্রে যেন ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন একটুক্ষণ।

সত্যিই কি ওঁর দিব্যদৃষ্টি আছে? উনি দেখতে পাচ্ছেন দাউদকান্দি পর্যন্ত? সেখানে কোনও নৌকো ঝড়-বাদলে বিপদে পড়লে এতদূর থেকে তাদের রক্ষা করার ক্ষমতা কোনও মানুষের থাকতে পারে?

আমি তা মানতে পারব না, তবে যারা বিশ্বাসী তাদের কথা আলাদা। শুনেছি, বিশ্বাসের জোর থাকলে অনেক কিছু সম্ভব হয়ে ওঠে। আবার অবিশ্বাসেরও জোর কম নয়।

মানুষটির প্রবল ব্যক্তিত্ব আছে ঠিকই, কিন্তু রাগী নন, সবসময়ে হাসিমুখে থাকেন। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, ইনি কি তান্ত্রিক, না ফকির, না সুফি সাধক?

সেখানে আর একটি বিচিত্র ব্যাপার ঘটছিল।

ওঁর ভক্তরা অনেকেই হাতে করে ওঁর জন্য কিছু না কিছু প্রণামী আনছিল, ফলমূল, মিষ্টির বাক্স এবং মদের বোতল। নানারকম মদ, হুইস্কি, ব্র্যান্ডি, রাম, বিয়ার ইত্যাদি। একটা বেশ বড় ড্রামে সবকটা বোতলের ছিপি খুলে ঢেলে দেওয়া হচ্ছিল। তার থেকে ছোট গেলাসে তুলে তুলে দেওয়া হচ্ছিল ইচ্ছুক ভক্তদের। একসঙ্গে অত রকম মদের মিশ্রণ আমি আগে দেখিনি বা চাখিনি। বিপজ্জনক হতেই পারে, কিন্তু আমরা কমল মজুমদারের চ্যালা, বাংলা মদে হাতেখড়ি, আমাদের আবার ভয় কী? নতুন বাবা নিজেও একটু একটু চুমুক দিচ্ছেন গেলাস থেকে, আমি যতক্ষণ ছিলাম, ততক্ষণে ওঁর বয়েসি কোনও লোকের বেশ নেশা হয়ে যাবার কথা, কিন্তু ঠিক সোজা হয়ে রইলেন। উপস্থিত অনেকেই এক গেলাসের বেশি পান করেনি।

মোটকথা সন্ধেটা বেশ ভালোই কাটল।

কোনওরকম ধর্মীয় গোঁড়ামির কথা শুনতে হয়নি। নতুন বাবা মাঝে মাঝে সহজ-সরল ভাষায় কিছু কিছু উপদেশ দিচ্ছিলেন, আর হঠাৎ হঠাৎ থেমে গিয়ে দূরবর্তী কোনও বিপন্ন ভক্তকে উদ্ধার করছিলেন ধ্যানযোগে। আর এক–একবার হুংকার দিচ্ছিলেন, আমি ওই!

নতুন বাবা আমার মনের মধ্যে একটা ছাপ ফেলে দিয়েছিলেন ঠিকই। সেই

একবারই মাত্র দেখেছি, কিন্তু এখনও মনে আছে তাঁর চেহারা। তাঁর হুংকার, 'আমি ওই', এটাও আমার কানে ধ্বনিত হয়েছে অনেকদিন। ঠিক কী অর্থে তিনি ওটা বলছিলেন, তা আমি বুঝিনি, জিজ্ঞেসও করিনি তিনি কি সোহং বলতে চাইছিলেন, যাতে ঈশ্বর ও মানুষের একাত্মতা বোঝায়? কিন্তু সেটা তো উপনিষদ তত্ত্ব বোধহয়! যাকগে, সবকিছু বোঝার দরকারই বা কী? ধ্বনি-ঝংকারটাই আসল।

বছরখানেক পরে আমি একটি গল্পে অনেকটা নতুন বাবা-সদৃশ একটা চরিত্র এবং তার মুখে 'আমি ওই' ধ্বনিটা ব্যবহার করেছিলাম।

কিন্তু আমার তো নতুন বাবার ভক্ত হবার ইচ্ছে হয়নি। একজন বেশ আকর্ষণীয় মানুষ, তাঁর কাছে মাঝে মাঝে গিয়ে গল্প করতে ভালো লাগতে পারে, কিন্তু আর সবকিছু ছেড়েছুড়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করার যুক্তি কী? বটু আর কাজল দুজনেই মেতে উঠেছিল এই বাবাকে নিয়ে। বায়তুল মোকাববমের কাছে বটুদের একটা সোনার গয়নার দোকান ছিল, শুনেছি, বটুর অমনোযোগে সে-ব্যবসা ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আর সে লেখাও বন্ধ করে দিয়েছে একেবারে।

সোনার দোকান নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই, কিন্তু মাহমুদুল হকের মতন একজন শক্তিশালী লেখক যদি সাহিত্যজগৎ থেকে বিদায় নেয়, আমার মতে, সেটা একটা দারুণ ক্ষতি।

বটুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল বেলাল আর রফিক আজাদ। প্রথম দিকে ঢাকা শহরে গিয়ে ওদের তিনজনকে সবসময়ে দেখতাম একসঙ্গে, থ্রি মাস্কেটিয়ার্স, আমি গিয়ে পড়লে চতুর্থজন। আমি ওদের থেকে বয়েসে বড়, তাই সমানভাবে মিশতেও পারি, আবার মাঝে মাঝে প্রয়োজন হলে বকুনিও দিতে পারি। বেলাল আর রফিক আস্তে আস্তে বটুর কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। কাজল আমাকে অনেকবার বলেছে, সুনীলদা, আপনি বটুরে বুঝায়ে বলেন, কেন সে আর ল্যাখে না?

বটুকে আমি এ-বিষয়ে অনেকবার প্রশ্ন করেও সঠিক কোনও উত্তর পাইনি। ও হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, লিখব লিখব। আবার যখন ইচ্ছে হবে। আমার মতন একজন লেখক আর কিছু না লিখলেই বা কী আসে যায়?

একবার সে আমাকে সুদীর্ঘ একটা চিঠি লিখেছিল। তার ভাষা চমৎকার। কিন্তু বক্তব্য আমার বোধগম্য হয়নি। মোটকথা. সে বলতে চেয়েছিল, লিখতে গেলে সে মনের জোর হারিয়ে ফেলছে. তাই সে আত্মানুসন্ধান করছে, সে-ব্যাপারে একমাত্র সাহায্য করতে পারেন তাঁর গুরু।

সব লেখকেরই মাঝে মাঝে এমন একটা সময় আসে, যখন মনে হয়, কিছুই যেন ঠিক হচ্ছে না। রাইটার্স ব্লক। সেটা নিজেকেই আবার কাটিয়ে উঠতে হয়। আত্মনির্ভরতা ছাড়া অন্য কারুর ওপর নির্ভর করাটা তো আরও বেশি দুর্বল হবার লক্ষণ!

বটু আর কাজলের সঙ্গে ঢাকা থেকে ফেরার পথে অনেকদিন পর আবার দেখা হল বলেই এসব মনে পড়ল। ওদের বলেছিলাম, একদিন আমাদের বাড়িতে আসতে, খুব সম্ভবত সময় পায়নি।

জীবনে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়, তাদের মধ্যে অল্প কিছুজনের সঙ্গেই হয় অন্তরঙ্গতা। সে-রকম অন্তরঙ্গ কারুকে জীবিত অবস্থাতেই বিনা কারণে হারাতে হলে বুকের ভেতরটা টনটন করে।

এক বিকেলে একজন অপরিচিত মহিলা ফোন করে বললেন, আপনার বন্ধু ওবায়দুল্লাহ কলকাতায় এসেছেন। আপনার সঙ্গে আজ সন্ধেবেলা দেখা করতে চান।

ওবায়দুল্লাহকে ঢাকায় সবাই বলে সেন্টুভাই। সে যেন বহুরূপী।

বিরাট বিরাট চাকরি করে, কিন্তু কখন কোনটা বদলায়, তা বুঝতে পারি না। কখনও শুনি সে বাংলাদেশের একজন মন্ত্রী, কখনও শুনি আমেরিকায় রাষ্ট্রদূত, কখনও বিশ্ব ব্যাংকের কী যেন। যদিও তার প্রধান পরিচয়, সে একজন কবি। অন্তত শুধু সেই পরিচয়েই সে আমাদের সঙ্গে মেশে। সে অত্যন্ত সুপুরুষ এবং বদমেজাজি।

ইদানীং সে বিশ্ব খাদ্য সংস্থার দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার বড় কর্তা হয়েছে, তার ঘাঁটি ব্যাংকক, প্রায়ই অফিসের কাজে কলকাতা শহরে আসে। তবে আসে ঘূর্ণিঝড়ের মতন, একবেলা-দেড়বেলা থেকেই চলে যায়।

আমি ভদ্রমহিলাকে বললুম, আজ তো আমি দেখা করতে পারছি না। আজ সন্ধেবেলা আমার একটা জরুরি কাজ আছে।

ভদ্রমহিলা বললেন, দেখুন, আপনাকে হঠাৎ এরকমভাবে বলা হয়তো আমার পক্ষে উচিত না, কিন্তু উনি আমাদের বস্, আর জানেনই তো, উনি কী রকম মেজাজি মানুষ। উনি কাল ভোরবেলার ফ্লাইটে ফিরে যাবেন, আমাকে বললেন, আজ সন্ধেবেলা আমার জন্য কোনও কাজ রাখবে না, আজ শুধু সুনীলের সঙ্গে আড্ডা দেব, সুনীলকে আনাবার ব্যবস্থা করো। গাড়ি পাঠাও। উনি উঠেছেন টলি ক্লাবে।

আমি বললাম, আজ সন্ধেবেলা আমাকে একটা পার্টিতে যেতেই হবে, কথা দিয়ে ফেলেছি। ওবায়দুল্লাহকে বলুন, এবার না হয়, পরেরবার দেখা হবে। ও তো আবার শিগগিরই আসবে নিশ্চয়ই!

ভদ্রমহিলা এর পরেও কাকুতি-মিনতি করছিলেন, আমাকে একটু কঠোর হতেই হল।

সন্ধে সাতটার সময় পোশাক বদলে বেরুবার উদ্যোগ করছি, দরজায় বেল। স্বাতী বাথরুমে, উৎপল বাইরে গেছে, এই সময় আমাকেই দরজা খুলতে হয়, ফোনও ধরতে হয়।

ফোনটা কানে নিয়ে দরজা খোলার পর দেখি মূর্তিমান সেন্টু আর তার পাশে এক মহিলা।

চোখ কটমট করে সেন্টু বলল, কী এমন রাজকার্য আছে যে, বন্ধুর সঙ্গে দেখা না করে সেখানে যেতে হবে?

আমি কথা শুনছি টেলিফোনে, তাই হাত তুলে তাকে একটু অপেক্ষা করতে বললাম।

সেন্টু হুকুমের সুরে বলল, কথা শেষ করো! শেষ করো! আমরা কি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব নাকি?

সেন্টু এমন ভাব করে, যেন আমরা সবাই তার অধঃস্তন কর্মচারী। অবশ্য উলটে একটা ধমক দিলে সে চুপসে যায়!

আমি ইঙ্গিতে তাদের ভেতরে এসে বসতে বললাম।

ফোন শেষ করে আমি সেন্টুকে বললাম, কলকাতায় আসবার আগে একটা খবর দাও না কেন? একটা চিঠি...কিংবা ব্যাংককে বুঝি টেলিফোন নেই?

সেন্টু বলল, তোমার মতন শুধু কবিতা লিখে তো আমরা সংসার চালাতে পারি না, আমাদের প্রচুর খাটতে হয়। অনেক জায়গায় ঘুরতে হয়, কখন কোথায় যাই, ঠিক থাকে না।

শুধু কবিতা লিখে সংসার চালানো? হায়রে! গদ্য লিখতে লিখতে হাড়-মাস কালি হয়ে গেল।

খানিকটা অস্বস্তির সঙ্গে বললাম, সেন্টু, আজ যে আমাকে এক জায়গায় যেতেই হবে। বাদ দেবার কোনও উপায় নেই! তুমি কালকের দিনটা থেকে যাও, কাল সারাদিন আমি তোমার সঙ্গে কাটাব!

সেন্টু বলল, কোথায় যেতে হবে, শুনি?

আমি বললাম, শুনলে তুমি নিশ্চয়ই হাসবে। কিন্তু এটা ক্যানসেল করা যাবে না। কমিট করে ফেলেছি। এইমাত্র ফোন করল, ওরা গাড়ি পাঠাচ্ছে। *টেলিগ্রাফ* পত্রিকা আর লাক্স সাবান কম্পানি মিলে একটা মেয়েদের সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে, তাজ বেঙ্গল হোটেলে, আমি তার একজন জাজ! *টেলিগ্রাফের* সম্পাদককে তুমি চেনো? এম জে আকবর, সে তোমারই মতন মেজাজি, আমি যদি আজ না যাই, সে রক্ষে রাখবে না!

সঙ্গের মহিলাটি বলল, ও হ্যাঁ, আজকের কাগজে পড়েছি।

মহিলাটির নাম ইন্দিরা চক্রবর্তী, আগে দু-একবার দেখেছি, অনেকের মধ্যে চোখে পড়বার মতন চেহারা। যেমন বিদুষী, তেমনই আকর্ষণীয় ব্যবহার।

সেন্টু বলল, বিউটি কনটেস্ট? তোমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে কি সুন্দরী মেয়ে আছে নাকি? এপর্যন্ত একজনও তো দেখলাম না। বাংলাদেশের মেয়েদের সঙ্গে তুলনাই চলে না! কী ঠিক বলছি কি না।

তারপরই ইন্দিরার দিকে ফিরে বলল, অফ কোর্স ইউ আর অ্যান একসেপশান!

ইন্দিরা হাসল।

আমি বললাম, বাংলাদেশের মেয়েদের সঙ্গে তুমি যা বললে, তা প্রায় নাইনটি পারসেন্ট সত্যি! ঢাকায় গেলে এক-একজন সুন্দরী মেয়েকে দেখলে মাথা ঘুরে যায়। আবার পশ্চিম বাংলায় অন্তত টেন পারসেন্ট মেয়ে আছে, তারা প্রায় অপ্সরীর মতন। তারা অবশ্য আমাদের মতন সামান্য মানুষদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

ইন্দিরার দিকে ফিরে বললাম, সেই টেন পারসেন্টের মধ্যে তুমি একজন!

ইন্দিরা হেসে বলল, পাশে কেউ বসে থাকলে তার সম্পর্কে এরকম বলতেই হয়।

সেন্টু বলল, সেই টেন পারসেন্টের মধ্যে আর একজন নিশ্চয়ই স্বাতী দেবী! তিনি কোথায়?

স্বাতী তৈরি হচ্ছে। সে অবশ্য ওখানে যেতে চায় না। সে যাবে আর একটা পার্টিতে!

সেন্টু জিজ্ঞেস করল, তোমাকে যেতেই হবে? ওয়েল! সেখানে আমি যেতে পারি না তোমার সঙ্গে? কোনও রেসট্রিকশান আছে?

আমি বললাম, তুমি অবশ্যই যেতে পার! তাহলে তো ভালোই হয়। তোমাকে আর সন্ধেটা একা কাটাতে হবে না!

সেন্টু এবার দাপটের সঙ্গে বলল, একা মানে? তুমি কি ভেবেছ, কলকাতায় তুমি ছাড়া আমার অন্যকোনও বন্ধু নেই? অনেক আছে। ফার মোর ইমপোরট্যান্ট দ্যান ইউ! আমার সময় কাটাবার কোনও প্রবলেম নেই। শুধু তোমার সঙ্গে সন্ধেটা কাটাব বলে আগে ঠিক করেছিলাম—

স্বাতী বেরিয়ে এল তৈরি হয়ে।

সেন্টু ভদ্রতা করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এই যে ম্যাডাম, আপনার বাড়িতে এলে আপনার সঙ্গে দেখাই হয় না। আপনি সুনীলের চেয়েও বেশি জনপ্রিয় আর ব্যস্ত, তাই না! আপনার এই হাজব্যান্ডটিকে আপনি বিউটি কনটেস্টের জাজ হতে দিতে রাজি হলেন? ও কি সৌন্দর্যের কিছু বোঝে?

স্বাতী বলল, ঠিক বলেছেন! বি বি সি-তে একটি মেয়ে খবর পড়ে, ওর মতে সে নাকি খুব সুন্দরী! আমার তো তাকে কাঠ-কাঠ মনে হয়। রং সম্পর্কেও ওর কোনও ধারণা নেই। মেয়েদের পোশাক কিছু বোঝে না। আগে প্রায়ই কোনও ফ্যাশনেব্‌ল মেয়ের শাড়ির রং লিখত হালকা মেরুন! আচ্ছা বলুন তো, হাল্‌কা মেরুন বলে কোনও রং হয়? আমি বকে বকে সেটা বন্ধ করেছি।

আমি বললাম, 'হাল্‌কা মেরুন' শুনতে ভালো নয়?

স্বাতী বলল, শাড়ি কি শোনার জিনিস, না দেখার জিনিস?

সেন্টুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, আপনি কী খাবেন?

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, স্বাতী, এখন আর একদম সময় নেই। সাড়ে সাতটার সময় আরম্ভ। ওবায়দুল্লাহকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি!

সেন্টু জিজ্ঞেস করল, ওখানে খাদ্য-পানীয় কিছু থাকবে তো? নাকি শুধু খেঁদি পেঁচিদের রূপসুধা পান করতে হবে?

আমি বললাম, সেসব অঢেল থাকবে। কোনো চিন্তা নেই।

ইন্দিরা নিজে থেকেই বলল, আমি তবে নিশ্চিন্ত। আমার অন্য কাজ আছে!

গাড়িতে ওঠার পর সেন্টু বলল, তোমার কাছে এমনি এমনি আসিনি। সামনের মাসে একটা বেশ বড় প্রতিনিধিদল আসবে কলকাতায়। একটা সেমিনার হবে। তাতে তোমাকেও থাকতে হবে।

আমি বললাম, সেমিনার? শুনলেই ভয় হয়। সমস্ত সেমিনারই তো শুধু কথার ফুলঝুরি। এই সেমিনারটা কী বিষয়ে?

সেন্টু বলল, স্ট্রিট ফুড। এ-শহরের রাস্তায় অনেকরকম খাবার বিক্রি হয়। ঘুগনি থেকে চাওমিন, কিছুই বাদ যায় না। দুপুরবেলা রাইটার্স বিল্ডিংয়ের কাছে গিয়ে দেখেছি, হাজার হাজার লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে খাচ্ছে। খুবই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নানারকম রোগ হতে পারে। আমরা বিশ্ব খাদ্য সংস্থা থেকে ঠিক করেছি, এগুলো তো বন্ধ করা যাবে না, অনেক লোকের জীবিকাও এর সঙ্গে জড়িত, তাই এগুলো রান্না আর পরিবেশন যতটা সম্ভব স্বাস্থ্যসম্মত করা যায়, তার ওপর জোর দেওয়া। তুমি এসব খাবার কখনও খেয়েছ?

আমি বললাম, খাব না কেন? ফুচকা আর আলু কাবলি আমার খুব প্রিয় খাবার। এখনও মাঝে মাঝে খাই। খালাসিটোলায় মদের দোকানের বাইরে ফুটপাথে সর্ষের তেল দিয়ে হাঁসের ডিমের ওমলেট বানায়। একসময় তা তিনচারটে করেও খেয়েছি, এখনও দেখলে লোভ হয়। কিন্তু খেতে ভয় করে!

সেন্টু বলল, ঢাকাতেও ওসব আছে। কিন্তু ঢাকায় আমার পক্ষে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এসব খাওয়া সম্ভব নয়। এখানে আমায় কেউ চেনে না। দু-এক জায়গায় চেখে দেখলাম, খুবই টেস্টি, যদি হাইজিনিকভাবে সার্ভ করা যায়...গরিব মানুষদের জন্য এরকম সস্তার খাবার তো রাখতেই হবে।

আমি বললাম, এখন আমরা একটা পাঁচতারা হোটেলে যাচ্ছি। ওখানে একটা ওমলেটের দাম দুশো-আড়াইশো টাকা। ফুটপাথে পাঁচ টাকা। এ-ই তো আমাদের দেশ।

কথা ঘুরিয়ে সেন্টু বলল, তুমি সুন্দরী মেয়েদের বিচার করবে কী করে? একজন সুন্দরীর থেকে আর একজনকে কী বেসিসে কম-বেশি সুন্দর বলা যায়? মিস ওয়ার্লড বিউটি কনটেস্টে যে একসঙ্গে দশ-বারোজন প্রায় ল্যাংটো মেয়ের ছবি ছাপা হয়, তখন তো আমার সবাইকেই একইরকম মনে হয়! তুমি এসব কিছু বোঝো?

আমি বললাম, না। মেয়েদের কোমরের মাপ, বুকের মাপ, নিতম্বের মাপ দেখে রূপের তারতম্য বিচার করার ক্ষমতা আমার নেই। এর আগে আমি আর একবার মাত্র এই ধরনের বিউটি কনটেস্টের জাজ হয়েছিলাম। বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে, তাদের কারুকেই আমার নিরাশ করতে ইচ্ছে হয় না। তাই আমি সবাইকেই বেশি বেশি নম্বর দিয়েছিলাম। আরও তো দুজন জাজ থাকে। তাদের নম্বরগুলোও যোগ দিয়ে অ্যাভারেজ করা হয়। তাই শেষ পর্যন্ত আমার কোনও দায়িত্ব থাকে না।

সেন্টু বলল, ক্যাট ওয়াকের সময় সব মেয়েই যেন চলন্ত পুতুল। এক-একটি মেয়েকে এক-এক রকম দেখায় ভিন্ন পরিবেশ। মনে করো জানলার সামনে একা দাঁড়িয়ে আছে, তখন একরকম, আবার বিয়ে বাড়িতে সাজগোজ করে এসেছে, তখন আরেকরকম, এর মধ্যে কোন অবস্থাটা বেশি সুন্দর? তুমি শামীমের বউ আনোয়ারাকে চিনতে? জানো, মেয়েটি হয়তো ফাটাফাটি রকমের সুন্দর না, কিন্তু একদিন আমি ওদের বাড়িতে যাচ্ছি, দেখি দোতলার জানালায় আনোয়ারা দাঁড়িয়ে আছে, একটা ডুরে শাড়ি পর, তার মুখখানা দেখে আমি এমন চমকে উঠেছিলাম! মাই গড! সেই মুখে বেদনা, অভিমান, বঞ্চনা, এই সবকিছু মিশে এমন একটা রং হয়েছে, যেন জীবনে ওরকম রূপ আমি আর কখনও দেখিনি। সেই মুহূর্তে তার মুখের সঙ্গে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরীরও তুলনা চলে না। মেয়েদের হাসিখুশি মুখের চেয়েও গভীর বিষাদমাখা মুখ বেশি মনে থাকে ; তাই না? আই স্টিল রিমেমবার দ্যাট ইভনিং। ইস্, নিজের দোষে মেয়েটা কী সর্বনাশ করল নিজের!

আমি প্রথমে খুবই চমকে উঠেছিলাম। তারপর আস্তে আস্তে বললাম, হ্যাঁ, আমি চিনতাম আনোয়ারাকে। কিন্তু তার সর্বনাশ হবে কেন? সে তো ওখানে ভালোই আছে শুনেছি।

ভালো আছে? কে বলল তোমাকে?

কে যেন বলল? সম্ভবত বটুর বউ কাজল। সে তার বড়বোনকে দু হাজার ডলার পাঠিয়েছে।

সেন্টু রাগের ঝাঁঝাল গলায় বলল, দু হাজার ডলার! দ্যাট্স নট আ জোক। রাবিশ! কারা ওসব রটায় জানো? যারা মেয়ে পাচার করে আরব দেশে। এইসব গুজব রটিয়ে বোঝাতে চায়, ওইসব জায়গায় গিয়ে এইসব মেয়েরা কীরকম স্বর্গসুখে আছে! আনোয়ারার বড়বোন তো রাবেয়া, তাকে আমি চিনি, সে এই গুজব ডিনাই করেছে! আমার দৃঢ় ধারণা, আনোয়ারা নষ্ট হয়ে গেছে। সি ইজ লস্ট ফর এভার!

আমি বললাম, ও কথা বোলো না। আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না যে, আনোয়ারার কোনও ক্ষতি হয়েছে!

সেন্টু বলল, তোমারও বুঝি ওর সম্পর্কে সফ্ট স্পট আছে?

গাড়ি এসে থামল তাজ বেঙ্গল হোটেলের সামনে।

হঠাৎ আমার মনে হল, একটু বাদেই আমাদের সামনে থাকবে দামি বিদেশি পানীয় আর নানারকম সুস্বাদু, মূল্যবান খাবার, যার যত ইচ্ছে। অথচ আসার পথে আমরা আলোচনা করছিলাম, রাস্তার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গরিব মানুষদের সস্তা খাবারের কথা।

আর সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতা মানে তো উচ্চবিত্ত পরিবারের সুখী সুখী, নরম, আদুরে মেয়েদের শরীর ও পোশাকের প্রদর্শনী। হাল্‌কা আমোদ-আহ্লাদ।

তার আগে হঠাৎ সেন্টু মনে করিয়ে দিল অভিমানিনী হঠকারী আনোয়ারার কথা।

কত রকম বৈপরীত্যের সিঁড়ি ভাঙতে হয় আমাদের, সারাজীবন ধরে।

১০



আজকাল সকালে খবরের কাগজ পড়তে গেলে নারী-পাচার চক্র, দেহ-ব্যবসা, নাবালিকা বিক্রি এইসব খবরের দিকে চোখ চলে যায়। এই ধরনের খবরও প্রায়ই থাকে। আগে এসবের দিকে তেমন মনোযোগ দিতাম না।

আজকের কাগজেই মানবাধিকার কমিশনের একটা লম্বা রিপোর্ট বেরিয়েছে। ভয়াবহ ব্যাপার!

পশ্চিম বাংলায় এমনিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা বেশ খারাপ, কিন্তু দেহ-ব্যবসায়ের নাকি একটি প্রধান কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এদিকে কত কল-কারখানা বন্ধ, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার, অনেকে খিদের জ্বালায় আত্মহত্যা করে, তার মধ্যেই দেহ-ব্যবসা বেড়ে চলে।

রিপোর্টে বলেছে, সারা ভারত জুড়ে যত নারী-পাচার চক্র আছে, তাদের একটা বড় অংশই নাকি কলকাতায়। ঠিক যেন বিশ্বাস হতে চায় না। এখানে সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে কত হৈ-চৈ, কত গান-বাজনার আসর, ফিল্ম-আন্দোলন, আবার ক্রিকেট-ফুটবল নিয়ে এত মাতামাতি, আবার নারী-ব্যবসার একটা চোরাস্রোতও বাড়ছে?

রিপোর্টে তো মিথ্যে কথা লিখবে না।

এখানে বলা হয়েছে, মেয়েদের ধরে আনে কিংবা ভুলিয়ে ভালিয়ে আনে বিভিন্ন জেলা থেকে।

কিছু মেয়ে আসে নেপাল থেকে, আর দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি জেলার থেকে। দিনাজপুর, ইসলামপুর, রায়গঞ্জ, ইংলিশ বাজার--এইসব জায়গাতেও পাচারকারীরা খুব সক্রিয়।

আর বাংলাদেশ থেকে এরা আনে সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, রাজশাহী আর হিলির মেয়েদেরই বেশি। অন্য জেলারও আছে। এরা সব আসে সীমান্ত পার হয়ে, স্থলপথে। আর যারা আকাশপথে আসে তাদের হিসাব নেই।

রিপোর্টে একটা ব্যাপার দেখে বেশ খটকা লাগল।

সাধারণত এইসব মেয়েদের দু'ভাগে ভাগ করা হয়। ট্রানজিট আর ডেস্টিনেশান। অর্থাৎ এক ঝাঁক মেয়েকে পশ্চিম বাংলায় প্রথমে এনে তারপর পাঠিয়ে দেওয়া হয় ভারতের অন্যান্য রাজ্যের পতিতালয়ে। কিংবা বিদেশে। তারা ট্রানজিট। আর যাদের কলকাতায় কিংবা পশ্চিম বাংলারই বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে দেওয়া হবে, তারা ডেস্টিনেশান।

বেশ! কিন্তু ট্রানজিটের মেয়েদের ঠিক কলকাতায় না রেখে প্রথমে জমা করে রাখা হয় মেমারিতে। বাইরে থেকে ট্রাকে করে মালপত্র এনে কোনও গুদামে জমা করে রাখার মতন।

কিন্তু মেমারিতে কেন? সেখানকার বিশেষত্ব কী?

বর্ধমান শহরের কাছেই মেমারি একটি অপেক্ষাকৃত ছোট শহর। একবার বইমেলার উদ্বোধন-উপলক্ষে গিয়েছিলাম সেখানে। মোটামুটি সুন্দর, ছিমছাম জায়গা। লোকজনের খুব উৎসাহ। নারী-পাচারকারীরা সেই জায়গাটাই বেছে নিল কোন কারণে?

রশিদ এখন বর্ধমান রেঞ্জের ডি আই জি। চারখানা জেলার দায়িত্ব ওর। হেড কোয়ার্টার চুঁচড়োয়। এর মধ্যে আমরা দলবেঁধে ঘুরে এসেছি ওর চুঁচড়োর কোয়ার্টার থেকে। সে কী বাড়ি! প্রায় তিনশো বছরের, মোটা মোটা দেওয়াল আর থাম। একটা জাল দিয়ে ঢাকা বারান্দায় দুটো ব্যাডমিন্টন কোর্ট হতে পারে। সে-বাড়িতে মোট বারো-চোদ্দখানা ঘর, অথচ রশিদের পরিবারের সদস্য মাত্র চার-পাঁচজন। জোব চার্নক নাকি একসময় থাকতেন ওই বাড়িতে। পাশেই গঙ্গা। সে-বাড়ির মাটির তলা দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ আছে, যা দিয়ে চলে যাওয়া যায় গঙ্গার ঘাটে। সেকালে এরকম পালাবার রাস্তা থাকত।

রশিদকে বললে নিশ্চয়ই একদিন যাওয়া যেতে পারে মেমারি শহরে।

সাধারণত আমরা দেশের রাজনীতি কিংবা আন্তর্জাতিক সংবাদ নিয়ে যত মাথা ঘামাই সে-তুলনায় অপরাধ-জগৎটাকে গুরুত্ব দিই না। দেহব্যবসা কিংবা নারী-পাচারের মতন বিষয় আমরা কোনও সভ্য আলোচনায় সামনে আসতে দিই না। ওসব গোপন জগতের ব্যাপার, গোপন থাকাই ভালো। নারী পাচার-টাচার চলছে নিয়মিত, তা তো আমরা জানিই, কিন্তু ও-বিষয়ে তো আমাদের কিছু করার নেই।

যদি না আমাদের নিজেদের কোনও বোন বা মেয়ে বা অতি পরিচিত কেউ এতে হঠাৎ জড়িয়ে পড়ে। তখনই চোখের সামনে খুলে যায় নরকের দরজা।

আনোয়ারার ব্যাপাবটা কয়েক মাস চাপা পড়ে গিয়েছিল। আবার নতুন করে আমাদের অস্থির করে তুলেছে।

ঢাকায় ওর বড়বোনকে টাকা পাঠাবার খবরটা গুজব বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে। শুধু ওবায়দুল্লার কথার ওপর নির্ভর না করে আমি বেলালকে দিয়েও যাচাই করে

নিয়েছি। স্মাগলাররাই এরকম গুজব রটাচ্ছে।

আনোয়ারার গয়নাগুলোর জন্যই স্বাতী বেশি ব্যতিব্যস্ত।

সে-গয়নার কথা কেউ জানে না। শামীমকে কিছু জানাতে নিষেধ করে গেছে আনোয়ারা। ওদের কোনও ছেলেমেয়েও নেই। আনোয়ারা যদি আর কোনওদিন আর না ফিরে আসে? কারুর কাছে ঋণ থাকলে যেমন সবসময় মনটা খচখচ করে, এও সেই অবস্থা।

এক-এক সময় মনে হয়, বাংলাদেশের অন্তত দু-একজনকে জানিয়ে রাখি। তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিই। কিন্তু আনোয়ারা যে আর কারুকেই জানাতে বারণ করেছে।

বীথি আর গাজী শাহাবুদ্দিন কলকাতায় আসে মাঝে মাঝে। ওরা বোধহয় মেয়েটির কথা ভুলে গেছে, ও-প্রসঙ্গ ওঠেই না। আরও কত নতুন নতুন প্রসঙ্গ এসেছে। এখন সব আলোচনাতেই ঘুরে-ফিরে আসে তসলিমা নাসরিনের কথা। তার লেখা ও তার জীবন।

তসলিমাকে প্রথম যখন দেখি, তখন মনে হয়েছিল খুবই লাজুক ধরনের মেয়েটি, আস্তে আস্তে নরমভাবে কথা বলে। কিন্তু তার কলম খুব ধারালো, গদ্য ঋজু। মেয়েদের ওপর নানান অনাচার ও বঞ্চনার বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখে। সেটাই স্বাভাবিক। সে বেশ কয়েকবছর আগেকার কথা। এখন অবশ্য সে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে খুব বিতর্কিত হয়ে পড়েছে।

মিউজিয়ামের পাশের রাস্তায় একটা হোটেলে গাজীরা প্রত্যেকবার এসে ওঠে। হোটেলটা আগে ছোট ছিল, এখন ধনী বাংলাদেশিদের দাক্ষিণ্যে সেটা ফুলে ফেঁপে উঠেছে, সাজিয়েছেও অন্যভাবে।

ওদের কটেজের সামনের লনে গাজী আর আমি বিয়ার নিয়ে বসেছিলাম একদিন। বীথি স্বাতীকে নিয়ে বেরিয়েছে শপিং করতে। গাজীর সঙ্গে আড্ডাটা বেশ মজার, যদি আর কেউ না থাকে, তা বলে বিশেষ কথাবার্তাই হয় না। গাজী এমনিতেই খুব কম কথা হলে আর অনবরত সিগারেট খায়। সিগারেট আমিও বেশি খাই, সে-জন্য প্রায়ই কাশি হয়, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হাঁপিয়ে যাই, গাজী আমার তুলনায় আরও বেশি চেইন স্মোকার।

একটি সিগারেট শেষ হতে না হতেই আর-একটা ধরাচ্ছে দেখে আমি বলে ফেললাম, তুমি এত বেশি সিগারেট খাও কেন, গাজী? দিনে তোমার ক'প্যাকেট লাগে?

গাজী হেসে বলল, বাঃ, আপনিও তো কম যান না! আপনার সিগারেটগুলো আরও বেশি কড়া!

তা ঠিক! কেন যে খাই! সবাই জানে, এতে কত ক্ষতি হয়। ছেড়ে দেওয়াই উচিত।

ছাড়েন না! আপনি ছাড়লেই আমিও ছাড়ব!

তুমি পারবে?

দেখেন না পারি কি না। প্রতিজ্ঞা করে ছাড়তে হবে।

দু'জনের হাতেই জ্বলন্ত সিগারেট।

আমি বললাম, এসো, দু'জনে একসঙ্গে প্রতিজ্ঞা করি, আজ থেকে আর কিছুতেই সিগারেট খাব না!

গাজী বলল, এই আমার সিগারেটটা ফেলে দিলাম। আর এক টানও দেব না!

প্রায় ভর্তি দামি সিগারেটের প্যাকেটটাও সে ফেলে দিল টেবিলের নিচে। আমার প্যাকেটটাও গেল সেখানে।

সেই মুহূর্তে যেন শরীরটা ঝরঝরে হয়ে গেল।

একটু পরে অন্য একটা টেবিল থেকে একটি যুবক উঠে এসে বলল, সুনীলদা, যদি কিছু মনে না করেন, আপনার কাছ থেকে একটা সিগারেট ধার নিতে পারি?

আমি আমার প্যাকেটটা তুলে বললাম, এই নাও। পুরো প্যাকেটটাই নিয়ে যাও!

গাজীও তার প্যাকেটটা তুলে বলল, এটাও আপনি নিতে পারেন।

ছেলেটি হকচকিয়ে গেল।

একটু আগেই যে আমরা দু'জনে একটা দারুণ বীরত্বের কাজ করে ফেলেছি, তা ও বুঝবে কী করে!

আমি তখনই ঠিক করে ফেললাম, শক্তি আর রশিদকেও ছাড়াতে হবে। যে-সব ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়, তারা পাশে বসে সিগারেট টানলে সংযম রক্ষা করা শক্ত।

এটা মাস ছয়েক আগেকার কথা।

শক্তি আর রশিদ আমার অনুরোধে পাত্তাই দেয়নি। হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। আমিও টেনে টুনে প্রায় মাস দেড়েক প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পেরেছিলাম। দম-টমের বেশ উন্নতি হচ্ছিল, কাশিও কমে গিয়েছিল, কিন্তু লেখার টেবিলে বসলেই ছটফট করতাম। বহুদিনের অভ্যেস, গাঁজায় দম দেবার মতন হাতে সিগারেট না থাকলে মাথা থেকে কলমের ডগায় কোনও ভাষা আসে না।

প্রথম প্রথম মাত্র দুটি সিগারেট কিনে আনিয়ে লেখার সময় আবার খাওয়া শুরু হল। লুকিয়ে-চুরিয়ে বাড়িতে খাই, বাইরে বেরিয়ে খাই না। তারপর আস্তে আস্তে লজ্জা-টজ্জা চলে গেল, হয়ে গেলাম পুনর্মূষিক! পকেটে প্যাকেট।

শক্তি ঠাট্টা করে বলল, সিগারেট ছাড়া তো খুব সোজা। রোজ রাত্তিরে ছেড়ে দেবে।

আমি ভেবেছিলাম, গাজীও নিশ্চয়ই প্রতিজ্ঞা রাখতে পারবে না। ড্রিংক-ফ্রিংকের চেয়েও সিগারেটেই ওর বেশি নেশা।

আশ্চর্য ব্যাপার, এবারে দেখা হতেই গাজী বলল, আপনি খাচ্ছেন, সুনীলদা, আমি কিন্তু আর ছুঁইনি।

বীথিও সাক্ষী দিল, সত্যি কথা। সেই যে আপনার কথায় ছেড়েছে, তারপর থেকে আর একটাও ধরেনি।

লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হবার মতন অবস্থা; গাজীর কাছে আমি হেরে গেলাম! গাজীর রোগা পাতলা চেহারা, আমার তুলনায় ওর ব্যক্তিত্বও যে খুব বেশি তা বলা যায় না, তবু ও এত মনের জোর পেল কোথা থেকে?

গাজী বলল, আমার পাশে বসে অন্যরা খেলেও এখন আমার কোনও অসুবিধা হয় না। আর জানেন, যখন খেতাম, দিনে দুই-তিন প্যাকেট, তখন কোনওদিন হিসাব করিনি, এখন হিসাব করে দেখি, উরে বাবা, কত টাকা বেঁচে যায়! অনেক লোকের একমাসের বেতন হয়ে যায়।

মুখরক্ষা করার জন্যে আমি বললাম, কোনও ব্যাপারে মানুষ হেরে গিয়েও আনন্দ পায়। যেমন তোমার কাছে হেরেছি বটে, কিন্তু তোমাকে যে ছাড়াতে পেরেছি, তাতেই আমার গর্ব হচ্ছে।

এবারে গাজীরা এসেছে ওদের মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে। কত ছোট দেখেছি মেয়েটিকে, এখন সে বিবাহযোগ্যা! তখন ঢাকায় যেতেই হবে।

রশিদের কথা মনে মনে ভাবছি, সন্ধেবেলা রশিদ নিজেই ফোন করল, ও চুঁচড়ো থেকে কলকাতায় এসেছে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মিটিং করতে, আজ রাত্তিরটা থেকে চলে যাবে কাল ভোরে। সুতরাং আজকের রাত বৃথা যায় কেন?

রশিদের গোলপার্কের ফ্ল্যাটটা খালি পড়ে আছে। এখন বিশিষ্ট সিনেমা পরিচালক গৌতম ঘোষ তার প্রতিবেশী। সুতরাং আড্ডাটা সেখানেই জমবে।

শক্তি আগে থেকেই সেখানে হাজির। রশিদ কলকাতায় এলে শক্তি ঠিক কীভাবে যেন খবর পায়, হয়তো বাতাসে গন্ধ পায়।

রশিদের নিজস্ব সিনেমা তোলার শখ অনেকটা ঘুচে গেছে। ও বুঝেছে, এখনই চাকরি ছেড়ে অনিশ্চিত ফিল্ম লাইনে ঢুকে পড়া খুবই ঝুঁকির ব্যাপার হবে। তবে, আমার গল্পের চিত্রনাট্যটা ও অন্য কারুকেও দিতে চায় না। নাসিরউদ্দিন শাহ অনেক করে নিতে চেয়েছিল, গোভিন্দ নেহালনিকে দেবে বলে, রশিদ রাজি হয়নি।

তার বদলে রশিদ গৌতম ঘোষের ছবির জন্যে কিছু কাজ করছে। এই মুহূর্তে গৌতম বিশ্ববিখ্যাত সানাইবাদক বিসমিল্লাহর ওপর একটা দীর্ঘ ডকুমেন্টারি বানাচ্ছে, ইংরিজি ও উর্দু মিলিয়ে, তাতে রশিদের ভূমিকা অনেকখানি।

আড্ডায় আরও দু'চারজনের মধ্যে রয়েছে একটি যুবতী, তার নাম প্রীতি সিং। সে বাংলা বলছে স্বাভাবিক ঝরনার মতন।

আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার পর প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এমন

বাংলা শিখলে কী করে?

সে বলল, শিখিনি তো। জন্মের পর থেকেই বাংলা বলি। বাবা পাঞ্জাবি, মা বাঙালি। কলকাতায় চোদ্দোবছর বয়েস পর্যন্ত মডার্ন স্কুলে পড়েছি। বাংলা জানব না?

মেয়েটি সিনেমা-সাংবাদিক। প্রধানত মুম্বাইয়েই থাকে, বহু জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। এখানে এসেছে গৌতম ঘোষের ইন্টারভিউ নিতে। এর মধ্যেই রশিদের সঙ্গে তার ভাব জমে গেছে বেশি।

—তুমি উঠেছ কোথায়?

—নিউ কেনিলওয়ার্থ হোটেলে। আপনার ইন্টারভিউ চাই। সত্যজিৎ রায় আপনার দুটি গল্পের ফিল্ম করেছেন।

—সত্যজিৎ রায় আমার গল্পের ফিল্‌ম করেছেন, সে তো অনেক বছর আগের কথা। তা নিয়ে এখন আর নতুন কথা বলার কী আছে! তুমি বরং এদের দু'জনের নাও।

এইরকম মেয়ে কিছু কিছু দেখি মুম্বাইয়ে, দিল্লিতে। সম্পূর্ণ স্বাধীন। একা কোথাও গিয়ে হোটেলে থাকে। সকলের সঙ্গে মেশে, নিরিবিলিতে দুর্দান্ত স্বভাবের পুরুষদের ইন্টারভিউ নেয়।

আমাদের সঙ্গে সে বসে আছে, হাতে হুইস্কির গেলাস, এবং সিগারেট, যোগ দিচ্ছে সব কথায়। যেন পুরোপুরি একজন পুরুষ সঙ্গীরই মতন, অথচ সে রীতিমতন স্বাস্থ্যবতী এবং আকর্ষণীয় চেহারার তরুণী।

আমাদের বাঙালি মেয়েরা এমন সহজ সাবলীল হতে পারে না কেন? একটা পুরোনো নীতিবোধ এবং যৌনভয় তাদের মধ্যে বোধহয় কাজ করে। সতীত্ব কথাটা কেউ আর এখন উচ্চারণ করে না, কিন্তু কিছু একটা হারানোর ভয় অনেক মেয়ের মধ্যে থেকেই যায়।

এই যে মেয়েটিকে রশিদ দু'তিনবার বলল, আর-একটু বোসো, আর-একটু বোসো, তোমাকে আমি হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দেব, তাতে ওব কোনও আপত্তি নেই।

আড্ডার এক ফাঁকে আমি রশিদকে বললাম, তোমার সঙ্গে শিগগির আমি একবার মেমারি যাব।

রশিদ ভুরু কুঁচকে বলল, মেমারি? সেখানে কী আছে? কোনও মিটিং?

—না, এমনিই জায়গাটা দেখতে যাব ভালো করে।

শক্তিও অবাক হয়ে তাকাল। মেমারিতে বিখ্যাত দ্রষ্টব্য তো কিছু নেই। তবু আমাকে যেতে হবে শুনে সেও বলল, তাহলে আমিও যাব।

ঠিক হল, যাওয়া হবে পরের উইকএন্ডে।

বাড়ি ফিরলাম রাত প্রায় বারোটায়।

স্বাতী শান্তিনিকেতনে, বাড়ি ফাঁকা থাকার কথা, দরজা খোলার পর দেখি ভেতরে বসে আছে কামাল।

এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সে তো এরকমই যখন-তখন আসে, পৃথিবীর যে-কেনো প্রান্ত থেকে। কামালের মতন এমন আন্তর্জাতিক মানুষ আমি আর দ্বিতীয় দেখিনি।

আমাদের বাড়িতে স্বাতী আর আমি দু'জনেই না থাকলেও তার জন্য অবারিত দ্বার। ধনঞ্জয়, উৎপলও তাকে অতি আপনজন মনে করে।

এখন আসছে মালয়েশিয়া থেকে।

একটুক্ষণ কথা হবার পর বললাম, কামাল, এখন শুতে যাবে তো?

কামাল বলল, হ্যাঁ, তার আগে টেলিফোন করতে পারি?

কামাল টেলিফোন করবে, তার জন্যে কি অনুমতি লাগে নাকি?

কামালকে সবাই বলে টেলিফোন-বাবু। কাছাকাছি কোনও টেলিফোন দেখলেই তার হাত নিশপিশ করে। কাজে-অকাজে, চেনা-অচেনা মানুষদের সে অনবরত ফোন করে। কখনও চোদ্দো হাজার মাইল দূরেও। নিজের বাড়ি থেকে যেমন সে টেলিফোনের জন্য প্রচুর খরচ করে, তেমনি অন্যদের বাড়ির ফোন ব্যবহার করতেও সে দ্বিধা করে না।

এতক্ষণ কি সে চুপ করে বসেছিল?

তবে একটা ব্যাপার ইদানীং লক্ষ করেছি, লোকাল ফোন সে যত খুশি করে, কিন্তু বিদেশের জন্য অনুমতি নেয়।

কামালকে বললাম, এত রাতে কাকে ফোন করবে? যাই হোক করো, আমি জামা-কাপড় ছেড়ে নিচ্ছি।

কামাল বলল, একটু দাঁড়াও।

নম্বর ঘুরিয়ে কার সঙ্গে যেন দু'একটা কথা বলার পর মাউথপিসটা চেপে ধরে কামাল বলল, তুমি একটু কথা বলবে?

—কে?

—মিস্টার অনুপ দত্ত।

—সে আবার কে? চিনি না। তার সঙ্গে আমি কথা বলব কেন?

—সৌদি আরবে ইন্ডিয়ান দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি। বাঙালি, নিশ্চয়ই তোমাকে চিনবে!

—আরে কী মুশকিল! হঠাৎ এভাবে এত রাতে কোনও অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলা যায়? এটা আমার স্বভাব নয়।

—বলো না। আনোয়ারার খোঁজ নিতে পারে।

—ইন্ডিয়ান এমব্যাসির লোক কেন খোঁজ নেবে?

যাই হোক, লোকটির সঙ্গে কথা বলতেই হল। সে নাকি আবার কবি! বাঙালি কবি পৃথিবীর কোথায় নেই!

সে বলল, তার পাশেই বাংলাদেশ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারিও বসে আছে, সেও কবি। এবং আমার অনেক লেখা পড়েছে।

তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বুঝলাম, ওদেশে নিষিদ্ধ হলেও দু'জনেই লুকিয়ে কিছুটা মদ্যপান করেছে, বেশ ফুরফুরে মেজাজে আছে।

দ্বিতীয়জনের নাম আনোয়ারুল ইসলাম। তাকে আমি সংক্ষেপে আনোয়ারার বৃত্তান্তটা জানিয়ে বললাম, যদি তার কোনও খোঁজ-খবর বের করতে পারেন, খুব উপকার হয়।

সে জী, নিশ্চয়, সার্টেনলি বললেও কণ্ঠস্বরে তেমন গুরুত্ব নেই। বরং বারবার সে বলতে লাগল, আপনি এখানে চলে আসেন না, আমরা এখানে কবিতা পাঠের আসর করব।

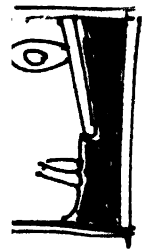
—ওখানে কবিতা পাঠের আসর? কে শুনবে?

—আছে। অনেক বাঙালি আছে। আপনি চলে আসেন, আমরা সব ব্যবস্থা করে দিব, আপনার থাকার কোনও অসুবিধা হবে না। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।

বুঝললাম, এসব কথার কথা। কাল সকালে ভুলে যাবে।

বললাম, ঠিক আছে। আপনারা একটা চিঠি পাঠান। তারপর চিন্তা করে দেখব। ওই মেয়েটির কথা ভুলে যাবেন না।

সৌদি আরবে গিয়ে কবিতা পাঠ করার আগ্রহ আমার নেই। বরং মেমারিতে গিয়ে দেখে আসতে হবে ব্যাপারটা।



১১

রশিদ সাধারণত সকাল নটা-সাড়ে নটার আগে ঘুম থেকে ওঠে না। এখানে তার অফিস যাবারও বালাই নেই। তার বাড়িটাই অফিস। বেশ কিছু লোক খুব সকাল থেকে বসে থাকে বাড়ির সামনে। যারা তার স্বভাব জানে, তারা বেলা করে আসে। সাহেবের ঘুম ভাঙলেও তারপর বিছানায় শুয়েই চা পান করবেন আধঘণ্টা ধরে।

পুলিশের চাকরিতে অবশ্য নিজের শরীরটাকেও নানান অবস্থার জন্য উপযোগী করে নিতে হয়। এমন নিদ্রাবিলাসী রশিদকেও আমি কখনও দেখেছি ভোর চারটেয় উঠে চটপট তৈরি হয়ে নিতে। গোপীবল্লভপুরে নক্‌শাল দমন-অভিযানে সে পরপর দু'রাত্রি ঘুমোয়নি।

প্রয়োজনে এরা সবই পারে।

শক্তি আর আমি পৌঁছেছি আগের রাত্রে। পূর্ণিমার রাত, চুঁচড়োর এই বাড়ির একেবারে পাশেই গঙ্গা। এখানে নদী বেশ চওড়া। চাঁদের আলোয় এই নদীকে মনে হয়েছিল স্বর্গের রাজপথ।

অনেক রাত পর্যন্ত চলছিল আড্ডা ও গান-বাজনা। নিজের কণ্ঠস্বর একেবারে বেসুরো, তবু গান সম্পর্কে এক তীব্র নেশা আছে রশিদের। চন্দননগর থেকে রশিদ ডেকে এনেছিল এক দম্পতিকে, সুজয় আর মধুছন্দা, এদের মধ্যে মধুছন্দা, ক্লাসিকাল গানের তালিম নিচ্ছে এ টি কাননের কাছে। মেয়েটির কণ্ঠস্বর বেশ সুখশ্রাব্য!

গায়িকার স্বামীদের একটা দুর্বলতা আমি আগেও লক্ষ করেছি। স্ত্রীর গান শুনে যখন অন্যরা বাহবা দেয়, তখন, একসময় স্বামীটি ভাবে যে, তাকে কেউ পাত্তা দিচ্ছে না। কিন্তু সে-ই বা কম কীসে? সেও তখন গান জুড়ে দেয়!

ক্লাসিকাল নয়, সুজয় জানে লালন ফকিরের কয়েকটা গান। গলা তেমন তৈরি নয়। রশিদ বাংলা গান পছন্দ করে না। সুজয় গান গেয়ে উঠতেই রশিদ হাত তুলে বলেছিল, এখন নয়, তুমি পরে গাইবে। মধুচ্ছন্দা পুরিয়া ধানেশ্রী গাইছে, সেই সুরটা নষ্ট করে দিও না।

কয়েক পাত্র হুইস্কি পেটে পড়ায় সুজয় অদম্য হয়ে ওঠে। সে আবার লালনের

গান ধরবেই, রশিদ হঠাৎ রেগে উঠে বলেছিল, মারবো এক ঝাঁপড়! তোর গান কে শুনতে চেয়েছে রে? তোর বউকে ডেকেছি বলেই তুই পিছুপিছু এসেছিস কেন? বউকে একা ছাড়তে ভয় পাস? এরকম পুতুপুতু করে আগলে রাখলে তোর বউ কোনওদিন নাম করতে পারবে না!

শক্তি তখন প্রতিবাদ করে উঠেছিল।

শক্তি আবার উচ্চাঙ্গসংগীতের তেমন সমঝদার নয়। রাগ-রাগিণী চেনে না। কিছুক্ষণ ধৈর্য করে শোনে বটে, তারপরই নিজে কিছু গেয়ে ওঠার জন্য ওর ঠোঁট শুলশুলিয়ে ওঠে।

সে বলল, অ্যাই রশিদ! মধুছন্দা তো অনেকক্ষণই গেয়েছে, এখন সুজয় একটু গাইতে চাইছে, তুই থামাচ্ছিস কেন? একটু গাইতে দে না!

রশিদ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, ওগুলো আবার গান নাকি? খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়! এ তো আবৃত্তি, এতে সুর কোথায়?

শক্তি বলল, আর তোদের ওই ক্লাসিকাল গানে পোয়েট্রির কোনও স্থানই নেই। অতি অর্ডিনারি এক লাইন দু'লাইন, তারপর একই সুর, রিপিট কথা, বেশিক্ষণ শোনা যায় না।

সুজয় বলল, লালনের গানে সুর নেই কে বলল?

ওদের তিনজনের মধ্যে তর্ক লেগে গেল। গান বন্ধ।

আমি নিরপেক্ষ।

ছোট বয়েস থেকে শুনছি বলে উচ্চাঙ্গসংগীত যেমন ভালো লাগে, তেমনই খুব পছন্দ পল্লীগীতি। আমি নিজে কখনও কখনও দু'চারখানা গান লিখব ভেবেছি, তা কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত কিংবা আধুনিক গানের ধাঁচে নয়, সরল পল্লীগীতির মতন (লেখা হয়নি অবশ্য)।

হারমোনিয়ামের ওপর হাত রেখে চুপ করে বসে আছে মধুছন্দা, ভুরু দুটো কুঁচকে গেছে। মাঝপথে গান থেমে যাওয়া যেন প্রেমের কথার মাঝখানে হঠাৎ রাজনীতির দলাদলির প্রসঙ্গ তোলার মতন রসভঙ্গের ব্যাপার।

মেয়েটি বেশ সুশ্রী। মুখখানা বতিচেল্লির আঁকা মেয়েদের মতন ডিম্বাকারের। মাঝখানে সিঁথি-কাটা চুল আর ঘটি-হাতা ব্লাউজ পরা। গানের গলা বেশ ভালোই। ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, আজ প্রথমেই রশিদকে অনুযোগের সুরে বলেছিল, ওকে ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্সে গত বছর সুযোগ দেওয়া হবে বলেও বাদ দেওয়া হয়েছে শেষ মুহূর্তে।

ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্সের কর্মকর্তাদের সঙ্গে রশিদের পরিচয় আছে। তাছাড়া পুলিশের বড়কর্তাদের অনুরোধ ওরা অগ্রাহ্য করতে পারে না। সুতরাং রশিদ ইচ্ছে করলেই মেয়েটিকে সুযোগ করে দিতে পারে। এটাই মধুছন্দার আশা, তাই

রশিদের সঙ্গে কথা বলার সময় ওর গলায় ফুটে ওঠে আধো-আধো ন্যাকামির সুর।

ডোভার লেন কনফারেন্সে প্রতিবছর রবিশঙ্কর-আলি আকবর খান এসে বাজান, রসুলন বাঈ, কিশোরী আমোনকর গান করেন, সেখানে কি এই মেয়েটি গান গাইবার যোগ্য? দু'চারজন লোকাল আর্টিস্টকে সন্ধের দিকে আসর জমে ওঠার আগে সুযোগ দেওয়া হয়। তাতে চান্স পেতে পারে, কিন্তু সে-সুযোগ পেলেও বেশিদূর যাবার সম্ভাবনা ওর নেই। ওকে লোকাল আর্টিস্ট হয়েই থাকতে হবে সারাজীবন।

ইদানীং দেখেছি, গায়িকাদের শুধু ভালো গান জানলেই চলে না, চেহারাটাও সুন্দর হওয়া চাই।

গানের জগতে একমাত্র লতা মুঙ্গেশকরই এক দারুণ ব্যতিক্রম। ভদ্রমহিলার রূপ নেই, মুখে-চোখেও লাবণ্য নেই, গত পঞ্চাশ বছর ধরে গানের জগতের রানি। বিশ্বরেকর্ড, এ পর্যন্ত কেউ এত বেশি সংখ্যক গান রেকর্ড করেনি। দশ হাজারেরও বেশি, ওঁর ধারে-কাছে আর কেউ নেই।

লতা মুঙ্গেশকর সত্যিই অদ্বিতীয়া, একমাত্র উনিই বলতে পারেন, রূপে তোমায় ভুলাব না, ভালোবাসায় ভুলাব। আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো, গান দিয়ে দ্বার খোলাব!

অন্যসব গায়িকাদেরই তেমন রূপ থাক বা না-থাক, সাজগোজ করে সুন্দরী সাজতে হয়। বিদেশিনী গায়িকাদের আবার নাচ না জানলে চলে না। কোমর যদি সরু না হয়, তাহলে সে-গায়িকাকে বিদায় নিতে হয় গানের জগৎ থেকে।

মধুছন্দা অবশ্য রূপের পরীক্ষায় ভালোভাবেই পাশ করে যাবে। কিন্তু ও সুজয়ের মতন একটা আস্ত গাড়লকে বিয়ে করতে গেল কেন? শুধু তাই-ই নয়, এরই মধ্যে দুটি ছেলেমেয়ে। অর্থাৎ হোপলেস কেস। স্বামী-ছেলেমেয়ে নিয়ে ভালোভাবে সংসার করবে, আর গান-বাজনার সাধনাও চালাবে, এ সম্ভব নয়। শিল্পের জগতে টিকে থাকা অত সহজ নয়। অন্য অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়।

সুজয় এখন রীতিমতন গাঁক-গাঁক করে চ্যাঁচাচ্ছে।

দু'পেগ হুইস্কিই মাথায় চড়ে গেছে ওর। রশিদ নিজে সহসা মাতাল হয় না, মাতালদের একেবারে পছন্দ করে না, একমাত্র শক্তিকেই প্রশ্রয় দেয়। শক্তির মাতলামি অনেকটা ছেলেমানুষি খেলার মতন।

শক্তি প্রথমে সুজয়ের পক্ষ নিয়ে তর্ক করছিল রশিদের সঙ্গে, এখন সুজয়ের বেসুরো চিৎকারে সে বেশ বিরক্ত। দু'জনের মধ্যে সন্ধি করাবার জন্য সে নিজে একটা গান গেয়ে উঠল। 'আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা...।' শক্তি কোন গানটা গাইছে শুনলেই বোঝা যায়, সে কটা পেগ খেয়েছে। এই গান মানে চার পেগ। 'বঁধু তোমায় করব রাজা' পাঁচ পেগ।

শক্তির গানের মাঝখানেও কথা বলতে লাগল সুজয়।

এবার শক্তির মেজাজ টং। সে সুজয়ের পিঠে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, এই শালা, চুপ করবি কি-না!

সুজয় শক্তির দিকে রক্তাক্ত চোখে তাকিয়ে বলল, তুমি আমার গায়ে হাত দিলে কেন?

মধুছন্দা তার স্বামীকে সামলাবার জন্য বলল, এই চুপ করো না, প্লিজ! উনি গান গাইছেন।

সুজয় বলল, ও আমার গায়ে হাত দিল কেন?

রশিদ বলল, এই এসব দিল্লাগি থামাও তো। আর গান কারুর গাইবার দরকার নেই। আমি আমির খাঁ সাহেবের রেকর্ড লাগব। সবাই চুপ করে থাকবে।

সুজয় বলল, কে দিল্লাগি করছে ; শালা, কালচার মারাচ্ছ? আমির খানের বোরিং গান এখন শুনতে হবে? গানের কী বোঝো তুমি?

রশিদ খুব ভদ্র। এ-সময় সে যদি বলত ছেলেটিকে যে, তুমি এবার বাড়ি যাও, তাহলে দোষের কিছু হতো না।

সুজয়ের হাতে এখন হুইস্কির বোতলটা, সে কাঁচা চুমুক দিচ্ছে।

রশিদ শুধু শান্তভাবে বলল, বোতলটা নামিয়ে রাখো।

মধুছন্দা বলল, দেখেছেন তো! সব জায়গায় গিয়ে ও এরকম মাতলামি করে। এরপর আর আমাকে কেউ ডাকবে? ও-ই আমার কেরিয়ার নষ্ট করে দেবে।

সুজয় একটা হুংকার দিয়ে বলল, কী আমি তোমার কেরিয়ার নষ্ট করে দিচ্ছি? আমি তোমায় সব জায়গায় নিয়ে যাই, যত শালা লম্পট, ধান্দাবাজ, ছুতো করে তোমার গায়ে হাত দেয়, আমি সামলাই বলে...।

এরপর ব্যাপারটা খুব বিচ্ছিরি দিকে গড়াল। শুরু হল স্বামী-স্ত্রীর প্রবল ঝগড়া। সুজয়ের মুখের ভাষাই শুধু ক্রমশ খারাপ হতে লাগল না, সে ফট করে এক চড় কষিয়ে দিল স্ত্রীর গালে।

শক্তি তাকে জোর করে সরিয়ে দিতে গেলে সে শক্তিকেও মারল এক লাথি। তারপর এক ধুন্ধুমার কাণ্ড।

আমি সেখান থেকে উঠে গিয়ে ওদিককার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম গঙ্গার জলে জ্যোৎস্নার খেলা।

একসময় সুজয় দুপদুপিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চেঁচিয়ে তার স্ত্রীকে বলল, তুই থাক এখানে। এই লম্পটগুলোর সঙ্গে ফুর্তি কর, যা খুশি কর। আমি আর কোনওদিন তোর মুখ দেখতে চাই না।

সত্যিই সে চলে গেল তার গাড়ি নিয়ে।

রশিদ মধুছন্দাকে বলল, একটু চুপ করে বসে থাকো, তারপর আমার গাড়ি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয় আসবে!

মধুছন্দা আড়ষ্টভাবে বলল, না, আমি বাড়ি যাব না। আজ ফিরে গেলেই ও আমাকে মারবে। বেল্ট দিয়ে পেটাবে!

শক্তি বলল, তোমাকে মারে? আগে মেরেছে?

মধুছন্দা বলল, অনেকবার। দেখুন না, পিঠে দাগ আছে।

আঁচল ফেলে দিয়ে সে পিঠের দিকের ব্লাউজটা তোলার চেষ্টা করতেই রশিদ বলল, থাক, থাক।

শক্তি বলল, রশিদ, ও ব্যাটাকে এক্ষুনি অ্যারেস্ট করাও। তারপর জমাদারদের দিয়ে ওকে আচ্ছা করে পেটাও।

রশিদ বলল, স্বামীটাকে থানায় এনে মার খাওয়ালেই কি তার বউয়ের সঙ্গে ভাব হয়ে যাবে? আমাদের অভিজ্ঞতা অন্যরকম। এই যে আজকে ওদের দু'জনের ঝগড়া হল, এটা কি শুধু হঠাৎ আজকের ব্যাপার? এর গভীরে অনেক কিছু আছে।

আমি কাছে এসে মধুছন্দাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার স্বামী তোমাকে মারে, তুমি একজন শিক্ষিত মেয়ে. একজন শিল্পী. তুমি প্রতিবাদ করতে পারো না?

মধুছন্দা মুখ নিচু করে বলল, কী করে প্রতিবাদ করব? আমি কি গায়ের জোরে পারব ওর সঙ্গে? আর মদ খেলে ওর গায়ে যেন অসুরের শক্তি হয়।

অন্য কোথাও চলে যেতে পারো না?

কোথায় যাব?

আপাতত বাপের বাড়ি। তারপর অন্য একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারো।

বাপের বাড়ি? হুঁঃ! মা-কে তো প্রায় মনেই পড়ে না। বাবাও চলে গেছেন তিন বছর আগে। এক দাদা, সে-ই ও-বাড়িতে থাকে।

সেই দাদা তোমাকে...

দাদাকে দেখলেই আমার ভয় করে। কেন জানেন? নিজের মুখে বলতে আমার লজ্জা নেই। আমার যখন চোদ্দো বছর বয়েস, আমার দাদা, আমার আপন দাদা, মায়ের পেটের ভাই, এক রাত্তিরে আমাকে রেপ করার চেষ্টা করেছিল। আমি ওর হাত কামড়ে দিয়ে কোনওরকমে পালিয়ে যাই। ওর হাতে এখনও সেই দাগ আছে। আপনারা বিশ্বাস করছেন না, তাই না?

রশিদ বলল, ইনসেস্ট এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। অনেক ফ্যামিলিতেই...মেয়েরা মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না!

মধুছন্দা বলল, সেই থেকে আমি একা কখনও দাদার সামনে যাই না। বাবা চলে যাবার পর ও-বাড়িতে আমি আর একবারও যাইনি!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার দাদা কী করেন?

একটা বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে কাজ করে। কমার্শিয়াল আর্টিস্ট।

কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। হয়তো অন্যদিক দিয়ে স্বাভাবিক লোক। একবার তোমার

ওপর জোর করেছিল, এখন তার জন্য অনুতাপও করতে পারে।

ওর চোখ দেখলে আপনি বুঝতেন। আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়। ওর ধারণা, আমি বাবাকে বলে দিয়েছি। বলিনি কিন্তু, সত্যি বলিনি। এই আপনাদের কাছেই প্রথম। দাদা আমাকে একা পেলে খুনও করে ফেলতে পারে।

আমি রশিদের দিকে তাকালাম।

রশিদ আস্তে আস্তে বলল, কোয়ায়েট লাইক্‌লি। এনিথিং ক্যান হ্যাপেন। এক একটা মানুষ সমাজে স্বাভাবিক জীবনযাপন করে। কিন্তু সেক্‌শুয়াল পারভারশানের জন্য হঠাৎ সাংঘাতিক কিছু করে ফেলতে পারে। এইসব কেসে কী হয় জানো? ওর দাদাটা যদি মধুছন্দাকে একবার রেপ করে ফেলত, তারপর ওর অনুতাপ হতে পারত, হয়ত আত্মহত্যাও করত। কিন্তু কিছু করতে পারেনি তো, তাই ফিক্‌সেশান হয়ে গেছে, এই বোনকে ও আবার রেপ করার চেষ্টা করবে, অথবা খুন করে ফেলাও আশ্চর্য কিছু নয়।

—অর্থাৎ, স্বামীর অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্য এই গায়িকাটির কোথাও যাবার জায়গা নেই। বিয়ে করতে গেলে কেন?

—কপাল! আমি আজ রাত্তিরটা এখানেই থাকব। তারপর কাল সকালে চলে যাব দক্ষিণেশ্বরে। ওখানে আমার এক মাসতুতো বোন থাকে।

শক্তি অস্থিরভাবে বলল, না, না, এখানে থাকবে কী! আজ রাত্তিরেই তোমাকে অন্য কোথাও যেতে হবে। এখানে আমরা আছি। কাল সকালে তোমার বরটা এসে যদি আমাদের নামে যা-তা কিছু বলে।

রশিদ বলল, দ্যাট ইজ নো প্রবলেম। এখানে আমার বউ আছে, দুটো মেয়ে আছে। ও তাদের সঙ্গে থাকবে। আমার বউ হচ্ছে, জুলিয়াস সিজারের বউয়ের মতন সব অভিযোগের ঊর্ধ্বে!

এ-বাড়িটা এতই বড় যে এক প্রান্তে কিছু ঘটলে, অন্য প্রান্তে তা টেরও পাওয়া যায় না। নাসিম কখনও আমাদের মদের আসরে যোগ দেয় না। সে তার মেয়েদের নিয়ে অন্য মহলে টিভিতে সিনেমা দেখছে।

রশিদ মধুছন্দাকে পৌঁছে দিয়ে এল নাসিমের কাছে। এরপর পান-আহার নিয়ে আমরা আরও দেড়ঘণ্টা জেগে ছিলাম। কিন্তু আড্ডা আর তেমন জমল না।

শক্তির গলা জড়িয়ে আসতেই আসর ভেঙে গেল।

আমি আরও কিছুক্ষণ একা বসে রইলাম বারান্দায়। মনটা প্রকৃতির দিকে ফেরাবার চেষ্টা করতেও বারবার মনে পড়তে লাগল মধুছন্দার কথা।

আজ খানিক আগে যা ঘটল, তার ফলেই কি বিয়ে ভেঙে যাবে সুজয় আর মধুছন্দার? এর জন্যে কি আমরাও কিছুটা দায়ী?

সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে, সুজয়ের মনে নিশ্চয়ই হীনমন্যতা বোধ জমেছে বেশ কিছুদিন

ধরে? এই স্ত্রীকে নিয়ে যেখানেই সে যায়, তার গায়িকা স্ত্রীর প্রতিই সবাই মনোযোগ দেয়। সুজয় একটা দেয়াশলাই কাঠির কোম্পানি করে মোটামুটি ভালোই রোজগার করে, তবু ওকে কে গ্রাহ্য করবে?

স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হলে স্ত্রীর জীবনই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কোথায় যাবে এখন মধুছন্দা! আজকাল এই ধরনের কোনও ঘটনা শুনলেই আনোয়ারার কথা মনে পড়ে। সে-ও কি শামীমের সঙ্গে এই ধরনের ঝগড়া করেছিল?

শামীম কক্ষনো আনোয়ারাকে শারীরিকভাবে অত্যাচার করতে পারে না। মধুছন্দার আরও একটি বিপদ, তার দুটি ছেলেমেয়ে আছে। তাদের নিয়ে কী হবে?

ইজি চেয়ারে বসে বসে ঝিমুনি আসতেই আমি দেখতে পেলাম, কাঁদতে কাঁদতে একটা দূরপাল্লার ট্রেনে উঠে পড়ছে মধুছন্দা। স্বামীকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বাচ্চা দুটোকেও ফেলে এল। ঠিক এইভাবে চলে এসেছিল আনোয়ারা।

ট্রেন থেকে মধুছন্দা যেখানে নামল, সে-জায়গাটা তো চেনা। মুম্বাইয়ের চার্চ গেট স্টেশান। সেখান থেকে বেরিয়ে একটা অটো ধরল। ঠিক যেন সিনেমার মতন দেখতে পাচ্ছি।

এটা কোন বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠছে মধুছন্দা? তিনতলায় একটা ফ্ল্যাটের দরজা। নাম লেখা আছে, কিন্তু সেটা পড়ার আগেই দরজা খুলে গেল।

একজন শক্ত চেহারার মাঝবয়েসি মানুষ, মুখখানা চৌকো ধরনের, বেশ পুরুষ্টু গোঁফ। মধুছন্দা কেঁদে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকে।

ব্যস, এখানেই শেষ।

আমার চোখ খুলে গেল, হাত বাড়ালাম সিগারেটের প্যাকেটের দিকে।

এটা কি স্বপ্ন, না ভবিষ্যতের ছবি?

ভবিষ্যতের ছবি আমি দেখব কী করে, আমার সে-ক্ষমতা নেই। স্বপ্নই, কিন্তু ওই যে লোকটাকে দেখলাম, সে কে? আমি জীবনে ওকে কখনও দেখিনি। ওর চেহারাটা আমি কল্পনায় তৈরি করলাম? গোঁফটোঁফ সুদ্ধ?

লোকটা ভালোও হতে পারে, খারাপও হতে পারে। হয়তো লোকটি মধুছন্দাকে ফিল্মে গাইবার সুযোগ করে দিতে পারে। তাপর মধুছন্দার বেশ নাম হয়ে গেল, গানের জগতে মধুছন্দা স্বাধীনভাবে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবে।

আর যদি লোকটা খারাপ হয়! মুম্বাইয়ের ফিল্মের জগতে অনেকরকম পঙ্কিলতা আছে। একটু সুন্দরী মেয়েদের নানারকম প্রতিশ্রুতি আর প্রলোভন দেখিয়ে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানো হয়। শত শত মেয়ের মধ্যে গান গাইবার সুযোগ মাত্র দু'-একজনই পায়। বাকিরা বড়জোর কোরাস গানে একটু গলা দেয়, শেষ পর্যন্ত বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়!

ওই লোকটা অতি বদ হবার সম্ভাবনাই বেশি। কেন আমার এরকম ধারণা হচ্ছে?

মোটা গোঁফওয়ালা পুরুষদের সম্পর্কে আমার মনে একটা বিরাগ ভাব আছে। আজকালকার দিনে কোনও রুচিসম্পন্ন লোক ওরকম গোঁফ রাখবে কেন? হাওড়া স্টেশনের কুলিদের ওরকম গোঁফ মানায়। গোঁফ-কামানো কুলি আমি এ পর্যন্ত একজনও দেখিনি। ওদের ধারণা, দৃশ্যমান গোঁফ হচ্ছে পৌরুষের লক্ষণ! এ হচ্ছে সেই ধরনের পৌরুষ, যা মেয়েদের সবসময় পায়ের তলায় রাখতে চায়।

একজন পুরুষ, যদি নেহাৎ গায়ের জোর বেশি বলেই তার স্ত্রীকে মারধর করে, তবে তার চেয়ে বর্বরতা আর কী হতে পারে? কিন্তু সেটা আটকাবার কোনও উপায় আমাদের হাতে নেই। জেনেশুনেও আমাদের চুপ করে থাকতে হবে। কারণ, বন্ধ ঘরের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী কী করছে, সেখানে নাক গলাবার অধিকার নেই কারুর। তবে, আজকাল মেয়েদের অনেকরকম আইনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। স্ত্রী যদি থানায় গিয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ করে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বামীকে গ্রেফতার করা হবে। পুলিশ মেয়েটিকে আশ্রয় দেবে। আশ্রয় মানে পাঠানো হবে উদ্ধার-আশ্রমে। সেগুলো একেবারে ভয়াবহ জায়গা।

কোনও স্ত্রী তার স্বামীর বিরুদ্ধে তখনই অভিযোগ আনবে, যখন সে বিবাহ-বিচ্ছেদের ঝুঁকি নেবে। তার নিজস্ব কোনও নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ের জায়গা থাকবে। মধুছন্দার মতন মেয়ে, যার বাপের বাড়িতেও যাবার উপায় নেই, সে কি চট করে বিবাহ-বিচ্ছেদের ঝুঁকি নিতে পারে? এই জন্যই হাজার হাজার মেয়ে স্বামীর কাছে মার খেয়েও মুখ বুজে থাকে।

এমন স্বামীর সঙ্গে ঘর করার চেয়ে বেশ্যাবৃত্তিও অনেক ভালো, এমন সিদ্ধান্ত কি নিতে পারে কোনও মেয়ে? হাজার জনের মধ্যে বড়জোর দু-চারজন।

সেই ইজি চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়লাম আমি। সুতরাং ঘুম ভেঙে গেল খুব ভোরে।

বাগানে ও নদীর ধারে হেঁটে বেড়ালাম খানিকক্ষণ।

তাতে শরীর বেশ স্নিগ্ধ হলেও মনের মধ্যে খচখচানি রয়েই গেল। কী করছে মধুছন্দা? ওর দুটি ছেলেমেয়ে আছে। তাদের ছেড়ে কতক্ষণ থাকবে?

রশিদ কখন জাগবে, আমার যেন সময়ই কাটতে চায় না।

এর মধ্যে রোদ আরও চড়া হতে লাগল। আমি আর-একবার বেরিয়ে ডজন খানেক গরম সিঙাড়া কিনে আনলাম মোড়ের দোকান থেকে।

ফিরে এসে দেখি শক্তি চা খাচ্ছে।

সে হাঁকডাক করে রশিদকে বিছানা ছাড়িয়ে নিয়ে এল বারান্দায়।

এখন রশিদ অন্তত তিন কাপ কফি খাবে, তারপর বাথরুমে গিয়ে খবরের কাগজ পড়বে প্রায় একঘণ্টা ধরে।

দ্বিতীয় কাপ কফি শেষ করার পর আমি রশিদকে বললাম, আমরা কখন বেরুব? বেশি দেরি করতে চাই না।

রশিদ রীতিমতন অবাক হয়ে বলল, বেরুব? কোথায়? আজ বিশেষ কাজ নেই, বাড়িতেই আড্ডা দেওয়া যাক। আমি পেঁয়াজকলি দিয়ে গোস্ত রান্না করব।

আমি বললাম, বাঃ, মেমারি যাবার কথা আছে না?

শক্তি বলল, মেমারি, সেখানে কী আছে? কিছু নেই!

আমি রশিদের দিকে তাকিয়ে বললুম, তুমি ভুলে গেছ?

আমি ভুলিনি! তুমি মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্ট পড়েছ। সেটা সব নিউজপেপারে ছাপা হয়েছে। ওরাও কি সেটা পড়েনি? এর পরেও কি ওরা মেমারিতে বসে থাকবে? এতক্ষণে পাখি উড়ে গেছে। ওখানে গেলে কিছুই দেখতে পাবে না। তাছাড়া তোমার তো বাংলাদেশের সেই মেয়েটি, কী যেন নাম?

আনোয়ারা।

হ্যাঁ, সেই মেয়েটিকে নিয়ে চিন্তা। সে অদৃশ্য হয়ে গেছে অনেকদিন আগে। মেমারিতে গিয়ে তার কোনও ট্রেস পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। সে কোনও আরব কান্ট্রিতে চালান হয়ে গেছে!

তবু আমি জায়গাটা দেখতে চাই নিজের চোখে।

তোমার এই কথার কোনও যুক্তি আছে?

আমি একটুক্ষণ চুপ করে রইলাম। আমার এই অনুরোধের সত্যিই কোনও যুক্তি নেই। আনোয়ারার পক্ষে সেখানে থাকার কোনও প্রশ্ন ওঠে না, আর বিক্রি বা পাচার হয়ে-যাওয়া হাজার হাজার মেয়েদের নিয়ে আমি মাথা ঘামিয়েই বা কী করব! তবু আমার একটা ঝোঁক চেপেছে। আনোয়ারকে উদ্ধার করার ব্যাপারে আমি কোনও সাহায্যই করতে পারব না জানি। তবু এইসব কারবার যারা করে তাদের একজনকে অন্তত আমি জলজ্যান্ত অবস্থায় দেখতে চাই। বুঝতে চাই, তারা কী ধরনের মানুষ!

চলো না রশিদ, কতক্ষণই বা লাগছে? বিকেলের মধ্যে ফিরে আসব।

শক্তি বলল, ধ্যাৎ, ছাড়ো তো! এমনি এমনি মেমারিতে কেউ যায়? তারচেয়ে বরং চলো, বেরিয়ে পড়ি, অট্টহাস ঘুরে আসি। চমৎকার জায়গা, ওখানে ভালো বাংলা পাওয়া যায়। একেবারে খাঁটি।

রশিদ আমার স্বভাব জানে।

একবার যখন মেমারি যাবার ইচ্ছে আমার মাথায় চেপেছে, আমি যাবই। ওরা যেতে না চাইলে, ট্রেনে একা।

রশিদ বলল, ঠিক আছে, সুনীলের যখন ইচ্ছে, ঘুরেই আসা যাক। ওখানে পনেরো মিনিটের বেশি থাকব না। রান্নার মাসি লুচি-ফুচি ভাজছে, আর কিমার তরকারি, না খেয়ে গেলে চিল্লামিল্লি করবে।

শক্তি বলল, সে-মেয়েটা এখনও জাগেনি?

রশিদ বলল, কোন মেয়েটা? ও, মধুছন্দা? সে তো ভোরবেলাতেই কেটে পড়েছে!

আমি চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, কারুকে কিছু না বলে?

রশিদ বলল, তাই তো! আমার বড়মেয়ে বাবলি বলল, ওর বাড়িতে পরার চটিটা খুঁজে পাচ্ছে না। মধুছন্দা নিজের চটি ফেলে ভুল করে বাবলির চটি পরে চলে গেছে।

কোথায় গেল মধুছন্দা? তার স্বামীর কাছে? আবার মার খাওয়ার জন্যে? কিংবা আমি স্বপ্নে যে-রকম দেখেছি, দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়েছে কোনও দূরপাল্লার ট্রেনে?

এটা না-জানা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা তিনজন তৈরি হয়ে উঠে পড়লাম গাড়িতে।

এ-যাত্রায় শক্তি না থাকলেই ভালো হতো। ও গজগজ করতে লাগল অনবরত। শুধু শুধু মেমারি যাবার কোনও মানে হয়? কী আছে সেখানে?

রশিদও চাপা বিদ্রূপের সুরে কয়েকবার বলল, সেখানে যে কিছু নেই, সেটা সুনীল নিজের চোখে না দেখলে শান্তি পাচ্ছে না।

কিন্তু ওদের কথা মিথ্যে হয়ে গেল। মেমারি-যাত্রা মোটেই অসার্থক হয়নি। বরং এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হল।



১২

চুঁচড়ো থেকে মেমারি এমন কিছু দূর নয়, তবু যেতে সময় লাগল অনেকক্ষণ। মাঝে মাঝেই থামতে হল।

পুলিশের কর্তারা যে-পথ দিয়ে যায়, সে-পথের প্রত্যেক থানা আগে থেকেই খবর পেয়ে যায়। বড় রাস্তার মোড়ে মোড়ে অফিসাররা দাঁড়িয়ে থাকে। তারা স্যালিউট করে তো বটেই, গাড়ি থামিয়ে কাছাকাছি থানায় একবার পায়ের ধুলো দেবার জন্য অনুরোধ জানায়।

প্রত্যাখ্যান করতে করতেও অন্তত দুটো থানায় যেতেই হল। প্রত্যেক জায়গাতেই এলাহি খাবার-দাবারের ব্যবস্থা। আমরা ভালো করে ব্রেকফাস্ট সেরে এসেছি, ক্ষুধার্ত অবস্থায় যেসব খাদ্য খুব লোভনীয় মনে হয়, ভরা-পেটে সেইসব খাদ্যই দেখলে গা গুলিয়ে ওঠে। খুব পেড়াপিড়িতে শুধু চায়ে চুমুক দিতে হল দু'জায়গাতেই।

চলন্ত গাড়িতে আমি রশিদকে জিজ্ঞেস করলাম, প্রত্যেক থানাতেই দেখছি পুলিশরা তোমাকে খাতির করার জন্য ব্যস্ত। এটাও কি ওদের ডিউটির মধ্যে পড়ে?

রশিদ বলল, পুলিশের সার্ভিস অনেকটা মিলিটারিরই মতন। সিনিয়ার অফিসারদের সবসময়ে সম্মান জানাতে হয়। দেখোনি, লাচ্চুদার সঙ্গে অন্যসময় যতই আড্ডা মারি, অফিসে প্রথম দেখা হলে আমাকেও পা-ঠুকে স্যালুট মারতে হয়।

আর এত খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা?

ওগুলো নিয়মের মধ্যে পড়ে না।

ওইসব খাবারের খরচ কে দেয়?

এসব জিজ্ঞেস করতে নেই! আমি কক্ষনো কিছু খাই না!

তোমাকে এত খাতির করার কারণ কি ওরা প্রমোশন কিংবা ট্রান্সফারের ব্যাপারে তোমার কাছ থেকে সাহায্য পাবে আশা করে?

তা আশা করে নিশ্চয়ই। আশা করতে দোষ কী? আমি অবশ্য ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমার জুনিয়র অফিসাররাই যা করবার করে।

শক্তি একমনে সিগারেট টানছিল, এবার বলল, বৈঁচি থানায় গোবিন্দ বলে যে

এস আইটাকে দেখলাম, ওর ডিমোশান করে দাও। সাসপেন্ডও করে দিতে পারো।

রশিদ বলল, সে আবার কী করল? ওকে তুমি চিনতে আগে থেকে?

শক্তি বলল, না, চিনি না। কিন্তু ওর গোঁফটা দেখলে? এত সরু যে প্রায় দেখাই যায় না। অথচ গোঁফ আছে। এই টাইপের লোকেরা দুশ্চরিত্র হয়।

রশিদ হেসে বলল, তাই নাকি? কিন্তু সব পুলিশের চরিত্র সংশোধন করা তো সম্ভব নয়!

শক্তি বলল, পুলিশ দুশ্চরিত্র হলে তাকে ঘুষখোরও হতে হয়। ব্যাটা নিশ্চিত ঘুষ খায়!

রশিদ বলল, দু'একটা ঘুষখোরও সার্ভিসে রাখা দরকার। ফেমাস ইকোনমিস্ট গুনার মিরডাল বলেছেন, আমাদের মতন গরিব দেশগুলোতে কিছু কিছু করাপশান থাকাও দরকার। সব চেপে দিলে কোনও কাজই হবে না! দেখবে, যারা ঘুষ-টুষ নেয়, তারা কাজের ব্যাপারে বেশ চটপটে হয়। তাছাড়া ও-বেচারা কতই বা ঘুষ নিতে পারে!

আমি বললাম, আমাদের রশিদ খান ঘুষও নেয় না, মন দিয়ে কাজও করে না!

রশিদ বলল, অ্যাই, অ্যাই, আমি অতবড় ডাকাত দলটা ধরলাম!

শক্তি বলল, কেন ধরতে গেলি? ব্যাংকের টাকা গেছে, তাতে সরকারের কী আসে যায়? কত গরিব লোক যে রোজ ঠকছে কতভাবে এক্সপ্লয়টেড হচ্ছে, সে-সম্পর্কে তোরা কিছু করতে পারিস?

রশিদ বলল, ম্যাকসিম গোর্কি বলেছেন, পুলিশ হচ্ছে বড়লোকদের দারোয়ান। গরিব মানুষদের সমস্যা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামালে চলে না। গরিবরা যদি বড়লোকদের আক্রমণ করতে আসে, তখন আমরা তাদের ধরে পেটাই। গুলি করে মেরেও ফেলি!

শক্তি একটা দোকানের কাছে গাড়ি থামিয়ে সিগারেট কিনল।

আমি রশিদকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি কখনও গোপনে কোথাও যেতে পারো না? সঙ্গে গার্ড থাকবে, সব থানায় খবর চলে যাবে?

রশিদ বলল, হোল পশ্চিম বাংলার মধ্যে একমাত্র আমিই কখনও গার্ড না নিয়ে, পুলিশের গাড়িও না নিয়ে ইচ্ছেমতন ঘুরে বেড়াই। সেবারে ট্রেনে করে শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম না?

মেমারি পৌঁছোতে দুপুর আড়াইটে হয়ে গেল।

এবারে আমরা স্বেচ্ছায় গেলাম থানায়। প্রাথমিক খোঁজ-খবর তো স্থানীয় পুলিশই দিতে পারবে!

এ থানার ওসির নাম মনোজ পাণ্ডে। খাঁটি বাঙালি নয়, কিন্তু বাংলা বলে স্বাভাবিক, সাবলীলভাবে। এর বেশ মোটা গোঁফ, সাধারণত যাকে বলে শেয়ালের ল্যাজের মতন। তার দু'জন সহকারীর নাম পিটার গোমেজ আর শাহনওয়াজ খান। একেবারে

আদর্শ সেকুলার সহাবস্থান!

রশিদ আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, আমার দুই বন্ধু, এঁরা লেখক। নাম শুনেছেন তো?

মনোজ পাণ্ডে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার। অবশ্যই নাম শুনেছি। ফেমাস।

অর্থাৎ নাম শোনেনি। গলার আওয়াজ শুনলেই বোঝা যায়। অন্য দু'জনও আমাদের সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ দেখাল না।

তিনজনই প্রথম থেকে দাঁড়িয়ে আছে। রশিদ বলল, বসুন, বসুন!

মনোজ পাণ্ডে বসল, অন্য দু'জন একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল তটস্থভাবে।

প্রাথমিক দু'চারটি কথার পর রশিদ জিজ্ঞেস করল, হিউম্যান রাইটস কমিশনের একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে, দেখেছেন? তাতে বলা হয়েছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা মেয়েদের ধরে এনে বিক্রি করে কিংবা বেশ্যাবৃত্তিতে কাজে লাগায়, তাদের একটা বড় সেন্টার এই মেমারি।

মনোজ পাণ্ডে বলল, হ্যাঁ স্যার, দেখেছি। দুটো জায়গা আমরা রেডও করেছি।

কারুকেই পাননি। তাই তো?

আগেই পালিয়েছে। কোনও ট্রেসও রেখে যায়নি।

কাগজ রিপোর্ট বেরুবার পর আপনারা রেড করেছেন। তখন ওরা পালাবে না কি ধরা দেবার জন্য বসে থাকবে? আগে আপনারা কোনও খবর পাননি!

মনোজ বলল, সে-রকম কোনও খবর ছিল না। এ অঞ্চলে জমির দখল আর ফসল-কাটা নিয়ে মারামারি বেশি হয়। আমরা তাই নিয়েই ব্যস্ত থাকি।

শুধু তাতেই সব সময় চলে যায়? অন্য ক্রাইমগুলো দেখেন না!

হিউম্যান রাইটস কমিশনের রিপোর্টে মেমারির নাম থাকায় আপনাদের রেসপনসিবিলিটি আর বদনাম হচ্ছে না? রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে আপনাদের ওপর চাপ আসবে।

শাহনওয়াজ খান এবার বিনীতভাবে বলল, স্যার, একটা কথা বলব? আটমাস আগে ওই মেয়ে-স্মাগলারদের একজন চাঁইকে আমরা অ্যারেস্ট করেছিলাম। বাইরের ব্যবহার দেখে বোঝা যায় না। কিন্তু একেবারে ঝানু ক্রিমিনাল। কিন্তু স্যার চার্জশিট দেবার আগেই তাকে ছেড়ে দিতে হল।

কেন?

স্থানীয় এম এল এ নিজে থানায় এসে রিকোয়েস্ট করলেন। তিনি নিজের দায়িত্বে...

কিছু রিটন্ দিয়েছিলেন?

না স্যার।

রশিদ হঠাৎ ফুঁসে উঠে বলল, কী করে বুঝব আপনি মিথ্যে কথা বলছেন না?

আপনি টাকা খেয়ে লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে তারপর এম এল এ-র ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন কি না, তা বুঝব কী করে? অনেক জায়গায় এম এল এ-রা আনডিউ চাপ দেয়, তা যেমন সত্যি, আবার অনেক থানায় অফিসাররা নিজেদের দায়িত্ব কাটাবার জন্য এরকম গল্প বানায়। আই নো দ্যাট ভেরি ওয়েল!

শাহনওয়াজ খান মিনমিন করে বলল, স্যার, ওনারা তো লিখিত কোনও অর্ডার দেন না কখনও।

সরকারি খাতায় না হোক, একটু ছোট চিরকুটে ওনাকে নিয়ে লিখিয়ে নিতে পারলে আপনার ঘাড় বাঁচবে। নইলে সব দায়িত্ব শুধু আপনার।

স্যার, উনি যদি সেটুকুও দিতে রাজি না হন?

তাহলে আপনিও ওঁর মৌখিক অনুরোধে কারুকে ছাড়বেন না।

স্যার, রুলিং পার্টির এম এল এ...

তো কী হয়েছে? আপনি তার অন্যায় না মানলে কী হবে? আপনার কী ক্ষতি হবে? আপনার চাকরি তো খেতে পারবে না। বড়জোর অন্য কোথাও ট্রান্সফার করিয়ে দেবে। তাও অনেক এম এল এ-ই মুখে তড়পায়, অতদূর আর যায় না। চিফ মিনিস্টার এসব পছন্দ করেন না। যে-লোকটাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন সে কি এখনও এখানেই আছে? তাকে আজই ধরে আনুন আবার!

গত সপ্তাহ থেকে সে এখান থেকে হাওয়া হয়ে গেছে!

বাঃ!

এসব প্রশাসনিক ব্যাপারে আমাদের কথা বলা উচিত নয়।

এবার আমি বললাম, যেখানে মেয়েগুলোকে ধরে এনে রাখত, সেই জায়গাটা একবার দেখতে যাওয়া যায় না?

রশিদ বলল, ইয়েস, তা যাওয়া যেতে পারে।

ওসির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, সেই জায়গাটা কি কোনও প্রাইভেট বাড়ি?

মনোজ পাণ্ডে বলল, বাড়ি... মানে... আগেকার দিনের এক জমিদার-বাড়ি, তার অনেকটা অংশই অ্যাবানডান্‌ড, কোথাও ছাদ ভেঙে গেছে, ঝোপঝাড় গজিয়ে গেছে। শুধু সামনের দিকে দুই বুড়ো-বুড়ি থাকে। ওদিকটায় কেউ যায়ই না।

রশিদ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলুন, দেখে আসি।

মনোজ পাণ্ডে হাত জোড় করে বলল, স্যার, অনেক বেলা হয়ে গেছে। একটু কিছু খেয়ে যাবেন তো? সব রেডি আছে।

রশিদ বলল, না, খাওয়া-টাওয়ার দরকার নেই।

শক্তি বলল, আমার একটু একটু খিদে পাচ্ছে। কী খাবার আছে?

মনোজ পাণ্ডে বলল, সামান্য কিছু... বিরিয়ানি। চিকেন কাবাব, পরোটা আর মাংসের ঝোল, সবজিও আছে কিছু, আর দই-মিষ্টি, এখানকার দই খুব বিখ্যাত।

শক্তি বলল, বাংলায় সামান্য কথাটার এটাই সঠিক মানে, শুধু খাদ্য বিষয়ে। কোথায় যেতে হবে, আপনার কোয়ার্টারে?

না স্যার, এখানেই ব্যবস্থা হয়েছে। সব রেডি। আপনাদের বেশিদূর যাতে যেতে না হয়, তাই হোটেলে ব্যবস্থা করিনি।

শক্তি বলল, আপনার বাড়িতে ডাল-ভাত খাওয়ালে যেতাম। থানার মধ্যে এত খাবার, ব্যাপারটা অশ্লীল। আমি জানি, সুনীল ওসব কিছু ছোঁবে না। দুপুরের খাওয়ার সময় বেগুন ভাজা না পেলে ও কিছুই খায় না। চলো, রশিদ।

রশিদ বলল, আমরা গাড়িতে অপেক্ষা করছি, আপনারা বরং খেয়ে নিন। ইনফ্যাক্ট বেশি লোকের তো যাওয়ার দরকার নেই। একজন কেউ সঙ্গে গেলেই হল। শাহনওয়াজ, আপনিই চলুন।

দরজার দিকে এগোতেই দেখা গেল, বাইরে অনেকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে একজন ফিসফিস করে ওসির কাছে গিয়ে কী যেন বলল। ওসি রশিদকে বলল, স্যার, আমার এখানকার হেড ক্লার্ক অনেক বইটই পড়ে, পোয়েট্রিও লেখে, সে আপনার বন্ধুদের অটোগ্রাফ নিতে চাইছে। সে একবার আসতে পারে কি?

শক্তি বলল, তাই ভাবছিলাম, এতক্ষণে একটা কেউও অটোগ্রাফ চাইল না। দেশটার হল কী?

হেড ক্লার্ক শুনলেই সুকুমার রায়ের 'হেড অফিসের বড়বাবু'র চেহারাটা চোখে ভাসে। যে এল, তার চেহারা রোগা পাতলা, বয়েসও ছাব্বিশ-সাতাশের বেশি না। বয়েস কম বলেই এখনও কবিতা লেখে, আর কিছুদিন পুলিশ অফিসে কাজ করলেই কবিতা ঘুচে যাবে।

এগিয়ে দেওয়া খাতাটায় সই করতে করতে শক্তি জিজ্ঞেস করল, কী নাম?

লোকটি বলল, রামপ্রসাদ দাস স্যার।

শক্তি বলল, গ্রাম দেশে এলে খাঁটি বাংলা নাম শোনা যায়। রামপ্রসাদ! গুড! দে মা আমায় তবিলদারি। এখানে টাকা-পয়সার হিসেব রাখতে হয় নিশ্চয়ই। তুমি কী কবিতা লেখ?

রামপ্রসাদ বলল, আমি আপনার অনেক কবিতা মুখস্থ বলতে পারি। ওঁর কয়েকটা।

শক্তি বলল, আমি পরীক্ষা নিতে চাই না। তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তুমি কী লেখ? ছোটদের না বড়দের?

সবরকম। অনেক লিখেছি। যদি বলেন...

ঠিক আছে, শোনাবার দরকার নেই। এই রশিদ সাহেবও একজন বড় কবি। তবে, উনি লেখেন উর্দু ভাষায়!

রশিদ বলল, আমার সই নেবার দরকার নেই। এখন চলো।

রামপ্রসাদ বলল, স্যার, এখানে এসেছেন যখন, একবার বুড়ো বটগাছটা দেখে

যাবেন।

শক্তি ভুরু কুঁচকে বলল, বটগাছ? আমরা ঢের বটগাছ দেখেছি। এখানে আমরা সাইট সিয়িংয়ের জন্য আসিনি।

রামপ্রসাদ বলল, না, সেজন্য নয়। ওই বটগাছে...

তার কথা শেষ করতে না দিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

গাড়িতে মাত্র মিনিট দশেক লাগল।

ভাঙা রাজবাড়িটা এককালে বেশ বড়ই রাজপ্রসাদ ছিল। অবশ্য এখানে আর রাজা আসবে কোথা থেকে, মাঝারিগোছের জমিদার ছিল বোধহয়। এই জমিদাররা চোখ ধাঁধানো বড় বড় বাড়ি বানাত। তারা বোধহয় ভাবত, তাদের বংশধররা অনন্তকাল ধরে সেই বাড়ি ভোগ করবে! কোথায় কী! জমিদারিই হাওয়া হয়ে যাবার পর এত বড় বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণেরও সাধ্য ছিল না উত্তরাধিকারীদের। এরকম কত রাজবাড়ি এখন ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়ে আছে।

এখানে সামনের দিকে মোটামুটি অক্ষত কয়েকটি ঘরে থাকে এক বৃদ্ধ দম্পতি। তাদের একমাত্র নাতি থাকে কানাডায়, মেম বিয়ে করেছে। তারা আর আসবে না। এই বুড়ো-বুড়ি গত হলে এ বংশে বাতি দেবার আর কেউ থাকবে না।

রশিদের বডিগার্ড একটা বড় গাছের ডাল জোগাড় করে ঝোপঝাড়ের ওপর পেটাতে লাগল। এখানে সাপ-টাপ থাকার খুবই সম্ভাবনা। এগোতে হল সাবধানে।

শক্তি গজগজ করে বলতে লাগল, সুনীলের যত উদ্ভট বাতিক। এখন কেউ নেই, তবু সে জায়গা দেখার কী আছে? পেটে ছুঁচো ডন মারছে, এরপর আমরা কোনও ধাবায় গিয়ে খাব, বিয়ার টিয়ার, সুনীল সে পয়সা দেবে!

আমি শাহনওয়াজকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা তো রেড করেছিলেন, সেটা কোথায়? এই ভাঙা বাড়িতে?

ইয়েস স্যার।

এখানকার খোঁজ পেলেন কী করে?

আমাদের কিছু কিছু সোর্স থাকে। তারা খবর আনে।

রশিদ ঝাঁঝালো গলায় বলল, তারা আগে খবর দিতে পারেনি? সবাই চলে যাবার পর খবর দেয়? একটা কথা জিজ্ঞেস করব? ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন?

জী স্যার। নিশ্চয়ই স্যার।

আপনাদের সোর্স খবর দেবার পর সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন, না দু'একদিন দেরি করেছিলেন?

তখন গোয়ালাদের পাড়ায় একটি গরুকে মেরে ফেলায় খুব গণ্ডগোল হচ্ছিল, আমরা তাতে খুব ব্যস্ত ছিলাম। তাই একদিন দেরি হয়েছে।

তার মধ্যে মেয়েগুলোকে নিয়ে হারামজাদারা পালিয়েছে। একটা গরুর জন্য

অনেকগুলো মেয়ে উদ্ধার হল না।

এবার শাহনওয়াজ মুখ তুলে খুব শান্তভাবে বলল, শুধু গরু নয়, স্যার। একজন মানুষও মারা গেছে। সে-হাঙ্গামা ছড়ালে আরও মানুষ মরতে পারত!

আমি বললাম, মেয়েদের প্রাণের দামই সবচেয়ে কম।

এক জায়গায় দু'তিনজন লোক ঝুড়ি ভর্তি করে এই ভাঙা বাড়ির ইট নিয়ে যাচ্ছে। এককালের রাজবাড়ির ইটে একালের কয়েকটি গরিব লোকের কাঁচা বাড়ি যদি একটু পাকা হয়, তাহলে ভালোই তো!

অনেক বড় বড় গাছও তো রয়েছে, এগুলোও কি কেটে নিয়ে যাবে? আমরা শহরের লোকেরা আজকাল গাছ-কাটা বিষয়ে খুবই স্পর্শকাতর। গ্রামের মানুষ নিজেদের বেঁচে থাকার কথাই বেশি ভাবে।

একটা ভেঙে-পড়া দেওয়ালের ওপর দিয়ে উঠে আমাদের ভেতরে ঢুকতে হল।

তারপর ঝোপঝাড় সরিয়ে আমরা যেখানে পৌঁছোলাম, সেটা বোধহয় ছিল ঠাকুর-দালান। বড় থামের কয়েকটা এখনও টিকে আছে। ভেতরটা বেশ পরিচ্ছন্ন।

মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে শাহনওয়াজ বলল, এইখানেই রাখা হয়েছিল সতেরোটি মেয়েকে।

শক্তি ফস করে জিজ্ঞেস করল, আপনারা তো কারুর দেখা পাননি। তবে কী করে জানলেন যে সতেরো জন? শুনলেন কী করে?

আমাদের সোর্স ওই নাম্বারটাই বলেছে।

রশিদ বলল, আর-একটা সত্যি কথা জিজ্ঞেস করব? ঠিক উত্তর দেবেন? ওরা কি আপনাকে ইনডিভিজুয়ালি টাকা দিত, না গোটা থানাকে থোক টাকা ধরে দিত?

ওরা মানে কারা? কেন টাকা দেবে?

ন্যাকামি করবেন না! ন্যাকামি করবেন না! এর মধ্যে টাকার খেলা আছে। আমি বুঝি না? আপনারা ইচ্ছে করে একদিন দেরি করেছেন, যাতে ওরা পালাতে পারে। তারপর একটা লোক-দেখানো সার্চ করেছেন!

আমি বললাম, শুধু তো একবার নয়। হিউম্যান রাইটস কমিশনের রিপোর্ট আছে, এখানে ব্যাচ বাই ব্যাচ মেয়েদের রাখা হতো। বেশ কিছুদিন ধরে। এক ব্যাচ চলে যায়, আর-এক ব্যাচ আসে। কমিশনের লোকেরা এই খবর জোগাড় করেছে। আর লোকাল থানা সে-খবর রাখত না? এটা বিশ্বাস করা যায়?

শাহনওয়াজ এবার তেড়িয়াভাবে জোর গলায় বলল, স্যার, আমি টাকার কথা কিছু জানি না। আমি বড়বাবুর কাছ থেকে যখন অর্ডার পেয়েছি, তারপর সার্চ করতে এসেছি।

রশিদ জিজ্ঞেস করল, আপনার ক'টি ছেলেমেয়ে?

চার মেয়ে, এক ছেলে।

মেয়েদের বিয়ের জন্য অনেক টাকা লাগবে। জমিয়েছেন? নিজস্ব জমি-জমা আছে কিছু?

না স্যার। বাপ-দাদার আমলের একটা বসতবাড়ি আছে, এখানে নয়, মুর্শিদাবাদের সালার থানার আন্ডারে।

শাহনওয়াজ সাহেব, আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি আজ অফিশিয়াল ভিজিটে আসিনি। তবে, কমিশনের এই রিপোর্টের ভিত্তিতে গভর্নমেন্ট কিছু অ্যাকশান নেবেই। ভিজিলেন্সের লোকজন এসে আপনাদের জেরা করবে। ক্যাশ টাকা এখানে যা আছে, লুকিয়ে ফেলুন। বোকার মতন বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন না। সরাতে হবে অন্য জায়গায়।

স্যার। আমি টাকা-পয়সার কিছু জানি না।

বারবার ওই কথা বলে আমার মাথা গরম করে দেবেন না। আমার এই যে বন্ধুটি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ইনি মানুষের মুখ দেখেই বলে দিতে পারেন, কে ঘুষ নেয়, আর কে নেয় না। শক্তি, একে তোমার কী মনে হচ্ছে। এর তো গোঁফ কামানো।

শক্তি বলল, ওর বুক পকেটে সিগারেটের প্যাকেটটা দেখেছো? ফাইভ ফাইভ ফাইভ। সরকারি চাকরি করে অত দামি সিগারেট খাওয়া যায়? তুই তো খাস শস্তার ফিলটার উইল্‌স। শাহনওয়াজ সাহেব, আপনি ড্রিংক করেন?

নো স্যার। আই নেভার।

তাহলে নিশ্চয়ই মাসে অন্তত হাজার পঞ্চাশেক জমে যায়। তাই না?

শাহনওয়াজ এবার চ্যালেঞ্জের সুরে বলল, আপনারা আমার নামে ফল্‌স অ্যালিগেশান দিচ্ছেন!

শক্তি বলল, না, না, এসব এমনি কথার কথা। আমরা অ্যালিগেশান দেবার কে? আমরা বাইরের লোক। রশিদও এসব ঝুট-ঝামেলায় জড়াতে চায় না। সব থানাতেই তো ওইসব ব্যাপার চলে— কি সুনীল, আর তো কিছু দেখার নেই। এবার যাই?

আমি বললাম, দেখো, এখানে ইট দিয়ে উনুন বানানো হয়েছিল। দেয়ালে কালির দাগ। এখানে রান্না হতো। পাশে একটা ছোট ঘর, এখানে এখনও কিছু প্লাস্টিকের থালাবাসন পড়ে আছে।

শক্তি মাটি থেকে একটা কিছু কুড়িয়ে নিয়ে বলল, ভাঙা কাচের চুড়ি।

আমি বললাম, ওরকম চিহ্ন আরও আছে। ছেঁড়া ব্লাউজ, একটা পেতলের দুল। ওই ছোট ঘরটায় আমি আরেকটা জিনিস পেয়েছি। সেই জন্যেই আমার এখানে আসা সার্থক!

কী জিনিস?

একটা চিঠি। দলা পাকানো অবস্থায় এককোণে পড়ে ছিল। কোনও একটি মেয়ের লেখা।

শক্তি বলল, কই দেখি। চিঠিটা কাকে লিখেছে?

ভগবানকে। হাতের লেখা দেখলে একেবারে অশিক্ষিত বলা যায় না। সেভেন-এইট পর্যন্ত পড়েছে নিশ্চয়ই।

মেয়েটির মুখ কল্পনা করতে গিয়ে আমার চোখের সামনে ভেসে আসে আনোয়ারার মুখ। তবে, এ বোধহয় আনোয়ারার চেয়ে বয়েসে ছোট।

বাবা কিংবা মাকে চিঠি লেখেনি এই নাম না জানা মেয়েটি। সরাসরি লিখেছে ওর ভগবানকে। বারবার একই কথা, হে ভগবান, আমি এ জন্মে কী দোষ করেছি? যদি দোষ করে থাকি, তুমি নিজে আমাকে শাস্তি দাও! এরা আমাকে রোজ রোজ...

পেন্‌সিলের লেখা, কিছুটা অস্পষ্ট মাঝে মাঝে।

রশিদ বলল, চিঠিটা রেখে দাও, পরে কাজে লাগতে পারে।

শক্তি বলল, চল চল—

বাইরে এসে দেখি, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই হেড ক্লার্ক, অর্থাৎ কবি রামপ্রসাদ দাস।

সে বলল, স্যার, বটগাছটা একবার দেখতে যাবেন না?

শক্তি বলল, ধ্যাৎ! বলেছি না, বটগাছ ফটগাছ দেখার সময় আমাদের নেই!

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, শুধু একটা বটগাছ? নাকি আরও কিছু দেখার আছে সেখানে? মন্দির-টন্দির থাকলে আমরা ইন্টারেস্টেড নই!

সে বলল, না মন্দির না। বেশিক্ষণ লাগবে না। এই তো কাছেই।

হেঁটেই গেলাম সেখানে।

একটা খালের ধারে একটা বিশাল ডালপালা ছড়ানো বটগাছ। অনেক গ্রামেই এরকম থাকে। তলায় শ্মশান।

আমরা বোটানিক্যাল গার্ডেনের বটগাছ দেখেছি। এটা তো তার চেয়ে পুরনো নয়। তেমন কিছু দর্শনীয় মনে হল না।

কবি বলল, স্যার, ওপরে দেখুন, একেবারে ডান দিকে, ডগার কাছে!

শক্তি বলল, আরে, ওখানে একটা লোক বসে আছে। আগে ভেবেছিলাম গোটা বাঁদর।

কবি বলল, না, মানুষ, ও এই গাছেই থাকে। ওর নাম ভবাই মণ্ডল।

রশিদ জিজ্ঞেস করল, কতদিন ধরে এই গাছের ডগায় আছে?

কবি বলল, তা প্রায় মাস চারেক হবে। ওর নামে খুনের চার্জ আছে।

রশিদ এবার শাহনওয়াজের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, এই লোকটা একটা মার্ডারার?

শাহনওয়াজ ঘাড় নাড়ল।

খুন করেছে কাকে? ওকে অ্যারেস্ট করেননি কেন?

ওখান থেকে ওকে কী করে অ্যারেস্ট করব? কেউ অত ওপরে উঠতে চায় না।

ওপরে না উঠেও গুলি করে ওকে ভয় দেখানো তো যায়! একটা লোক গাছে উঠে বসে থাকবে বলে তাকে গ্রেফতার করা যাবে না? রাবিশ!

স্যার, ও গুলিকে ভয় পায় না। ওকে গুলি করে মেরে ফেলা যায়। কিন্তু ওকে কেন মারব? ও তো কোনও দোষ করেনি!

দোষ করেনি, তবে যে বললেন, ওর নামে মার্ডার চার্জ আছে।

জী স্যার, খুন করেছে ঠিকই। কিন্তু সব খুনই কি দোষের? ও লোকটা ইটভাটায় কাজ করত। খুব গরিব। ওর বউ মরে গেছে। ছিল একটা এগারো বছরের মেয়ে। একদিন তিনটে লোক ওর চোখের সামনে থেকে মেয়েটাকে ধরে নিয়ে যায়, ওর মাথায় ডাণ্ডা মেরে অজ্ঞান করে ফেলে যায়। মেয়েটাকে ধানক্ষেতে নিয়ে গিয়ে রেপ করে তিনজনে, তারপর গলাটিপে শেষ করে। এর কয়েকদিন পর হাটের মধ্যে সেই তিনজনের একজনকে চিনতে পারে ভবাই মণ্ডল। একটা দোকান থেকে মাছ কাটা বটি তুলে নিয়ে সোজা গিয়ে গলা কেটে দেয় লোকটার। বহুলোক তা দেখেছে। তারপর থেকেই ও গাছের ডগায় উঠে বসে আছে।

কিন্তু ওখানে একজন লোক কতদিন থাকতে পারে? খিদে-তেষ্টার ব্যাপার আছে না?

হয়তো কখনও কখনও নামে মাঝরাত্তিরে। আমরা জানি না। কেউ নাকি ওকে খাবার দিয়ে যায়।

এখানে সর্বক্ষণের একজন পুলিশ পোস্টিং করলেই তো ওকে ধরা যেতে পারে।

ধরলেই তো ওর নামে কেস দিতে হবে। পুলিশ কাস্টডিতে দিনের পর দিন পচবে। তারপর বিচার হবে। আইন-অনুযায়ী ওর শাস্তি হবেই। কিন্তু ও কি সত্যিই অপরাধী? ওর মেয়েকে রেপ করে খুন করেছে, তাদের একজনকে মেরে ফেলা কি অপরাধ? আইন কি তা বোঝে? আমরা ওকে ধরতে চাই না।

কবিটি বলল, গাছের ওপর যে-কটা দিন ও থাকতে চায়, থাক না। কেন শুধু শুধু ওকে জেলে পচতে হবে? এখানে আইনই তো অপরাধী। ও বেশ মনের আনন্দেই আছে। মাঝে মাঝে ওর গান শুনতে পাই!

শক্তি বলল, রাত্তিরবেলা চুপি চুপি গাছ থেকে নেমে অন্য কোথাও পালালেই তো পারে।

শাহনওয়াজ বলল, পালালে কোথাও না কোথাও ধরা পড়ার চান্স থাকে। আমাদেরও দায়িত্ব এসে যায় ওকে ধরার। তার চেয়ে ও গাছেই থাকুক। আমি অন্তত তাই চাই।

ভবাই মণ্ডল খুব গরিব ছিল, সে নিশ্চয়ই থানার লোকদের টাকা পয়সা দিয়ে হাত করেনি। মনে হয়, থানা থেকেই ওর খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।

আমি শাহনওয়াজের কাঁধে হাত রাখলাম। লোকটি ঘুষখোর হতে পারে, কিন্তু এর চরিত্রে একটা নরম মানবিক দিকও আছে!



১৩

মেমারি থেকে আমার ইচ্ছে ছিল শান্তিনিকেতন যাওয়ার, শক্তি বলল, আগে চল কেন্দুলি। কালকেই সেখানে জয়দেবের মেলা।

সারা রাজ্যজুড়েই এই সময় আসে মেলা, কিন্তু কেঁদুলির মেলা একেবারে অনন্য। এ শুধু বাউলদের মেলা। অনেকগুলি তাঁবুতে জমে বসে যায় বাউলদের আখড়া। ইচ্ছেমতন যাওয়া যায় যে-কোনও আখড়ায়, একপাশে বসে পড়লে কেউ-না-কেউ এগিয়ে দেয় গাঁজার কল্‌কে। বাউল গানের সঙ্গে গাঁজার বেশ-একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে।

রশিদ বাউল গানের ভক্ত নয়। ওর মতে, বড় জোর দু'খানা বাউল গান শোনা যায়, তারপর বোরিং, জাস্ট বোরিং! অধিকাংশ বাংলা গান সম্পর্কেই ওর এই মত।

আমি আর শক্তি এই কেঁদুলির মেলায় এসেছি অনেকবার। শুধু যে গানের টানে তা নয়, এক অন্যরকম জীবনযাপনের লোভে। বাউলদের সঙ্গে মিশে, দুটো-তিনটে দিন নিজেরাও যেন বাউল হয়ে যাওয়া যায়। শীতের মধ্যে সারারাত ধুনির আগুনে গা সেঁকে নেওয়া, যখন ইচ্ছে মাটিতেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেই হয়, খাওয়া-দাওয়ার কোনও চিন্তা নেই, কোথা থেকে যেন মাঝে মাঝে এসে পড়ে রুটি-তরকারি, অনবরত গাঁজার সাপ্লাই কে দেয়, কে জানে! এইভাবেই বাংলা মদের বোতলও আসে।

এসবই প্রথম যৌবনের কথা। এখন খানিকটা আরামপ্রিয় হয়েছি, তাছাড়া এখন স্বাচ্ছন্দ্যের অনেক সুযোগ-সুবিধে। একসময় পুলিশের কাছে কত তাড়া খেয়েছি। দু-একবার মারও খেয়েছি। এখন পুলিশের বড় বড় অফিসাররা আমাদের বন্ধু। পুলিশের মধ্যেও যে এমন সাহিত্যপ্রিয় মানুষ থাকে, তা তো আগে বুঝিনি।

এখন আর মাঠে শুয়ে থাকার প্রশ্ন নেই। রশিদের এলাকার মধ্যে যে-কোনও বাংলোতে যখন-তখন ওঠা যায়।

রশিদ বলল, শান্তিনিকেতন গেলেও একবার কেঁদুলির মেলায় আমাকে আসতেই হতো। সেটা অফিসিয়াল ডিউটি। চল, আগেই মেলাটা ঘুরে যাই।

আমার অবশ্য কেঁদুলির এই মেলাটার ওপর আগেকার মতন তেমন আকর্ষণ নেই।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই বদলায়। এই মেলাটার পরিবর্তন অল্প-অল্প পরিসরে অনেকখানি। এর মধ্যে সাহেব-মেমরা ঢুকে পড়েছে। এবং মাইক।

অজয় নদী পেরুতে পেরুতে রশিদ জিজ্ঞেস করল, তোমরা কোথায় থাকতে চাও? ইলামবাজারে বাংলোর ব্যবস্থা করে দিতে পারি, অথবা মেলার মধ্যে আমার জন্য সুইস কটেজও থাকবে।

সুইস কটেজ শুনলেই কৌতূহল হয়। বাংলোতে তো কতই থেকেছি। ইলামবাজার খানিকটা দূরে, মেলার মধ্যে রাত-কাটানোই তো ভালো। ঘুমের মধ্যেও গান শোনা যাবে।

গিয়ে দেখা গেল, সুইস কটেজ মোটেই কটেজ নয়। সেটি একটা তাঁবু। বাইরেরটা রঙিন, এই যা। পুলিশ-মহলে এই ধরনের তাঁবুর এই নাম। অবশ্য ভেতরে শোওয়ার ব্যবস্থা আছে।

ভেতরে ঢুকেই রশিদ বলল, শক্তি, এই মেলার মধ্যে মদ্যপান নিষেধ। আমিই এই নির্দেশ জারি করেছি। সেইজন্য... বুঝতেই পারছ...তোমারও এখানে খাওয়া চলবে না।

শক্তি মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, তুই কী করবি?

রশিদ অম্লান মুখে বলল, আমিও খাব না!

শক্তি এবার চওড়া করে হেসে বলল, না খেয়ে থাকতে পারবি?

রশিদ বলল, অফকোর্স পারব! আমি দিনের পর দিন থাকতে পারি। উইদাউট টাচিং আ ড্রপ অফ অ্যালকোহল! কী ভাবো আমাকে?

শক্তির একটা কবিতার বইয়ের নাম, 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাব'। প্রায় সেই ধরনের বাক্যেই সে বলল, না খেয়ে থাকতে পারি, কিন্তু কেন থাকব? বাউলদের কারণ-বারি পান তাদের ধর্মীয় সাধনার জন্য লাগে। তুই তাদের রিলিজিয়াস রাইটে কেন হস্তক্ষেপ করছিস?

রশিদ মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, উঁহু, উঁহু, বাউলদের সাধন ভজনের জন্য গাঁজা লাগে। দ্যাট্‌স অল রাইট, কিন্তু মদের সঙ্গে এদের কোনও সম্পর্ক নেই। পাবলিকলি ড্রিংকিং ইজ প্রহিবিটেড! টেন্টগুলোর মধ্যেও নিষেধ। সেইজন্যই তোমাদের আমি অপশান দিয়েছিলাম, ইলামবাজারের ডাকবাংলোয় থাকতে পারো।

শক্তি বলল, ধ্যাৎ! খালি বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছিস! বোতল-ফোতল বার কর। আমরা মেলার বাইরে নদীর ধারে বসে খাব।

এইসব সময়ে ওরা আমার মতামত নেবার কথা ভাবেই না। যেন আমার মতামতের কোনও মূল্যই নেই। ওরা যা ঠিক করবে, তা আমাকে মেনে নিতেই হবে।

আমি বললাম, রশিদ, তুমি মেলার মধ্যে মদ-পান নিষিদ্ধ করেছে, বেশ করেছ।

সেইসঙ্গে মাইক বাজানো বন্ধ করতে পারো না?

রশিদ আমার দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, সে-ক্ষমতা আমার নেই। সেটা ডি এম পারেন। যদিও আমার মাঝে মাঝেই ইচ্ছে করে, লাথি মেরে ওইসব মাইক-টাইক ভেঙে ফেলি!

সন্ধে নেমে এসেছে, এখন ডাকছে অসংখ্য কাক। কাকের ডাকে একেবারে কান ঝালাপালা হবার জোগাড়। এখানে এত কাক কেন? কোথাও বেশি কাক থাকা মানেই সেই জায়গাটা অতি নোংরা, আবর্জনায় ভর্তি।

মেলায় আসে লাখ লাখ মানুষ, কিন্তু তাদের জন্য বাথরুমের ব্যবস্থা যৎসামান্য। তাই এই কয়েকটা দিন নদীর ধার মানুষের গু-মূতের গন্ধে ম ম করে। শক্তি নদীর ধারে বসে মদ্যপানের কথা ভাবছে। সেখানে গেলে এখন পেট থেকে অন্নপ্রাশনেরও ভাত উঠে আসবে।

এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে মাইকের গাঁক গাঁক চিৎকার।

একটা মাইক বাজলে আপত্তির কিছু ছিল না। কিন্তু এখন বড বড় আখড়াগুলোতে আলাদা আলাদা মাইক। চতুর্দিক থেকে পরস্পরবিরোধী শব্দের যেন মারামারি কাটাকাটি চলে। ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যাকোফোনি!

আগে এই মেলাতে ইলেকট্রিকের আলোই ছিল না। বিভিন্ন তাঁবুতে জ্বলত হ্যাজাক বাতি। বা কোনও কোনওটায় শুধু কাঠের আগুন-জ্বলা আলো। বাউলরা গাইতেন খালি গলায়। এক তাঁবু থেকে অন্য তাঁবুতে গেলে বোঝা যেত গায়কী ও সুরের বৈচিত্র্য।

এখন বাউলদের মধ্যে স্পষ্ট দুটি ভাগ। একদল, যারা বিলেত-আমেরিকা গেছে, আর যারা যায়নি।

বাউলদের বিদেশযাত্রা শুরু হল ষাটের দশক থেকে। তার আগে সাহেবরা বাউল গান গ্রাহ্যই করেনি।

ষাটের দশকের গোড়ায় কবি অ্যালেন গিন্‌সবার্গ এসেছিল এদেশে। ছিল প্রায় ছ'মাস। অ্যালেন 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' গানটি শিখেছিল বেনারসে। তারপর সে আমেরিকায় ফিরে গিয়ে হিপিদের মধ্যে এই গান ছড়িয়ে দেয়।

অনেক বাউলদের সঙ্গেও মিশেছিল সে। একবার কেঁদুলির মেলায় এসে পূর্ণ দাস বাউলের গান তার খুব পছন্দ হয়।

পূর্ণ দাসের বাবা নবনী দাসও বিখ্যাত বাউল ছিলেন, তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথেরও স্নেহধন্য।

সেই ষাটের দশকের গোড়ায় পূর্ণ দাস তরুণ যুবক, গলায় অসম্ভব তেজ। 'সখী হে–' কিংবা 'ভোলা মন' বলে সে যখন তান দেয়, তখন যেন তা চলতেই থাকে, মাইল মাইল পেরিয়ে যায়, তা শুনে সাহেব- মেমদের তাক লেগে যাবারই কথা।

অতক্ষণ দম রেখে তান দেবার ক্ষমতা অনেক ক্লাসিক্যাল গায়কেরও থাকে না। হাতে একতারা নিয়ে, পায়ে ঘুঙুর বেঁধে সে গানের সঙ্গে নাচতেও পারে চমৎকার।

অ্যালেন আমেরিকায় ফিরে গিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে পূর্ণ দাসের সংগীত-প্রতিভার প্রশংসা করেছিল। সেই বন্ধুদের মধ্যে একজন বব ডিলান, সে তখন পশ্চিমী সংগীতজগতে পপ্ গানের রাজা। অসম্ভব তার জনপ্রিয়তা। সে একবার উডস্টক নামে একটি নির্জন স্থানে বহু গায়ক-গায়িকার সমাবেশ ঘটিয়ে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। সেই সমাবেশের আগে অ্যালেন বলেছিল বব ডিলানকে, তুমি ইন্ডিয়া থেকে ওই বাউল গায়কটিকে নেমন্তন্ন করো না!

শুনেছি, বব ডিলান তার নিজস্ব জেট বিমান কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিল শুধু পূর্ণ দাসকে নিয়ে যাবার জন্য। বাউল পূর্ণ দাস, যে আগে পশ্চিম বাংলার বাইরে বিশেষ কোথাও যায়নি, সে সেই প্রথমবার পা দিল বিমানের সিঁড়িতে। সেই থেকে শুরু হল বাউলদের বিদেশযাত্রা। পূর্ণ দাসের সাফল্যের পর বাউলদের সম্পর্কে আগ্রহ জেগে উঠল ইউরোপ-আমেরিকার কিছু কিছু মহলে। বিশেষভাবে আগ্রহী হল ফরাসিরা। শান্তিনিকেতনে যাবার পথে ট্রেনে যেসব বাউলরা গান গায়, তারা অনেকেই এখন ইউরোপ-আমেরিকা ঘুরে এসেছে।

কেঁদুলির মেলায় যেহেতু বাউলদের বৃহত্তম সম্মেলন হয়, তাই সেই সময়টায় অনেক সাহেব-মেমই আসে সেখানে। এখন অবশ্য আমার ধারণা, বীরভূমের এই বাউলমেলার চেয়েও আরও বড় হয়েছে নদীয়ার মাঝদিয়ার বাউলমেলা, সেখানে বাংলাদেশ থেকেও কয়েক শ' বাউল এসে যোগ দেয়। কাছেই সীমান্ত। ওদের ভিসা-টিসা লাগে না। দু'দেশেরই সীমান্তরক্ষীরা মনে করে, আকাশের পাখি আর ফুলের সুগন্ধের মতন বাউলরাও সব সীমান্তের ঊর্ধ্বে।

সাহেব-মেমরা আসছে তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু কেঁদুলির মেলায় সাহেবদের মনোরঞ্জনের জন্যই বোধহয়, বাউলদের সাজপোশাকের চাকচিক্য বেড়েছে, আর খালি গলায় গান গাওয়ার অভ্যেসটা চলে গেছে।

এসে পড়েছি যখন, দু-একটা আখড়ায় তো যেতেই হবে।

প্রথম আখড়াটায় গিয়েই একটা চমক লাগল।

এটা বেশ বড়সড় আখড়া। তাঁবু নয়, শামিয়ানা খাটানো। শ'দুয়েক নারী-পুরুষ সেখানে বসে আছে শতরঞ্জির ওপর। আগেকার মতন হ্যাজাক বাতি আর নেই, চড়া আলো জ্বলছে।

মাইকে যে গান গাইছে, তার মুখখানা চেনা-চেনা। খুব সম্ভবত ট্রেনে ও গান গায়, এখন একটা নানা রঙের তাপ্পি-মারা আলখাল্লা পরেছে। চলন্ত ট্রেনে ওকে প্রচণ্ড চিৎকার করে গাইতে হয়, মাইকের ব্যবহার ঠিক জানে না। এখানেই সেই একইরকম চিৎকার করছে, তার ফলে মাইকে মাঝে মাঝেই ক্যাঁ ক্যাঁ করে বিকট

শব্দ হচ্ছে। সে গাইছে, 'গোলেমালে গোলেমালে পিরিত কইরো না—'। আর ঠিক পাশের আখড়া থেকেই গান ভেসে আসছে, 'মাঝিগিরি জানি ভালো, ভয় পেও না ব্রজাঙ্গনা—'। দুটি গান পাশাপাশি চলছে, তেল আর জলের মতন।

শ্রোতাদের দিকে চোখ ঘোরাতে গিয়ে হঠাৎ এক জায়গায় চোখ আটকে গেল। উঁচু করে খোঁপা বাঁধা, অনেকখানি ঝোলা দুল, ওই মেয়েটি কে? যাকে ভাবছি, সত্যিই সে?

শক্তি একটা সিগারেটের তামাক ফেলে দিয়ে তার মধ্যে গাঁজা ভরতে ব্যস্ত। তাকে একটা কনুই দিয়ে খোঁচা মেরে চোখের ইঙ্গিত করলাম।

শক্তি সেদিকে তাকিয়ে, কিছু বুঝতে না পেরে বলল, কী?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওই যে মেয়েটি, মাথায় ফুল গোঁজা, ও কে?

শক্তি বলল, ওই তো সেই কাল রাত্তিরের মেয়েটি, কী যেন নাম, মধুছন্দা, তাই না?

তারপরই আবার বলল, কাল রাত্তিরে অত কান্নাকাটি করল—।

হ্যাঁ, মধুছন্দাই, কোনও সন্দেহ নেই, যদিও আজ শালওয়ার-পাঞ্জাবি পরে আছে।

মেয়েটি বসে আছে বেশ দূরে। আমাদের দেখতে পায়নি।

আজ সকাল থেকে মেয়েটির কথা মাঝে মাঝেই মনে পড়ছিল। স্বামীর সঙ্গে অত ঝগড়া হল, বাড়িতে ফিরবেই না বলছিল, ওর জন্য দুশ্চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক।

রশিদ অন্য পুলিশদের সঙ্গে মিটিং করছে, গান শুনতে আসেনি।

অমারও আর গানের দিকে মন নেই, কৌতূহল যেন একটা জীবন্ত প্রাণী হয়ে ছটফট করছে বুকের মধ্যে। এটা গল্প শোনার কৌতূহল, মানুষের আদিমকালের নেশা। মেয়েটা বাড়িতে ওব নিষ্ঠুর প্রকৃতির স্বামীর কাছে ফিরে গিয়েছিল, না অন্য কোথাও আশ্রয় নিয়েছে? ওরকম একটা কাণ্ড ঘটে গেল, তারপরেও এত তাড়াতাড়ি সে এই মেলায় গান শুনতে এসেছে? তাও আবার মাথায় ফুল গুঁজে।

শক্তি বলল, সেই হারামজাদাটাও তো এসেছে দেখছি!

একটু দূরে দাঁড়িয়ে মধুছন্দার স্বামী সিগারেট টানছে। তার গায়ে একটা টকটকে লাল জামা।

মধুছন্দা কি অন্য কারুর সঙ্গে এসেছে? ওর স্বামী ওর খোঁজ করার জন্য এসেছে আলাদাভাবে?

এ-সবই একটা গল্পর ছিন্ন অংশ। জোড়া দিতে না পারলে স্বস্তি নেই।

আমরা আর অন্য আখড়ায় যেতে পারছি না, মেয়েটির সঙ্গে একবার একটু কথা বলতেই হবে।

একজন বাউল গান শেষ করার পর অন্যজন উঠে যখন প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন শক্তি খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ডাকল, এই মধু, মধু—

একদিনের আলাপেই শক্তি অনেকেরই নাম ভেঙে ছোট করে নেয়, আর তুই-তুকারি করে।

একজন ছেলে আর মধুছন্দা ঘাড় ঘুড়িয়ে এদিকে তাকাল।

ছেলেটিকে অগ্রাহ্য করে শক্তি মধুছন্দাকে হাতছানি দিল।

মধুছন্দা কাছে এসে খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, ও মা, আপনারাও এই মেলায় এসেছেন? আগে বলেননি তো? আমি তো এই মেলায় প্রত্যেকদিন আসি।

কার সঙ্গে এসেছ?

আমার হাজব্যান্ড। সেও বাউল গান শুনতে খুব ভালোবাসে। নিজেও গায়।

সুজয় এসে দাঁড়াল কাছাকাছি।

মধুছন্দা এমনভাবে তার স্বামীর সম্পর্কে কথা বলল, যেমনভাবে সব সুখী দম্পতিই পরস্পর সম্পর্কে মন্তব্য করে। যেন কাল রাত্তিরে কিছুই ঘটেনি।

সুজয় অবশ্য আমাদের পাশে এল না, নিজের থেকে কোনও কথাও বলল না।

আমারও ওই লোকটির সঙ্গে কথা বলার কোনও প্রবৃত্তি নেই। ওর মুখের ভাষা খুব খারাপ। তাছাড়া, বউকে যারা মারে, সেইসব লোকের মুখের দিকে তাকাতেও আমার ইচ্ছে করে না।

আরও দু-চারটে কথার পর মধুছন্দা ফিরে গেল তার আগের জায়গায়। সুজয়ও একটাও কথা না বলে গেল তার পেছনে পেছনে।

ও কি দেখতে এসেছিল, আমরা ওর সুন্দরী বউকে ফুসলে কোথাও নিয়ে যাবার চেষ্টা করি কি না?

আমি শক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম, কাল রাত্তিরে ওরা অমন বিশ্রী ভাষায় ঝগড়া করল, তারপর একদিনের মধ্যে আবার ভাব হয়ে গেল। কী আশ্চর্য ব্যাপার না?

শক্তি বলল, হারামজাদাটা বউকে পেটায়। বেশ্যা-ফেস্যা মাগী কত কী বলল—

আমি বললাম, তারপর মধুছন্দা ফিরে গেল কী করে? ওর আত্মসম্মান বলে কিছু নেই?

শক্তি বলল, হোপলেস কেস! এ মেয়েছেলেটা কোনওদিন গায়িকা হতে পারবে না। আত্মসম্মান-জ্ঞান না থাকলে কেউ আর্টিস্ট হতে পারে?

আমি আর-একবার তাকালাম মধুছন্দার দিকে। ওর দাদা ওকে রেপ করার চেষ্টা করেছিল। বাপের বাড়িতে ফিরে যাবার কোনও উপায় নেই ওর। স্বামী ওকে সন্দেহ করে, মারে। সেই স্বামীর ঔরসে ওর দুটি সন্তান আছে। অর্থাৎ মেয়েটির জীবনটা ট্র্যাজেডিতে ভরা।

যারা এসব জানে না, তারা ভাববে স্বামীকে নিয়ে গর্বিত একটি সুখী মেয়ে। মাথায় ফুল গুঁজে এসেছে।

হয়তো এটাই ভালো। মেয়েটি আসলে অসহায়। মনের জোর নেই। সেই অসহায়ত্ব

ঢেকে রাখার জন্য সাজগোজ করেছে। মাথায় ফুল।

এখানে যতজন মেয়ে বসে আছে, তাদের অনেকেরই জীবনে হয়তো চাপা রয়েছে এরকম অনেক ট্র্যাজেডি। জানা আর না-জানার মধ্যে অনেক তফাত হয়ে যায়।

শুধু মেয়েদের কথা মনে হল কেন? অনেক পুরুষের জীবনেও গোপন ট্র্যাজেডি থাকে না? কত পুরুষের তো জীবনে কত জটিলতা থাকে, কত অপমান-নিষ্পেষণ অসহায়ভাবে সহ্য করে যেতে হয়, অথচ তা প্রকাশ করা যায় না। অথচ আজকাল নারীবাদীদের লেখা পড়লে মনে হয়, মেয়েরাই শুধু নির্যাতিত, আর সব পুরুষমানুষই বেশ মজায় আছে।

কিছুক্ষণ পর রশিদের তাঁবুতে ফিরে এসে দেখি, দুটি অল্পবয়েসি ছেলেমেয়ের সঙ্গে সে গল্প করছে। অল্পবয়েসি মানে, দু'জনেই বাইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে। দু'জনেই গেরুয়া রঙের আলখাল্লা পরা। মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। কপালে ও নাকে চন্দনের দাগ, একেই বোধহয় রসকলি বলে। তাদের হাতে চায়ের ভাঁড়।

রশিদ বলল, এসো আলাপ করিয়ে দিই। এই ছেলেটির নাম আকাশ দাস বাউল, আর মেয়েটির নাম মৃত্তিকা দাসী। এরা এই বছরেই প্রথম প্রকাশ্যে গান গাইছে। বেশ ভালো গলা।

আকাশ আর মৃত্তিকা? এ যেন রূপকের মতন।

আকাশের মুখে এখনও লেগে আছে কৈশোরের লাবণ্য। আর মৃত্তিকার ডাগর চোখদুটিতে যেন বিশ্বকে প্রথম দেখার বিস্ময়।

আমি আকাশকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বাড়ি কোথায়? এই বীরভূমে?

সে রিনরিনে গলায় বলল, না গো দাদা, আমার বাড়ি মরুভূমিতে।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, মরুভূমিতে? এদিকে মরুভূমি কোথায়?

সে বলল, কত মরুভূমি? তুমি দেখতে পাও না? কত সংসারই তো মরুভূমি। আর মানুষগুলো বাব্‌লা কাঁটার ঝাড়!

শক্তি একটু হেসে বলল, ওরে বাবা, এ যে ভাবের কথা বলে!

মেয়েটার দিকে তাকাতেই, কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলল, আমার জন্ম সমুদ্দুরে। কান্নার সমুদ্দুর!

আমি বললাম, বেশ! তোমাদের দু'জনের দেখা হল কোথায়?

মেয়েটিই বলল, এক গভীর জঙ্গলে। মনের ভুলে সেখানে আমি একলা ঢুকে পড়ে আর দিশা পাই না। কোন দিকে যাব, সব দিকই এক মনে হয়। বড় ডর লাগছিল গো দাদা। যদি বাঘ-সিংগি এসে আমায় খেয়ে ফেলে। একটা বুনো তেঁতুল গাছতলায় বসে কাঁদতেছিলাম, এমন সময় শুনি বংশীধ্বনি। তারপর দেখি এই কালো মানিককে। দেখামাত্র মনে হল, এ-ই আমার মনের মানুষ। এই মানুষ আমাকে ঠিক রাস্তায় নিয়ে যাবে।

ছেলেটি মুচকি হেসে বলল, সত্যি কথা বলতে কী, আমিও রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম। অনেক দিন ইচ্ছে ছিল, জঙ্গলে গিয়ে একটা চন্দন গাছ খুঁজব। কিন্তু কোথায় চন্দন গাছ, শুধু চতুর্দিকে দেখি নিষ্ফলা বৃক্ষ! এক জায়গায় দেখি, গভীর আঁধার হয়ে আছে। সেখানে কারা যেন ফিসফাস করছে। ভয়ে আমার বুক ঢিপঢিপ করতেছিল। খুব ভয় লাগলে আমি বাঁশি বাজাই। বাঁশির সুর আমায় পথ দেখায়। তারপর এক স্থানে গিয়ে দেখি এক তরুমূলে এই কাঞ্চন কন্যাটি বসে আছে। আরও দেখি যে, ওর কপালে মঙ্গলরেখা। তখনই আমার সব ভয়-ভাবনা দূরিত হয়ে গেল।

রশিদ তার বিখ্যাত খ্যাঁ খ্যাঁ করে জোরে হেসে উঠে বলল, এখানে দু'দুটো জাঁহাবাজ পোয়েট আছে, তারা কখনও এভাবে কথা বলতে পারে না! তরুমূলে, অ্যাঁ? কাঞ্চনকন্যা, অ্যাঁ? বিউটিফুল!

আকাশ বাউল এ-কথায় একেবারেই লজ্জা পেল না। এটাই যেন তার স্বাভাবিক ভাষা।

আকাশের গায়ের রং বেশ কালো। মেঘবর্ণও বলা যেতে পারে। আর মৃত্তিকা দাসী ঠিক কাঞ্চনবর্ণা না হলেও ফর্সার দিকেই, অনেকটা চালতা ফলের মতন।

এরা দুটিতে যেন কৃষ্ণ আর রাধা।

যদিও পুরাণ-অনুযায়ী রাধার বয়েস কিছুটা বেশি হওয়া উচিত, সে তো আসলে কৃষ্ণের মামিমা। কিন্তু ওসব আর কেউ এখন মনে রাখে না। এখন সব ছবি আর মূর্তিতে কৃষ্ণ-রাধা সমান বয়েসি।

এদের বেশ চমৎকার মানিয়েছে।

যেহেতু ওদের দু'জনের কথায় একটুও কৃত্রিমতা নেই। সহজ, সাবলীল, তাই ওদের নিয়ে ইয়ার্কি-ঠাট্টা করতে ইচ্ছে হল না।

শক্তি অবশ্য বলল, তোরা কী খেয়ে বেঁচে থাকিস রে? দখিনা পবন, না জ্যোৎস্নার আলো?

বিদ্রূপটা ঠিক বুঝতে না পেরে আকাশ বলল, যখন যা পাই, তখন তাই খাই। মানুষের খিদে বড় বেশি গো! ফল-পাকুড় খায়, পশু-পাখি খায়, আবার মানুষ মানুষকেও খায়।

মৃত্তিকা দাসী বলল, আমি মাটির হাঁড়িতে চাল ফুটিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোনও কিছুই রান্না করি না।

শক্তি বলল, ফ্যান গালিস না তো? ফ্যান-ভাত অতি উত্তম জিনিস। সঙ্গে আলু সেদ্ধ দিস তো? আর যদি দু-একটা ডিম ফেলে দিস, তারপর একটু ঘি দিয়ে, অতি অপূর্ব খাদ্য!

আকাশ বলল, আমরা ডিম খাই না, ঘিও খাই না। নেহাৎ অন্ন ভক্ষণ না করলে আমার কষ্ট হয়, তাই শুধু চাল ফুটিয়ে নেই।

শক্তি বলল, বেশ, তাও মন্দ না। সঙ্গে নুন আর কাঁচা লঙ্কা থাকে নিশ্চয়ই!

মৃত্তিকা হঠাৎ হি হি করে হেসে উঠল। এর মধ্যে হাসির খোরাক সে কী পেল কে জানে!

আমি বললাম, তোমরা ডালও খাও না? ডাল আবার কী দোষ করল? আমি একসময় একটা গান শুনেছিলাম :

ডাইল রান্ধো রে
কাঁচা মরিচ দিয়া
গুরুর কাছে লওগা মন্তর
বিরলে বসিয়া
ও মন ডাইল রান্ধো রে...

মৃত্তিকা বলল, এ ডাইল আমাদের খাবার ডাল নয় গো। এ হল পরমাত্মার সাধনা।

আমি অন্য একটি কৌতূহলে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের দু'জনের কেউ কি কখনও ইশ্‌কুল-কলেজে পড়েছ?

আকাশ দু'হাত তুলে বলল, এই জগৎসংসারের বিশ্ববিদ্যালয়ে অনবরত পাঠ নিয়ে চলেছি। আর কোনও গুরুগৃহে যাইনি।

এটা একটা ধরা-বাঁধা উত্তর।

তবু আমার সন্দেহ হল, অন্তত বইটই পড়ার মতন বিদ্যে ওদের আছে নিশ্চয়ই। একেবারে নিরক্ষর হলে কি এমন সাজিয়ে কথা বলতে পারে? অবশ্য আমি আগেও জায়গায় দেখেছি, গ্রামের মানুষ সাধারণ কথার মধ্যেও একটা কিছু তত্ত্বকথা খোঁজে। খাঁচা বললেই ভাবে দেহ-পিঞ্জর, ফল বলতেই বোঝে কর্মফল।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এই মেলায় তোমরা গান গাইবে? মেলা শেষ হলে কোথায় যাবে?

ওরা দু'জন পরস্পরের দিকে তাকাল।

তারাপর আকাশ বলল, জানি না!

মৃত্তিকা বলল, আগে তো মেলা শেষ হোক! তারপর চিন্তা করব। আগে থেকে চিন্তা করে কী লাভ গো দাদা!

আমার ইচ্ছে হল, মেয়েটিকে একবার জড়িয়ে ধরে একটু আদর করি। তিনদিন পর কোথায় যাবে, তা সে এখন চিন্তা করতে চায় না। আমরা যদি এরকমভাবে তৈবি করে নিতে পারতাম জীবনটাকে!

রশিদ বলল, মেলার চ্যাঁচামেচির বদলে এখানে ওদের গান শুনে নাও খালি গলায়। সেই গানটা করো তো, বৃন্দাবন বিলাসিনী—

এটা একটা পুরোনো গান। শুক-সারি সংবাদ। ওদের দু'জনের গলাতেই বেশ সুর আছে। গানের সঙ্গে শরীর দুলিয়ে নাচ, ভুরু কাঁপানো অভিনয়।

বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের
রাই আমাদের, রাই আমাদের, শ্যাম তোমাদের!
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূরপাখা
সারি বলে, আমার রাধার নামটি তাহে লেখা
ঐ যে যায় যে দেখা
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু
সারি বলে, আমার রাধা বাঞ্ছা কল্পতরু
তবে কে কার গুরু!...

দু'খানা গান শোনবার পর রশিদ ওদের একটা পঞ্চাশ টাকার নোট দিতে চাইলে আকাশ জিভ কেটে বলল, আমাদের আজ পেটপুরে ভোজন হয়ে গেছে। টাকা নিয়ে কী করব গো দাদা! মাথাটা ছুঁয়ে একটু আশীর্বাদ করে দ্যান শুধু।

টাকা দেখে মৃত্তিকার মুখে রাগ রাগ ভাব ফুটে উঠেছে!

সত্যিই, এইরকম ভাব, টাকা-পয়সার পরোয়া না করে কেউ কেউ এখনও জীবন কাটাতে চায়? কতদিন পারবে?

ওরা তিনদিন পরের কথাও ভাবে না আর আমি ভাবছি, কতদিন পারবে? ছিঃ!

হাত ধরাধরি করে ওরা দু'জন যখন তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল, তখন আমার মনে হল, এত সুন্দর দু'জন মানুষ আমি বহুদিন দেখিনি।

একটু আগে, মধুছন্দা আর তার নিষ্ঠুর স্বামীটিকে দেখে মনের মধ্যে যে-গ্লানি জন্মেছিল, এদের দু'জনকে দেখে তা কেটে গিয়ে বেশ একটা নির্মল আনন্দ বোধ করলাম। ভাগ্যিস রশিদ ওদের ডেকে এনেছিল, তাই বাউল সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ ধারা সম্পর্কেও আশাবাদী হওয়া গেল।

পরদিন শান্তিনিকেতন খানিকটা ছুঁয়ে ফিরে গেলাম চুঁচড়োয়। শক্তির এখনই কলকাতায় ফেরার মন নেই। সে আরও কিছুদিন এদিকে ঘোরাফেরা করতে চায়। আমি একাই উঠে পড়লাম ট্রেনে।

মাঝপথে শুরু হল বৃষ্টি।

শীতকালে সচরাচর এমন বৃষ্টি হয় না। কিন্তু আজকাল ডিপ্রেশান অর্থাৎ নিম্নচাপ বস্তুটিকে একেবারেই বিশ্বাস নেই। প্রকৃতিই কি পালটে যাচ্ছে? শীতকালে এমন ঝড়-বৃষ্টি বাপের জন্মে দেখিনি।

হাওড়া স্টেশানে পৌঁছোলাম রাত পৌনে দশটায়। প্ল্যাটফর্মগুলোতে এখন জনারণ্য। কেউ বৃষ্টির জন্য বাইরে বেরুতে পারছে না। এ-সময় ট্যাক্সি পাওয়া খুব মুশকিল।

কলকাতায় ফিরে বাড়ি পৌঁছোতে দেরি হলে খুব অস্থির অস্থির লাগে। লাইনে একটাও ট্যাক্সি নেই। বৃষ্টির মধ্যে ছোটাছুটি করতে করতে শেষ পর্যন্ত একটা শেয়ারের

ট্যাক্সি পাওয়া গেল। এর মধ্যে জামা-প্যান্ট একেবারে ভিজে গেছে।

শেয়ারের ট্যাক্সিটা আমাকে গড়িয়াহাট মোড়ে নামিয়ে দিল। বাড়ির কাছে যাবে না। এখনও বৃষ্টি পড়ছে, তেমন তোড়ে না হলেও।

এদিকে আবার লোডশেডিং।

আমাদের ফ্ল্যাটবাড়িতে জেনারেটর আছে বটে, কিন্তু রাত দশটার পর আর চালাবে না। তাহলে কি হেঁটে উঠতে হবে দশতলায়?

গেটের দারোয়ান আমাকে এত ভেজা অবস্থায় দেখে বলল, স্যার, সাড়ে দশটা বাজে, এখন তো আর জেনারেটর চালাতে পারব না। একটু বসে যান না, কারেন্ট এসে যাবে একটু পরেই।

সে-কথায় কর্ণপাত না করে আমি জেদ করে উঠতে লাগলাম সিঁড়ি দিয়ে। যদি উঠতে উঠতে হার্ট অ্যাটাক-ফ্যাটাক হয়ে যায় তো হোক! এইরকম সময় মনে হয়, স্বাতী কেন শখ করে দশতলায় ফ্ল্যাট নিতে চাইল? চার-পাঁচ তলা হলে তবু উঠতে অসুবিধে হয় না।

দশতলায় এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বেল দিলাম দরজায়।

দু'বার, তিনবার, চারবার, কেউ সাড়া দিচ্ছে না! মানুষের ধৈর্যের তো একটা সীমা থাকবে! এবার কি দরজায় লাথি মারব? উৎপল গেল কোথায়? স্বাতী নিশ্চিত বাথরুমে, কিংবা টিভি দেখছে।

তারপরই মনে পড়ল, এখন তো লোডশেডিং, কলিং বেল বাজবে কী করে? টিভিও চলবে না। তবে কি স্বাতী ঘুমিয়ে পড়েছে? দরজায় ধাক্কা দিলেও তো শুনতে পাবে না। তাহলে?

অবশ্য আমি যে আজই ফিরব কিংবা কখন, তা কিছু জানাইনি।

তারপর একটি অলৌকিক কাণ্ড ঘটল।

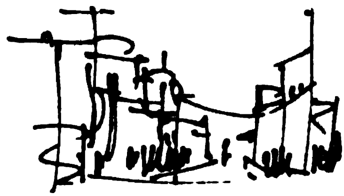
দরজা খুলে দিল একটি রমণী। প্রথমে মনে হল অচেনা।

তারপরেই চিনতে পারলাম। এ তো আমাদের আনোয়ারা। ঢাকার শামীমের স্ত্রী। সে ফিরে এসেছে?

আমি বললাম, আরে! কী দারুণ সারপ্রাইজ!

আনোয়ারা কিন্তু আমার সঙ্গে একটাও কথা বলল না। দরজা খুলে দিয়ে ধীরপায়ে হেঁটে গিয়ে বসল একটা সোফায়। নিচু করে রইল মুখখানা।

১৪



মাত্র ন'মাসে একজন মানুষ এতখানি বদলে যেতে পারে? শরীরে নয়, ব্যবহারে?

আমাদের পুরো বাড়ির জন্য তখনও জেনারেটর বসানো হয়নি বটে, তবে আমাদের ফ্ল্যাটে ইনভার্টার ছিল, তাতে দুটো আলো বা পাখা চলে। বসবার ঘরে জ্বলছে একটা আলো।

আমার সর্বাঙ্গ বৃষ্টিতে ভেজা, লোডশেডিংয়ের জন্য দশতলা সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়েছে, খুবই ক্লান্ত এবং বিরক্ত অবস্থায় পৌঁছে আচমকা আনোয়ারাকে দেখতে পেয়ে যেন এক মুহূর্তে শরীরটা স্নিগ্ধ হয়ে গেল।

যখন আকস্মিকতার সঙ্গে মিশে থাকে বিস্ময় ও আনন্দ, তখন পুরো ঘটনাটা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগে। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। যে-মেয়েটি আমাকে দরজা খুলে দিয়ে সোফায় গিয়ে বসল নতমুখে, সে কি সত্যি আনোয়ারা?

হালকা সবুজ রঙের সালোয়ার-কামিজ পরা, মাথার চুল খোলা, দু'হাতে কিংবা কানে কোনও অলংকার নেই। শরীরের গড়ন ঠিক যেমন দেখেছি ন'মাস আগে, হয়তো সামান্য একটু রোগা হয়েছে।

জুতো খুলে ভেতরে এসে আমি বললাম, আনোয়ারা! তুমি কবে ফিরেছ?

মুখ না তুলেই সে বলল, আজ।

আমি বললাম, আজই? কখন?

একইভাবে বসে থেকে, ভাবলেশহীন গলায় সে বলল, সকালে।

তুমি আগে থেকে খবর দিয়েছিলে? তোমাকে কেউ এয়ারপোর্টে আনতে গিয়েছিল?

না।

কোথায় ছিলে এতদিন? সৌদি আরবে?

জ্বী।

আমরা কেউ তোমার কোনো খবর পাইনি। এত চিন্তা করেছি, তুমি একটাও চিঠি লেখোনি কেন? যাক, তুমি ফিরে এসেছ, এটাই সবচেয়ে বড় কথা। ওখানে কেমন ছিলে?

ভালো।

একবারও আমার দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছে না আনোয়ারা। কাটা কাটা উত্তর দিচ্ছে। গলার আওয়াজও যেন বদলে গেছে অনেকটা।

ফ্ল্যাটটা বড় বেশি নিস্তব্ধ লাগছে। টিভি বন্ধ। স্বাতী কোথায়?

আনোয়ারাকে সে-কথা জিজ্ঞেস করতেই সে মুখে কিছু না বলে ফ্রিজটা দেখিয়ে দিল।

স্বাতী প্রায়ই অভিযোগ করে, আমি যখন বাইরে কোথাও যাই, তখন আর বাড়ির কথা আমার নাকি মনেই থাকে না।

মনে থাকে ঠিকই, কিন্তু টেলিফোনে খবর-টবর দিতে ভুলে যাই।

কোনও কোনও মানুষ আছে, তারা কোথাও গিয়ে একটা টেলিফোন যন্ত্র দেখলেই দৌড়ে গিয়ে ঝপাৎ করে রিসিভারটা তুলে নম্বর ঘোরাতে শুরু করে। দরকার থাক বা না থাক। সেই তুলনায় আমি ফোন-নিস্পৃহ।

চুঁচড়োয় থাকবার সময় একবার রশিদই ফোন করেছিল স্বাতীকে, তখন আমি দু'একটা কথা বলেছি। তারপর আর কবে কখন ফিরব, তা জানানো হয়নি।

স্বাতীকে কোনও কারণে অসময়ে বাইরে যেতে হলে ও আমাকে চিঠি লিখে রেখে যায়। সে-চিঠি একটা ম্যাগনেট দিয়ে ফ্রিজের গায়ে আটকানো থাকে।

কাছে গিয়ে পড়লাম :

আমাকে বিশেষ কারণে রঞ্জার বাড়িতে যেতে হচ্ছে। সেখানে একটা গুরুতর ব্যাপার হয়েছে, আমার যাওয়া দরকার। ফিরতে দেরি হতে পারে। উৎপলের জ্বর হয়েছে, ও ওর দিদির বাড়ি চলে গেছে। আনোয়ারা রইল। তোমার চা খেতে ইচ্ছে হলে নিজে বানিয়ে নাও। আর খিদে পেলে মুড়ি-বাতাসা খাও!

'মুড়ি-বাতাসা'টা নিতান্তই কথার কথা। আজকাল কোনও বাড়িতেই বাতাসা থাকে না। আর রান্নাঘরের হাজারটা কৌটোর মধ্যে কোনটা মুড়ির তা খুঁজে বের করার ধৈর্য আমার নেই।

অথচ খিদে পেয়েছে ঠিকই। তার চেয়েও বেশি তৃষ্ণা।

আনোয়ারাকে বললাম, তুমি একটু বসো। আমি জামা-টামা বদলে আসছি।

বাথরুমে গিয়ে সবকিছু খুলে ফেলে জল-ঝারি খুলে দাঁড়ালাম তার তলায়। আজ আর দিনের বেলা স্নান হয়নি। বৃষ্টিভেজার পর একটু সাবান মাখাও বেশ উপকারি।

বাথরুমের নিভৃতিতে অধিকাংশ মানুষই অতীত-ভীবষ্যৎ নিয়ে কিছু না কিছু চিন্তা করে। যদি না ঘটমান বর্তমানে কোনও সংকট থাকে।

আমার প্রথমেই মনে পড়ল, রাত সাড়ে দশটার বেশি বেজে গেছে। এত রাত পর্যন্ত তো স্বাতী সাধারণত বাড়ির বাইরে থাকে না। একতলায় আমাদের গাড়িটা রয়েছে দেখছি। তার মানে কি ট্যাক্সি নিয়ে গেছে? কলকাতায় অবশ্য মেয়েদের

চলাফেরার ব্যাপারে দুশ্চিন্তার তেমন কিছু নেই, তবু কী ঘটেছে রঞ্জাদের বাড়িতে?

রঞ্জা অর্থাৎ রঞ্জাবতী স্বাতীর বাল্যবান্ধবী। গুণী মহিলা, ভালো গান গাইতে পারে আবার যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে তুলনামূলক সাহিত্য পড়ায়। ওর স্বামীও বেশ গুণী কিন্তু তুলনায় তার চরিত্রে দোষের মাত্রাটা অনেক বেশি। বিনায়ক অনেকগুলো পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে, এখন প্রাইস ওয়াটারহাউজ নামে বিদেশি কোম্পানিতে খুব উচ্চ চাকরি করে, প্রভূত রোজগার, সল্টলেকে অত্যাধুনিক কায়দার বাড়িতে থাকে ওরা। বিনায়ক অতি বাড়াবাড়ি রকমের মদ্যপ। প্রতি রাতেই বাড়িতে এসে খুব দাপাদাপি করে, রঞ্জাবতীকে নাকি কখনও চড়-চাপড় মেরেও বসে। পরদিন সকালেই অবশ্য পায়ে ধরে ক্ষমা চায়। এই জন্য ওদের বিবাহ-বিচ্ছেদের উপক্রম হয় প্রায়ই। বিনায়ক নিজেকে শোধরাবার চেষ্টাও করে। এর মধ্যে একবার অ্যালকোহলিক অ্যানোনিমাস ক্লাবে ভর্তিও হয়েছিল, সেখানে কী-সব প্রার্থনা-ট্রার্থনার মাধ্যমে মদের নেশা ছাড়াবার ব্যবস্থা আছে শুনেছি। সে-সময় কয়েক সপ্তাহ বিনায়ক বেশ ভালোই ছিল। (ঠিক ভালোও বলা যায় না, তখন বিনায়ক মদও খায় না, কারুর সঙ্গে কথাও বলে না, সন্ধের পর থেকে একটি বই মুখের সামনে নিয়ে বসে থাকে।) তারপর আবার একদিন বিনায়ক রুদ্ররূপ ধারণ করল, সকাল থেকে শুরু করল মদ্যপান।

এখন রঞ্জার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি চরম আকার ধারণ করলে বিনায়ক নিজেই আবার ক্ষমাটমা চেয়ে চুপচাপ থাকে, বোতলের দিকে হাত বাড়ায় না। তারপর আবার। আমার ধারণা এইরকমই চলবে আরও বহুদিন। ওদের বিচ্ছেদ হবে না। সাধারণত শিক্ষিত দম্পতির মধ্যে তৃতীয় একজনের দৃঢ়ভাবে অনুপ্রবেশ না ঘটলে অন্য কোনও কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় না।

ওদের দুটি ছেলে-মেয়ে, তাদের মধ্যে মেয়েটি বেশ বড়, উনিশ-কুড়ি বছর বয়েস তো হবেই। বিনায়ক এত মদ্যপান করেও চাকরিটা যখন রক্ষা করে যাচ্ছে, তখন বিয়েটাও টিকিয়ে রাখতে পারবে মনে হয়। আজ আবার এমন গুরুতর কী ব্যাপার ঘটল?

টাটকা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে এসে আমি প্রথমই একটা গেলাশে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে সোডা-জল মিশিয়ে নিলাম। তারপর বসবার ঘরে এসে দেখি, আনোয়ারা একইরকমভাবে মাথা নিচু করে বসে আছে।

আমি ওর পাশের সোফায় বসে হালকা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর বেগম সাহেবা, বলো, ওখানে গিয়ে কী অ্যাডভেঞ্চার করলে? চাকরি করতে ওখানে?

আনোয়ারা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

কী চাকরি?

এবার কোনও উত্তর নেই।

তুমি কি একলা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে, না অন্য কারুর সঙ্গে?

আবার মাথা নাড়ল। তাতে ঠিক কোন উত্তরটা দিল, বোঝা গেল না।

আবার জিজ্ঞেস করলাম, ওখানে কি রোজ ভাত খেতে? খাওয়াব কোনও অসুবিধে হতো না?

এবার দু'দিকে মাথা নাড়া।

এখানে তুমি খেয়েছ কিছু? উৎপলের তো জ্বর, স্বাতী তোমাকে খাবার দিয়ে গেছে?

কোনও শব্দই খরচ করতে চায় না আনোয়ারা, শুধু মাথা নেড়ে উত্তর।

আনোয়ারাকে আমি যতবার দেখেছি, হয় ও উঁচুগলায় বেশি কথা বলেছে, জোরে জোরে হেসেছে কিংবা কেঁদেছে। ছোট-বড় বিবেচনা না করে মারতেও গেছে। অতিরিক্ত প্রাণশক্তিতে ভরপুর। সেই মেয়ের এখন হল কী?

আমি কৌতুকছলে, একটু ঝুঁকে এসে, ওর থুতনিতে হাত ছুঁইয়ে বলতে গেলাম, কী গো, মুখই তুলছ না। আমার দিকে তাকাতেই চাইছ না কেন?

আমি হাত ছোঁয়ানোর আগেই আনোয়ারা ছিটকে সরে গেল সোফার অন্য পাশে। ভয়ে ওর মুখখানা কুঁকড়ে মুকড়ে গেছে।

আর্ত গলায় বলে উঠল, না, না, আমারে ধরবেন না, আমারে ধরবেন না!

তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে আবার ফ্যাকাসে গলায় বলল, বাড়িতে আর কেউ নাই!

কেউ আমার দিকে জুতো তুললেও বোধহয় আমি এতটা অপমানিত বোধ করতাম না। মেয়েটা বলে কী? 'বাড়িতে আর কেউ নাই'? সত্যিই আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই। দরজা বন্ধ। কিন্তু আমরা তো সভ্য সমাজের মানুষ।

ও কী ভেবেছে, এই সুযোগ নিয়ে আমি ওর গায়ে হাত দেব? আমার সম্পর্কে এই ধারণা! ওর জন্য আমি আর স্বাতী কত দুশ্চিন্তা করেছি, কত জায়গায় ওর খোঁজ করতে গেছি!

মুখটা হঠাৎ যেন তেতো হয়ে গেল।

এর সঙ্গে তো আর কথা বলার কোনও কারণই নেই। তবু যথাসম্ভব সংযতভাবে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি রাত্তিরে কিছু খাবে?

সে দু'দিকে মাথা নাড়ল।

এবারে ধৈর্য হারিয়ে আমি খানিকটা ধমকের সুরে বললাম, তাহলে আর এখানে বসে আছ কেন? যাও, শুয়ে পড়! দরজা বন্ধ করে দিও!

সে কোনও উত্তর দিল না, খানিকটা ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার হুইস্কির গ্লাসটার দিকে।

ঢাকায় শামীমদের বাড়িতে যে-কয়েকবার গেছি, অত্যুৎকৃষ্ট স্কচ পরিবেশিত হয়েছে। ওই গৃহের আড্ডায় নিয়মিত পানীয়-চর্চা হয়। আনোয়ারাকেও দেখেছি, একটু-আধটু রেড ওয়াইন সেবন করতে।

সৌদি আরবে মদ্যপান নিষিদ্ধ, আমরা জানি। সেখানে কয়েক মাস থেকেই

আনোয়ারা সুরাবিরোধী হয়ে উঠেছে?

কিন্তু আমার বাড়িতে তো সৌদি আরবের আইন খাটবে না।

ওকে আর কিছু না বলে আমি গেলাসটা হাতে নিয়ে উঠে গেলাম খাওয়ার টেবিলের কাছে। এগারোটা বেজে গেল, স্বাতীর খোঁজ নিতেই হবে। টেলিফোনের খাতাটা কোথায়?

মাথার মধ্যে রাগ বা বিরক্তি থাকলে অতি প্রয়োজনীয় জিনিসটা খুঁজে পেতে অকারণে অনেকটা দেরি হয়।

সাতখানা ড্রয়ার খুলে ঘাঁটাঘাঁটির পর দেখা গেল টেলিফোনের খাতাটা বহাল তবিয়তে পড়ে আছে একেবারে পাশের টুলটার ওপর।

রঞ্জাদের বাড়ির টেলিফোন বাজতেই লাগল, কেউ ধরে না।

তারপর একজন ধরল, সে-লোকটি হিন্দিভাষী।

স্বাতী ওখানে হ্যায়? নেই হ্যায়। বহুদিদি হ্যায়? নেই হ্যায়। মিস্টার দত্ত বা মিসেস দত্ত, কই হ্যায়? নেই হ্যায়!

এ তো মহা মুশকিল। খুব সম্ভবত ও বাড়ির দারোয়ান। সে-রকম একজনকে দেখেছি বটে একদিন। লোকটি দেখছি নেই হ্যায় ছাড়া আর কিছু বলতেই জানে না।

আবার জিজ্ঞেস করলাম, আরে ভাইয়া, কোঠিমে কোই ভি হ্যায়?

সে বলল, কোঠিমে কোই নেই হ্যায়!

সত্যিই ও বাড়িতে কেউ নেই? তাহলে স্বাতী গেল কোথায়?

ওর কোনও বোনের বাড়িতে গেছে? তাহলে স্বাতী তো সে-কথাই লিখে যেত। এত রাতে আমার কোনো শ্যালিকাকে তার দিদির খবর জিজ্ঞেস করলে ঘাবড়ে যাবে না তো?

ছোট শ্যালিকাটি ডাকাবুকো ধরনের, সে সহজে ঘাবড়ে যাবার পাত্রী নয়।

খুকুমাকে ফোন করতেই ওর ছেলে বলল, মা তো বেরিয়ে গেছে ছোট্টিমার সঙ্গে। ছোট্টিমা-ই এসে ডেকে নিয়ে গেলেন।

কতক্ষণ আগে বলো তো?

একঘণ্টা কি দেড়ঘণ্টা আগে।

কোথায় গেছে বলতে পার?

জানি না। না, না, ছোট্টিমা বলছিলেন, সল্টলেকে।

ছোট্টিমা অর্থাৎ স্বাতী। রাত হয়েছে বলে সে একা না গিয়ে ছোটবোনকে সঙ্গে নিয়েছে। তাহলে এটা নেমন্তন্ন-টন্নর ব্যাপার নয়। রঞ্জাদের বাড়ি যদি হয়, সে-বাড়িতেও কেউ নেই কেন?

আর কোনও কিছু চিন্তা করার অবকাশ নেই।

দ্বিতীয় একটা চাবির গোছা থাকে 'চিনি' লেখা একটা কৌটোয়। ভেতরের ঘর থেকে কিছু টাকা নিয়ে এলাম।

তারপর দেয়ালের উদ্দেশে বললাম, আমি এখন বেরিয়ে যাচ্ছি, কখন ফিরব ঠিক নেই!

আমাদের ড্রাইভারকে রাত্তির দুটো-তিনটে পর্যন্ত থাকতে বললেও সে থাকে। কোনো আপত্তি করে না। কিন্তু তাকে একবার ছুটি দিয়ে দিলে আবার খবর দিয়ে আনানো খুব শক্ত। মহেন্দ্র এমনিতেই ন'টা পর্যন্ত বসে থাকে, ওকে ছুটি দেবার পরেই স্বাতী নিশ্চয়ই সল্টলেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণটা আকস্মিক।

গাড়িটা পড়ে আছে। আমি অনেকদিন চালাই না। এখন অতদূর যেতে ভরসা হয় না। তবে এই রকম পরিস্থিতিতে আফসোস হয়, গাড়ি চালানো প্র্যাকটিস রাখাই উচিত ছিল। অবশ্য পাতাল রেল হয়ে যাবার পর ট্যাক্সি এখন পাওয়া যায় যখন-তখন, আগেকার মতন চালকরা আর এদিক যাব না, ওদিক যাব না, এইসব বায়নাক্কা করে না।

সামাজিকতা রক্ষা করতে আমি রঞ্জাবতী-বিনায়কদের নতুন বাড়িতে গেছি মাত্র দু'বার। মহেন্দ্র গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সল্টলেকে ঠিকানা খুঁজে বাড়ি বের করা বেশ শক্ত, রাত্তিরবেলা আমার পক্ষে আরও শক্ত হবে। এত রাত্রে ওখানকার রাস্তায় কোনও জন-মনুষ্য থাকে না, কারুকে কিছু জিজ্ঞেস করার উপায় নেই।

যতদূর মনে আছে, সাত নম্বর ট্যাঙ্কের পাশে ডানদিকে গোটা দুয়েক রাস্তা ঘুরে একটা পার্কের কাছে। বেশ কয়েকবার ঘুরপাক খাবার পর ট্যাক্সি-ড্রাইভার শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারল।

গোটা বাড়ি অন্ধকার, শুধু সামনের ঘরটায় আলো জ্বলছে। গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে দারোয়ান। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই চোখ পড়ল বারান্দায়, সেখানে একটা থাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে রঞ্জার বারো-তেরো বছরের ছেলে টিপু!

তার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটা দেখেই আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মনে হল, এ বাড়িতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে। কার? বিনায়ক না রঞ্জার?

আমি গেট খুলে জিজ্ঞেস করলাম, টিপু, বাড়িতে আর কেউ নেই? তোমার বাবা কোথায়?

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে টিপু বলল, বাবা দিল্লিতে।

অফিসের কাজে বিনায়ককে প্রায়ই দিল্লি যেতে হয়। এত মদ্যাসক্তি সত্ত্বেও সেখানে সে কী করে কাজকর্ম করে, তা কে জানে! মোটকথা, আজ এ-বাড়িতে সে কোনও কুকীর্তি করেনি।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মা কোথায়? স্বাতীমাসি এখানে এসেছিল?

গেটের কাছে এসে টিপু আঙুল দেখিয়ে বলল, সব্বাই ওখানে আছে। তুমি তাড়াতাড়ি যাও!

আমি বুঝতে না পেরে আবার জিজ্ঞেস করলাম, ওখানে মানে?

এবার দারোয়ানও ডানদিকে হাত দেখিয়ে বলল, হুঁয়া দেখতা হ্যায়, দুটো বড়াবড়া বাত্তি—

ট্যাক্সিটা ছাড়িনি, ঝট করে উঠে পড়ে বললাম, চলো—

তিনটে মোড় পেরিয়ে সেই বাতিওয়ালা বাড়ি, সেটা একটা নার্সিং হোম, সামনে একটা পুলিশের গাড়ি।

ভেতরের লবিতে বেশ ভিড়, তার মধ্যে দেখতে পেলাম স্বাতী আর খুকুমাকে। যথাসম্ভব অনুত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে রঞ্জার?

খুকুমা বলল, রঞ্জাদির কিছু হয়নি।

তার মানে? তোমরা এখানে—

শ্রেয়া সুইসাইড অ্যাটেম্‌ট করেছে।

কে?

এ-প্রশ্নটা এমনি এমনি মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। শ্রেয়া কে, তা তো আমি জানিই। রঞ্জার মেয়ে, তার ডাকনাম মউ।

কেন?

এ-প্রশ্নটাও অবান্তর। আত্মহত্যার কারণ সঙ্গে সঙ্গে জানা যায় না। শ্রেয়া তার মায়েরই মতন পড়াশুনোয় ব্রিলিয়ান্ট। সুতরাং তার খারাপ রেজাল্টের জন্য বকুনি খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া এখন কোনও পরীক্ষাও নেই। শ্রেয়া সদ্য এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছে।

স্বাতীর মুখখানা থমথম করছে। আমাদের মেয়ে নেই, শ্রেয়াকে সে নিজের মেয়ের মতনই ভালোবাসে।

উনিশ বছরের মেয়ে এক অত্যাশ্চর্য প্রাণী। তাদের হৃদয়টা পারদের, অর্থাৎ ধাতুর, কিন্তু তরল, নির্দিষ্ট কোনও আকার নেয়নি। আর শরীরটা কাচের, যে-কোনও সময় ভেঙে যেতে পারে।

অন্য কেউ ওদের মন বুঝতে পারে না। এমনকী নিজের মা-বাবাও না।

খুকুমার কাছ থেকে জানতে চাইলাম, গলায় দড়ি, না আগুন?

কোনওটাই নয়। বিষ। কোথা থেকে জোগাড় করল, ঠিক কখন খেয়েছে, জানা যায়নি। দরজা বন্ধ। রঞ্জা সন্ধেবেলা একবার দেখিয়েছিল, টিপু অনেকবার ডাকলেও তার দিদি দরজা খোলেনি, কোনও সুইসাইড নোটও লেখেনি শ্রেয়া।

ডাক্তাররা ওর পেট পাম্প করেছে, কিছুই প্রায় বেরোয়নি। বিষের ধরনটাও বোঝা যাচ্ছে না। জ্ঞান ফিরছে না কিছুতেই। আটচল্লিশ ঘণ্টা না কাটলে—

বিনায়ককে খবর দেওয়া হয়েছে?

খুকুমা বলল, হ্যাঁ। কিন্তু এতরাতে তো দিল্লি থেকে ফেরার উপায় নেই। কাল

সকালের আগে–। বিনায়কদাকে অবশ্য বলা হয়েছে, সাইকেল অ্যাকসিডেন্ট, তেমন কিছু নয়, তবু তাই শুনেই বিনায়কদা কাঁদতে আরম্ভ করেছিল।

স্বাতী ভেতরে চলে গেছে। আমাকে কি একবার দেখতে দেবে?

খুকুমা বলল, কারুকেই ও. টি. তে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। রঞ্জাদিও দরজার বাইরে বসে আছে। চলুন, সেই পর্যন্ত যাই।

রঞ্জা ঠিক যেন একটা পাথরের মূর্তি। চোখের পলকও পড়ছে না যেন। স্বাতী তার পাশে দাঁড়িয়ে।

একটি সুন্দর, স্বাস্থ্যবতী, সচ্ছল পরিবারের মেয়ে, পডাশুনোয় উজ্জ্বল, সে কেন তার জীবনটা শেষ করে দিতে চাইবে? এ-প্রশ্নটাই ঘুরতে থাকে মনের মধ্যে।

বাবা-মায়ের ঝগড়া সে সহ্য করতে পারেনি? কিন্তু আজ তো সে-রকম কিছু ঘটেনি। তাছাড়া যতদূর শুনেছি, বিনায়ক তার ছেলেকে খুবই ভালোবাসে।

কোনও যুবক তার হৃদয়টা মুচড়ে দিয়েছে? ভাবতেই ভয় করে।

এই বয়েসটাই যে সাংঘাতিক। এই বয়েসে জীবনের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা যায় না। মনুষ্যজন্ম যে একবারই মাত্র পাওয়া যায়, তাও মনে থাকে না, আত্মহত্যার ঘটনা এই বয়েসেই সবচেয়ে বেশি হয়।

রঞ্জার বাবা নেই। মা থাকেন আসানসোলে দাদার কাছে। বিনায়কের নিকটজনেরাও থাকে বিদেশে। বন্ধুদের ওপরেই ভরসা।

বিনায়ক এখানে নেই, আমাকে পায়নি, রশিদকে পায়নি, অমিতাভ নামে ওদের আর-এক বন্ধুকেও খোঁজাখুঁজি করেছিল, সেও বেড়াতে গেছে দার্জিলিং। একজন পুরুষমানুষও পাশে নেই।

একটু বাদে স্বাতী বলল, আমি আর খুকুমা আজকের রাতটা রঞ্জার পাশেই থাকব। তুমি বরং বাড়ি ফিরে যাও। আনোয়ারা একা আছে।

আনোয়ারা সম্পর্কে আমার মনটা বিরূপ হয়ে আছে। ওরকম অদ্ভুত ব্যবহার করছিল, ওর সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে রাত কাটাবার আমার একটুও ইচ্ছে নেই।

যদিও ক্লান্ত শরীরটা একটা বিছানা চাইছিল, তবু আমি বললাম, না, আমিও থেকে যাই, যদি কিছু ওষুধ-টষুধ আনতে হয়। আনোয়ারাকে বলে এসেছি শুয়ে পড়তে।

বিরক্তি গোপন করতে না পেরে আমি আবার বললাম, গয়না-টয়নাগুলো ফেরত দিয়ে কালকেই ওকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিতে হবে। ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আমরা আর থাকতে চাই না।

স্বাতী কোনও মন্তব্য করল না।

নার্সিং হোমের বাইরে এসে আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

খুব খানিকটা বৃষ্টি হয়েছে বলে বাতাস এখন ঠান্ডা। এতরাতে এই অঞ্চলে গাড়ি-টাড়ি চলে না, চতুর্দিক একেবারে নিস্তব্ধ।

মেয়ের দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দিল্লিতে এখন বিনায়ক কী করছে? আজ কি মদ খেয়েছে খুব? ভোরবেলা ওকে ফ্লাইট ধরতে হবে।

আমার চোখে একটা দৃশ্য ভেসে উঠল।

একদিন ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে গাড়িতে যাচ্ছিলাম দমদমের দিকে, উলটোদিকের রাস্তায় দেখি সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে একটি তরুণী, জিনসের ওপর টকটকে লাল রঙের টি-শার্ট পরা। দ্বিতীয় দৃষ্টিপাতে চিনতে পারলাম, সে শ্রেয়া, ঝলমলে মুখ, এ যেন যৌবনের শ্রেষ্ঠ রূপ। আমার দিকে সে হাত নাড়ল। একটা ফিল্মে দেখেছিলাম, সোফিয়া লোরেন ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে যেন শ্রেয়ার খুব মিল, যদিও সাইকেল চালাচ্ছে সে।

সেই শ্রেয়া এখন অপারেশন টেবিলে শুয়ে আছে জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে।

রাস্তার ওপাশে একটা সিমেন্টের বেঞ্চ মতন রয়েছে, বসলাম গিয়ে সেখানে। ঘড়ি পরার অভ্যেস নেই। তবু আকাশ দেখে বোঝা যায়, রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

কখন সেই সিমেন্টের বেঞ্চে শুয়ে পড়েছি, ঘুমও এসে গেছে তা খেয়াল নেই।

একসময় মনে হল, কে যেন নরম হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আমার মাথায়।

সত্যিই কেউ, না বাতাস? এইরকম সময় টুকরো টুকরো স্বপ্নের অনেকরকম খেলা চলে। একবার মনে হল, আমার মাথায় মায়ের হাত। পরের মুহূর্তেই অন্য স্বপ্ন, আমি যেন নদীর জলে ভাসছি। তারপরই মনে হল, স্বয়ং দেবী সরস্বতী আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন আর মৃদুস্বরে ডাকছেন, সুনীলদা, উঠুন!

আমার এত বয়েস হয়ে গেল যে আমি দেবী সরস্বতীরও দাদা!

চোখ মেলে দেখলাম, সরস্বতী-টতি নয়, খুকুমা।

এখনও ভালো করে ভোর হয়নি, একটু একটু আলো মিলে ফিকে হয়ে আসছে অন্ধকার। তার মধ্যেই খুকুমার মুখখানা দেখে আমার বুকটা ধক করে উঠল।

খুকুমা বলল, সুনীলদা, উঠুন, শ্রেয়া আর নেই।

এসব কথা একবার শুনলে মানে বোঝা যায় না।

নেই মানে?

খুকুমা বলল, মিনিট দশেক আগে ওর সবকিছু থেমে গেছে।

সত্যি সত্যি চলে গেল মেয়েটা? ওর মায়ের এত ব্যাকুলতা ওকে আটকাতে পারল না? কতবার তো দেখেছি, হাসপাতালে ঠিক সময় নিয়ে গেলে এইসব ক্ষেত্রে বাঁচানো যায়। মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এসে এখন স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে, এমন একটি ছেলেকে আমি চিনি।

বোবার মতন জিজ্ঞেস করলাম, রঞ্জা কী করছে?

খুকুমা বলল, একই জায়গায় বসে আছে। এখন ভেতরে যেতে দিচ্ছে, আপনি

যাবেন?

আমি প্রবলভাবে দু'দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, না, না, আমি আর দেখতে চাই না!

শ্রেয়ার সেই ঝলমলে মুখটাই আমার মনে গাঁথা থাক।

স্বাতী এখন খুবই কান্নাকাটি করবে আমি জানি। কিন্তু আমি ওকে কীভাবে সান্ত্বনা দেব? বরং কান্নাই ভালো।

খুকুমা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। আমি একটু সরে গিয়ে বললাম, বোসো।

মিনিট পাঁচেক দু'জনেই নিঃশব্দ। বিনায়ক হয়তো এইসময়ে বিমানের সিঁড়ি দিয়ে উঠছে দিল্লিতে। এখানে পৌঁছতে অন্তত আটটা তো বাজবেই।

খুকুমা আবার ভেতরে চলে গিয়ে খানিক বাদে ফিরে এল। হাতে চাবির গোছা।

সে বলল, আপনি এবার বাড়ি চলে যান। মেজদি বলল, আনোয়ারা ঘুম থেকে উঠে কারুকে দেখতে পাবে না, বেচারি ঘাবড়ে যাবে। উৎপল আসবে না। যদি চা-টা খেতে চায়—

আনোয়ারা জেগে উঠে ফাঁকা ফ্ল্যাট দেখলে ঘাবড়ে যেতেই পারে। আমাদের একটি রান্নার মেয়ে আছে, সে আসে নটা-সাড়ে নটার সময়। ততক্ষণ ও কী করবে? কেউ বেল বাজালে কি ও দরজা খুলে দেবে?

তা বলে কি আমি এখন গিয়ে ওকে চা তৈরি করে খাওয়াব নাকি? অ্যাবসার্ড!

আমি বললুম, খুকুমা, তুমি বরং চলে যাও! তুমি আর এখানে থেকে কী করবে? তোমার অফিস আছে। তুমি একবার আমাদের ওখানে গিয়ে ওকে একটু বুঝিয়ে বল, কেন আমাদের দেরি হচ্ছে। ও যদি নার্ভাস ফিল করে, তাহলে আজকের দিনটার জন্য তোমার বাড়িতেও নিয়ে যেতে পার ওকে।

খুকুমা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। সে বলল, হ্যাঁ, আসলে অফিসে যেতেই হবে আজ। বাড়িতে আমার ছেলে আছে, ও অবশ্য নিজের ব্রেকফাস্ট তৈরি করে নিতে পারে। আমি আপনাদের ফ্ল্যাটে গিয়ে ঐ বাংলাদেশি ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলে দেখছি, যদি আমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকতে চান।

স্বাতী আজ সারাদিনেও ফিরতে পারবে কি না সন্দেহ।

তা ঠিক। আপনিও চলুন না। আপনি আর শুধু শুধু রাস্তায় বসে থেকে কী করবেন?

বিনায়ক পৌঁছনো পর্যন্ত আমার অপেক্ষা করা উচিত নয়?

এইসময় একটা পুলিশের গাড়ি থামল। তার থেকে নামল তাইয়েব খান। লাচ্ছুদার সহকারী, আমার অনেকদিনের চেনা।

কাছে এসে তাইয়েব বলল, সুনীল, তুমি এত ভোরে এখানে! তোমার আত্মীয়

নাকি এরা? শুনলাম, বিনায়ক দত্তের মেয়ে নাকি—

হ্যাঁ। তুমি বিনায়ককে চেন?

সেই জেভিয়ার্স কলেজে এক সঙ্গে পড়েছি—

তাইয়েবকে দেখে ভরসা পেলাম। রশিদ কলকাতায় নেই, লাচ্চুদার ওপর ভরসা করা যায় না। এখন পুলিশের সাহায্যের বিশেষ দরকার হবে।

খুকুমাকে বললাম, তুমি তাহলে একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাও। আমার কাছে অন্য চাবি আছে।

তাইয়েব খুকুমাকেও চেনে। সে বলল, ব্রততী? এর মধ্যে একদিন আমার অফিসে এসেছিলে না?

খুকুমা বলল, হ্যাঁ, আপনাকে পাইনি। একটা দরকার ছিল। আমার অফিসের একজনের পাসপোর্টের পুলিশ ভেরিফিকেশনেব জন্য।

তাইয়েব বলল, সে দরকার মিটে গেছে?

না। একজন ইন্সপেক্টর গিয়েছিল এনকোয়ারি করতে, সে পাঁচশো টাকা ঘুষ চেয়েছে। আমাদের কলিগ খুব আপরাইট লোক। সে কিছুতেই ঘুষ দেবে না।

কে এনকোয়ারিতে গিয়েছিল বলতে পার? নাম মনে আছে?

কী সাম চ্যাটার্জি।

ও, ওই চ্যাটার্জিটা একটা বাসটার্ড! আমি দেখছি। তুমি কাল-পরশুই চলে এস ফার্স্ট আওয়ারে, আগে একটা টেলিফোন করে—

ভেতরে শ্রেয়ার শরীর ক্রমশ হিমশীতল হয়ে আসছে। উড়ন্ত বিমানে বসে ছটফট করছে বিনায়ক, সে এখনও শেষ খবরটা জানে না। আর এরা এখানে কাজের কথা আলোচনা করছে। জীবন তো এরকমই।

কথা শেষ করে খুকুমা বলল, আমি তাহলে চলি। ট্যাক্সি ধরতে হবে।

তাইয়েব বলল, এত ভোরে এখানে ট্যাক্সি পাবে কোথায়? সেই বাইপাসে যেতে হবে। তাও দাঁড়াতে হতে পারে অনেকক্ষণ।

খুকুমা বলল, আপনার গাড়িটা ওই পর্যন্ত আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবে?

তাইয়েব বলল, ওই পর্যন্ত কেন, তোমার বাড়ি পর্যন্তই পৌঁছে দিয়ে আসবে!

খুকুমা উঠে পড়ল পুলিশের গাড়িতে।

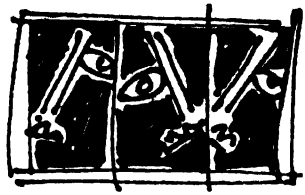
তাইয়েব আমার দিকে ফিরে বলল, চলো, ওই কোণের ঝুপড়িটায় চা খেয়ে আসি। সুনীল, তোমার কোনও ছেলে বা মেয়ে মারা গেছে?

না।

আমার ছেলে...আমি জানি, এরকম অবস্থা কীভাবে ফেস করতে হয়। বিনায়ক এলে আমি ওর সঙ্গে প্রথমে কথা বলব।

আমি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

১৫



ঝুপড়ির চায়ের দোকানটার সামনে বেশ কয়েকজন লোক জড়ো হয়েছে এত সকালেই।

নার্সিং হোমটা বেশ বড়, অনবরত লোকজন যাওয়া-আসা করে, কোনও সংকটাপন্ন রুগির আত্মীয়স্বজন সারারাত জেগে সামনে বসে থাকে। এ চায়ের দোকানের ভবিষ্যৎ উন্নতি আটকায় কে?

একটা কেটলিতে গরম জল ফুটছে, কাপ-প্লেট সাজাচ্ছে এক মহিলা। কাছেই একটি লোক, সম্ভবত ওর স্বামী, একটা খাটিয়ার ওপর ঘুমোচ্ছে। একটা সসপ্যান ভর্তি ঘন দুধ, ওপরে সর পড়ে আছে।

তাইয়েব সেই মহিলাকে বলল, এ মাইয়া, কাপগুলো গরম পানিতে আচ্ছা করকে ধুয়ে নাও!

মহিলাটি বলল, সব আভি আভি ধোলাই করকে রাখা।

তাইয়েব বলল, দুধটা ছেঁকে নেবে। সর যেন না পড়ে।

আমি বললাম, চিনি দেবে না।

মহিলাটি এবার মুখ তুলে আমাদের একবার দেখে নিল। তার দৃষ্টিতে খানিকটা বিস্ময়, খানিকটা বিরক্তি। আপন মনে বিড়বিড় করে বলল কী যেন!

কোনও কোনও খদ্দের যে চিনি নিতে চায় না, এইসব ছোটখাটো দোকানিরা সে-ব্যাপারটা ঠিক বোঝে না। একই তো দাম দিতে হবে, তবু চিনি খাবে না কেন? এরা বোকা।

ভাঁড়ে চুমুক দেবার আগে তাইয়েব আবার বলল, দো ঠো নামকিন বিস্কিট দেও।

আমি বললাম, আমার বিস্কুট লাগবে না, তুমি নাও।

তাইয়েব বলল, তুমি শুধু চা খাও? শোনো, ডোন্‌ট ডু দ্যাট। সারারাত পেটটা বিশ্রাম নেয়। সকালবেলা হঠাৎ খানিকটা গরম জিনিস পেটে গেলে লিভারটা চমকে ওঠে। সেটা ক্ষতিকর।

তাইয়েবের উপদেশ দেওয়ার অভ্যেস আছে। আমার চেয়ে বয়েসে কিছুটা ছোটই

হবে, কিন্তু ও ছোট-বড় মানে না, অনেককেই নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়ে ফেলে।

বিনা আপত্তিতে আমি একটা বিস্কুট নিলাম।

চায়ের স্বাদটা বেশ ভালোই লাগছে, একটু আদা মিশিয়ে দিয়েছে বোধহয়। কিন্তু আজকাল চায়ের ভাঁড় এত ছোট হয়ে গেছে যে, এক ভাঁড়ে ঠিক জুত হয় না।

মহিলাটিকে বললাম, আরও দুটো চা দাও।

তাইয়েব মহিলাটিকে বলল, ওই যে লোকটা শুয়ে আছে, ও তোমার আদমি? ওকে তুলে দাও। তুমি একা কাজ করবে, আর ও ঘুমোবে, এটা ঠিক নয়।

মহিলাটি বলল, উ বহুত রাত তক কাম করে।

কী কাম করে?

মিস্তিরি কা কাম।

রাত্তিরে আবার মিস্তিরিদের কী কাজ থাকে?

লোকটি এইসময় চোখ মেলে তাকাল। চোখদুটো টকটকে লাল। রাত্তিরে প্রচুর গাঁজা খেয়েছে। আহা বেচারির কাঁচা ঘুম ভাঙানো হল।

সব ব্যাপারেই তাইয়েবের পুলিশি-কৌতূহল। আমি সরে গেলাম একটু দূরে। আস্তে আস্তে আলো ফুটছে। এরই মধ্যে সাইকেল নিয়ে ছুটতে শুরু করেছে খবরের কাগজের হকাররা। একটা দুধের ভ্যান এসে থামল কাছেই।

একবার কি স্বাতী আর রঞ্জার সঙ্গে দেখা করে আসা উচিত? এইরকম সময়ে কোনও সান্ত্বনার ভাষা আমার জানা নেই। অন্য কারুর কান্না আমি সহ্য করতে পারি না। শ্রেয়া মেয়েটা চলে গেল?

তাইয়েব কাছে এসে বলল, সুনীল, তুমি মর্নিং ওয়াক করো?

আমি মাথা নাড়লাম দুদিকে।

যোগ ব্যায়াম-ট্যায়াম করো?

না।

ইউ শুড ডু সামথিং। অন্তত কুড়ি-পঁচিশ মিনিট ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ।

আবার উপদেশ!

এত সকাল সকাল সিগারেট ধরালে?

বাঃ, চা খেলে তারপর সিগারেট টানতে হবে না?

তুমি, রশিদ, শক্তি, তোমরা সিগারেট খেয়েও বেঁচে আছ কী করে? আমি জীবনে একটাও সিগারেট খাইনি। নেভার টাচ্‌ড অ্যালকোহল। খুব বন্ধু কিংবা ফ্যামিলি ছাড়া আর কারুর সঙ্গে কক্ষনো কোনও হোটেল-রেস্তোরাঁয় খেতেও যাই না।

তুমি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

তার মানে।

এটা একটা হিন্দু মাইথোলজির গল্প। তুমি জানো না বোধহয়। দেবতা আর দৈত্যরা

তো সবসময়ে মারামারি করে। এক দৈত্যরাজার ছেলের নাম প্রহ্লাদ, সে আবার দেবতাদের রাজা হরির খুব ভক্ত, দৈত্যদের মধ্যে ওনলি এক্সেপ্শান। সেই রকমই তুমি। পুলিশ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের যা ইমেজ আছে, তুমি তার একেবারেই ব্যতিক্রম। তুমি কাজ নিয়ে সবসময়ে ব্যস্ত থাকো, অথচ তোমার শত্রুরাও জানে, তুমি কখনও এক পয়সাও ঘুষ খাও না। কোনও উপহারও নাও না কারুর কাছ থেকে।

তাইয়েব গম্ভীরভাবে বলল, সেটি এক্সেপশান নয়। দ্যাট শুড বি দ্য রুল।

তারপর হঠাৎ পকেট থেকে রুমাল বের করে ও চোখে চেপে ধরল।

কাঁদছে? এ কী ব্যাপার, একজন জবরদস্ত পুলিশ অফিসারের চোখে জল? আমি অজান্তে ওকে কোনও আঘাত দিয়েছি?

কয়েক মুহূর্ত পরেই নিজেকে সামলে নিয়ে চোখ মুছে ফেলল তাইয়েব।

আমার চোখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে বলল, প্রত্যেকদিন ব্যায়াম করি। সিগারেট-মদ খাই না। চাকরিতে সবসময় কারেক্ট থাকার চেষ্টা করেছি। সারাজীবনে অন্য কোনও মানুষের ক্ষতি করিনি। কিন্তু তাতে লাভটা কী হল? আমার ছেলেটা... আমার ছেলেটা...।

আমার শরীরটা যেন খানিকটা হিম হয়ে গেল।

ঘটনাটা ঘটেছিল বছরখানেক আগে। তাইয়েবের ছেলে, যেমন সুন্দর স্বাস্থ্য, তেমনই চমৎকার ব্যবহার, সে একটা বিদেশি জাহাজ কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছিল। কিছুদিনের জন্য পোস্টিং হয়েছিল চট্টগ্রামে। হঠাৎ ছেলেটি সেখানে খুন হয়। অমন একটি শান্ত, ভদ্র ছেলে কেন হঠাৎ খুন হল, তা সঠিক জানা যায়নি। চট্টগ্রামের পুলিশ জানাতে পারেনি, এদিককার পুলিশের পক্ষেও খোঁজ নেওয়া সম্ভব নয়।

খবরের কাগজে এরকম খুন-টুনের কথা প্রায়ই থাকে। কিন্তু নিজের পরিবারে কিংবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে এরকম কিছু ঘটলে তা সহ্য করা যায় না।

একটু উপদেশ দেওয়ার অভ্যেস থাকলেও তাইয়েব মানুষটা খুবই সৎ, সবাই তাকে পছন্দ করে। এমন একজন মানুষের এমন আকস্মিক কঠিন শোক কেন প্রাপ্য হবে? জলজ্যান্ত যুবক সন্তান, প্রথম চাকরিতে যোগ দিতে গেল, আর ফিরল না! তাইয়েবের ধর্মাচরণেও কোনও ফাঁক নেই, শুধু পারিবারিক ধর্ম নয়, মানবধর্মও পালন করে যাচ্ছে নিষ্ঠার সঙ্গে। তবু কেন... এ-প্রশ্নের কি কোনও উত্তর আছে?

নিরাসক্তভাবে, আবেগবর্জিত হয়ে হয়তো অনেক কিছু বলা যেতে পারে, আমার সে-যোগ্যতা নেই।

তাইয়েব বলল, বিনায়কের অনেক দোষ আছে আমি জানি, কতবার বকাঝকা করেছি, কিন্তু ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে ও খুবই দুর্বল। একদিন আমার সামনেই, ওদের বাড়িতে, বিনায়ক মাতলামি শুরু করেছিল, শ্রেয়া এসে ধমক দিয়ে বলল, বাবা, তুমি আর খাবে না! বিনায়ক সঙ্গে সঙ্গে আধ-গেলাস মদ ফেলে দিল। শ্রেয়ার মতন

একটা ব্রিলিয়ান্ট মেয়ে...

তুমি কার কাছে খবর পেলে, তাইয়েব?

এই নার্সিং হোমের মালিক আমার চেনা। শ্রেয়া শেষনিশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে সে আমাকে ফোন করেছে। শোনামাত্র আমার মনে পড়ল নিজের ছেলের কথা। সেদিনও ভোররাতে ফোন এসেছিল চিটাগং থেকে। একটুক্ষণ ঝিম হয়ে বসে থাকার পর ভাবলাম, এখন একমাত্র আমিই বিনায়ককে সান্ত্বনা দিতে পারি। কিংবা মুখে কিছু বলতেও হবে না, ওর পাশে দাঁড়ালেই চলবে।

বিনায়ক এখন আকাশে।

খুকুমা এখনও বাড়ি পৌঁছোয়নি, আরও দশ-পনেরো মিনিট লাগবে। আনোয়ারা এর মধ্যে জেগে উঠলেও খুকুমা সবদিক সামলে নেবে। আমার এই শ্যালিকাটি খুবই কাজের মেয়ে।

আমি তাইয়েবকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি চাকরি ছেড়ে দেবে বলেছিলে না?

হ্যাঁ। ভেবেছিলাম, চাকরি ছেড়ে, কলকাতা শহর ছেড়েও চিরকালের মতন চলে যাব। এখানে আমাদের বাড়িতে, চতুর্দিকে ছেলেটার স্মৃতি ছড়ানো। আমি অনেকটা মেনে নিলেও মালেকা কিছুতেই অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারছে না। বেরুতেই চায় না বাড়ি থেকে। অনেকটা ওর জন্যই ঠিক করেছিলাম লখনৌতে গিয়ে সেট্‌ল করব। জানো তো, আমরা ওরজিনালি আওধের লোক।

তাই নাকি?

নবাব ওয়াজির আলি শাহকে ইংরেজরা যখন কলকাতায় নির্বাসন দেয়, তখন তাঁর সঙ্গে আমার গ্রেট গ্রান্ডফাদারও এসেছিলেন, একটা বড় দল এসেছিল।

হ্যাঁ, শুনেছি ওয়াজির আলি শাহ তাঁর চিড়িয়াখানাটাও সঙ্গে এনেছিলেন।

রাইট। আমার গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার মেটিয়াবুরুজে সেট্‌ল করে গেলেন, আর ফিরে যাননি। আমার বাবাও ছিলেন পুলিশ অফিসার। আমরা এখন প্র্যাকটিক্যালি বাঙালি, আমি তো রশিদের মতন রোজ রাত্তিরে মদ খাই না, কিন্তু রাত্তিরে একটা-দুটো রবীন্দ্র সংগীত না শুনলে আমার ঘুম হয় না। তবে বাড়িতে এখনও আমরা উর্দু কথাও বলি।

রশিদরাও তো বাইলিঙ্গুয়াল। বাড়িতে উর্দু আর বাংলা দুটোই বলে।

সুনীল, তুমি যাই-ই ভাব, রশিদ তোমার বন্ধু হতে পারে, কিন্তু ওর উর্দু মোটেই পাক্কা নয়। ও উর্দুতে যেসব কবিতা লেখে, সেগুলো কি ঠিক কবিতা?

দ্যাখো ভাই, উর্দু আর ফরাসি, এই দুটো ভাষা নিয়ে কে বেশি জানে, কে কম জানে, এই নিয়ে অনেকের মধ্যে রেষারেষি হয়। কিন্তু আমি তো কিছু মতামত দিতে পারব না, কারণ ও-দুটো ভাষার কোনওটাই আমি জানি না। যাই হোক, লখনৌতে গিয়ে কী হল?

ওখানে গিয়ে দু'একজন আত্মীয়কে খুঁজেও পেলাম। আই পি এস ট্রেইনিংয়ের সময়ে আমাদের ব্যাচের কয়েকজন ওখানে অফিসার, তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল। শহরের আউটস্কার্টে একটা সুন্দর দোতলা বাড়ি পছন্দও হয়ে গেল, দামও রিজ্‌নেব্‌ল, সেটা কিনতে গিয়েও কিনলাম না। শেষ পর্যন্ত মনে হল, এখানে আমাদের মন বসবে না।

কেন?

ওখানে যাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল, তাদের সঙ্গে অনেক ব্যাপারেই আমাদের মিল আছে। প্রথমত, আমাদের ধর্ম এক, আমি রশিদের মতন নাস্তিক নই, আমি আল্লার বান্দা। ভাষাতেও মিল আছে। আমার উর্দু শুনে কেউ ভুরু কোঁচকায়নি। খাদ্যের ব্যাপারে, ওরা মাছটাছ তেমন খায় না বটে, কিন্তু কাবাব-বিরিয়ানি তো আমরাও পছন্দ করি। এসবই ঠিক আছে, কিন্তু ওদের সঙ্গে কথা বলব কী নিয়ে? মানসিক ওয়েভ লেংথে কোনও মিল নেই। পাঁচ মিনিট কথা বলার পর আর কোনও সাবজেক্ট খুঁজে পাইনি। আসলে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সর্বনাশ করে গেছেন। এমন একটা কালচার আমাদের মর্মে গেঁথে দিয়েছেন, তার থেকে আর মুক্তি নেই। ওখানে ওরা যেসব গজল-টজল শুনে আহা আহা করে, তা খানিকক্ষণ বাদে আমার বোরিং লাগে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার বাণীর যে-গভীরতা, যেমন, 'আমি সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়', এখানে সর্বনাশের পর আশা কথাটা ইউজ করা হয়েছে, এর মর্ম তো ওরা বুঝবে না। উর্দুভাষা ছাড়িনি বটে, কিন্তু বাংলার কালচার আমাদের গ্রাস করে ফেলেছে, আবু সয়ীদ আইয়ুবের যেমন হয়েছিল। ফিরে এসে ভালোই হয়েছে।

মালেকা, তোমার স্ত্রী, সে কী বলল? সেও থাকতে চাইল না ওখানে?

তিন-চারদিন পরেই মালেকা ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। ওর কারণটা অন্য। ও বলতে লাগল, আমাদের বাচ্চু আর নেই, কিন্তু বাচ্চুর বন্ধুরা মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। ওদের দেখলেই মনে হয়, ওরাও তো আমার বাচ্চুরই মতন। লখনৌতে থাকা মানে আমরা যেন ইচ্ছে করে বাচ্চুর স্মৃতি মুছে ফেলতে চাইছি। নাঃ, আমাদের জীবনটা এই শহরেই কাটবে।

তাইয়েব, তুমি যে এত রবীন্দ্রসংগীত ভালোবাস, তা আগে জানতাম না।

তোমরা তো মনে করো, তোমাদের রশিদই একমাত্র গান-বাজনা বোঝে!

রশিদ রবীন্দ্রনাথের গান তেমন পছন্দ করে না। তোমার রশিদের ওপর এত রাগ কেন?

মোটেই রাগ নেই। হি ইজ আ লাভেব্‌ল ক্যারেকটার। আমি ওকে অনেকভাবে হেল্প করার চেষ্টা করি। সার্ভিসে থাকতে গেলে কতকগুলো ডিসিপ্লিন তো মানতেই হয়, রশিদ তা কিছুতেই শুনবে না। তোমরাও ওকে খুব কবি-কবি বলে তোল্লা দাও।

সেদিন দেখি যে, একটা কাগজে ও ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে বলেছে, আমি পুলিশ নই, আমি কবি। পুলিশে চাকরি করে আমি পুলিশ নই বলাটা... ও সাসপেন্ড হতে পারত, নেহাৎ চিফ মিনিস্টার ওকে প্রশ্রয় দেন।

হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটে তাইয়েব জিজ্ঞেস করল, শ্রেয়া কেন আত্মহত্যা করল, কোনও নোট রেখে গেছে কি না, তুমি জানো?

আমি দুদিকে মাথা নাড়লাম।

তাইয়েব বলল, সেটা জানতেই হবে। আমি পার্সোনালি ইনভেস্টিগেট করব। যদি দেখি কোনও বয়ফ্রেন্ড ওকে বিট্রে করেছে কিংবা দারুণ আঘাত দিয়েছে, তাহলে সে-ছোকরাকে আমি গুলি করে মারব।

যতরকম সাঙ্ঘাতিক কারণই থাক, আত্মহত্যা ব্যাপারটা কোনওক্রমেই সমর্থন করা যায় না। যে আত্মহত্যা করে, সব দোষ তার। শ্রেয়া চলে গিয়ে কতজন মানুষের মন ভেঙে দিয়ে গেল বলো তো!

সেটাও ঠিক। যে যায়, সে তো চলেই গেল, আর যারা রইল...

আবার গলায় বাষ্প জমে গেল তাইয়েবের।

এইসময় নার্সিং হোমের মালিক গেটের বাইরে এসে তাকালেন এদিক-ওদিক। তাইয়েবকেই খুঁজছেন। দেখতে পেয়ে কাছে এসে বললেন, স্যার, আপনি অনেকক্ষণ ধরে বাইরেই দাঁড়িয়ে আছেন, চলুন, চলুন, ভেতরে গিয়ে বসবেন। আপনার গাড়ি দেখতে পাইনি, তাই ভেবেছিলাম, আপনি এখনও আসেননি। এইমাত্র একজন খবর দিল।

তাইয়েব আমার দিকে তাকিয়ে বলল, চলো, ভেতরেই বসা যাক।

আমার সঙ্গে সে আলাপ করিয়ে দিল নার্সিং হোমের মালিকের।

ভেতরের অফিসঘরে এসে তাইয়েব ব্যস্ত হয়ে পড়ল টেলিফোন নিয়ে। আমি পড়তে লাগলাম টাটকা খবরের কাগজ।

এরই মধ্যে একসময় তাইয়েব বলল, সুনীল, তোমার একটা ফোন এসেছে।

প্রথমে আমি হকচকিয়ে গেলাম। আমি যে এইসময়ে একটা নার্সিং হোমের অফিসঘরে বসে থাকব, তা পৃথিবীতে কারুর তো জানার কথা নয়। এটা কি কোনও অলৌকিক ডাক? একটু আগেও তো দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তায়।

উঠে দাঁড়াতেই মনে পড়ল, একমাত্র খুকুমাই ফোন করতে পারে এখানে।

ঠিক তাই। খুকুমা বলল, সুনীলদা, আপনাদের ফ্ল্যাটে এসে দেখি সেই ভদ্রমহিলা একা একা বসে কাঁদছেন। আমাকে দেখে কান্না থামালেন, আর কোনও কথার উত্তরই দিতে চান না। আমি সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম, তবু চুপ করে রইলেন। মেজদি যতদূর মনে হচ্ছে, বিকেলের আগে ফিরতে পারবে না। এখন কী করব? আমি চা তৈরি করে দিয়েছি, তাও খেলেন না।

আমি বললাম, তোমার বাড়িতে নিয়ে যাও। স্বাতী কখন ফিরতে পারবে, কোনও ঠিক নেই। আমিও ঠিক বলতে পারছি না।

খুকুমা বলল, আমার বাড়িতে নিয়ে যাবার কথা তো বলেছি। উনি তো কোনও কথাই বলছেন না। যদি যেতে না চান, জোর করে নিয়ে যাব কী করে? আপনি বরং একটু বুঝিয়ে বলুন।

আমার কথা শুনবে না।

তাহলে মেজদিকে ডাকুন। আমি তো আর কী করব বুঝতে পারছি না।

ঠিক আছে। নার্সিং হোমের ফোন বেশিক্ষণ আটকে রাখা যায় না। আমি স্বাতীকে ডেকে একটু পরে ফোন করছি। তুমি ছেড়ে দাও, আর কিছুক্ষণ থাকো।

অপারেশন টেব্‌ল থেকে সরিয়ে এনে শ্রেয়াকে রাখা হয়েছে একটা ক্যাবিনে। সেখানে বসে আছে রঞ্জা আর স্বাতী ছাড়াও কয়েকজন মহিলা।

সেই ক্যাবিনে না ঢুকে একজন ওয়ার্ডবয়কে দিয়ে স্বাতীকে ডেকে পাঠালাম।

স্বাতীর এখন চোখে জল নেই, শান্ত মুখ। তাকে সব বুঝিয়ে বললাম। আমার সঙ্গে একলা ফ্ল্যাটে থাকতে যে আনোয়ারা ভয় পাচ্ছে, তাও বলতে হল।

অফিসঘরে এসে আবার ফোন করে পাওয়া গেল খুকুমাকে। সে বলল, আমি কর্ডলেসটা ওকে দিচ্ছি।

স্বাতী বলল, আনোয়ারা, আমি কোথায় আছি, আমার বোনের কাছে শুনেছ নিশ্চয়ই। আমি আজ ফিরব না, তুমি আমার বোনের বাড়ি চলে যাও। কাছেই বাড়ি, ওখানে তোমার কোনও অসুবিধে হবে না। আমার বোন তোমাকে চা বানিয়ে দিয়েছে, তুমি খাওনি কেন? ব্রেকফাস্ট খেয়ে নাও। আনোয়ারা, শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? কোনও সাড়াশব্দ দিচ্ছ না কেন? আনোয়ারা, আনোয়ারা, আমি স্বাতীদি বলছি!

ওদিকে কোনও শব্দ নেই।

স্বাতী তাকাল আমার দিকে। ধীর গলায় বলল, ও আসবার পর থেকে আমার সঙ্গেও ভালো করে কথা বলেনি। এখন তো কোনও উত্তরই দিচ্ছে না।

আমি বললাম, খুকুমা তো ওকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে পারবে না। আর আমাদের একা একা রাখাটাও...

তাইয়েব বলল, কী ব্যাপার জানতে পারি?

আমি বললাম, আনোয়ারা নামে বাংলাদেশের একটি মেয়ে...

তাইয়েব বলল, ও সেই মেয়েটি, যাকে তুমি অনেক খোঁজাখুঁজি করেছিলে কয়েকমাস আগে?

আমি বললাম, আমাদের ধারণা ওকে সৌদি আরবে চালান করে দেওয়া হয়েছিল, সে কাল ফিরেও এসেছে আমাদের বাড়ি, কোনও কথা বলতে চাইছে না।

তাইয়েব জিজ্ঞেস করল, মেয়েটি সৌদি আরেবিয়া যাবার আগে বাংলাদেশ থেকে

তোমাদের বাড়িতে এসেছিল, আবার ফেরার সময় ঢাকায় না গিয়ে তোমাদের বাড়িতেই...তোমাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা আছে বুঝি?

তা ঠিক নয়। ঢাকাতে ওদের বাড়ি বেশ কয়েকবার গেছি, ওব স্বামীকেও চিনি। আনোয়ারা আমাদের বাড়ি আগে কখনও আসেনি। এবারে সৌদি আরবে যাবার আগে ও একগাদা গয়না রেখে গেছে স্বাতীর কাছে। বোধহয় ঢাকায় কারুর কাছে বিশ্বাস করে রেখে আসতে পারেনি। এবার নিশ্চয়ই গয়নাগুলো ফেরত নেবার জন্যই এসেছে।

আনোয়ারার গয়নার কথা অনেককেই বলিনি। তাইয়েবকে জানানো যায়।

তাইয়েব মাথা নেড়ে বলল, দ্যাট মেক্‌স সেন্স। সৌদি আরেবিয়াতে নিশ্চয়ই এমন কিছু ঘটেছিল, যেজন্য মেয়েটি এখন ট্রমার মধ্যে রয়েছে। কথা বলতেও পারছে না। এরকম হতেই পারে। এখন ওকে খুব সাবধানে রাখা দরকার। একলা রাখা তো উচিতই নয়।

কিন্তু খুকুমা কতক্ষণ থাকবে? ওকে অফিস যেতে হবে, জানই তো ওরা কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা নতুন ট্রাভলিং এজেন্সি খুলেছে, খুব খাটতে হয়।

তাহলে, সুনীল, তুমি এক কাজ করো। স্বাতী তো এখানে রইলেনই, তুমি বরং ফিরে যাও। বিনায়ক এলে আমি ম্যানেজ করব। এখানে আরও ফর্মালিটিজ আছে। তোমার আর থাকার দরকার নেই।

আমি স্বাতীর মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে আবার তাইয়েবের দিকে ফিরে বললাম, শোনো, তাতেও একটা প্রবলেম আছে। আনোয়ারা আমাকে আগে বেশ ভক্তি-শ্রদ্ধা করত, এখন এমন বদলে গেছে, আমাকেও ভয় পাচ্ছে। যেন আমি একটা বাঘ, ওকে খেয়ে ফেলব। কাল রাত্তিরে ও এমন একটা কথা বলেছে, তারপর আর আমি ওই ফ্ল্যাটে ওর সঙ্গে একা থাকতে রাজি নই!

তাইয়েব এক হাতের তালুতে নিজের থুতনি ঘষতে ঘষতে বলল, এটা কীসের চিহ্ন জানো? একটু একটু মাথার গণ্ডগোলের। এইসময় পুরোনো সম্পর্কগুলো মনে থাকে না। সেইজন্যই খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হয় এদের সঙ্গে। একা থাকলে...ধরো যদি হঠাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, আবার হারিয়ে যায়, দ্যাট উইল বি আ শেইম! কিংবা তোমাদের বাড়িতেই যদি সুইসাইড অ্যাটেম্প্ট করে...

আমি এবারে একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, তাইয়েব, তুমি কোনও সমাধানের কথা বলতে পারছ না, নতুন নতুন সমস্যার কথা তুলছ। আমরা এখন কী করতে পারি, সেটাই বলো—।

আমার মনে হয়, সুনীল, তোমাকে তো আমরা চিনি। ইউ আর আ সিভিলাইজ্‌ড পার্সন। ফ্ল্যাটে অন্য একটি মেয়ে থাকলেই যে তুমি তার গায়ে হাত-টাত দেবে, এটা আমরা বিশ্বাস করি না। স্বাতীও নিশ্চয়ই তোমাকে চেনেন। তুমি ফিরে যাও,

আস্তে আস্তে মেয়েটির ভয় ভাঙাবার চেষ্টা করো।

না, আমি তাতে রাজি নই। মেয়েটি যদি চ্যাঁচামেচি শুরু করে? পাশের ফ্ল্যাটের লোকজন শুনতে পাবে। এইসব ব্যাপারে মেয়েরা কোনও অভিযোগ করলে সবাই প্রথমে বিশ্বাস করে ফেলে। আমি ওসব ঝঞ্ঝাটে যেতে চাই না।

তুমি নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে ভয় পাচ্ছ?

হ্যাঁ, পাচ্ছি!

স্বাতী এবার মৃদু গলায় আমাকে বলল, তুমি ফিরেই যাও। তোমার ওষুধ খেতে হবে। তোমার কাছে তো প্রায়ই সকালে অনেক লোকজন আসে। তুমি সে-রকম দু'একজনকে ডেকে নাও!

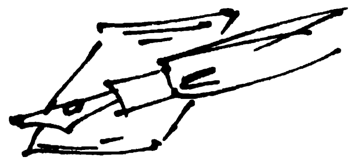
খুকুমাকে বলা হল, আরও অন্তত মিনিট চল্লিশেক অপেক্ষা করতে।

সুবোধ আর মল্লিকার আজ সকালে আসবার কথা আছে, কী একটা ইন্টারভিউয়ের ব্যাপারে। কিন্তু সে-তো এগারোটার সময়। এখন বাজে মাত্র সাড়ে সাতটা।

শ্যামল প্রায়ই *কৃত্তিবাস* পত্রিকার লেখাটেখা দেখাতে আসে, কিন্তু সে ঘুম থেকে ওঠে অনেক দেরিতে। তবু ফোন করলাম তাকে। আশ্চর্য ব্যাপার, আজই সে ভোরবেলা চলে গেছে হলদিয়ায়।

আমি যতদূর সম্ভব নম্বর মনে করে করে ফোন করতে লাগলাম বিভিন্ন মানুষকে।

১৬



খুকুমারা যে-পাড়ায় থাকে সেই অঞ্চলটি নতুন গড়ে উঠেছে। আগে কলকাতা ছিল উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, উত্তর ও দক্ষিণে স্পষ্ট ভাগ ছিল, দু'দিকের কালচারও অনেকটা আলাদা। উত্তর কলকাতায় এখনও রয়ে গেছে পুরোনো আমলের বেশ কিছু বনেদি বাড়ি, এমনকি সেইসব কিছু কিছু বাড়ির বাগানে পাথরের নগ্ন নারীমূর্তি এবং ফোয়ারাগুলিও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। আর দক্ষিণ কলকাতায় সবই নতুন বাড়ি, নিছকই বাড়ি, তাতে কোনো স্থাপত্য নেই।

দেশভাগের পর জনসংখ্যার চাপে এ-শহর ক্রমশ বাড়ছিল দক্ষিণে, সমস্ত জলাভূমি বুজে গেল, নষ্ট হয়ে গেল বুনো শেয়াল, হাঁস ও বাঁদর-ভোঁদড়দের আস্তানাগুলোও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, মুসলমানদের পরিত্যক্ত কিছু কিছু বাড়ি কয়েক বছর হানাবাড়ির মতন পড়ে থাকার পর এখন আবার জীবন্ত হয়ে মিশে গেছে অন্য বাড়ির জটলায়।

আপাতত শহর ক্রমশ স্ফীত হচ্ছে পূর্বদিকে, কারণ পশ্চিমে কোনো উপায় নেই, সেদিকে গঙ্গার সীমারেখা। পূর্ব কলকাতায় এত দ্রুত বাড়িঘর উঠছে, তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন রাস্তা, ওইসব দিক আমাদের পক্ষে চেনা দুষ্কর। আমার কৈশোর কেটেছে উত্তর কলকাতায়, পরে স্থায়ী হয়েছি দক্ষিণে, আজও দক্ষিণ কলকাতার অনেক রাস্তা অচেনা লাগে। কিন্তু সল্টলেক কিংবা নিত্য-নতুন পূর্ব কলকাতার অঞ্চলে এসে দিশা হারিয়ে ফেলি। খুকুমা কোনোক্রমে আনোয়ারাকে বুঝিয়ে-টুঝিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছে জেনে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরলাম নিজের ফ্ল্যাটে। সত্যিই. উৎপলও নেই বাড়িতে, স্বাতীও সারাদিনে ফিরতে পারবে না, আমার সঙ্গে একলা সময় কাটাতে আনোয়ারা অস্বস্তি বোধ করতেই পারত! আমি ইয়ার্কির ছলে একবার শুধু ওর থুতনিটা ছুঁতে যেতেই এমনভাবে ও আঁতকে উঠল, তাতেই বোঝা যায়, ওর মাথাটা এখন স্বাভাবিক অবস্থায় নেই।

আমি নিজের চা-টা বড়জোর বানিয়ে নিতে পারি, কিন্তু রান্নাবান্না একেবারে সম্ভব নয়। রাঁধতে যে একেবারে পারি না তা নয়, বাচ্চা বয়েসে বয়েজ স্কাউটে যোগ

দিয়ে ডাল আর বেগুনভাজা রান্নার পরীক্ষা দিয়ে কুকিং ব্যাজ পেয়েছি, ফ্যানা-ভাত আর ডিমসিদ্ধও ফুটিয়ে নিতে পারি, সেগুলো খেতেও বেশ অনবদ্য হয়। শুধু নিজের জন্য কিছু রাঁধতে বোকা বোকা লাগে। কাছাকাছি কত হোটেল-রেস্তোরাঁ আছে। তবে অনেক নামকরা রেস্তোরাঁর চেয়েও বাজারের মধ্যে যে সস্তার ভাতের হোটেল আছে, সেখানকার খাবার আমার বেশি ভালো লাগে। অন্নপূর্ণা হোটেলে যে এতবড় চিতল মাছের পেটি দেয়, সে-সাইজ তো বাড়িতেও কখনও খাওয়া হয় না। আর একটা দই-বেগুনের স্বাদও অপূর্ব। মহেন্দ্র এলে ওকে দিয়ে টিফিন কেরিয়ারে খাবার আনিয়ে নিলেই হবে।

সারারাত ভালো ঘুম হয়নি, এখন স্নান করে নেওয়া দরকার।

এই সময় দরজা খোলার একটা সমস্যা হয়। উৎপল থাকলে সে-ই সবদিক সামলায়। ধনঞ্জয়ও সকালের দিকে আসে মাঝে মাঝে। ঘর পরিষ্কার করার মেয়েটি কখন আসে, কখন যায়, টের পাই না। এক একসময় স্বাতী আর আমি ছাড়া আর কেউ থাকে না, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য। তখন স্বাতী আর আমি পালা করে বাথরুমে যাই।

এখন স্বাতীও নেই, আমি একলা ড্যাং ড্যাং। বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করলে কলিং বেল শুনতে পাব না। কিন্তু নার্সিং হোমের আশেপাশে অতক্ষণ থাকার জন্য আমার পাজামা আর পাঞ্জাবিতে আর ঘামে-ভেজা পিঠে যেন মৃত্যুর গন্ধ লেগে গেছে। এক্ষুনি চান করতে ইচ্ছে করছে।

বাথরুমের দরজা খোলা রাখা যেতে পারে। কেউ তো দেখবার নেই।

ঠিক স্নানের মধ্যপথে, কলিং বেল নয়, বেজে উঠল টেলিফোন।

কত সময় আমরা বাড়ি থাকি না, ফোন এমনিই বেজে যায়। কিন্তু বাড়িতে আছি, ফোন ঝনঝনাচ্ছে, তখন মনে হয়, কেউ যেন দারুণ গুরুত্বপূর্ণ কোনো খবর জানাতে চাইছে। কিংবা ভারতের রাষ্ট্রপতি খুব বিপদে পড়ে সাহায্য চাইছেন আমার।

উলঙ্গ অবস্থাতেই, ঘরের মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়ে, ফোনটা ধরতে হল। খুকুমা।

সে বলল, সুনীলদা, আপনার বাড়ি থেকে সেই আনোয়ারা নামে ভদ্রমহিলাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আনতে আমার ঘাম ছুটে গেছে। কিছুতেই আসতে চান না, কোনও কথাই বলেন না। যাই হোক, কোনওক্রমে তো এনেছি। চা-টোস্ট, ডিমসেদ্ধ করে দিলাম, ছুঁয়েও দেখলেন না। শেষ পর্যন্ত দুধ-মুড়ি-কলা মুখে দিলেন খানিকটা। তাও সবটা নয়।

আমি বললাম, বাঃ! তুমি ছাড়া আর কেউ পারত না। মেয়েটি এখনও ঘোরের মধ্যে আছে, স্বাভাবিক হতে পারছে না, ওকে দোষ দেওয়াও যায় না। তোমার কাছে আছে, তাতেই আমরা নিশ্চিন্ত। ঠিক আছে, পরে আবার কথা হবে। এখন আমি একটু ব্যস্ত আছি!

আমার ব্যস্ততাটা যে কী ধরনের, তা বুঝিয়ে বলাও মুশকিল। উলঙ্গ অবস্থায় ভিজে গায়ে কতক্ষণ টেলিফোনে কথা বলা যায়?

খুকুমা খানিকটা ধমকের সুরে বলল, দাঁড়ান, ছাড়বেন না। আমিও এখন কম ব্যস্ত নই। অফিসে একজন খুব বড় ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথা বলতে হচ্ছে। অনেক টাকার ডিল। ভদ্রলোক একটু বাথরুমে গেছেন, সেই ফাঁকে আপনাকে কথা বলছি। আনোয়ারা যখন দুধ-মুড়ি খাচ্ছিল, তখন ওর মুখটা অসম্ভব কুঁচকে যাচ্ছিল। প্রথমে ভাবছিলাম, বুঝি কান্না। তারপর বোঝা গেল, কান্না নয়, পেট ব্যথা-ট্যাথা হলে ওরকম হয়। খুব সম্ভবত ওর অ্যাকলেমেশিয়া হয়েছে।

সেটা আবার কী জিনিস?

সেটা একটা মেয়েলি অসুখ। পেটে খুব ব্যথা হয়। ওর চিকিৎসা করার দরকার। সে-দায়িত্ব আমরা নিতে পারব না। আমাদের প্রথম কাজ আজই ওকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া। ওর কাছে টিকিট আছে নিশ্চয়ই। আমি দেখছি, আজই সন্ধের ফ্লাইটে ওর জন্য একটা সিট বুক করা যায় কি না। তোমাকে পরে খবর দেব। ঠিক আছে?

না, ঠিক নেই। এই সময় আমার বাড়িতেও তো আর কেউ থাকে না। ছেলে কাজে চলে যায়, আমার রান্নার মেয়ে বাসন্তী দশটার মধ্যে কাজ সেরে ফেলে কেটে পড়ে, তাকে আজ বলে এসেছি, একটা পর্যন্ত অবশ্য থাকতে। তখন আমি অফিস থেকে গিয়ে একসঙ্গে লাঞ্চ করব। ঘরটর দেখিয়ে দিয়েছি, মহিলা ইচ্ছে করলে শুয়ে থাকতে পারেন, বই পড়তে পারেন। একটা পেইন কিলার দিতে গিয়েছিলাম, এমন আঁতকে উঠলেন, যেন আমি ওঁকে বিষ দিচ্ছি। উনি মেয়েদেরও বিশ্বাস করতে পারছেন না।

খুকুমা, আমি তোমাকে এক ঘণ্টা বাদে...

আসল কথাটা শুনুন। বাসন্তী একটু আগে ফোন করে জানাল, ভদ্রমহিলা একটু আগে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন।

অ্যাঁ? এই কথাটা আগে বলোনি?

সবটা বুঝিয়ে না-বললে এসব ব্যাপার পুরুষদের মাথায় ঢোকে না। আমার মনে হয়, ব্যথা সহ্য করতে না-পেরে উনি কোনও ডাক্তারখানা খুঁজতে গেছেন। বাসন্তী রান্নাঘরে ছিল, সেই সময় টুক করে বেরিয়ে গেছেন দরজা খুলে।

যাঃ! তাহলে এখন...

আপনি শিগগির বেরিয়ে পড়ুন। আমাদের পাড়াতেই দু'তিনটে ওষুধের দোকান আছে, সেখানে গিয়ে খোঁজ করুন। বেশিক্ষণ হয়নি।

খুকুমা, আমি তোমাদের বাড়িটা ঠিক চিনতে পারব না। মহেন্দ্র নিয়ে যায়, সে-তো আসবে এগারোটার সময়।

আপনাদের ফোন গাইডে আমার বাড়ির ঠিকানা লেখা আছে। ঠিকানা জানলে

কলকাতার সব বাড়িই খুঁজে বের করা যায়। দেরি করবেন না। বেরিয়ে পড়ুন।

আমি এখন দোকানে দোকানে ওকে খুঁজতে যাব?

তাছাড়া আর কে যাবে বলুন? বাসন্তীর দ্বারা হবে না। আমার পক্ষে এখন অফিস থেকে বেরুনো অসম্ভব। ওই যে ভদ্রলোক এসে গেছেন, আমি রাখছি।

লেখকরা সাধারণত একটু ন্যালাখ্যাপা ধরনের মানুষ হয়। তাদের বাস্তব দায়িত্বজ্ঞান থাকে না। তারা প্রতিদিনের বাজারদরের খেয়াল রাখে না। তারা গল্প-উপন্যাস লেখার সময় নানান কাল্পনিক চরিত্রের অনেক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায়, কিন্তু নিজের পরিবার সম্পর্কে উদাসীন।

আমারও তো সে-রকমই হবার কথা।

আমি এখন স্নান-টান সেরে, শুধু পাজামা পরে খালি গায়ে থাকব, খবরের কাগজগুলোতে চোখ বুলিয়ে তারপর লিখতে বসব, একটা ছোটদের গল্প আর আরেকটা গ্রন্থ-সমালোচনা দিতে হবে দু' একদিনের মধ্যে। এইরকম ভেবে রেখেছি, তার বদলে এখন আমাকে ছুটতে হবে এক মহিলাকে খুঁজতে? এখন তো আর অল্পবয়েসের তরুণটি নই, প্রেমিকাদের পেছনে ছুটি না। একা একা রাস্তাঘাটে ঘোরাফেরাও করা যায় না, কেউ-না-কেউ এসে অটোগ্রাফ চায়।

এই আনোয়ারা আমাদের কী বিপদেই ফেলেছে! আমাদের পরিবারের ওপর তার এতখানি নির্ভরতাও যে এতখানি বিড়ম্বনার কারণ হবে, তা সে নিজে কিছুই বোঝে না! তার ওই গয়নার পুঁটলিটা আমাদের কাছে জমা না-রাখলে তাকে নিয়ে এত মাথা ঘামাবারও প্রয়োজন হতো না!

খুকুমা সাবধান করে দিয়েছে, বেশি দেরি করবেন না। কী ঝামেলা! দেরি করলে সে অনেক দূরে চলে যেতে পারে!

আবার বাথরুমে ফিরে এসে শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়েছি, আবার বেল। এবার টেলিফোন নয়, কলিং বেল, সদর দরজায়।

ফাঁকা ফ্ল্যাটে উলঙ্গ অবস্থায় এসে ফোন ধরা যায়, কিন্তু সেইভাবে তো দরজা খোলা যায় না। এই সময়ে সারা পৃথিবীর ওপর রাগ হয়।

যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি গা মুছে নিচ্ছি, ওদিকে কলিং বেলটা একটু থেমে থেমে বেজেই চলেছে।

আমি চিৎকার করে বললাম, একটু দাঁড়াও, খুলছি, খুলছি!

হয়তো কাজের মেয়েটি এসেছে। কিংবা জমাদার। কিংবা লিফ্‌টম্যান এসেছে কোনো চিঠি দিতে। কিংবা কোনো তরুণ কবি হাতে একগুচ্ছ কবিতার পাণ্ডুলিপি নিয়ে। কোনোটাই আমার পক্ষে তেমন প্রয়োজনীয় নয়। অথচ খুলতে হবে দরজা।

মাথা মুছে, পাজামায় পা গলাতে গলাতে শুনতে লাগলাম, অস্থিরভাবে সেই বেল বাজানো।

আমি বিকট চিৎকারের সঙ্গে ধমক দিয়ে বললাম, বলছি না, দাঁড়াও, অপেক্ষা করো!

এর মধ্যে আবার পাজামার একদিকের দড়ি ভেতরে ঢুকে বসে আছে! এসময় গোট বিশ্বসংসারের ওপর রাগ হবে না?

এ-দড়ি উদ্ধার করার চেয়ে অন্য পাজামা পরা ভালো। যদি পাওয়া যায়! সাধারণত এইরকম সময় আর সব পাজামাই উধাও হয়ে যায় বাড়ি থেকে।

না, আলমারিতে আর একটা পাজামা আছে। তার দড়িও ঠিকঠাক। সঙ্গে সঙ্গে একটা নাম মনে পড়ে গেল, তুষার তালুকদার।

আনোয়ারাকে খুঁজতে গেলে শেষ পর্যন্ত হয়তো পুলিশের সাহায্য নিতে হবে। রশিদ এখন বাইরে থাকে, তাইয়েব খানও আজ শ্রেয়ার আত্মহত্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে সারাদিন। আর কোনও নাম মনে পড়ছিল না। কিন্তু তুষার তালুকদার এখন পুলিশ কমিশনার। তারও ওপরে আছেন রথীন ভট্টাচার্য অর্থাৎ লাচ্চুদা। সন্ধি মুখার্জি কিংবা নজরুল ইসলাম, এরাও এনেক সাহায্য করতে পারে। কলকাতা-পুলিশে বাংলা সাহিত্যপ্রেমী অফিসারের সংখ্যা অনেক।

যে এতবেশি বেল বাজায়, তাকে খানিকটা বকুনি দেওয়া যেতেই পারে। কিন্তু দরজা খোলার পর আমার রাগ একেবারে জল হয়ে গেল। কামাল। পৃথিবীতে এই মানুষটিই আমাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারে।

কামালকে দেখে অবাক হওয়াও যায় না। সে যে-কোনো দিন, যে-কোনো সময়ে পৃথিবীর যে-কোনও দেশ থেকে এসে হাজির হতে পারে।

একগাল হেসে সে বলল, এসে পড়লাম। তোমাকে দরজা খুলতে হল? লিখছিলে নিশ্চয়ই? উৎপল নাই? স্বাতী কোথায়? ম্যাঙ্গোস্টিন নিয়া আসছি। স্বাতী ভালোবাসে।

রসগোল্লার মতন দেখতে এই ফলগুলো খুব পাওয়া যায় মালয়েশিয়ায়। সুতরাং কামাল এখন কোথা থেকে আসছো তা আর জিজ্ঞেস করার দরকার নেই।

আমি বললাম, কামাল, তুমি যে-কাজটা সবচেয়ে বেশি ভালোবাস, আগে সেইটা করো। টেলিফোনের পাশে বসে যাও। তুষার, লাচ্চুদা, নজরুল, সন্ধি মুখার্জি এদের মধ্যে কাকে পাও দেখ। জরুরি কথা আছে। আমি এর মধ্যে চুল আঁচড়ে নিচ্ছি।

কামাল বিনা বাক্যব্যয়ে নম্বর ঘোরাতে শুরু করল। কামাল ওদের অনেককেই চেনে। না-চিনলেও ক্ষতি নেই, এক মিনিটে ভাব করে নিতে পারে যে-কোনও কারুর সঙ্গে।

সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে রিপোর্ট দিতে লাগল। তুষার তালুকদার নাই, সে এখন দিল্লিতে। লাচ্চুদা ঘুমাচ্ছেন, আধঘণ্টা পরে ডাকতে হবে। নজরুল ইসলাম এইমাত্র বেরিয়ে গেল। প্রসূন মুখার্জিকে পেয়েছি...

আমি বললাম, প্রসূন মুখার্জি নয়, সন্ধি মুখার্জি।

কামাল বলল, কেন, প্রসূন মুখার্জিও তো একজন ডিআইজি।

প্রসূন মুখার্জিকে আমি চিনি না, কামাল চেনে। কলকাতা শহরের যত মানুষকে কামাল চেনে, তার অর্ধেকও আমার অচেনা। যদিও কামাল কলকাতায় থাকে না।

সংক্ষেপে সব ব্যাপারটা শুনে প্রসূন মুখার্জি কোনও গুরুত্বই দিল না। হাসতে হাসতে বলল, একজন অ্যাডাল্ট মহিলা এই প্রকাশ্য সকালবেলা বাড়ি থেকে একটু বেরিয়েছেন, তাতে আপনি এত প্যানিক করছেন কেন? হয়তো কাছাকাছি কোনও দোকান-টোকানে গেছেন। কিংবা পার্কে গিয়ে ফ্রেশ এয়ার নিচ্ছেন। আপনিই তো বললেন, এক ঘণ্টাও হয়নি। দেখুন গিয়ে, এর মধ্যে হয়তো বাড়ি ফিরে এসেছেন। এত সামান্য কারণে কি পুলিশকে দৌড় করানো উচিত?

আমি বললাম, ভয় পাচ্ছি, তার কারণ, ভদ্রমহিলার বোধহয় মাথার ঠিক নেই। কাল থেকে কারুর সঙ্গে কথা বলছিলেন না। সেই জন্যই...

প্রসূন মুখার্জি বলল, এক মিনিট ধরুন।

এক মিনিট নয়, মিনিট তিনেক ধরে সে অন্য কাদের সঙ্গে যেন বন্দর এলাকায় চিনির বস্তা লোপাট বিষয়ে আলোচনা করতে লাগল। তারপর বলল, হ্যাঁ, সুনীলবাবু, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, পাগল খোঁজা পুলিশের কাজ নয়। সেজন্য অ্যান্টি-ভ্যাগরান্সি ডিপার্টমেন্ট আছে। যাই হোক, আপনারা দেখুন, সারাদিনেও যদি খোঁজ না পান, তখন আমাকে খবর দেবেন, আমি সে-সময় লালবাজারে থাকব।

প্রসূন মুখার্জি খুব একটা অন্যায় কিছু বলেনি, ব্যাপারটা শুনলে সামান্যই মনে হবে। এর থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজে পুলিশের ব্যস্ত থাকার কথা। কিন্তু আমাদের বন্ধুশ্রেণির কেউ হলে উদ্বেগের কারণটা বুঝত।

আনোয়ারার কাহিনিটা কামাল বুঝে গেছে।

সে বলল, পুলিশ লাগবে না, চলো, আমরাই খুঁজে বের করব। কলকাতায় যখন ফিরেছে—

আমি বললাম, কামাল, তুমি এয়ারপোর্ট থেকে সোজা এসেছ? হাত-মুখ ধোবে? চা করে দেব?

কামাল বলল, কোনও দরকার নাই। চলো, বেরিয়ে পড়ি।

তুমি খুকুমাদের এই বাড়িটা চিনতে পারবে? মহেন্দ্র এখনও আসেনি, ট্যাক্সি নিতে হবে।

মহেন্দ্র আসেনি, গাড়িটা তো আছে দেখলাম। চাবি থাকে কেয়ারটেকারের কাছে। আমি চালাব। খুকুমার বাড়ি ঠিক খুঁজে বের করব।

তুমি সরাসরি কুয়ালালামপুর থেকে আসছ, না ঢাকায় থেমেছিলে?

না, থামিনি। এইখান থিকা ঢাকায় যাব। এই দিক দিয়া গ্যালে টিকিট সস্তা হয়।

দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে পড়লাম।

কামাল প্রধানত থাকে কানাডায়। সে-দেশে গাড়ি চলে রাস্তার ডানদিক দিয়ে।

কিন্তু আমাদের এখানে রাস্তার বাঁ-দিক দিয়ে গাড়ি চালাতেও তার কোনও অসুবিধে হয় না। আর ক্লান্তি জিনিসটা কী, তা বোঝেই না কামাল।

খুকুমার বাড়িতে মাত্র একবার এসেছে, তবু প্রায় সরাসরি পৌঁছে গেল সেখানে। বাসন্তী রয়েছে সেখানে। না, আনোয়ারা ফেরেনি। তার জিনিসপত্র সবই আছে। শুধু হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে বেরিয়েছে মনে হয়।

ছোট রাস্তা থেকে বড় রাস্তা পর্যন্ত মোট ছটি ওষুধের দোকান, একটি মিষ্টির দোকান, আর পাশাপাশি চারখানা মার্বেল পাথরের দোকান। এখন প্রচুর নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে, তাই মার্বেল পাথরের খুব চাহিদা। আমরা ছোটবেলায় মনে করতাম, খুব বড়লোকদের বাড়িতেই শ্বেত পাথরের সিঁড়ি থাকে। এখন যত্রতত্র।

কোনও দোকানেই আনোয়ারা নেই। সে-রকম কোনও পার্কও নেই এ-পাড়ায়, কিছু ফাঁকা জমি এখনও ভর্তি হওয়ার অপেক্ষায় পড়ে আছে।

একটা চায়ের দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে দিয়ে কামল বলল, সুনীল, তোমার জন্য আমার খারাপ লাগছে। তোমার নিশ্চয়ই ল্যাখাপড়ার অনেক কাজ আছে, তুমি কতক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে?

আমি বললাম, লেখাপড়া না-হয় একদিন বন্ধ রাখা যায়, কিন্তু কোথায় খুঁজতে যাব, সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

খবর পেয়েছি, আনোয়ারার এক মামা থাকেন এখানে, টালিগঞ্জে। ভদ্দরলোক ফিল্‌মের ব্যবসা করেন। সাজ্জাদ হোসেন, নাম শুনেছ?

না।

তোমার শোনার কথাও না। তিনি বি-গ্রেড ছবির প্রোডিউসার, গ্রামে-গঞ্জে সেসব মুভি ভালোই চলে। ভদ্রলোকের ঢাকাতেও যাতায়াত আছে, আনোয়ারা সেখানে যেতে পারে। টালিগঞ্জের ফিল্ম পাড়ার ওঁর বাড়ি নিশ্চয়ই অনেকেই চিনবে।

আনোয়ারার কাছে ওই ভদ্রলোকের নামও কখনও শোনা যায়নি।

তবু একটা চান্স নেওয়া যায়। একবার এয়ারপোর্টেও...। দু'একটা হাসপাতালেও অবশ্যই খোঁজ নিতে হবে। আমি একটা সাজেশান দিচ্ছি। তোমার এভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাটা ভালো দেখায় না। তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসছি বাড়িতে, গাড়িটাও তো তোমার লাগবে। আমি ট্যাক্সি করে এইসব জায়গায় ঘুরে দেখে আসি।

কামাল, মেয়েটা ভালোয় ভালোয় ঢাকা পৌঁছে গেলে আমি নিশ্চিন্ত হতাম। অবশ্য আজ তো গয়নাগুলো তোলাও যাবে না।

গয়না?

আনোয়ারার বেশকিছু গয়না রাখা আছে আমাদের কাছে। মানে ব্যাংকে। স্বাতীকেই সেই গয়না তুলতে হবে। শোনো কামাল, আনোয়ারা এই গয়নার কথা কারুকে জানাতে নিষেধ করেছিল। তোমাকে বলা মানে, সারা পৃথিবীকে জানানো।

কিন্তু আমি আর চেপে রাখতে পারছি না। ও-দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে চাই।

না, না, গয়নার কথা এখন আর কারুকে জানাবার দরকার নাই। আমার কাছ থেকে কেউ কিছু টের পাবে না। আনোয়ারাকে খুঁজে বের করে আমি ওই গয়না-টয়নাসমেত ওকে ঢাকায় পৌঁছে দিয়ে আসব। চলো তাহলে।

দাঁড়াও, প্রসূন মুখার্জি যাই-ই বলুক, আমার মনে হয়, লোকাল থানায় একটা মিসিং ডায়েরি করে রাখা ভালো। ধরো যদি ওর কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়...

সেটা ঠিকই। থানায় জানিয়ে রাখা ভালো।

যাওয়া-আসার পথেই একটা থানা দেখেছি। কামাল সঙ্গে থাকায় প্রধান সুবিধে এই, আমি নিজের মুখে যা বলতে পারি না, কামাল তা সাতকাহন করে জানাতে পারে।

থানার তরুণ ওসি আমায় চিনতে পারেনি প্রথমে। কামাল আমাকে প্রায় একজন নোবেল-লরিয়েট সমতুল্য লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পর ছেলেটি বলল, ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনি তো, আপনি তো স্যার আয়ান রশিদ খানের বন্ধু! আপনাদের কথা অনেক শুনেছি।

অর্থাৎ আমার লেখা-টেখা কিছু নয়, রশিদ খানের বন্ধু হিসেবেই আমার পরিচয়ের গুরুত্ব। সে যাই-ই হোক।

এক মহিলা ঘণ্টা দেড়েক বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, এ-ঘটনা শুনে সে-ও তেমন গুরুত্ব দিল না। একটা কিছু অপরাধ, খুন, ধর্ষণ, অন্তত দুর্ঘটনা না ঘটলে পুলিশ দায়িত্ব নিতে চায় না। প্রিভেনসান ইজ বেটার দ্যান কিওর, এটাও তারা মানে না।

কিন্তু আমাদের তারা খাতির করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। ছেলেটির নাম রতন দাস, মুখে একটা আলগা ধবনের বুদ্ধির ছাপ আছে। সে আমাদের চা-টা খাওয়াবেই। দু'তিনবার আপত্তি জানিয়েও এক কাপ আধা-ঠাণ্ডা চা পান করতে হল।

উঠবার আগে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ভাই এফ আই আর লিখে নেবে না?

ছেলেটি বলল, কোনও দরকার নেই। আমার মনে থাকবে। বিকেলে একবার খবর নেবেন। মহিলার নামটা আর মোটামুটি একটা চেহারার ডেসক্রিপশান লিখে দিয়ে যান সাদা কাগজে।

বোঝা গেল, এ রাজ্যে মেয়ে-পাচারকারীরা কেন অবাধে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। কোনও মেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেও পুলিশ সে-খবরে গা করে না। খবর দিতেও অনেক সময় দেরি হয়ে যায়। যদি ওপর মহল থেকে চাপ আসে, তখন পুলিশ তৎপর হয়ে উঠলেও কোনও লাভ হয় না, ততক্ষণে সেই মেয়েটি বা মেয়েদের পাচার করে দেওয়া হয় অন্য রাজ্যে, অনেক দূরে। কিংবা এইসব ব্যাপার উপেক্ষা করার ব্যাপারেও পুলিশের স্বার্থ থাকে।

এসব জায়গায় নেইম ড্রপিং করা বিশেষ দরকার। আমি খানিকটা কঠোরভাবে বললাম, শুধু রশিদ খান নয়, পুলিশ কমিশনার তুষার তালুকদারও আমার বিশেষ পরিচিত। তুষার দিল্লি থেকে আজ বিকেলেই ফিরবে। আমি কি তুষারকে বলব খবর নিতে?

সে বলল, না, না, স্যার, তার দরকার হবে না। অত চিন্তা করবেন না।

কামাল একটা কাগজে সব লিখে-টিখে দিল তার সামনে। সে একবার চোখ বুলিয়ে কাগজটা পাশে রেখে দিতে গিয়েও আমায় দেখল। এবার তার ভুরু কুঁচকে গেল।

তারপর জিজ্ঞেস করল, আপনারা যাকে খুঁজছেন, তার নাম আনোয়ারা চৌধুরি?

কামাল বলল, ইয়েস।

ইজ সি অ্যা বাংলাদেশি ন্যাশনাল?

ইয়েস। উই বোথ নো হার ভেরি ওয়েল। শি কাম্স ফ্রম অ্যান রেস্পেকটিভ ফ্যামিলি।

আপনি কোথাকার? আপনিও বাংলাদেশের?

ওরিজিনালি। নাও আই হ্যাভ কেনেডিয়ান পাসপোর্ট।

ওসি টং টং করে বেল বাজিয়ে, গলা তুলে ও বলল, চক্রবর্তী বাবু, কাল রাত্তিরে যে-মেসেজটা এসেছিল, সেই ফাইলটা আনুন তো।

চক্রবর্তীর গায়ের রং মোষের মতন। চেহারার ভাবটাও অনেকটা তাই। সাধারণত চক্রবর্তী উপাধিকারী ব্রাহ্মণদের গায়ের রং এরকম কালো হবার কথা নয়। মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দরা যেমন ফর্সা। আজকাল অবশ্য অনেক কিছুই বদলে যাচ্ছে।

চক্রবর্তী এসে ফাইল থেকে কী-সব পড়ে শোনাল। তারপর রতন দাস মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার, আপনাদের ক্যান্ডিডেটের নামে কাল রাত থেকেই রেড অ্যালার্ট দেওয়া হয়েছে, তাকে অলরেডি খোঁজাখুঁজি চলছে।

কামাল জিজ্ঞেস করল, কেন? হোয়াই?

উনি কাল সন্ধেবেলা একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করেছেন। উনি কাল রয়াল জর্ডান এয়ারলাইন্সে এসেছেন দুবাই থেকে। ইন্ডিয়ার ভিসা নেই। ট্র্যানজিটে দু'ঘণ্টা থেকে ঢাকা যাওয়ার কথা। কিন্তু সেখান থেকে কী করে যেন হাওয়া হয়ে গেছেন। ঢাকার ফ্লাইটে উনি ওঠেননি।

ট্রানজিট থেকে বেরুল কী করে? আশ্চর্য ব্যাপার।

আশ্চর্য হবার কী আছে? জেলখানা থেকে প্রিজ্নার পালায়, কোর্ট থেকে আসামি পালায়, হাসপাতাল থেকে রুগি পালায়, আর ট্রানজিট লাউঞ্জ থেকে পালানো এমন কী শক্ত? মেয়ে বলে খানিকটা সুবিধেও আছে। মেয়েদের ওপর তেমন নজর রাখা হয় না। ভিসা না-নিয়ে এই কান্ট্রিতে ঢুকেছেন, এটা একটা অপরাধ।

চক্রবর্তী নামে ব্যক্তিটি এবার খাঁক খাঁক করে বলল, অপরাধ আবার কী? পাকিস্তানের আমল ছিল আলাদা। বাংলাদেশ হবার পর আমরা ভেবেছিলাম, ভিসা-টিসা এসব আর লাগবেই না! শুধু শুধু ঝামেলা!

রতন দাস বলল, চক্রবর্তী, তোমাকেও এখন যশোরে যেতে গেলে ভিসা নিতে হবে। অথচ কত কাছে।

চক্রবর্তী বলল, ইচ্ছে করলে এক লাফেই চলে যাওয়া যায়। তা না, পাসপোর্ট-ভিসা, বর্ডারে ঘুষ, দু'দিকেই ঝাঁক ঝাঁক দালাল, যতসব স্টুপিড ব্যাপার।

রতন দাস এ-আলোচনা থামিয়ে দিয়ে আমাকে বলল, তাহলেই বুঝছেন স্যার, আপনাদের এফ আই আর লিখে নিলে আপনারাই মুশকিলে পড়তেন। এই অবস্থায় ওকে আপনারা আশ্রয় দিলে সেটাও হতো বে-আইনি ব্যাপার।

কামাল আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সে-দায়িত্ব নিতে রাজি আছেন। কী হবে, ওঁকে আপনারা জেলে পাঠাবেন? চেষ্টা করে দেখুন।

আমি কামালকে থামালাম। এরপর কামাল বলতে চাইবে, ভারতের প্রধানমন্ত্রীও আমার চেনা।

আমি বললাম, সব থানাই ওর খোঁজ করবে এখন। ভালোই তো হল। ওকে খুঁজে পাওয়াটাই সবচেয়ে বেশি দরকার। তারপর ভিসা-টিসার একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে!

রতন দাস বলল, হ্যাঁ, স্যার, এমন কিছু সিরিয়াস প্রবলেম নয়। যদি পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে আপনার চেনা থাকে, তাহলে তিনি একটা কিছু ব্যবস্থা করে দেবেনই। ওঁরা ইচ্ছে করলে সব পারেন।

যদি? ছেলেটি আমাকে একটা সূক্ষ্ম খোঁচা মারল। তুষার তালুকদারের সঙ্গে যে আমার ঘনিষ্ঠতা আছে তা ও পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি। এইসব ছোটখাটো অপমান হজম করে ফেলা ছাড়া উপায় নেই। তুষার এখন কলকাতায় নেই, নইলে এই থানা থেকেই তাকে একটা ফোন করা যেত। তাহলে কি আজ সন্ধেবেলাতেই তুষারের বাড়ি থেকে এই থানায় একটা টেলিফোন... নাঃ, এটাই আমার একরকম ছেলেমানুষি! পৃথিবীতে একজন থানার ওসি আমাকে তেমন সম্মান দিল না, তাতে কী আসে যায়?

কামালও সব ব্যাপারটা বুঝেছে।

সে খুব শান্তভাবে রতন দাসকে বলল, উই উইল গেট ইন টাচ। আবার আপনার সঙ্গে আমাদের কথা হবে। এখন আর দেরি করে লাভ নেই। সুনীল, চলো যাই। ইনশাল্লা, পুলিশের চেয়ে আমরাই সম্ভবত ওকে আগে ওকে খুঁজে বের করব।

রতন দাস বলল, ইন দ্যাট কেস, আমার সাজেশান, মহিলাকে আপনাদের বাড়িতে লুকিয়ে রাখবেন না। অ্যাট লিস্ট পুলিশ কমিশনার সাহেবকে একটা খবর জানিয়ে দেবেন।

থানা থেকে বেরিয়ে কামাল আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেল বাড়িতে। আমার অনুরোধ সত্ত্বেও সে গাড়িটা নিল না, চলে গেল ট্যাক্সিতে।

তারপর সারাদিন তার পাত্তা নেই। যে এত টেলিফোন করতে ভালোবাসে, ফোনও করল না।

হোটেলের খাবার আনিয়ে খেয়ে আমি একটা ঘুম দিলাম। আগের রাত্তিরের ঘুম না-হওয়া পুষিয়ে নেওয়া। সমুদ্রে তলিয়ে যাবার মতন গাঢ় ঘুম। এই সময় কেউ দরজায় বেল দিলেও খোলা যাবে না।

একবার ঘুম ভাঙল বিকেল চারটায়। একবার আনন্দবাজার অফিসে যাবার কথা ছিল, কিন্তু ইচ্ছে করল না। তাছাড়া, নিজেকে যুক্তি দিলাম, এই সময় আমার বাড়িতে থাকাই উচিত, যদি কেউ কিছু খবর দেয়।

আবার শুয়ে পড়লেও ঘুম এল না। খুকুমার টেলিফোন। তার কাছে নতুন কোনও খবর নেই, আমিও তাকে কিছু জানাতে পারলাম না।

এই সময় বই পড়তেও ইচ্ছে করে না, লেখা-টেখার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং অলসভাবে টিভির চ্যানেল ঘোরানো। কিছুই মন দিয়ে দেখার যোগ্য নয়।

ঠিক সাতটা পনেরোয় ফোন এল তুষার তালুকদারের।

সে বলল, এইমাত্র দিল্লির ফ্লাইটে কলকাতায় নেমেছি। কী হয়েছে সুনীল? তোমার এক চ্যালা আছে, কামাল, সে আমাকে দিল্লিতে ফোন করেছিল। কী করে দিল্লিতে আমার গেস্ট হাউজের নাম্বার খুঁজে বের করল?

কামালকে যারা ঘনিষ্ঠভাবে চেনে না, তারা এই ব্যাপারটা বুঝবেই না। পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্তের কোনও মানুষকে টেলিফোনে যোগাযোগ করার অলৌকিক ক্ষমতা আছে এই ভূয়োদর্শী যুবার।

তুষার আবার বলল, ও যে ঠিক কী বলল, আমি বুঝতে পারিনি। শুধু বলতে লাগল, কলকাতায় ফিরেই যেন আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করি। খুব দরকার আছে। দিল্লিতে আমার হাতে একটুও সময় ছিল না।

আমি বললাম, তুষার, তুমি সবে পৌঁছেছ। বাড়ি যাও, হাত-পা ধোও। ঘণ্টা দু'এক বাদে তোমাকে ফোন করব। দরকার আছে ঠিকই, কিন্তু তা জীবন-মরণ সমস্যা নয়!

তুষার বলল, আমি বাড়ি যাচ্ছি না, লালবাজারে একটা মিটিং আছে। তবে ন'টার মধ্যে ডেফিনিটলি বাড়ি ফিরব। তুমি সোয়া ন'টায় ফোন করো, কিংবা আমিই...

তুষারের সঙ্গে রশিদের তফাত এই যে, এইরকম অবস্থায় রশিদ বলত, শোনো, আমি লালবাজারে গিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে একটা মিটিং সেরেই তোমার বাড়ি চলে আসছি। তখন সব শুনব। সোডা আনিয়ে রেখো!

তুষারের অত মদ্যপানের ঝোঁক নেই।

স্বাতী ফিরল একটু পরেই। ঝড়ে বিধ্বস্ত শালিকের মতন চেহারা। দু'একটা কথা

বলেই ঢুকে গেল স্নানের ঘরে।

তার পনেরো মিনিট পরে খুকুমা। সে সারাদিন অফিস করেছে, দুশ্চিন্তাও চালিয়ে গেছে, কিন্তু চেহারায় কোনও ছাপ নেই। তার জীবনীশক্তি অদম্য।

স্বাতী একেবারে অন্যরকম চেহারা নিয়ে বেরিয়ে এসে ছোটবোনকে বলল, খুকুমা, কী খাবি? আমার সারাদিন কিছুই খাওয়া হয়নি। মহেন্দ্রকে ডেকে খাবার আনাচ্ছি।

খুকুমা বলল, আগে একটু চুপ করে বোস তো! আমি কাজু বাদাম এনেছি। সুনীলদা, ভোদকার বোতল বার করুন। আগে একটা ড্রিংক্ করি, তারপর খাবার কথা।

আনোয়ারার সম্পর্কে যেটুকু খবর জানাবার কথা, ওরা দুইবোন শুনল। কিন্তু সদ্য চলে যাওয়া শ্রেয়ার কথাও ওরা ভুলতে পারছে না। তাই মাঝে মাঝে আনোয়ারার কথার ফাঁকে ফাঁকে এসে পড়তে লাগল শ্রেয়ার কথা। বিনায়কের তীব্র শোকের কথা বলতে বলতে সজল হয়ে যাচ্ছে স্বাতীর চোখ। তাইয়েব কতটা সাহায্য করেছে, তাও বলতে লাগল এক-একবার।

আমি মাঝে মাঝে চোরাচোখে ঘড়ি দেখছি। সোয়া নটা বেজে গেলেই তুষারকে ফোন করতে হবে। কামালের জন্যও দুশ্চিন্তা হচ্ছে। তার এই দীর্ঘ নীরবতার মর্ম বুঝতে পারছি না। মাঝে মাঝে আমার মনে একটা বিচ্ছিরি চিন্তা উঁকি মারছে। আনোয়ারা কোনও কারণে মারা যায়নি তো? নইলে কামাল এমন চুপ করে থাকবে কেন?

ঠিক ন'টা বেজে দশ মিনিটে ফোন করল কামাল।

আমি ফোন ধরলেও সে স্বাতীর সঙ্গেই কথা বলতে চায়।

স্বাতী কথা বলছে, আমি আর খুকুমা প্রায় হাঁ-করা ঔৎসুক্যে সেইসব কথার মর্ম উদ্ধার করার চেষ্টা করছি।

এরকম অসাধ্যসাধন কামালের পক্ষেই সম্ভব।

সারাদিনে সে সারা কলকাতা চষে বেরিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সন্ধান পেয়েছে আনোয়ারার, সে বেঁচেই আছে।

পুলিশ তার সন্ধান পায়নি, কামালই পেয়েছে। আনোয়ারা আছে বেহালার একটা নার্সিং হোমে। অত দূরে আনোয়ারা গেল কী করে, আর কামালই বা কী করে পৌঁছে গেল সেখানে, তা আপাতত রহস্যময় রয়ে গেল।

ফোন ছেড়ে দিয়ে স্বাতী বলল, কামাল আমাদের ওই নার্সিং হোমে এখনই একবার যেতে বলেছে। উঃ, এত টায়ার্ড লাগছে! এখন আবার যাওয়া—

পরমুহূর্তেই গা-ঝাড়া দিয়ে বলল, না, যাব। খুকুমা, তুই কী করবি? তুই বরং...

খুকুমা বলল, আমিও যাব। সুনীলদাকে নিয়ে যাবার দরকার নেই।

দুই বোন দশ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে গেল, আমাকে একা রেখে।



১৭

এবারে আমাদের ইচ্ছে থাকলেও আনোয়ারাকে আর কলকাতায় রাখার উপায় ছিল না। কারণ সে দুটি বে-আইনি কাজ করে ফেলেছে। তার ভিসা নেই। সে এয়ারপোর্টের ট্রানজিট লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসেছে বিনা অনুমতিতে। এর ফলে তার জেল হওয়া উচিত, অথবা ডিপোর্টেশান।

ওপরের মহলের অনেককে ধরাধরি করে আনোয়ারাকে জেলে পাঠানোটা আটকানো গেল কোনওক্রমে, তার জন্য তুষার তালুকদারই সাহায্য করল প্রচুর। তারপর সে-ই পরামর্শ দিল, ভাই মেয়েটিকে আর এখনেও রাখা রিস্কি হয়ে যাবে, কালকের ফ্লাইটেই ঢাকায় পাঠিয়ে দাও। কারণ, এটা তো শুধু আমাদের পশ্চিম বাংলার ব্যাপার নয়, এয়ারপোর্ট সিকিউরিটির ভার ভারত সরকারের। ওরা গোলমাল করবে।

অথচ এবারেই আনোয়ারাকে কিছুদিন অন্তত কলকাতায় রাখার বিশেষ দরকার ছিল। স্বাতী আর খুকুমা ওকে কিছুতেই যেতে দিতে রাজি নয়। আনোয়ারাও যেতে চায় না। শুধুই কাঁদছিল, কিন্তু আমরা অসহায়।

স্বাতী আর খুকুমা রাত্তিরবেলা যখন বেহালার নার্সিং হোমে পৌঁছলো, তখন আনোয়ারাকে ইঞ্জেকশান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। কামাল ওদের কী বলেছিল জানি না। নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু, নইলে দুই বোন সারাদিন বিধ্বস্ত হয়ে থাকার পরেও ওখানে ছুটে গেল কেন?

আমার ধারণা হয়েছিল, আনোয়ারা বুঝি বিষটিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। আসলে তা নয়, সে পেটের যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল ফুটপাথে, রাস্তার লোকই তাকে ধরাধরি করে পৌঁছে দিয়েছে কাছাকাছি একটা নার্সিং হোমে।

খুকুমার বাড়ি থেকে বেহালা অনেক দূর। সেখানে আনোয়ারা গেল কেন? আর কলকাতা শহরে অজস্র নার্সিং হোম, তার মধ্যে বেহালার এক অখ্যাত নার্সিং হোম থেকে কামালই-বা তাকে খুঁজে বার করল কী করে? ধাঁধার মতন মনে হলেও কামালের পক্ষে সবই সম্ভব।

পরে অবশ্য আস্তে আস্তে সবই জানা গিয়েছিল। কামালের কৃতিত্ব যে-কোনো

গোয়েন্দা কাহিনিকেও হার মানিয়ে দেয়।

কামালের কাছে শুধু একটাই সূত্র ছিল। আনোয়ারার এক মামার নাম সাজ্জাদ হোসেন, তিনি এদিককার লোক। কয়েকখানা বাংলা সিনেমার প্রযোজক। কামাল ধরেই নিয়েছিল, তাঁর বাড়ি হবে টালিগঞ্জে। কিন্তু টালিগঞ্জে স্টুডিও-পাড়া থাকলেও ফিল্মের সব লোক যে সেখানেই বাড়ি করবেন, তার কোনও মানে নেই। টালিগঞ্জের কয়েকটি স্টুডিওতে টুঁ মেরে কামাল জানতে পারল, সাজ্জাদ হোসেনের বাড়ি সোনারপুরে।

কামাল ছুটল সেখানে, ট্যাক্সিতে। পরোপকারের জন্য জলের মতন টাকা খরচ করতেও কামালের দ্বিধা নেই। সোনারপুরে সাজ্জাদ হোসেনের খোঁজ পাওয়া গেল সহজেই। তিনি বড় ব্যবসায়ী, সিনেমা তোলা তাঁর প্রায় শখের ব্যাপার, তাঁর দুখানি মাছের ভেড়ি আছে। বাগানওয়ালা প্রশস্ত বাড়ি, সেই বাড়ির মধ্যেই আছে দরগা।

বাড়িতে পৌঁছেও একটুর জন্য সাজ্জাদ হোসেনের সঙ্গে দেখা হল না। আধঘণ্টা আগে তিনি শুটিং স্পটে চলে গেছেন। চোখের জলে মুক্তো ঝরে ছবির শুটিং চলছে ক্যানিংয়ে নদীর ধারে।

এবারে ট্যাক্সি ছেড়ে ট্রেন। ঘণ্টা দেড়েকের যাত্রা। শেষ পর্যন্ত সাক্ষাৎ পাওয়া গেল সাজ্জাদ হোসেন সাহেবের।

সাজ্জাদ হোসেন বিষয়ী মানুষ। নিজের চেষ্টায় উন্নতি করেছেন, মানুষ চরিয়ে খান। কামালের মতন একজন উটকো পুরুষ এসে তাঁর ভাগ্নি সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করলে তাঁর তো সন্দেহ হবেই। কোনও আত্মীয়তা আছে? নেই। কামাল বিবাহিত, আনোয়ারাও তাই। দু'জনে থাকে দু'দেশে। তবু কামাল সেই মেয়েটির খবর নেবার জন্য, এতদূরে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে কেন? কামাল বলতে পারছে না যে, পুলিশও খুঁজছে আনোয়ারাকে।

যাই হোক, কামালের মুখে-চোখে এমন একটা সহজ সারল্য আছে, বেশিক্ষণ তাকে অপছন্দ করে থাকা যায় না। হোসেন সাহেব জানালেন যে, আনোয়ারা এসেছিল সোনারপুরে, কিন্তু তখন তাঁর বেরুবার খুব তাড়া, টাকা-পয়সা না নিয়ে এলে শুটিং শুরুই হবে না। সব কথা শোনার সময় নেই। বাড়িতে তাঁর স্ত্রীও নেই। তিনি গেছেন মুর্শিদাবাদে বাপের বাড়িতে। তিনি ভাগ্নিকে বললেন, তুই বাড়িতে থাক, বিশ্রাম নে। আমি সন্ধেবেলা ফিরে এসে তোর সব কথা শুনব।

কাহিনির এই পর্যন্ত শুনে মনে হতেই পারে, এর সঙ্গে বেহালার নার্সিং হোমের কী সম্পর্ক?

এইবার আসছে।

সোনারপুরের বাড়িতে মেয়েরা কেউ নেই শুনে আনোয়ারা বলেছিল, সে তাহলে এক জায়গায় ঘুরে আবার সন্ধেবেলা ফিরে আসবে।

কোথায় যাবে একা একা?

আনোয়ারা বলেছিল। প্লেনে আসার সময় কলকাতার এক দম্পতির সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। পাশে বসেছিল। মৃণাল ঘোষ ও মমালয়া ঘোষ। ঠিকানা দিয়েছে। বেহালায় থাকে। তাদের সঙ্গে দেখা করে আসবে।

এখানে একটা প্রশ্ন। আনোয়ারা আমার সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলেনি। স্বাতী কিংবা খুকুমার কাছেও মন খোলেনি। আর প্লেনে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য আলাপ, এমন দম্পতির সঙ্গে দেখা করার জন্য তার এত ব্যস্ততা কেন?

আর একটা সূত্র পেল কামাল। কিন্তু মৃণাল ঘোষ খুব কমন নাম, ঠিকানা ছাড়া শুধু বেহালায় থাকে এইটুকু জেনে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে কী করে? অসম্ভব।

একটা ফোন-বুথে ঢুকে টেলিফোন গাইড দেখতে লাগল কামাল। সতেরো জন মৃণাল ঘোষের নাম আছে। তার মধ্যে বেহালা অঞ্চলের ঠিকানাতেই পাঁচজন। কামাল তাদের প্রত্যেককে ফোন করা শুরু করল।

কামালের ফোন পেয়ে সেইসব মৃণাল ঘোষেরা যে প্রথমটায় হতভম্ব বা বিরক্ত হয়েছিলেন, তা অনুমান করাই যায়। চিনি তো কামালকে। সে ভূমিকা করে না, কথা শুরু করে মাঝখান থেকে। আপনি মৃণাল ঘোষ, আপনি কাল দুবাই থেকে ফিরেছেন? কি না, আপনার স্ত্রীর নাম কি মোমালয়া? কিংবা, মৃণালবাবু, আপনার বাড়িতে আনোয়ারা গেছে?

মমলয়া নামটি সন্দেহজনক। হয় হোসেন সাহেব ভুল শুনেছেন কিংবা আনোয়ারা ভুল বলেছে। বাঙালি মেয়েদের এরকম নাম হয় না। কামাল আবার সেটা বদল করে নিয়েছে মোমালয়া।

যাই হোক, কামালের দুরন্ত অধ্যবসায়ে শেষ পর্যন্ত উদ্দিষ্ট মৃণাল ঘোষ এবং তাঁর স্ত্রী মলয়া ঘোষের সন্ধান পাওয়া গেল। মলয়া ঘোষ একজন লেডি ডাক্তার। তাঁদের সঙ্গে দুবাই থেকে এক প্লেনে পাশের সিটে বসে এসেছে আনোয়ারা চৌধুরি নামে এক মহিলা ঠিকই। কিন্তু কলকাতার বাড়িতে তো তিনি আসেননি।

আবার যোগসূত্র ছিন্ন। কিন্তু এই পর্যন্ত জানা গেল, আনোয়ারা মলয়া ঘোষের সঙ্গে দেখা করার জন্য বেহালায় যেতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বাড়িতে পৌঁছোয়নি। কামালের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট।

ঠিকানা জেনে নিয়ে সে হাজির হল বেহালায় সেই মৃণাল ঘোষের বাড়িতে।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বেশ সজ্জন। স্বামী ইঞ্জিনিয়ার, স্ত্রী ডাক্তার। ছুটিতে গিয়েছিলেন ইজিপ্টের পিরামিড দেখতে। বেহালায় নতুন বাড়ি। সে-বাড়ির নাম রূপসা। অর্থাৎ একজনের অন্তত আদি নিবাস ছিল যশোরে।

এঁরা সন্দেহপ্রবণ নন। কামাল আনোয়ারার খোঁজ করতে এসেছে জেনে মৃণাল উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞেস করলেন, মহিলার কোনও বিপদ হয়েছে নাকি? প্লেনে ওঁকে কিছুটা অসুস্থ মনে হচ্ছিল, তাই না খুকু?

খুকু অর্থাৎ মলয়া বললেন, ঠিক অসুস্থ নন, কেমন যেন উদভ্রান্ত। আমাদের সঙ্গে কাটাকাটা কথা বলছিলেন, আবার মাঝে মাঝে চোখে রুমাল দিচ্ছিলেন। খুব প্রিয়জনদের অনেকদিনের জন্য ছেড়ে এলে এরকম হতে পারে।

কামাল বলল, না, মানে, সে-রকম কিছু বিপদ হয়নি। তবে, আপনাদের বাড়িতে আসবেন বলে বেরিয়েছিলেন দুপুর বারোটাব দিকে, অথচ এখানে আসেননি, সন্ধ্যা হয়ে গেল। তাই একটু চিন্তা হচ্ছে।

উনি কি কলকাতা শহরটা চেনেন ভালো করে?

খুব ভালো চেনেন না। ঢাকার মানুষ তো। একা একা ঘোরার অভ্যাস নাই।

কলকাতার মেয়েরা একা চলাফেরা করতে পারে, তবে রাস্তা না চিনলে ট্যাক্সিওয়ালারা অনেক বেশি ঘোরায়। হয়তো মাঝপথে অন্য কারুর বাড়িতে গেছেন।

তাও হতে পারে। তবে এ-শহরে তার চেনাশুনা বেশি মানুষ নাই।

উনি উঠেছেন কোথায়?

দক্ষিণ কলকাতায় আমাদের এক কমন ফ্রেন্ডের বাড়িতে। তাঁরাও চিন্তা করছেন।

আমাদের সঙ্গে প্লেনেই আলাপ। ব্যাপার হল কী, প্লেনে যখন ডিউটি-ফ্রি জিনিস বিক্রি করছিল, তখন খুকু একটা পারফিউম কিনতে গিয়ে দেখল কিছু ডলার কম পড়ছে। ফেরার পথে সব ডলারই প্রায় ফুরিয়ে ফেলেছি। খুকু পারফিউমটা ফেরত দিচ্ছে দেখে ওই মহিলা হঠাৎ বললেন, ন্যান, ন্যান, আমি দাম দিয়ে দিচ্ছি! তা কখনও হয়, ওইভাবে আমরা নিতে পারি? খুকু নেবে না। মহিলা বললেন, আমি আপনাকে উপহার দিচ্ছি। আচ্ছা বলুন তো, চিনি না, শুনি না, হঠাৎ এমন কারুর কাছ থেকে উপহার নেওয়া যায়? অবশ্য বাংলাদেশের মানুষরা অনেকে এমন দিলদরিয়া হয় আমি জানি।

কামাল বলল, মানুষ তো মানুষকে কিছু উপহার দিতেই পারে।

মলয়া বলল, কিন্তু আমাদেরও তো প্রতিদানে কিছু দেবার সুযোগ থাকা উচিত। শেষ পর্যন্ত একটা ব্যবস্থা হল। আমাদের কাছে ভারতীয় টাকা ছিল, সেই টাকার বদলে উনি ডলার দিলেন। আমাদের সুবিধে হল, আর ওঁরও ভারতীয় টাকার দরকার ছিল, কলকাতায় লাগবে!

কামাল জিজ্ঞেস করল। উনি কলকাতায় থাকবেন বলেছিলেন?

মলয়া বললেন, হ্যাঁ। কলকাতাতেই থাকবেন, এখন ঢাকায় ফিরবেন না।

কামাল আর ভিসার ব্যাপারটা ভাঙল না।

মলয়া আবার বলল, নামার পর যা হয়, সবাই আলাদা হয়ে যায়। ওঁকে আর দেখিনি। তবে যখন ওঁকে আমার কার্ড দিয়েছিলাম ঠিকানার জন্য, উনি যেই দেখলেন আমি একজন গাইনোকোলজিস্ট, উনি আমার একটা হাত চেপে ধরে খুব আবেগের সঙ্গে বললেন, আপনি ডাক্তার? আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার আছে।

আপনার কাছে যাব।

কামালের মনে পড়ল, খুকুমা বলেছিল আনোয়ারার পেটব্যথার কথা। কিন্তু সে-প্রসঙ্গ আর তুলল না।

ঘোষ দম্পতি কামালকে চা-টা না খাইয়ে ছাড়লেন না। কামালের এটুকু দরকারও ছিল। প্লেন থেকে নামার পরই সে সারাদিন না খেয়েদেয়ে ঘুরছে। ওর মধ্যে কামাল ওদের দু'জনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ফেলল মালয়েশিয়া বেড়িয়ে আসার জন্য। সে আতিথ্য দেবে।

বাইরে এসে কামাল চিন্তা করতে লাল, এরপর কোন দিকে যাবে?

আনোয়ারা বেহালায় আসবে বলে রওনা দিয়েছিল, কিন্তু মৃণাল ঘোষের বাড়িতে পৌঁছোয়নি। মাঝপথে ছিনতাই হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক নয়, কলকাতায় এরকম ঘটে না, তাও দিনের বেলা। তাহলে কী হতে পারে? হঠাৎ অসুস্থ? সেই পেটের ব্যথা?

কাছাকাছি এক-একটা নার্সিং হোম আর হাসপাতাল ধরে ধরে সে খোঁজা শুরু করল। বেশি দূর যেতে হল না। তারাতলা মোড়ের কাছেই গুড হোপ নার্সিং হোম, বড় রাস্তার ওপরেই, সেখানে শুয়ে আছে আনোয়ারা।

নার্সিং হোমে আনোয়ারাকে নিল কেন? সরকারি হাসপাতালে যে-কোনও রুগিকে ভর্তি করতে বাধ্য। কিন্তু নার্সিং হোম তো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। রাস্তার ভিখিরিকে তারা নেবে না। ভদ্রলোকের মতন পোশাক পরা কেউ এলেও প্রথমে প্রশ্ন উঠবে, চিকিৎসার খরচ কে দেবে? পাবলিক যদি ধরাধরি করে কারুকে রাস্তা থেকে নিয়ে আসে, তাহলে তক্ষুনি ফেরত দেওয়াও যায় না, পাবলিক ক্ষেপে উঠে ভাঙচুর করতে পারে। তবু পাবলিকের কাছেই প্রশ্ন তুলতে হয়, মানবিকতার খাতিরে এমার্জেন্সিতে ভর্তি করে নিচ্ছি, কিন্তু খরচ কে দেবে?

পাবলিক মানবিকতার দিকটাই শুধু বোঝে, কিন্তু খরচ দেয় না কেউ।

আনোয়ারার সঙ্গে ছিল তার হ্যান্ডব্যাগ। ভিড়ের মধ্যে উপকারী সেজে কেউ তার হ্যান্ডব্যাগটা অনায়াসেই হাপিস করে দিতে পারত, এরকম প্রায়ই হয়। কিন্তু আনোয়ারার সৌভাগ্য, এক্ষেত্রে তা হয়নি। একজন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন সেখানে। তিনিই হ্যান্ডব্যাগটা তুলে নিয়ে উঁচু করে ধরে রইলেন। নার্সিং হোমে এসে অজ্ঞাতপরিচয় রোগিণীকে ভর্তি করার সময় সেখানকার কর্তৃপক্ষকে বললেন, আপনারা এই ব্যাগটা জমা রাখুন।

পাবলিকের সামনেই খোলা হল সেই হ্যান্ডব্যাগ। তার মধ্যে রয়েছে কিন্তু ভারতীয় টাকা এবং কয়েকগুচ্ছ ডলারের নোট। সুতরাং চিকিৎসার খরচের চিন্তা নেই। সবাইকে দেখিয়ে, একটা সেলোটেপ দিয়ে আটকে হ্যান্ডব্যাগটা রেখে দেওয়া হল লকারে।

কামাল যখন আনোয়ারাকে আবিষ্কার করে, তখন সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

নার্সিং হোমের কর্তৃপক্ষ কামালকে জানাল, পেশেন্টের অবস্থা তেমন কিছু গুরুতর

নয়, কিন্তু ঘুম ভাঙার পর বাড়ির কোনও মহিলা ওর কাছে থাকলে ভালো হয়। কামাল যখন এর স্বামী নয়, তখন কামালকে দূরে থাকতে হবে।

তাই কামাল আমার বদলে ফোন করেছিল স্বাতীকে।

স্বাতী আর খুকুমা নার্সিং হোমে পৌঁছবার পর কামাল ওদের বসিয়ে রেখে বাইরে গেল তুষার তালুকদারকে ফোন করতে। পুলিশ যাকে খুঁজছে, তার খবর জানিয়ে দেওয়া কামালের কর্তব্য।

এরপর যে ছোট নাটকটি হল, তা খুবই দুঃখের, কিন্তু আমরা নিরুপায় অভিনেতা।

খুকুমা আগেই সন্দেহ করেছিল কিছুটা। নার্সিং হোমে গিয়ে পরিষ্কার জানা গেল। আনোয়ারা পাঁচ মাসের গর্ভবতী!

এই অবস্থাটা সে আমাকে কিংবা স্বাতীকেও বলতে পারেনি লজ্জায় বা যে-কোনও কারণেই হোক। এই জন্যই সে বেহালায় গাইনোকলজিস্ট মলয়া ঘোষের কাছে ছুটে যেতে চেয়েছিল।

এইরকম অবস্থা নিয়ে সে ঢাকায় ফিরে যেতে চায় না।

সে ভেবে রেখেছিল, কলকাতায় বেশ কিছুদিন থেকে গর্ভপাত করিয়ে নেবে। কিন্তু সে-দায়িত্ব নিতে রাজি হবে কে? পাঁচমাস যথেষ্ট বেশি সময়, কোনও ভদ্র নার্সিং হোম অ্যাবরশান করাতে রাজি হয় না। আজে-বাজে জায়গায় গেলে জীবনের ঝুঁকি থাকে।

তাছাড়া, ভিসা ছাড়া যে কলকাতায় থাকা যায় না, সে-কথাও আনোয়ারা চিন্তা করেনি। অবশ্য ঢাকা থেকে কলকাতার ভিসা পাওয়া যত সহজ, সৌদি আরব থেকে তো আর তা নয়। হয়তো সম্ভবও নয়! এয়ারপোর্ট থেকে পালাবার মতন দুঃসাহসের কাজও সে করে ফেলেছে।

পরদিন সকালেই তাকে ছাড়িয়ে আনা হল নার্সিং হোম থেকে। বিকেলে তাকে প্লেনে তুলে দেবার ব্যবস্থা সব ঠিকঠাক।

সারাদিন তার কী আছাড়ি-পিছাড়ি কান্না। সে কিছু খাবে না, স্নান করবে না। বারবার স্বাতীর পা জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, বউদি, আমারে তাড়ায়ে দিও না, কয়েকটা দিন থাকতে দাও, ঢাকায় গ্যালে আমার মরণ ছাড়া উপায় থাকবে না, আমি মরতে চাই না, বউদি আমারে বাঁচাও।

স্বাতীরও চোখে জল। সে একবার আমাকে বলল, ওগো, দেখো না, কিছু একটা ব্যবস্থা করা যায় না?

আমি অন্য ঘরে চলে যেতে যেতে বললাম, কামালকে জিজ্ঞেস করে দেখো।

কামাল বলল, সবদিকই কনসিডার করে দেখা হয়েছে। অন্য কোনও উপায় নাই। আনোয়ারা, আর একদিনও এখানে থাকলে তোমারে পুলিশে ধরবে।

আনোয়ারা বলল, ধরুক পুলিশ। আমি এখানে জেল খাটব। তবু ঢাকা যাব না!

কামাল বলল, জেল খাটবে মানে কী! এখানকার পুলিশ তোমারে অ্যারেস্ট করে এয়ারপোর্ট সিকিউরিটির হাতে তুলে দেবে। তারা সব অবাঙালি। তারা কতক্ষণ ধরে জেরা করবে কে জানে। তারপরও তারা নেক্‌সট অ্যাভেইলেবল ফ্লাইটে তুলে দেবে। দুবাইতেও ফেরত পাঠাতে পারে। তার বদলে চুপেচাপে নিজেরা চলে যাওয়াই ভালো।

দুপরের দিকে তুষার তালুকদার নিজে একবার ঘুরে গেল। এয়ারপোর্টে সব ব্যবস্থা করা আছে। ইমিগ্রেশান কোনও ঝামেলা করবে না।

আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে তুষার বলল, সুনীল, তোমাকে একটা রিকোয়েস্ট আছে। মহিলাকে চোখে চোখে রাখতে হবে। এখান থেকে যদি আবার সরে পড়ে, তাহলে খুবই মুশকিল হবে। আমি ব্যাপারটা যতদূর সম্ভব গোপন রাখার চেষ্টা করছি। বেশি জানাজানি হলে, ট্রানজিট লাউঞ্জের দুজন সিকিউরিটি গার্ডকে সাসপেন্ড করতেই হবে। তখন ওরা আন্দোলন করতে পারে।

আমি বললাম, কামাল ওকে চোখে চোখে রাখছে। কামালের ওপর ডিপেন্ড করা যায়।

সকাল থেকে ঠিক ছিল, কামালও আজ ঢাকায় যাবে আনোয়ারার সঙ্গে। কিন্তু বিকেলের দিকে কামাল মত বদলে ফেলল। সে বলল, আমি ভেবে দেখলাম, এখন আনোয়ারার সঙ্গে আমার যাওয়াটা ঠিক হবে না। লোকে ভুল বুঝতে পারে। ও একাই যাক। কিছুদিন মাদারিপুরে ওর বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকুক। এখনই তো আর কেউ সবকিছু জানছে না।

কামাল সঙ্গে গেলে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। কিন্তু ওকে জোরও করা যায় না। বেচারি কলকাতায় পৌঁছবার পর একটু বিশ্রাম নেবারও সময় পায়নি। এখানে ওর নিজেরও কিছু কিছু কাজ থাকে।

বিকেলবেলা বিদায় দৃশ্যটি খুবই ট্র্যাজিক। অঝোরে কাঁদছে আনোয়ারা, মানুষের বুকে এত কান্নাও থাকে? দরজা থেকে তাকে প্রায় টেনে বার করা হল, জোর করে তোলা হল লিফ্‌টে। অন্য ফ্ল্যাটের অনেকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখছে কৌতূহলি হয়ে। কেউ মারা গেল নাকি?

খুকুমা, স্বাতী, কামাল সবাই এয়ারপোর্টে যাবে আনোয়ারাকে পৌঁছে দিতে। আমি আর শেষ সময়টায় ঘর থেকেই বেরোলাম না। অত কান্না আমার সহ্য হয় না।

দুপুরে স্বাতী ব্যাংক থেকে নিয়ে এসেছে গয়নার পুঁটুলিটা। আনোয়ারা কিছুতেই সেটা নেবে না। জোর করে পুঁটুলিটা ভরে দেওয়া হয়েছে তার ব্যাগে। এখন আমরা বিবেকের দায় থেকে মুক্ত।

জানালা দিয়ে দেখলাম, গাড়িটা চলে গেল এয়ারপোর্টের দিকে। হয়তো এ-ই আমার আনোয়ারাকে শেষ দেখা।

একটা বিবাহিতা মেয়ে গিয়েছিল বিদেশে। সে ফিরে এল গর্ভবতী হয়ে। এ এক

বিরাট সামাজিক কেলেংকারি, তাই না? কিন্তু এতে মেয়েটির দোষ কতখানি?

সন্তানজন্মের জন্য গর্ভধারণের পুরো দায়িত্বটাই মেয়েদের ওপর দিয়েছে প্রকৃতি। পুরুষ শুধু বীর্য ঢেলে দিয়েই খালাস। সেই হিসেবে পুরুষরা অতি স্বার্থপর। সেইজন্যই, কোনও বিবাহিত পুরুষ বিদেশে গিয়ে, এমনকী স্বদেশেও গোপনে কিছু কিছু যৌন অভিযান চালাতে পারে অনায়াসে। রোগ থেকে সাবধান থাকলে কোনও চিহ্নও থাকে না। তাই তাতে কোনও সামাজিক কেলেংকারিও হয় না।

সৃষ্টির একেবারে প্রথম দিকে নারী ও পুরুষ দু'জনেরই কি গর্ভধারণের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেবার কথা ছিল? হয়তো তাই। নইলে পুরুষের বুকেও দুদিকে স্তনের মতন দুটি ফুসকুড়ি রয়ে গেছে কেন? স্তন তো বাচ্চাদের স্তন্যপান করাবার জন্য। পুরুষের বুকে ওই দুটি ফুসকুড়ির তো কোনও প্রয়োজনীয়তাই নেই। মানুষের শরীরে একেবারে প্রয়োজনহীন এমন। চাক্ষুষ আর তো কোনও প্রত্যঙ্গ থাকে না! বিজ্ঞানীরাও এর উত্তর খুঁজে পাননি।

মেয়েদের ওপরেই পুরোপুরি গর্ভধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অন্য একটি বিবেচনায়। দম্পতির দুজনের একজনকে তো খাদ্য সংস্থানের জন্য বেরুতে হবে। তাছাড়া সদ্যজননী ও নবজাতকের পাহারার ব্যবস্থাও করতে হবে একজনকে। ঝড়-বাদল, হিংস্র পশু, ততোধিক হিংস্র অন্য মানুষের আক্রমণ, এইরকম কত বিপদ হতে পারে। সেই প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পুরুষের, সেইজন্য তার শরীরে অতিরিক্ত পেশীশক্তিও দিয়ে দেওয়া হল, যাতে সে লড়তে পারে।

কিন্তু পুরুষ যে সেই পেশীশক্তির অপব্যবহারও করতে পারে। তা কি প্রকৃতি বোঝেনি? পেশীশক্তির জোরে পুরুষ তার সঙ্গীটির ওপর যখন তখন অত্যাচার করতে পারে, বলাৎকার করতে পারে অন্য মেয়েদের, জোর করে কোনও অনিচ্ছুক নারীর গর্ভে নিষেক করতে পারে বীর্য। পৃথিবীব্যাপী পুরুষেরা তো সেই আধিপত্যই চালিয়ে যাচ্ছে। অনিচ্ছায় গর্ভবতী হলেও সামাজিক অত্যাচার সহ্য করতে হয় শুধু মেয়েদের। স্বার্থপর পুরুষদের নিজেদের তৈরি করা এই সামাজিক নিয়ম!

গর্ভে যে-সন্তানটি আসে, সে তো একেবারেই নির্দোষ। যেন সমুদ্রে ভাসমান একটি প্রাণ। সে তার পিতৃপরিচয় জানে না। তার কোনও ভাষা নেই, ধর্ম নেই। সম্পূর্ণ অসহায়, অনভিজ্ঞভাবে, চক্ষু বোজা অবস্থায় সে মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে। কত পরিবারে তার জন্মের পরেই আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে সে জন্মমুহূর্ত থেকেই অবাঞ্ছিত। তাকে গোপনে ফেলে দেওয়া হয় আঁস্তাকুড়ে। কিংবা মেরে ফেলা হয় গলা টিপে। কন্যাসন্তান হলে এই সম্ভাবনা অনেক বেশি। আবার গর্ভে থাকার সময়েই তাকে হত্যা করার অনেক রকম ষড়যন্ত্র চলে।

আনোয়ারার সন্তানটির কী হবে? তাকে মেরে ফেললেও কি আনোয়ারার সামাজিক কলঙ্ক মুছে যাবে? কিংবা আত্মহত্যা করতে হবে তাকেও? আনোয়ারা

বারবার বলছিল, সে বাঁচতে চায়।

দমদম এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের বাড়িতে ফিরতে যতটা সময় লাগে, তার আগেই কলকাতার বিমান পৌঁছে যায় ঢাকায়। কামালরা ফেরার আগেই আমি বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। এয়ারপোর্টে শেষ বিদায় দৃশ্যের বর্ণনা আমি আজই শুনতে চাই না। ফিরলাম অনেক রাতে।

কামাল থেকে গেল আরও কয়েকটা দিন।

সারাদিন সে সারা শহরে চক্কর মেরে বেড়ায়, তার সঙ্গে আমার প্রায় দেখাই হয় না। দুপুরে সে বাড়িতে খায় না। তার সঙ্গে শুধু দেখা হয় রাত্তিরে, খাবার টেবিলে। তখন সে তার নতুন ব্যবসার পরিকল্পনার কথা শোনায়। তার নিত্য-নতুন পরিকল্পনা। এখন সে মেতে উঠেছে, কিছু কিছু বাংলা সিনেমা মালয়েশিয়ায় আর ক্যানাডায় দেখাবার ব্যবস্থা করবে, তাতে তার লাভ থাকবে টোয়েন্টি পারসেন্ট। এখানকার বিভিন্ন প্রযোজকদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে, সাজ্জাদ হোসেনের বাড়িতেও গেছে তিনবার।

এর মধ্যে ঢাকায় সে বেলালকে টেলিফোন করেছিল। বেলাল প্রথমবার জানিয়েছে যে, আনোয়ারার ঢাকায় ফেরার কথা সে কিছু শোনেনি। ঢাকায় কিছু চাঞ্চল্যও ঘটেনি। কোনও আড্ডাতেই আনোয়ারার প্রসঙ্গ ওঠেনি।

কোনও খবর না থাকাই তো ভালো খবর।

দ্বিতীয়বার বেলাল জানাল যে, সে শামীমের কাছে খোঁজ নিয়েছিল। শামীম জানে যে আনোয়ারা ফিরেছে, কিন্তু সে শ্বশুরবাড়িতে যায়নি। সে উঠেছে সম্ভবত তার বড় বোনের বাড়িতে। আনোয়ারার এই বোন থাকে ধানমণ্ডিতে, কিন্তু বেলাল সে-বাড়ির ঠিকানা বা ফোন নাম্বার জানে না। একমাত্র বীথি ভাবির সঙ্গে আনোয়ারার একবার দেখা হয়েছিল, তিনি তো বললেন, আনোয়ারার চোখে নাকি কী-সব অসুখ হয়েছে। কালো চশমা পরে আছে। সে একটু মোটাও হয়েছে।

চোখে কালো চশমা পরলেই সবসময় তা চোখের অসুখের জন্য নাও হতে পারে। যাই হোক, তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয় নিশ্চয়ই। এমনিতে শুনে মনে হয়, আনোয়ারা ভালোই আছে। তাহলে শুধু শুধু সে ঢাকায় ফিরতে অত ভয় পাচ্ছিল কেন?

স্বাতী শুধু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। ওর চোখভরা সেই প্রশ্ন, আনোয়ারার পেটের সন্তানটির কী হবে?

পরের শনিবার আমাকে যেতে হল হলদিয়া।

ইদানীং প্রতি বছরই হলদিয়ায় খুব বড় আকারের এক কবি-সম্মেলন হয়। লক্ষ্মণ শেঠ ওখানকার একচ্ছত্র নেতা। তার স্ত্রী তমালিকা পণ্ডা শেঠ নিজে একজন কবি। তারই ব্যবস্থাপনা ও আতিথেয়তার তুলনা নেই। প্রচুর কবি ও অকবি যোগ দেয়, বাংলাদেশ থেকেও একটা বড় দল আসে। দু'দিন ধরে খাওয়া-দাওয়া ও আড্ডা

হয় জমজমাট।

আমি এবার যাব না ভেবেছিলাম, এই সময় আমার ব্যাঙ্গালোরে অন্য একটি মিটিংয়ে যাবার কথা। কিন্তু অন্যতম ব্যবস্থাপক শ্যামলকান্তি দাশ এসে চেপে ধরল, আমাকে যেতেই হবে। একেবারে ঝুলোঝুলি।

শক্তি তখন বসে ছিল আমার পাশে। সে বলল, তুমি যাবে না? গুলি মারো ব্যাঙ্গালোর। চলো, কয়েকদিন হলদিয়ায় মোচ্ছব করে আসি। ওদিক থেকে রশিদকেও ডেকে নেব! তারপর দিঘা ঘুরে আসব।

শ্যামলকান্তি বলল, এবার শামসুর রাহমান আসছেন। তিনি বিশেষ করে আপনার কথা বলে দিয়েছেন। তাছাড়া বেলালদা আসছেন।

এরপর আর না-বলার উপায় নেই।

উদ্যোক্তারা কলকাতা থেকে কয়েকখানা বাস আর গাড়ির ব্যবস্থা করে। একটা গাড়িতে শক্তি, বেলাল, সমরেন্দ্র আর আমি। কোলাঘাটের কাছে এক জায়গায় চা-পানের জন্য থামা হল। বেলাল আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, সুনীলদা, আপনি আনোয়ারার লেটেস্ট খবর শুনেছেন?

আমি দু'দিকে মাথা নাড়লাম।

বেলাল বলল, ও তো একটা খুব মুশকিল বাধিয়ে নিয়ে এসেছে। পাঁচমাসের প্রেগনেন্ট!

যেন আমি এ-খবর জানি না। এই ভান করে চেয়ে রইলাম।

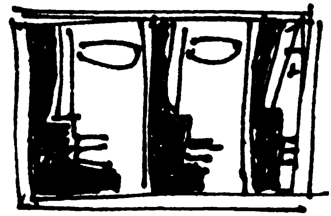
বেলাল আবার বলল, এখনও অনেকে জানে না। কিন্তু ওদের নামকরা ফ্যামিলি, সবাই জেনে যাবেই। এর মধ্যেই গসিপ শুরু হয়ে গেছে। আনোয়ারা এর মধ্যে একবারও ওর স্বামীর কাছে যায়নি। কামাল ঢাকায় গিয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে দু'বাড়িতে। শামীমকে কী-সব বুঝিয়েছে। শামীম মানুষটি খুব ভালো। ওর সম্পর্কে কত কী শোনা গিয়েছিল। ও কিন্তু এর মধ্যে অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে ইনভল্ভড হয়ে পড়েনি। শুধু তাই নয়, ও প্রস্তাব দিয়েছে ও আনোয়ারাকে ফিরিয়ে নিতে রাজি আছে। তাকে আগের মতনই স্ত্রীর সম্মান দেবে। শুধু পেটের সন্তানটিকে নষ্ট করতে হবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঢাকাতে ওসব করা যায়?

প্রকাশ্যে করা না গেলেও গোপনে গোপনে সবই হয়। সেটা কোনও প্রবলেম নয়। কিন্তু আনোয়ারাকে তো জানেন, কীরকম জেদি। ও এই শর্তে ফিরে যেতে রাজি নয়। ও পেট খালাস করবে না কিছুতেই।

তাই নাকি?

ওদের তো আগে বাচ্চা-কাচ্চা হয়নি। এই প্রথম প্রেগনেন্সি। এবারে টারমিনেট করলে ভবিষ্যতে আর আনোয়ারার মা হবার সম্ভাবনা থাকবে না। তাই আনোয়ারা এই বাচ্চাটাকে রেখে দিতে চায়। স্ত্রী হতে না পারুক, তবু ও মা হবে।



১৮

কয়েকদিনের মধ্যেই আমাকে বিদেশযাত্রার ব্যবস্থাপনা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হল। নিউ জার্সির নূপুর লাহিড়ি তার বাবার নামে একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠ করেছে, তার উদ্বোধন করতে হবে, সেইসঙ্গে কিছু উৎসব। সব মিলিয়ে দিনদশেকের ব্যাপার। স্বাতী যাবে না, আমাকেও তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হবে।

নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি অঞ্চলে এত বন্ধু-বান্ধব যে, সবাই অনুরোধ করে তাদের বাড়িতে থেকে আসার জন্য। এবার ব্যাপারটা হল উলটো। আমার ফিরে আসার তাড়া, অথচ ফিরতে পারছি না। আমাকে দেওয়া হয়েছিল এয়ার ইন্ডিয়ার একটা ক্লাব ক্লাসের টিকিট, সেটা আসলে বিনামূল্যের টিকিট, কোনও কোনও উৎসবে ওরা এরকম একখানা-দু'খানা কমপ্লিমেন্টারি টিকিট দেয়, অর্থাৎ স্পনসর করে। কিন্তু সস্তার তিন অবস্থার মতন, বিনা পয়সার টিকিটের ঝামেলা অনেক। উঁচু ক্লাসের টিকিট বটে, কিন্তু যখন-তখন রিজার্ভেশান বাতিল হয়ে যেতে পারে। চেনাশুনোদের মধ্যে ধ্রুব কুণ্ডুই একমাত্র চাকরি করে না, তার নিজস্ব ব্যবসা, সে সপ্তাহের মাঝখানেও যে-কোনও দিন দুপুরে আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে পারে। এক বিকেলে সে আমাকে নিয়ে গেল, সেখানে গিয়ে শুনলাম, সেদিন টিকিট-কাটা যাত্রীতেই বিমান ভর্তি হয়ে যাবে, সুতরাং আমার জায়গা হবে না!

এইরকম চলল দিনের পর দিন। রোজ আর এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যাই না। টেলিফোনে খোঁজ নিলে বলে, আগামী দশ-বারোদিনের মধ্যে একটাও সিট খালি নেই, কবে পাওয়া যাবে, তাও বলা যাচ্ছে না। শুনলে রাগে গা জ্বলে যায়। ইচ্ছে হয়, টিকিটটা ছিঁড়ে ফেলি!

এইটুকু জানা গেল যে, নিউইয়র্ক থেকে প্যারিস পর্যন্ত সিট কবে পাওয়া যাবে তা খুবই অনিশ্চিত, তবে প্যারিস থেকে কলকাতা পর্যন্ত আসন পাওয়ার সমস্যা নেই। অর্থাৎ নিউইয়র্ক থেকে প্যারিস পর্যন্ত অন্য বিমান-সংস্থায় নিজের পয়সায় টিকিট কাটলে দেশে ফেরা যেতে পারে। বিদেশে আমন্ত্রিত হয়ে এসে কি কেউ নিজের পয়সায় টিকিট কাটে? অগত্যা সেই খোঁজখবরই নিতে হল।

এর মধ্যে প্রতিদিনই কারুর না কারুর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়াচ্ছি। ধ্রুবকেই নিয়ে যেতে হয়। এসব দেশে একা চলাফেরার তো উপায় নেই। কোনও বাড়িতেই আন্তরিকতার অভাব নেই, তবু আমি মনে মনে খানিকটা সঙ্কুচিত বোধ করি। এতদিন আমার থাকার কথা নয়, তবু বাধ্য হচ্ছি থেকে যেতে।

এক রাত্রে বাড়ি ফেলার পর বৃতি জানাল যে. শাবানা আজমি আমাকে দু'বার ফোন করেছিল। একবার সে মেসেজ রেখেছে, একবার বৃতি তার সঙ্গে কথা বলেছে। আমার সঙ্গে খুব দরকার।

শাবানা আজমি মানে কোন শাবানা আজমি? ফিল্ম স্টার? সে আমাকে ফোন করবে কেন? আমার সঙ্গে তার সামান্য চেনা আছে বটে, কিন্তু ফোন করেনি তো কখনও। তাও নিউইয়র্কে?

সে কি এদেশে এসেছে?

বৃতি বলল, না, বম্বে থেকে কল করেছে। ফোন নম্বর দিয়েছে, আপনাকে ফোন করতে বলেছে।

রশিদ আমার গল্প নিয়ে ফিল্ম করার জন্য একসময় মেতে উঠেছিল, তখন শাবানাকেও চিত্রনাট্য শোনানো হয়েছিল, কিন্তু সে-পরিকল্পনা তো ধামাচাপা পড়ে গেছে এর মধ্যে। কেউ টাকা দিতে এগিয়ে আসেনি।

অন্যের বাড়ি থেকে ফোন করতে সঙ্কোচ হয়। ধ্রুবই বলল, ফোন করুন না। নিশ্চয়ই আপনার কোনও গল্প নিয়ে হিন্দিতে মুভি করতে চায়।

সে-রকম একটা সম্ভাবনার কথা যে আমার মনের মধ্যেও উঁকি দিয়েছে, তা আমি স্বীকার করতে বাধ্য। না হলে এত ব্যস্ত হয়ে দু'বার ফোন করার আর কী কারণ থাকতে পারে? বাংলায় আমার অনেক গল্প-উপন্যাস নিয়ে ফিল্ম হয়েছে, হিন্দিতেও হয়েছে *শোধ*, কিন্তু সেটি আর্টফিল্ম, বম্বের মূলধারার কোনও হিন্দি ছবি হয়নি। শুনেছি, ওরা অনেক টাকা দেয়। টাকার কথাটাই বেশি করে মনে পড়ে।

ধ্রুব নিজেই উৎসাহ করে শাবানার নম্বর ধরে দিল। নিউইয়র্কে এখন রাত সোয়া বারোটা, বম্বেতে সকাল দশটা। ফিল্‌ম স্টাররা নাকি অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়। কিন্তু শাবানা কিংবা তার স্বামী কেউই বাড়ি নেই, এর মধ্যেই বেরিয়ে গেছে। ধ্রুব মেসেজ রেখে দিল।

অর্থাৎ সাসপেন্স রয়ে গেল। রাত্তিরে কি ভালো করে ঘুম হবে? সত্যজিৎ রায় যেদিন আমাকে ফোনে *অরণ্যের দিনরাত্রি*-র কথা বলেছিলেন, সেদিন সত্যিই আমি সারারাত ঘুমোতে পারিনি। অবশ্য সেটি প্রথমবারের ব্যাপার।

অক্টোবর মাস, আজই এখানে প্রথম তুষারপাত শুরু হয়েছে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলাম বাইরের দিকে। প্রথম দিনের তুষারপাত দেখতে সবারই ভালো লাগে। পরে অবশ্য বিরক্তি ধরে যায়। গাছপালাগুলো আস্তে আস্তে সাদা হয়ে আসছে।

কালো রাস্তাগুলোও এখন সাদা। আজ আকাশে জ্যোৎস্নাও আছে। তার মধ্যে নিঃশব্দে অবিরাম তুষারপাত, অনেকটা অলৌকিক দৃশ্যের মতন মনে হয়।

পরদিন সকালেই ফোন এল। শাবানা নয়, তার স্বামী জাভেদের। প্রথমেই সে জিজ্ঞেস করল, দাদা, আপনার কি ঘুম ভাঙালাম? আপনি কবে কলকাতায় ফিরছেন? আপনার সঙ্গে আমার খুব দরকার আছে।

শাবানা একটু-আধটু বাংলা বললেও জাভেদ আখতার একেবারেই বাংলা জানে না। সে কথা বলে উর্দু আর ইংরিজি মিশিয়ে। বম্বের বিখ্যাত পরিচালক গুলজারও উর্দুভাষী। কিন্তু বাংলা বলেন চমৎকার। তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা মূল ভাষায় পড়ার জন্য বাংলা শিখেছেন, বিয়েও করেছেন বাঙালি নায়িকা রাখীকে।

আসল কারণটা না জানিয়ে জাভেদ বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল, দাদা, আপ কলকাতা কব লোটেঙ্গে?

আমি কলকাতায় কবে ফিরব, তা নিয়ে ওর মাথাব্যথা কেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন বলো তো?

—আপনি যখন কলকাতায় ফিরবেন, তখন আমিও কলকাতায় গিয়ে আপনার সঙ্গে বসব।

—সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু বিশেষ কোনও কারণ আছে কী? যদি একটু ইঙ্গিত দাও।

—ফোনে ঠিক কাজ হবে না। আপনার সামনাসামনি বসতে হবে।

শেষ পর্যন্ত জাভেদ যা বলল, সেটি শুনে আমার হাসি পেয়ে গেল। নিতান্তই স্বার্থপরের মতন কথা। অধিকাংশ সিনেমার লোকই এমন হয়, নিজেদের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না।

জাভেদ আখতার সিনেমার চিত্রনাট্য লেখার জন্য বিখ্যাত। এবং গানও লেখে। বলা যায়, দুটোতেই তার খ্যাতি এক নম্বর। শাবানা আজমির সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় এই দম্পতি সারা ভারতে পরিচিত। এখন জাভেদ সবাইকে জানাতে চায় যে, সে শুধু গান-লেখক নয়, সে একজন কবিও। কবিতা লেখা দিয়েই সে জীবন শুরু করেছিল। এখন আবার উর্দুতে কবিতা লিখতে শুরু করেছে।

বেশ ভালো কথা! কিন্তু এর মধ্যে আমার ভূমিকা কী?

জাভেদের মাথায় ঢুকেছে যে, বাংলাতেও কবি হিসেবে খ্যাতি না পেলে সারা ভারতে কল্কে পাওয়া যায় না। বাঙালিরা কবির জাত। শাবানা আজমির বাবা কাইফি আজমিও নামকরা কবি, তিনি নাকি বলতেন, বাংলা কবিতার সঙ্গে তুলনা করতে না পারলে নিজের কবিতার মূল্য বোঝা যায় না। সুতরাং যত টাকা লাগে লাগুক, জাভেদ বাংলা অনুবাদে তার একটা কবিতার বই বের করতে চায় এবং খুব তাড়াতাড়ি। আগামী মাসে শাবানার জন্মদিন, সেইদিন সে কবিতার বইটির উদ্বোধন

করবে কলকাতার সবচেয়ে বড় মঞ্চ, সায়েন্স সিটি মঞ্চে। অপর্ণা সেন ও শাবানা তার কবিতা পাঠ করবে, বিরাট ব্যাপার হবে।

সর্বনাশ, ও কি ওর কবিতাগুলো আমাকে দিয়ে অনুবাদ করাতে চায় নাকি? সে-কাজ কোনওক্রমেই আমার দ্বারা সম্ভব নয়। অন্যের কবিতা অনুবাদ করা আমার কাজ নয়, খুব অল্পবয়েসে আমি কিছু বিদেশি কবিতার অনুবাদ করেছিলাম, সেটা অল্পবয়েসের কারণেই। এখন আর প্রশ্নই ওঠে না।

আমি সাবধান হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, জাভেদ, তোমার কবিতার বই বাংলায় বেরুবে, এ তো অতি আনন্দের কথা। কে অনুবাদ করেছে?

জাভেদ বলল, আপনার বন্ধু রশিদ খান। সেও তো কবি!

একথা শুনে আমার আকাশ থেকে পড়ার মতন অবস্থা। রশিদ কবি বটে, উর্দুও ভালো জানে। কিন্তু বাংলা? সে বাংলা বলতে পারে, পড়তেও পারে কষ্ট করে, কিন্তু এক লাইনও বাংলা লিখতে পারে না। সে করবে বাংলায় অনুবাদ? তা যে কী পদার্থ হবে, তা আর বলে কাজ নেই।

জাভেদ আবার বলল, দাদা, রশিদ কাজ শেষ করে ফেলেছে। বইটা প্রিন্টিং প্রেসে দেবার আগে এখানকার গুলজার সাব আমাকে বললেন, তুমি অনুবাদগুলো কোনও বাঙালি কবিকে দিয়ে একবার দেখিয়ে নাও। তুমি সুনীলবাবুকে অ্যাপ্রোচ করো। সেই জন্যই দাদা আপনার সঙ্গে আমার একবার বসা খুব দরকার। আপনি মেহেরবানি করে অনুবাদগুলো দেখে দিন, আমি আপনার সামনাসামনি বসব, মূল কবিতাগুলো আপনাকে পড়ে পড়ে শোনাব, আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন, কোথায় কোথায় ভুল হয়েছে!

কবিতার জন্য এক-একজন মানুষের কত দুর্বলতা থাকে! এমনিতে জাভেদ আখতারের দারুণ খ্যাতি, অনেক টাকাও উপার্জন করে, উর্দু কবিতার মুশায়রায় প্রচুর হাততালি পায়, তবু বাঙালি পাঠকদের কাছে স্বীকৃতি পাবার জন্য সে ব্যাকুল! সেজন্য সে জলের মতন অর্থ ব্যয় করতেও রাজি।

ওর এই প্রস্তাবও আমার মনঃপূত নয়। তবু মুখের ওপর প্রত্যাখ্যান করা গেল না। বললাম, আমি ফিরব দিনসাতেকের মধ্যেই, তারপর আমার নিজের কিছু জরুরি কাজ আছে—

কলকাতায় ফিরেই ফোন করলাম রশিদকে। রশিদ বলল, তোমাকে ওখানে জাভেদ ফোন করেছিল? অপর্ণার কাছ থেকে তোমার বন্ধুর নম্বর জোগাড় করেছে।

আমি কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি নাকি ওর একটা কবিতার বই বাংলায় অনুবাদ করেছ?

রশিদ গলা নিচু করে বলল, প্লিজ ডোন্‌ট টেল এনি ওয়ান। আমি কি বাংলা লিখতে পারি নাকি? একটা মেয়েকে জোগাড় করেছি, তাকে মোটামুটি উর্দুর মানে

বলে দিয়েছি, সে বাংলায় লিখেছে।

—রশিদ, এইভাবে কি কবিতা হয়?

—সেইজন্যই তো তোমার সাহায্যের দরকার!

—রশিদ, কেন আমাকে ফাঁসালে? তুমি পিনাকীকে হঠাৎ আমার বাড়িতে নিয়ে এসেছিলে, তারপর যা হল তার জন্য আমি অপরাধবোধে ভুগছি। আবার জাভেদকে আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছ। ওর কবিতা যদি আমার পছন্দ না হয়, আর সেটি আমি ওর মুখের ওপর বলে ফেলি, তাহলে ওর সঙ্গেও আমার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে।

—ওর কবিতা তোমার পছন্দ হবে না, তা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। ওসব কবিতায় চিৎকার বেশি। তুমি শুধু বাংলা ভাষাটা ঠিক আছে কি না দেখে দেবে।

—কেন এ ভারটা শক্তিকে দিলে না? শক্তি আমার তুলনায় অনেক ফ্রি থাকে। শক্তির হাতে কবিতার ম্যাজিক আছে।

—জানো তো, শক্তি কথার ঠিক রাখতে পারে না। তাছাড়া ওরা ঠিক শক্তিকে চেনে না। সিনেমার লোকেরা তোমাকে চেনে।

দু'দিনের মধ্যেই জাভেদ আখতার এসে হাজির হল কলকাতায়। উঠল তাজ বেঙ্গল হোটেলে। সিনেমার লোক হিসাবে ওদের এমন একটা স্টেটাস হয়ে যায় যে, নিজের খরচে এলেও সস্তার হোটেলে থাকতে পারে না।

কবিতার বইটির পাণ্ডুলিপি রশিদ আমাকে আগেই দিয়েছিল। একবার চোখ বুলিয়েই বুঝেছি, এইসব কবিতা, ইংরিজিতে যাকে বলে, নট মাই কাপ অফ টি। সব কবিতাই বর্ণনামূলক, খানিকটা উচ্চকণ্ঠ, বাংলা কবিতা অনেকটা ভাষা-নির্ভর সঠিক শব্দ-ব্যবহারের ওপরেই ঝোঁক থাকে। আর অনুবাদের যা অবস্থা, তাতে পুরো খোল-নলচেই পালটে ফেলা উচিত। সেটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সব কবিতাগুলো আমি নতুন করে লিখব নাকি? সুতরাং, হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ হয়েছে, চমৎকার হয়েছে বলাই ভালো।

তাজ বেঙ্গল হোটেলের ঘরে আড্ডা বসল। সঙ্গে প্রচুর খাদ্য ও মদ্য। জাভেদ কিন্তু এক ফোঁটাও মদ স্পর্শ করে না। শুনলাম, একসময় সে যখন বম্বেতে নিজের স্থান করে নেবার জন্য লড়াই চালাচ্ছে, তখন প্রচুর মদ্যপান করত, সবসময় নেশা করে থাকত, তারপর হঠাৎ একদিন প্রতিজ্ঞা করে মদ ছেড়ে দেয়। রশিদের দিকে তাকিয়ে সে বলল, বুঝলে রশিদ ভাই, সিনেমার লাইনে লেগে থাকতে গেলে মদের নেশা একেবারে ছাড়তে হবেই। কত ট্যালেন্টেড লোক যে এইভাবে নিজেদের কেরিয়ার নষ্ট করেছে।

অশোক নামে একজন নিরীহ আবৃত্তিকারকেও আমরা ডেকে এনেছি। জাভেদ একটার পর একটা নিজের কবিতা পড়ে যাচ্ছে উর্দুতে, আর অশোক তার বাংলা

অনুবাদ পড়ে শোনাচ্ছে। প্রতিটি কবিতার পর জাভেদ আমার দিকে উৎসুকভাবে তাকিয়ে থাকে। আমি দুটো একটা শব্দ বদলে দিই শুধু। সাথের বদলে সঙ্গে, দিবানিশার বদলে দিনরাত, তস্করের বদলে চোর। তারপর বলি, বাকি অনুবাদ নিখুঁত হয়েছে। জাভেদ খুশি হয়ে আবার নিজের কবিতার উচ্চারণে মগ্ন হয়ে যায়।

এরকম বৈঠক চলল তিনদিন। শেষ দিনে একটা ঘটনা ঘটল। হঠাৎ সেখানে একটি মেয়ে এসে উপস্থিত। মেয়েটি বেশ সুন্দরী এবং উগ্র সাজগোজ। ঠোঁটে এমন লিপস্টিক মেখেছে, যেন রক্ত মাখা। সে ঢুকেই বেশ অভিমানী, ঝাঁকালো গলায় বলল, রশিদদা, জাভেদ সাহেব কলকাতায় এসেছেন, আপনি আমাকে খবর দেননি?

আমি এক মুহূর্তে বুঝে গেলাম, এ হচ্ছে সে-ই মেয়ে, যাকে দিয়ে রশিদ বাংলা অনুবাদ করিয়েছে। সে তো তার কৃতিত্বের কিছুটা ভাগ দাবি করবেই। মেয়েটিকে আমি আগে কখনও দেখিনি, রশিদ যে এইসব সুন্দরী মেয়েদের কোথা থেকে জোগাড় করে জানি না।

রশিদ খানিকটা বিব্রত হয়ে মেয়েটিকে নিয়ে বাইরে চলে গেল। অনেকক্ষণের মধ্যেও আর ফিরল না।

এই কাহিনিতে জাভেদ আখতারের কবিতার প্রসঙ্গ এতখানি বলার এমনিতে কোনও কারণ নেই, শুধু সামান্য একটু যোগসূত্র আছে।

রশিদ সেই মেয়েটিকে নিয়ে বেরিয়ে যাবার পর কিছুক্ষণ অন্য গল্প হল। জাভেদ ওর পরবর্তী ফিল্মের চিত্রনাট্য কী বিষয়ে লিখছে, সে-বিষয়ে বলতে লাগল। কমার্শিয়াল হিন্দি ফিল্‌মের ফর্মুলা গল্প যেমন হয়। বাল্যপ্রেম, খুন, ধর্ষণ, প্রতিশোধ—সবই আছে, তার সঙ্গে তিনখানা নাচ আর সাতখানা গান। গল্পের এক জায়গায় জাভেদ বলল, দাদা, এই স্টোরিতে একটি বাঙালি মেয়ে আছে। তাকে দু'জন লোক ধরে নিয়ে গিয়ে সাতদিন ধরে রেপ করে। দু'জনেই সমানভাবে রেপ করেছে। তারপর মেয়েটাকে একটা নদীতে ছুড়ে ফেলে দেয়। মেয়েটা কিন্তু বেঁচে গেল, এক চার্চের পাদরি তাকে উদ্ধার করল। কিছুদিন পর জানা গেল যে, মেয়েটা প্রেগনান্ট। মেয়েটা ঠিক করল, সে পেটের বাচ্চাটাকে নষ্ট করবে না। সে যেভাবেই হোক, তার ধর্ষণকারীদের খুঁজে বের করবে। তাদের কাছে সে তার সন্তানকে নিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু বাচ্চা যখন জন্মাল...

আমি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে জাভেদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এ যে আনোয়ারার কাহিনির সঙ্গে অনেকখানি মিল। ওকে কেউ রেপ করেছে কি না, কিংবা একজন না দু'জন, তা আমি জানি না। কিন্তু বিদেশ থেকে যে গর্ভবতী হয়ে ফিরে এসেছে। সে তার সেই অবৈধ সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখবে।

একবার ভাবলাম, জাভেদকে বলি, তুমি ঢাকায় যাও। আমার চেনা আনোয়ারা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা কর, তখন বুঝতে পারবে, এই অবস্থায় মেয়েদের

মনের ভাব কেমন হয়!

তারপরই মনে হল, তা মোটেই উচিত নয়। আনোয়ারা নিশ্চই তার অবস্থাটা বেশি লোককে জানাতে চায় না। এটা তার নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার!

তাছাড়া হিন্দি সিনেমার কাহিনিকাররা বাস্তবতার ধার ধারে না। জাভেদের ফিল্মের মেয়েটি নিশ্চয়ই তার ধর্ষণকারীদের খুঁজে পাবে, সেখানে অনেক অতি নাটক হবে! আনোয়ারাও কি তার সন্তানের জন্মের পর ফিরে যেতে চাইবে আরব দেশে, তার সন্তানের জনককে খুঁজবে?

১৯



কামাল যখন যে-বাড়িতে থাকে, সে-বাড়িতে সে জলের মাছের মতন কিংবা বাতাসে ভাসা পাখির মতন সাবলীল। রান্নাঘর থেকে ঠাকুরঘর পর্যন্ত সব জায়গায় তার অনায়াস যাতায়াত। আমাদের বাড়িতে অবশ্য ঠাকুরঘরের বালাই নেই। সে যে-কটা দিন থাকে, আমাদের বাড়ি বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। কতরকম গল্প শোনায় সে। তবে, স্বাতী তাকে আজকাল পেট ভরে খেতে দেয় না।

একসময় কামালের চমৎকার ছিপছিপে চেহারা ছিল, সুদর্শন পুরুষ যাকে বলে, সে অনায়াসে সিনেমার নায়ক হতে পারত। আমি কামালের জীবনের একটি অধ্যায় নিয়ে একটি উপন্যাস লিখেছিলাম, সেটার নাম, *ভালোবাসা প্রেম নয়*। কামাল সেটা নিয়ে ফিল্ম বানাবারও উদ্যোগ নিয়েছিল, নিজেই থাকবে মুখ্য ভূমিকায়। অনেকখানি এগোবার পর সে-পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়েছে। সেই দুঃখেই কি না কে জানে, কামাল ইদানীং কিছুটা মোটা হতে শুরু করেছে, এখন তার মধ্যপ্রদেশ বেশ আয়তনে বাড়ছে, আমার মতন অতটা নয় যদিও, কিন্তু বেশ বোঝা যায়। সেই জন্যই খেতে বসে কামাল যখন শেষ পাতে আর দুহাতা ভাত ও ডাল খেতে চায়, স্বাতী তখন বলে, কামাল, তুমি আরও ভাত খাবে? কী, করছো কী? আয়নায় নিজের শরীরটা দেখো না?

আমি স্বাতীকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করি।

আর যাই হোক, কামাল আমাদের বাড়িতে অতিথি। অতিথিকে কি কেউ দুহাতা বেশি ভাত দিতে বারণ করে? স্বাতী তবু বলে, ওর এত সুন্দর চেহারা ছিল, কেন তা নষ্ট করবে?

কামাল লাজুক মুখে বলে, থাক, আর খাব না।

বোঝা যায়, ওর খিদে মেটেনি। আমি বলি, নাও কামাল, খেয়ে নাও, স্বাতীর কথা শুনো না।

আমি অবশ্য ভাত খুব কম খাই, কামালের তিনভাগের একভাগও না। আমার শরীরের আয়তন বৃদ্ধির কারণ অন্য। সে বদনেশা কামালের নেই। যারা মদ্যপান

করে না, তারা ভাতজাতীয় খাদ্য বেশি খায়। কোনটা বেশি খারাপ, তা বলা মুশকিল!

কামাল যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, টেলিফোনটা থাকে তারই দখলে। কলকাতা শহরে বোধহয় আমার চেয়েও তার চেনা মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি।

তার সঙ্গে দেখা করতেও আসে অনেকে। তাতে আমার কোনও অসুবিধে নেই। কারণ, সকালবেলাটা আমি অন্য ঘরে বসে লেখাপড়া করি। কিন্তু মুশকিল হয়, যখন কামাল তার কোনও আমন্ত্রিত ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে চায়। লেখাপড়ার মাঝখানে উঠে যেতে হলে বিরক্তি তো হবেই। তাছাড়া এইসব অধিকাংশ আলাপই একেবারে অপ্রয়োজনীয়। এজন্য কামালকে আমি কয়েকবার বকুনি দিয়েছি, তবু সে ভুলে যায়।

অল্পদিনের ব্যবধানে কামাল কলকাতায় ফিরে এসেছে ঢাকা থেকে। আনোয়ারা সম্পর্কে নতুন কোনও খবর নেই। আমি আর স্বাতী তাকে পইপই করে বলে দিয়েছি, এখানকার আর কারুর সঙ্গে সে যেন আনোয়ারা-বিষয়ে আলোচনা না করে। এক রমণীর অবৈধভাবে গর্ভবতী হওয়া অনেকের কাছেই রসালো কৌতূহলের বিষয়, আমরা তার প্রশ্রয় দিতে চাই না।

এক সকালে কামাল বসবার ঘরে তার দু-একজন অভ্যাগতের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল, একবার আমার পড়াশুনোর ঘরে এসে মৃদুগলায় বলল, সুনীল, তুমি একবারটি ও ঘরে আসবে? বেশি সময় না, পাঁচ মিনিট!

লেখাপড়ার মাঝখানে পাঁচ মিনিটের জন্য উঠে গেলেও যে কতখানি মনঃসংযোগ নষ্ট হয়, তা অন্যদের বোঝানো যায় না। সময়টা যেন পাখির মতন, উড়ে যেতে চায়, আবার তাকে কষ্ট করে ফিরিয়ে আনতে হয়। অনেক সময়ে ফিরিয়ে আনা যায়ই না!

কামালের দিকে খানিকটা উগ্রভাবে চেয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন, আমাকে ও ঘরে যেতে হবে কেন?

কামাল বলল, একজন তোমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছেন। দুইটা কথা বলতে চান।

আমি ভারিক্কিভাবে জিজ্ঞেস করলাম, আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়? কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে? আমি আসতে বলেছি?

অবশ্য আমার কাছে বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে অনেকেই আসে। মফঃস্বলের কোনও কবি হয়তো তার কবিতার বান্ডিল কিংবা ক্ষীণ কাব্যগ্রন্থ নিয়ে হঠাৎ চলে আসে। ধমক দিতে গেলে কাঁচুমাচুভাবে বলে, অনেক দূর থেকে এসেছি, আপনাকে বেশি বিরক্ত করব না...।

বিরক্ত করার যে কম-বেশি কিছু হয় না, তা ওরা বোঝে না। তবু সেই নিরীহ অনভিজ্ঞ কবিদের ক্ষমা করা যায়। শহুরে মানুষদের তো আগে থেকে অনুমতি নিয়ে

আসা উচিত।

কামাল খানিকটা অপরাধীভাবে বলল, না, অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাই, মানে, আমারই আগে বলা উচিত ছিল, তবু যদি তুমি একবার আসো–

চেয়ার ছেড়ে উঠতেই হল।

বসবার ঘরে দু'জন অতিথি। এর মধ্যে একজনকে আগেও দেখেছি, কামালের সঙ্গে কী-সব অর্ডার-সাপ্লাইয়ের ব্যবসা সম্পর্কে আলোচনা করে। কামাল ক্যানাডা থাকে জেনে অনেকেই সেখানে চামড়ার জিনিস কিংবা চটের ব্যাগ ইত্যাদি পাঠাবার সুযোগ নিতে চায়।

অন্য ব্যক্তিটির বেশ রাশভারি চেহারা। পাজামা ও সিল্কের পাঞ্জাবির ওপর জহর কোট পরা। যদিও বেশ গরম পড়েছে, তবু কেউ কেউ নিজেদের উঁচু অবস্থা বোঝাবার জন্য এইসব কোট-ফোট পরে থাকে। মাঝবয়েসি, একটু ভারির দিকে চেহারা, ফরসা রং, মসৃণভাবে দাড়ি কামানো, তবে পুরুষ্ট গোঁফ আছে। তাঁর বসে থাকার ভঙ্গির মধ্যেই রয়েছে বেশ রাশভারি ভাব।

একপলক দেখেই মনে হল, এই ধরনের মানুষের সঙ্গে আমার দৈনন্দিন জীবনের কোনও যোগসূত্র থাকার কথা নয়।

কামাল গদগদ ভাবে পরিচয় করিয়ে দিল, সুনীল, ইনি সাজ্জাদ হোসেন।

নামটা আমার শোনা মনে হল। একজন সাজ্জাদ হোসেন ছিলেন বিখ্যাত শানাইবাদক, তিনি নিশ্চিত নন। তাছাড়া তিনি এখনও বেঁচে আছেন কি না, তাও জানি না।

আমি কপালে হাত তুলে সেলাম জানাবার আগেই তিনি হাত জোড় করে বললেন, নমস্কার!

আমার ইতস্তত ভাব ঠিক বুঝতে পেরে কামাল বলল, সাজ্জাদ হোসেন সাহেব আমাদের আনোয়ারার আপন মামা। এখানকার একজন নামকরা ফিল্ম প্রোডিউসার।

এবার আমার মনে পড়ল। হ্যাঁ, শুনেছি বটে এঁর কথা। মনে রাখবার প্রয়োজন বোধ করিনি।

কামাল আবার বলল, এনার দুখান ফিল্ম আমি কানাডায় দেখাবার চেষ্টা করতেছি। বোধহয় হয়ে যাবে। তোমার সঙ্গে ইনি একটা সিরিয়াস বিষয়ে ডিসকাশান করতে চান।

সাজ্জাদ হোসেন বললেন, এমন কিছু সিরিয়াস বিষয় নয়। আমি আপনার নাম অনেক শুনেছি। আপনার লেখা কয়েকটা স্টোরি তো ফিল্মও হয়েছে। কয়েকটা টিভি সিরিয়ালও লিখেছেন। আপনার কাছে এসেছি একটা অনুরোধ নিয়ে। আমি ফিচার ফিল্ম ছাড়াও টিভি সিরিয়ালও প্রোডিউস করি। আজকাল ফিল্মে তেমন লাভ নেই, ফ্লপ করলে তো একেবারেই গেল। টিভি সিরিয়ালে স্টেডি ইনকাম হয়। অনেক সেফ!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সাজ্জাদ সাহেব, একটু চা খাবেন তো?

তিনি বললেন, না, না, আমি চা, কফি, কোল্‌ড ড্রিংক্স টাচ করি না। আপনি ব্যস্ত হবেন না। কাজের কথাটা বলে নেই। আমার প্রোডিউস করা একটা বাংলা সিরিয়াল *সোনার সংসার* বেশ সাকসেসফুলি চলতে আছে। দুশো সাতষট্টি এপিসোড রান করছে। আমার স্যাংকশান আছে এক হাজার এপিসোড। এখন প্রবলেম হয়েছে কী, আমার যে স্টোরি রাইটার, তার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। সে আর লিখতে পারবে না। সেরে উঠতে কতদিন লাগবে তার ঠিক নেই। আর একটা কথা কী জানেন, হার্ট অ্যাটাক যার একবার হয়, সে আবার লেখালেখি শুরু করলেও তার লেখায় আর হিউমার থাকে না! তাই না?

তাই বুঝি?

এটাই আমাদের অভিজ্ঞতা। আপনাব কাছে সেইজন্যই অনুরোধ, আপনি আমার *সোনার সংসারের* বাকি এপিসোডগুলি যদি লিখে দেন! কামাল সাহেব বলছিলেন, এসব লিখতে আপনার বেশি সময় লাগে না। আপনি নামকরা রাইটার। উই আর গুড পে-মাস্টার। আপনাকে আমরা পার এপিসোড...

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম, সাজ্জাদ সাহেব, আমার বাড়িতে এসে আপনি আমাকে এই অফার দিলেন, এজন্য অজস্র ধন্যবাদ। কিন্তু...

কামালও আমাকে বাধা দিয়ে বলল, তুমি তো এক একটা সকালে বসবা আর একটা করে এপিসোড লিখে দেবা। তোমার পক্ষে ভেরি ইজি।

কামালের মুখখানা ঝলমল করছে। সে আমার জন্য দারুণ একটা সুযোগের ব্যবস্থা করেছে। তার বকুনিটা পরে পাওনা রইল।

আমি সাজ্জাদ সাহেবকে বললাম, কামাল আপনাকে যা-ই বলে থাক, আমি এ-ধরনের কাজ কখনও করি না। আমার কিছু কিছু গল্প-উপন্যাস ফিল্ম আর টিভি সিরিয়াল হয়েছে বটে। কিন্তু সে-সবই ছাপা বই থেকে। আমি কখনও ফিল্মের জন্য কিংবা টিভির জন্য কাহিনি লিখে দিইনি। সেটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সাজ্জাদ হোসেন বললে, আগে লেখেননি, এখন লেখেন। সম্ভব নয় বলছেন কেন? আপনি শুধু স্টোরি লাইনটা ঠিক করে দেবেন। তারপর আমার স্ক্রিপ্‌ট রাইটার ডায়ালগ বসিয়ে বসিয়ে সব ঠিকঠাক করে দেবে।

আমি বললাম, আমি এ-ধরনের কাজ করতে চাই না। আমার অন্য কাজ আছে।

সাজ্জাদ হোসেন বললেন, আগের স্টোরি রাইটারকে আমরা দিতাম পার এপিসোড এক হাজার। আপনার নাম আছে। আপনাকে আমরা দেবো ঠিক করেছি দেড় হাজার। এখন আপনি যদি মোট সাড়ে সাত শো এপিসোড লেখেন, তাইলে কত টাকা হয়! মোর দ্যান দশ লাখ!

এবার আমি হেসে ফেলে বললাম, ওরে বাবা, সে যে অনেক টাকা! শুনে মনে

হচ্ছে, আমারও হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে।

সাজ্জাদ সাহেবও হেসে বললেন, কী যে বলেন! আপনার হেল্‌থ এত ভালো, তাহলে কালই আপনাকে আগের স্ক্রিপ্টগুলো পাঠিয়ে দেবো। যদি চান তো ক্যাসেটও দিতে পারি। আগামী দুটো এপিসোড আমার করা আছে, তার পর থেকে...। আমি আজই আপনাকে কিছু অ্যাডভান্স করে যেতে চাই। ধরেন, হাজার পনেরো টাকা। আপনার কি ক্যাশে নিলে সুবিধা হয়?

যারা সারাজীবন টাকার কারবার করে, তারা মনে করে টাকার অঙ্কেই সবকিছু নির্ধারিত হয়। সাধারণত বাঙালি লেখকরা লেখালেখি করে কত আর টাকা পায়? দশ লাখ টাকা সত্যিই তো অনেক টাকা। যতদূর জানি, একমাত্র হুমায়ুন আহমেদের কাছেই এই টাকাটা এমন কিছু নয়। বাকি লেখকদের কাছে এত টাকার প্রস্তাব অবশ্যই লোভনীয়!

আমি এবার খুবই বিনীতভাবে বললাম, সাজ্জাদ সাহেব, একসময় আমার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। টাকার জন্য আমি খবরের কাগজে বিস্তর লেখালেখি করতে বাধ্য হয়েছি। তখন অবশ্য টিভি সিরিয়াল ছিল না। তখন এই ধরনের একটা প্রস্তাব পেলে নিশ্চয়ই লুফে নিতাম। কিন্তু এখন তো আমার আর তেমন টাকার প্রয়োজন নেই। সংসার ছোট। একমাত্র ছেলে, বিদেশে থাকে। এখন যেটুকু উপার্জন করি, তাতেই দিব্যি চলে যায়। এখন আমার যখন যা ইচ্ছে হয়, শুধু তাই-ই লিখব। অর্ডারি কিছু লেখার প্রশ্নই ওঠে না।

সাজ্জাদ হোসেন কয়েক মুহূর্ত অপলকভাবে আমার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, আপনি রাজি নন?

আমি বললাম, আজ্ঞে না। এখন আমি অন্য একটা লেখা নিয়ে বেশ সমস্যায় আছি।

কামাল বলল, হুমায়ুন আহমেদও তো কত টিভি সিরিয়াল লিখেছে। খুব পপুলার হয়। তুমি ট্রাই করে দেখো! নিশ্চয়ই পারবে!

কামালের ওপর আমার রাগ ক্রমশ বাড়ছে। সে সাহিত্যজগতের কিছুই বোঝে না। হুমায়ুন আহমেদ লেখে নিজের কাহিনি, নিজেই পরিচালনা করে। সেটা অন্যরকম ব্যাপার। এখানে অন্য একজনের অর্ধেক লেখা কাহিনির সঙ্গে বাকি কাহিনি আমাকে জুড়তে বলা হচ্ছে। এরকম একটা প্রস্তাব আমাকে দেওয়াই যে অপমানজনক, সেটা কামাল কিংবা সাজ্জাদ হোসেন বুঝতে পারছে না।

তবু আমি শান্তভাবেই বললাম, হুমায়ুনের যা ক্ষমতা, তা কি সবার থাকে। না হলে সে এত বড় হয় কী করে? সে আমার বন্ধু, আবার ছোট ভাইয়েরও মতন। তার ক্ষমতা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই।

এর পরেও কামাল বলল, তুমি আগে কখনও টিভির জন্য লেখো নাই। এবারে

হয়তো দারুণ নতুন একটা কিছু করে দেখাতে পারতে, চতুর্দিকে সাড়া পড়ে যেত। মনে করো, এটা তোমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ!

এবারে খানিকটা উষ্মার সঙ্গেই বললাম, ওরে কামাল, এখনও একটা ছোট কবিতা লেখাও আমার পক্ষে চ্যালেঞ্জ মনে হয়। আমার আর নতুন চ্যালেঞ্জ খোঁজার দরকার নেই।

সাজ্জাদ হোসেন একটা হাত পকেটে ভরে রেখেছিলেন, বোধহয় টাকা বের করতেন। এবারে হাতটা বাইরে এনে বললেন, তাহলে আমরা উঠি। চলেন কামাল ভাই।

আমি বললাম, রাগ করলেন নাকি? এক্ষুনি উঠবেন না। আরেকটু বসুন! আপনি তো চা-কফি কিছুই খাবেন না। প্রথম এলেন, একটা অন্তত মিষ্টি খান।

তিনি অপ্রসন্ন মুখে বললেন, আমার ডায়াবিটিস আছে। মিষ্টদ্রব্য স্পর্শ করি না।

এরপর আমার প্রশ্ন করা উচিত, হুইস্কি-টুইস্কি চলে কি না। কিন্তু সকালবেলাতে ওইসব নাম উচ্চারণ করতে নেই। ওসব সন্ধের পরের ব্যাপার। অবশ্য শক্তি কিংবা রশিদ সকাল-সন্ধে মানে না।

কথা ঘোরাবার জন্য আমি বললাম, শুনেছি, সোনারপুরে আপনার মস্তবড় বাড়ি। একদিন আপনার বাড়ি দেখতে যেতে পারি? আমি সোনারপুর-বারুইপুরের দিকে মাঝে মাঝেই যাই। আপনারা কি ওখানকার আদি বাসিন্দা?

সাজ্জাদ হোসেন বললেন, আসেন, একদিন অবশ্যই আসেন। না, ওখানে আমি নতুন বাড়ি করেছি। আমাদের আদি বাড়ি মুর্শিদাবাদের সালারে। পার্টিশানের পর আমাদের ফ্যামিলির অনেকেই ওপারে চলে গেছে। আমার মাদার আর আমি যাই নাই। আমাদের তিন পুরুষের ব্যবসা আছে, তাছাড়া এদিকে অনেক বন্ধুবান্ধব। টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়ার সঙ্গে আমার নাড়ির যোগ। তা ছেড়ে যাব কেন?

আমি বললাম, আপনার কথা শুনে আমার আরেকজনের কথা মনে পড়ল। আপনি নবাব ফারুকির নাম শুনেছেন? অনেক কাল আগে নবাব ফারুকি অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী ছিলেন। একবার আমি বাংলাদেশের কবি ওবায়দুল্লা, অর্থাৎ সেন্টু ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তখনই তাঁর অনেক বয়েস, চুরাশি বছর, তবু প্রতি সন্ধেবেলা ক্যালকাটা ক্লাবে আড্ডা দিতে যান তাঁর রোল্স রয়েস গাড়ি চেপে। আর নিয়ম করে তিন পেগ সিভাস রিগ্যাল হুইস্কি পান করেন। খুবই রসিক মানুষ। কথায় কথায় তিনি বললেন, অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করে, পার্টিশানের পর আমি ওখানে চলে গেলাম না কেন? আমি তাদের বলি, আমার বন্ধুবান্ধবসহ ক্যালকাটা ক্লাবটাকে যদি ঢাকায় তুলে নিয়ে যেতে পারো, তাহলে আমি যাব! বলেই হা-হা করে হাসলেন!

সাজ্জাদ হোসেন জিজ্ঞেস করলেন, আমার এক ভাগ্নি আনোয়ারা আপনার বাড়িতে মাঝে মাঝে এসে থাকে শুনেছি?

যে-কোনও কারণেই হোক, আনোয়ারা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে আমার আর এখন ইচ্ছে করে না। বুকের মধ্যে একটু একটু টন টন করে।

সংক্ষেপে বললাম, দু-একবার থেকেছে। ঢাকায় ওদের বাড়িতেও গিয়েছি কয়েকবার।

উনি বললেন, ওর মা আমার বড় ভগিনী। ফরিদপুরের এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিয়ে হল, তারপর থেকে সেখানেই। আমাদের মধ্যে যাতায়াত বিশেষ ছিল না। ওই আনোয়ারার বিয়ের সময় একবার গিয়েছিলাম ফরিদপুরে ওদের গ্রামে, তারপর ঢাকায় রিসেপশান হল। এরপর আর দেখা-সাক্ষাৎ নাই। হঠাৎ কয়েক সপ্তাহ আগে সোনারপুরে আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত। নিজেই একা গিয়েছিল ট্যাক্সি চেপে। আই ওয়াজ সারপ্রাইজড। তখন আমার থাকার উপায় ছিল না। শুটিং চলছিল একখানা ছবির। মেয়েটাকে বললাম, তুমি থাক, খাও, বিশ্রাম নাও। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে কথা বলব। ফিরতে আমার একটু রাতই হল। শুটিংয়ের ব্যাপার জানেন তো, সময়ের ঠিক থাকে না। ফিরে এসে দেখি, সে নাই। অনেক আগেই চলে গেছে। তারপর আর কোনও খবরও দিল না।

এ-কাহিনি আমবা সবাই জানি। তবু প্রথম শোনার মতন কৌতূহলি মুখ করে রইলাম।

উনি জিজ্ঞেস করলেন, কী হল তার? হঠাৎ এতকাল পর আমার বাড়ি গেল কেন, আবার একটু পরে চলে এলোই বা কেন, কিছুই বুঝলাম না। আপনার এখানে আর কতদিন ছিল?

আমি কামালের মুখের দিকে চকিতে দৃষ্টিপাত করলাম। তাকে বুঝিয়ে দিলাম, বাকি কাহিনি সাজ্জাদ হোসেনকে বিশদভাবে জানাবার দরকার নেই।

কামাল বলল, পরের দিনই বিকালে ঢাকায় ফিরে গেছে। ভালোই আছে।

সাজ্জাদ সাহেব বললেন, ভালো আছে? আপনি ওর মায়ের খবর জানেন?

কামাল বলল, ওর মা?

কামালের মুখ দেখেই বোঝা যায়, আনোয়ারার মা ওর চিন্তার এলাকার মধ্যে কখনও ছিলেন না। তাঁকে সে কখনও দেখেনি।

সাজ্জাদ হোসেন বললেন, গত শনিবার আমার দিদি, মানে, আনোয়ারার মায়ের ইন্তেকাল হয়েছে। রাত্তিরে, ঘুমের মধ্যে, কেউ কিছু টেরও পায়নি।

এই ধরনের খবর শুনলে অন্তত তিরিশ সেকেন্ড নীরবতা পালন করাই স্বাভাবিক।

কৌতূহল দেখাব না ঠিক করেও আমার মুখ দিয়ে প্রশ্ন বেরিয়ে এল, গ্রামের বাড়িতে, না ঢাকায়? আনোয়ারা সেখানে ছিল?

সাজ্জাদ সাহেব বললেন, গ্রামের বাড়িতে। দিদি শহরে থাকা পছন্দ করতেন না। বাড়িতে হাঁস, মুরগি, গরু, সে-সবের ওপর খুব মায়া ছিল। শুনলাম তো, আনোয়ারাও

ছিল সেখানে। মায়ের সঙ্গে তার শেষ দেখাটা অন্তত হয়েছে। দুলাভাই এক লোককে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন, কিন্তু আমার তো এখন যাওয়ার উপায় নাই। এত কাজ নিয়ে ফেঁসে গেছি।

অভিজ্ঞ লোকেরা বলে গেছেন, দুঃসময় কখনও একা আসে না।

আনোয়ারার এখন যা সমস্যা তাকে দুঃসময় বললেও কম বলা হয়। তার ওপর মাতৃবিয়োগ। মেয়েরা তো মায়ের কাছেই শুধু মন খুলে কথা বলতে পারে।

একটু পরেই সাজ্জাদ সাহেব ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর অন্য জায়গায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে নিখুঁত ভদ্রতার সঙ্গে বললেন, আমাদের সোনারপুরের বাড়িতে একদিন অবশ্যই আসবেন।

আমি তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম।

কামাল এর পরে আমার সঙ্গে কিছু কথা বলার চেষ্টা করতেই আমি বললাম, এখন নয়। পরে কথা হবে। এখন আমাকে একটা জরুরি লেখা শেষ করতেই হবে। বিকেলে লোক আসবে নিতে।

লেখার ঘরে এসে আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে তাকালাম জানালা দিয়ে।

দশতলার ওপর এই ঘর থেকে দেখা যায় দিগন্ত পর্যন্ত। বাড়ি-ঘরের কংক্রিট জঙ্গল পেরিয়ে দিগন্ত একেবারে সবুজ। একদিন বেলালকে আমি বলেছিলাম, জানো তো বেলাল, আমার এই ঘরের বিরাট কাচের জানলা দিয়ে ঢাকা পর্যন্ত দেখা যায়। মাঝপথে সুন্দরবন।

আমার মন চলে গেল ফরিদপুরে। যেখানে কেটেছে আমার বাল্যকালের কয়েকটি বছর। সেখানকারই এক গ্রামে আনোয়ারা তার মায়ের মৃতদেহের পাশে বসে আছে, এই ছবিটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ঘুমের মধ্যে ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন মহিলা।

আনোয়ারা কি তার মাকে নিজের শরীরের অবস্থা জানিয়েছিল? কিংবা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ওকে দেখেই? মায়েদের পক্ষে বুঝে ফেলা খুবই সম্ভব। প্রবল ইন্সটিংকটের ব্যাপার। আমাদের দেশে অধিকাংশ মায়ের কাছেই এ এক সাংঘাতিক পাপের ঘটনা। তিনি এই নিদারুণ দুঃসংবাদ সহ্য করতে পারেননি? সে-আঘাতেই মারা গেলেন?

দূর ছাই, এসব আমি কী ভাবছি? কিশোরদের একটা পত্রিকার জন্য একটা গল্প আজই শেষ করতে হবে। অর্ধেকের বেশি লেখাও হয়ে গেছে। একটা পাতার অর্ধেকটা লেখা, তার সঙ্গে আমি আর একটা লাইনও যোগ করতে পারছি না। গল্পটা আর মনেই নেই, আমি শুধু ভাবছি আনোয়ারার মায়ের কথা।

সে-মহিলাকে আমি জীবনে কখনও দেখিইনি, তবু তাঁর জন্য খুবই কষ্ট হচ্ছে আমার। একটা বয়েসের পর সব মায়েদের চেহারাই প্রায় একই রকম হয়ে যায়। কিছুদিন আগে রেলের কামরায় এক বয়স্কা মহিলাকে দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম।

অবিকল আমার মায়ের মতন। কল্পনায় আনোয়ারার মায়ের মুখের সঙ্গে আমার মায়ের মুখ মিলে যাচ্ছে।

এতবড় একটা আঘাত পেয়ে চলে গেলেন মহিলা, ঘুমের মধ্যে। হয়তো তাঁর শখ ছিল, একসময় নাতি-নাতনিদের আদর করবেন। কিন্তু তাঁর কন্যার পেটে যে এসেছে, সে অবাঞ্ছিত। সে পাপের সন্তান। আনোয়ারাকে কি তিনি তীব্র গালমন্দ করেছিলেন, না কেঁদেছিলেন খুব?

আঃ, এ কী ঝামেলা! আনোয়ারার ব্যাপার নিয়ে আমি আর একটুও মাথা ঘামাব না ঠিক করে ফেলেছিলাম। তাকে আমার জীবনের বৃত্তের বাইরে সরিয়ে রাখাই ভালো, কারণ তাকে আমি কিছুই সাহায্য করতে পারব না! খুব রাগ হল সাজ্জাদ হোসেনের ওপর। তিনিই তো আমার আজ সকালটা নষ্ট করে দিয়ে গেলেন।

কী আশ্চর্য ধরনের মানুষ! প্রথমে তিনি এতবড় ঘটনার উল্লেখও করেননি। আমার সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্রই ব্যবসায়িক কথাবার্তা শুরু করে দিলেন। আমি রাজি না হওয়ায় চলে যাচ্ছিলেন রাগ করে। তারপর এমনভাবে বললেন, যেন এমন কিছু ব্যাপার নয়। একটা মৃত্যুর ঘটনা কেউ এত সাধারণ, ক্যাজুয়ালভাবে বলে? হয়তো তিনি ভেবেছেন, তাঁর দিদির বয়েস হয়েছিল, চলে গেছেন—এ তো স্বাভাবিক ব্যাপার!

আমি এত ভাবছি কেন? কেন এত ধরনের কষ্টে আমার গলার কাছে বাষ্প জমছে? যে-মহিলাকে আমি চিনি না, কিন্তু কল্পনার ফাঁকে দেখতে পাচ্ছি, তার জন্যে কি শোক করা যায় না?

আজ আর লেখাটা শেষ করার কোনও আশা নেই। জোর করে একটা-দুটো বাক্য লিখতে গিয়েও বুঝতে পারলাম, ভাষাটা জমছে না। উঠে পড়লাম টেবিল ছেড়ে।

স্বাতী বাড়িতে নেই, সে গেছে শান্তিনিকেতনে। আমি একটা গানের ক্যাসেট চালিয়ে দিলাম।

বসবার ঘর খালি। কামাল অন্য লোকটিকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। বারান্দা থেকে উৎপল এসে জিজ্ঞেস করল, মেসো, আপনার লেখা হয়ে গেছে? চান করবেন? খাবার গরম করব?

আমি বললাম, একটু পরে।

পরক্ষণেই মত বদলে ফেলে বললাম, আজ আমি বাইরে যাব। এক জায়গায় নেমন্তন্ন আছে।

তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। মহেন্দ্র আসবে দেরিতে, তাই গাড়ির বদলে নিলাম ট্যাক্সি।

কোথাও নেমন্তন্ন নেই। কোথায় যাব?

মায়ের মৃতদেহের সামনে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে আনোয়ারা। তার বুকভর্তি অপরাধ-বোধের পাষাণভার। সে কি ভাবছে, মায়ের মৃত্যুর জন্য সে-ই দায়ী? পেটের

সন্তানটিকে সে যদি আগেই নষ্ট করে ফেলত, তাহলে মা কিছু জানতে পারতেন না। এতবড় আঘাতও পেতেন না।

মাতৃগর্ভের তরল অন্ধকারে যে অজাত শিশুটি ভাসছে, সে এসব কিছুই জানে না। সে কি শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর আলো দেখতে পাবে?

অনেকদিন পর এই রকম সময়ে ঢুকে পড়লাম পার্ক স্ট্রিটের অলিমপিয়ায়। এখানকার বেয়ারারা অনেকেই আমাকে চেনে।

কিছু অর্ডার দেবার আগেই একজন আমাকে হুইস্কি, সোডার বোতল আর একটা বোতলে ঠান্ডা জল দিয়ে গেল। আমি যে সাধারণত বরফ খাই না, তাও মনে রেখেছে।

এই বেয়ারাটির নাম মকবুল, কিন্তু আমার বন্ধু পার্থ সবসময়ে ওকে বাসুদেব বলে ডাকে। অন্য কোনও পানশালায় বাসুদেব নামে একজন বেয়ারাকে সে খুব পছন্দ করত, এক গাড়ি-দুর্ঘটনায় বাসুদেব মারা গেছে। সেই বাসুদেবের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখার জন্য পার্থ এখন সব পানশালার বেয়ারাদেরই বাসুদেব নামে ডেকে অর্ডার দেয়।

প্রথম দিন মকবুল ওই ডাক শুনে আপত্তি করেনি। খানিকটা দার্শনিকের মতন বলেছিল, বাসুদেব, কানাই, জোসেফ কিংবা সিরাজ, যে-নামে ইচ্ছে হয় ডাকুন না, নামে কী আসে যায়! আমি তো মানুষটা একই থাকব।

পার্থ তা শুনে হেসে বলেছিল, তুমি কি শেক্সপিয়র পড়েছ নাকি?

মকবুল আজ আমাকে বলল, স্যার, অনেকদিন আসেননি? শরীর-টরির ভালো ছিল তো?

একসময় এখানেই এতই আড্ডা দিতাম যে, এরা সবাই আমাদের আত্মীয়ের মতন হয়ে গেছে। অনেকদিন পর দেখা হলে কুশল সংবাদ নেয়।

আমি আলগাভাবে বললাম, হ্যাঁ শরীর ঠিক আছে, এদিকে অনেক দিন আসা হয়নি, তোমরা সবাই ভালো আছো তো?

এর মধ্যে আরেকটি বেয়ারা পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, এই, স্যারকে খবরটা দিয়েছিস তো?

মকবুল বলল, স্যার তো দু'মাস পরে এলেন। ওনার বাড়ির ঠিকানা তো জানি না। বলব কী করে?

আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী খবর?

সেটা বলার আগেই মকবুল বলল, এই রে, স্যারকে ওই ভদ্রলোক ডাকছেন।

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, একেবারে দরজার কাছে টেবিলে একজন ভদ্রলোক একা বসে আছেন। কোঁচানো ধুতি ও সিল্কের পাঞ্জাবি পরা, আমার চেয়ে বয়েসে বেশ বড়। তিনি হাত তুলে আমায় ডাকছেন।

ভদ্রলোককে চিনি না। কখনও দেখিনি। আমাকে ডাকবেন কেন? ডাকলেই বা

আমাকে কেন যেতে হবে? অচেনা লোকের সঙ্গে মদ্যপান আমি একেবারেই পছন্দ করি না।

ভদ্রলোক বললেন, আরে এখানে এসোই না একবার। এসো—

'তুমি' সম্বোধন? যতই বয়েসে বড় হোক, তবু অচেনা মানুষকে কেউ তুমি বলে? তবে কি আমার কোনও দূর সম্পর্কের আত্মীয়-টাত্মিয়?

মকবুল বলল, স্যার, আপনি না গেলে উনি ডেকেই চলবেন। ছাড়বেন না।

অগত্যা আমাকে উঠে যেতেই হল।

তিনি পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন, বোসো! শোনো আমি কারুকে আপনি-টাপনি বলতে পারি না। একা একা মদ খেতে আমার ভালো লাগে না। অথচ এক একদিন কাজকর্ম কিছু ভালো লাগে না ; শুধু মদ্যপান করতে ইচ্ছে করে। বাড়িতে ভালো ভালো সব বোতল সাজানো আছে। অনেক। খুব দামি, তবু বাড়িতেও ভালো লাগে না। তুমি বোসো। তোমাকে চিনি, তুমি তো একজন রাইটার, তাই না? টিভিতে দেখেছি তোমাকে।

তাঁর পাশের চেয়ারে বসতেই মকবুল আমার গেলাসটা দিয়ে গেল এই টেবিলে।

ভদ্রলোক ভারিক্কি গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ওটা কী খাচ্ছ?

আমি হুইস্কির ব্র্যান্ডটার নাম বলতেই তিনি অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন, ওটা ফেলে দাও! আমি তোমাকে স্কচ খাওয়াব। রাইটাররা গরিব হয়। তারা বাজে বাজে সস্তার মদ খেয়ে লিভার নষ্ট করে! খবরদার দেশি হুইস্কি খাবে না।

আমি হেসে বললাম, রাইটাররা গরিব হয় বলেই তাদের পেটে দামি স্কচ-টচ সহ্য হয় না। আমি এটাই খাব।

ভদ্রলোক বললেন, আমি অবশ্য তোমার লেখা-টেখা কিছু পড়িনি। আমার ওয়াইফ খুব বাংলা পড়ে। আমাকে শোনাবারও চেষ্টা করে। তুমি দেশ ম্যাগাজিনে একটা কী যে-সিরিয়াল লিখছিলে, পাখি-টাখির ছবি দেওয়া, কী যেন লেখাটার নাম?

আমি বললাম, সে এমন কিছু নয়। এবারে বলুন, আপনি কী করেন?

তিনি বললেন, আমার নাম শুনে চিনবে না। কিন্তু আমি নামকরা বনেদি বাড়ির লোক। পড়ন্ত নয়, আমি ব্যবসায়ে অনেক টাকা করেছি। বাড়িতে শুয়ে শুয়ে টাকা রোজগার করি।

—কীসের ব্যবসা আপনার?

—তা শুনলে তুমি আঁতকে উঠবে। আমি কঙ্কালের ব্যবসা করি। আমার নাম শঙ্কর দেব।

—ঠিক বুঝলাম না।

—মানুষের কঙ্কাল সাপ্লাই করি বিদেশে। প্রচুর ডিমান্ড। ডিমান্ড-অনুযায়ী সাপ্লাই দিতে পারি না। শোনো, তোমাদের রবিঠাকুরও কিন্তু চামড়ার ব্যবসা করতেন।

—তা জানি। চামড়া তো পাওয়াই যায়। কিন্তু কঙ্কাল পান কোথা থেকে? সবাই তো ডেডবডি পুড়িয়ে ফেলে!

—বোঝ দেখি, হিন্দুরা কি বোকা! শুধু শুধু এত দামি কঙ্কাল পুড়িয়ে নষ্ট করে। বোগাস সিস্টেম!

—মুসলমান, খ্রিস্টানরা কবর দেয় বটে, কিন্তু সেসব কবর থেকে ডেডবডি কি আবার তোলা যায়? সেটা তো অপরাধ!

—আমি ওসব অপরাধ-টপরাধ করি না। আমার সাপ্লায়ার আছে, তারা কোথা থেকে ডেডবডি জোগাড় করে আনে, তা তারাই জানে। নো কোয়েশ্চেন আস্‌ক্‌ড! তাছাড়া হাসপাতাল আর মর্গের সঙ্গে আমার কন্ট্রাক্ট আছে। ওদের কাছ থেকে আনক্লেইমড ডেডবডিগুলো আমি কিনে নেই।

দুপুরবেলা এইসব গল্প শুনতে কারুর ভালো লাগে? আমি উসখুস করতে লাগলাম।

শঙ্কর দেব আবার বললেন, প্রচুর ডিমান্ড, অনেক কঙ্কাল দরকার। ফরেন এক্সচেঞ্জ পাই! ওই রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখো?

দরজার বাইরে একটা হাড় জিরজিরে চেহারার ভিখিরি দাঁড়িয়ে আছে। সে এতই লম্বা যে, ঝুঁকে পড়েছে।

শঙ্কর দেব বললেন, ওই যে হারামজাদা ভিখিরিটা, ওর এত কষ্ট করে বেঁচে থাকার কী দরকার? ওর জীবনের কোনও দাম আছে? অথচ ওই হাড়ের খাঁচাটার অনেক দাম। ও মরলে দেশে ফরেন এক্সচেঞ্জ আসবে! আচ্ছা ধরো, ওকে আজই আমি দু'হাজার টাকা দিলাম। দিয়ে বললাম, খা ব্যাটা, কয়েকটা দিন মনের সুখে যা খুশি খেয়ে নে। তারপর মর! খাঁচাটা আমার লাগবে। যদি এমন বলি, সেটা কি আনএথিক্যাল হবে?

ওরে বাবা, এ কার পাল্লায় পড়েছি? এক চুমুকে গেলাসটা শেষ করে বললাম, আমাকে এক্ষুনি উঠতে হবে।

—মোটে একটা খেলে? অন্তত আর একটা নাও।

—ধন্যবাদ। আমার আর থাকার উপায় নেই!

উঠে পড়ে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে মনে পড়ল, মকবুল আমাকে কী যেন একটা কথা বলতে চেয়েছিল।

মকবুলকে ইশারায় ডেকে বললাম, ওই ভদ্রলোকের জন্য আমার এখানে বসা গেল না। আরেকদিন আসব। তুমি কী বলছিলে?

মকবুল বলল, স্যার, আমার মেয়ের কথা আপনার মনে আছে?

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। হোটেল-রেস্তোরাঁর বেয়ারাদের ব্যক্তিগত জীবনের কথা তো আমরা কিছুই জানি না। ওদের বউ-ছেলেমেয়ে আছে কি না, তা কি আমরা

খোঁজ করি? ওর মেয়েকে আমি কখনও দেখিনি, তার অস্তিত্ব সম্পর্কেই আমার ধারণা নেই, তবে তার কথা আমার মনে থাকবে কী করে?

সরাসরি উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার তোমার মেয়ের?

মকবুল বলল, তেরো বছর বয়েস, ওর নাম আইমা, হঠাৎ একসময় পেটে ব্যথা শুরু হল। অসহ্য কষ্ট। ছটফট করত। আমাদের পাড়ার হাসপাতালে দেখালাম, সেখানে ডাক্তার বলল, ক্যানসার হয়েছে। অপারেশান করাতে হবে। আরেকজন ডাক্তারও একই কথা বলেছিল। বড় ডাক্তার দেখাতে হবে, অপারেশানও তো অনেক টাকার ব্যাপার। মহাবিপদে পড়েছিলাম। একদিন আপনারা এখানে বসেছিলেন। আমি গিয়ে সব বললাম। যদি আপনাদের কোনও বড় ডাক্তার চেনা থাকে, যদি কোথাও একটু কম খরচে হয়...। আপনি সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার জয়ন্ত সেনকে একটা চিঠি লিখে দিলেন।

এইবার আমার মনে পড়ল, জয়ন্তকে একটা চিঠি লিখে দিয়েছিলাম বটে। সে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তার কাছে আরও দু-একজনকে পাঠিয়েছি।

জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কী হল?

মকবুল বলল, স্যার, জয়ন্ত সেন কী ভালো ডাক্তার। কী ভালো মানুষ। একটাও পয়সা নিলেন না। অপারেশান করে দিলেন। ক্যানসার-ট্যানসার কিছু হয়নি স্যার, এমনি টিউমার। মেয়েটা একেবারে ভালো হয়ে গেছে। ক্লাস সেভেনে পড়ছে। আপনার জন্যই মেয়েটা বেঁচে গেছে স্যার।

আমি মৃদু গলায় বললাম, আমার জন্য নয়, জয়ন্ত সেনের জন্য।

তবু মনটা আমার আনন্দে ভরে গেল। আজ এই প্রথম একটা সত্যিকারের ভালো খবর শুনলাম!

একটি বাচ্চা মেয়ের বেঁচে থাকার জন্য খুব সামান্য হলেও আমার একটা ভূমিকা আছে।

মকবুল আমায় প্রণাম করার চেষ্টা করতেই আমি তাকে জোর করে দাঁড় করিয়ে কাঁধে দু'বার চাপড় দিলাম।



২০

হঠাৎ জাপানে যাওয়ার একটা আমন্ত্রণ এসে গেল। এর আগে জাপান যাইনি, এমনকি হংকং, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনামেও যাওয়া হয়নি। আমরা সাধারণত পশ্চিমাস্য, অর্থাৎ পশ্চিমের দেশগুলিতে বারবার যাওয়া হলেও পুবের দেশগুলির কথা মনে পড়ে না।

একবার শুধু জার্মানি থেকে ফেরার পথে ব্যাংককে ছিলাম দেড়দিন। পূর্ব প্রাচ্য সম্পর্কে আমার ওইটুকু অভিজ্ঞতাই সম্বল।

সে-অভিজ্ঞতাও মোটেই সুখকর হয়নি। নারী-ব্যবসার একটা বীভৎস রূপ দেখে আমি শিউরে উঠেছিলাম। সে যাই হোক, জাপান সম্পর্কে আমার আগ্রহ অনেকদিনের। জাপান খুবই ব্যয়বহুল দেশ, নিজের খরচে সেখানে বেড়াতে যাবার মতন সংগতি আমার নেই।

আমন্ত্রণ পেয়েছি বটে, কিন্তু তেমন কিছু লোভনীয় নয়। সরকারি নয়, আমাকে নিয়ে যেতে চায় একটি নিপ্‌পন-বাংলা সংস্কৃতি সংস্থা, তাদের আর্থিক সংগতি বিশেষ নেই। প্লেনের ভাড়া দিতে পারবে না। তবে ওখানে পৌঁছোবার পর সব আতিথ্য ওদের। ইচ্ছেমতন যতদিন খুশি থাকতে পারি।

আমি তাতেই রাজি। থাকা-খাওয়ার খরচটাই তো আসল। তাছাড়া ওদের চিঠির ভাষা খুব আন্তরিক।

বিভিন্ন বিমান সংস্থায় খোঁজ নিয়ে দেখলাম, বাংলাদেশ বিমানই সবথেকে সুবিধেজনক। সবদিক থেকে।

রাত্রির বিমানে কলকাতা থেকে ঢাকা। সেখানে রাত্রিবাস করতে হবে, পরদিন সকালে জাপানের ফ্লাইট। হোটেলের ব্যবস্থা বিমানই করে দেবে।

আমি ধরেই নিয়েছিলাম, এয়ারপোর্টের খুব কাছাকাছি কোনও হোটেলে থাকতে হবে, উঠতে হবে ভোরে। সুতরাং ঢাকার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ নেই, তাই কারুকে খবরও দিইনি।

ঢাকা পৌঁছোনোর পর একটা বাসে আমাকে তোলা হল। বিমানের কয়েকজন

কর্মচারী ছাড়া আর কোনও যাত্রী নেই সে-বাসে। এবং বাসটা চলছে তো চলছেই। কাছাকাছি মোটেই নয়, শহরের একেবারে কেন্দ্রে সেই বাস থামল পূর্বাণী হোটেলে। এ-হোটেল আমার পরিচিত।

আমাকে খাতির করার জন্যই কি এই হোটেলে নিয়ে এলো? আমি বাংলাদেশের ভিসা নিয়ে আসিনি। ট্রানজিট প্যাসেঞ্জারদের তো শহরের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে দেওয়া হয় না। আরও একটা চমক অপেক্ষা করছিল আমার জন্য।

হোটেলের লাউঞ্জে বসে আছে বেলাল, রফিক আজাদ, ইমদাদুল হক মিলন। আরও কয়েকজন। আমারই অপেক্ষায়, রীতিমতন এক অভ্যর্থনা কমিটি।

বেলালকে জিজ্ঞেস করলাম, কী করে তোমরা খবর পেলে?

বেলাল হেসে বলল, বাংলাদেশে আবার খবরের অসুবিধে কী? সবাই সব খবর পায়।

পরে অবশ্য জানা গেল, রফিক আজাদও আমারই মতন একই আমন্ত্রণ পেয়েছে জাপান থেকে। সে অবশ্য যাবে দুদিন বাদে। বাংলাদেশ বিমানের কোনও অফিসার ওর বন্ধু, সে আমার আজকেই আসার কথাটা জানিয়ে দিয়েছে।

শুরু হয়ে গেল আড্ডা।

খানিকটা দূরে একটি তরুণী কথা বলছে দুজন যুবকের সঙ্গে। তার দিকে আমার চোখ চলে যাচ্ছে বারবার। মেয়েটি বেশ সুশ্রী, এবং সুশ্রী মেয়েদের দিকে চোখ চলে যাওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়াও আমার মনে হচ্ছে, মেয়েটিকে আমি আগে কোথাও দেখেছি, কিন্তু ওর নাম বা পরিচয় মনে পড়ছে না।

এরকম অবস্থায় বেশ অস্বস্তি হয়।

তাই আমি একসময় বললাম, বেলাল, ওই মেয়েটিকে দেখো তো। ওকে চেনো?

এরা সবাই তরুণীটিকে চেনে।

বেলাল বলল, নীলোফার আরা। জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে হিস্ট্রি পড়ায়। আপনি ওর সঙ্গে আলাপ করতে চান?

নামটা শুনেই মনে পড়ে গেল। শান্তিনিকেতনের বাড়িতে দেখা করতে এসেছিল। অনেক কথা হয়েছে, খানিকটা কান্নাকাটিও করেছিল। আনোয়ারা-শামীদের বিচ্ছেদের ঘটনায় ওর ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। মেয়েটি অবশ্য বারবার অস্বীকার করে বলেছিল, ও কোনোক্রমেই দায়ী নয়। এই নীলোফারের সঙ্গে আমার আরেকবার দেখা হয়েছিল, এই ঢাকাতেই, আগের নির্বাচনের সময়। তখন কোনও অদ্ভুত কারণে মেয়েটি আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়নি, না-চেনার ভান করেছিল। তার সেই ব্যবহারের কোনও অর্থ খুঁজে পাইনি, বেশ বিরক্ত হয়েছিলাম, সেই জন্যই সে আমার মন থেকে অনেকটা মুছে গেছে।

বেলালের প্রশ্নের উত্তরে বললাম, না, না, আলাপ করতে চাই না।

এরপর পরিকল্পনা হতে লাগল। কোথায় যাওয়া যায়। আমি হোটেলের ঘরে একা একা কাটাব, তা তো আর হতে পারে না। কোথাও বসে পানাহার করতে হবে, সবাই মিলে একসঙ্গে।

এর মধ্যে নীলোফার উঠে পড়েছে। বেরিয়ে গেল আমাদের পাশ দিয়েই। এদিকে দৃষ্টিপাত করল না, হয়তো ইচ্ছে করেই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই মেয়েটির কি বিয়ে হয়ে গেছে?

মিলন বলল, আপনার একে খুব পছন্দ হয়েছে মনে হচ্ছে!

রফিক বলল, স্বাতীদির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নাকি? আবার একটা বিয়ে করতে চান?

প্রশ্নটি যে আমি বোকার মতন করে ফেলেছি, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গটা না জানলে তো এরকম মনে হবেই।

আসলে, যতদূর শুনেছিলাম, শামীম নাকি এই মেয়েটির প্রেমে পড়েছিল। ওকে বিয়ে করার জন্য খেপে উঠেছিল। মেয়েটির দিক থেকে কোনও সাড়া ছিল না।

ঢাকার খবর অনেকদিন জানি না। আনোয়ারা তার স্বামীর সঙ্গে ফিরে যাবে না বলেছে। তার ফলে শামীম যদি নীলোফারকে বিয়ে করতে চায়, সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেটা জানার কৌতূহলেই আমার ওই কথা জিজ্ঞেস করা।

রফিক বলল যে, নীলোফারের বিয়ে হয়ে গেছে। তবে কার সঙ্গে, তা সে জানে না। বেলাল বলল, আমি কিছু শুনিনি। মিলন দৃঢ়ভাবে বলল, না, হয়নি! আমি জানি!

ঠিক হল, গাজী শাহাবুদ্দিনের বাড়িতেই যাওয়া হবে। এমন কিছু রাত হয়নি। তাছাড়া, গাজী শাহাবুদ্দিনের দ্বার সবসময়ে উন্মুক্ত।

এখান থেকেই গাজীকে টেলিফোন করা হতে সে অতি উৎসাহ দেখিয়ে বলল, এখুনি চলে এসো সুনীলদাকে নিয়ে। গাড়ি পাঠাব?

আমি বেলালকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার তো ভিসা নেই। আমি কি হোটেল থেকে বেরুতে পারব?

মিলন বলল, কেন পারবেন না? আমরা আছি না সঙ্গে?

মিলনের সব কথার মধ্যেই বেশ ব্যক্তিত্বের জোর থাকে। আমার বেশ ভালো লাগে।

এর পরে গাজীর বাড়ির আড্ডায় আনোয়ারা বা শামীমদের কোনও প্রসঙ্গই উঠল না। ওরা কেউ কিছু বলেনি। আমিও জিজ্ঞেস করিনি।

আনোয়ারা সম্পর্কে যে আমার মনে একটা অপরাধবোধ আছে, তা আমি নিজেই টের পাই। আনোয়ারা কলকাতায় থাকতে চেয়েছিল, আমরা রাখতে পারিনি। প্লেনে তুলে দিয়েছি প্রায় জোর করে। আমার বাড়ি থেকে তাকে প্রায় জোর করে টেনে-হিঁচড়ে বের করা হয়েছিল, সে-দৃশ্যটা এখনও আমার চোখে ভাসে।

অথচ ওকে রেখে দেবার কোনও উপায় আমাদের ছিল না। ভিসা নেই, ট্রানজিট থেকে পালিয়েছিল, এজন্য পুলিশ ওকে ধরতই। আমি তো তখন মিলনের মতন জোর দিয়ে বলতে পারিনি, আমরা আছি না। কে তোমায় কী করবে?

আনোয়ারার কথা জিজ্ঞেস করিনি, কিন্তু চিন্তা তো আছেই। ওর গর্ভের সন্তানটি এখন সাত-আট মাস হবে। কী তার ভবিষ্যৎ? এত দেরিতে গর্ভপাতের কোনও প্রশ্নই নেই। কিছুদিন আগে ওর মা মারা গেছেন, সম্ভবত এই কারণেই। সেটাই বা ও সহ্য করেছে কীভাবে?

অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে, আবার ভোরে উঠে চলে গেলাম জাপান।

এই যে নিপ্‌পন-বাংলা সংস্কৃতি সমিতি, এর মধ্যে আছেন দু-একজন জাপানি আর অনেক বাংলাদেশি জাপানবাসী। ওখানকার পশ্চিম বাংলার বাঙালি একজনও নেই। পরে জেনেছি, সংখ্যার দিক দিয়েও ওখানে পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালিরা খুবই কম। মাত্র দুশো, আর বাংলাদেশিরা দশ হাজার!

নতুন সংস্থা, আমাদের জন্য হোটেলের ব্যবস্থা করতে পারেনি। আমন্ত্রিতদের রেখেছে এক-একজনের বাড়িতে।

আমাকে যে আতিথ্য দিয়েছে, তার নাম ফারুক, আমার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট, সে একটি কারখানার ফোরম্যান। খুবই দিলদরিয়া মানুষ, খুবই আন্তরিকভাবে যত্ন করেছে। কিন্তু ওর বাড়ির মতন অমন ভয়াবহ জায়গায় আমি জীবনে কখনও থাকিনি।

জাপানে বাসস্থানের খুব টানাটানি, তা আগে থেকে জানা থাকলেও নিজের চোখে দেখার অভিজ্ঞতা মর্মে গেঁথে যায়। ওখানে সচ্ছল অবস্থার মানুষেরাও ছোট ছোট বাড়িতে থাকে। বাংলাদেশিরা অনেকেই পাঁচ-ছজন মিলে থাকে একটি ঘরে। আলাদা রান্নাঘর নেই। সেই শয়নকক্ষেই রান্না।

ফারুকের অবশ্য একতলার একটি ফ্ল্যাট। আলাদা ফ্ল্যাট ঠিকই, কিন্তু এরকম ফ্ল্যাট আমরা আগে কখনও দেখিনি। একটিই মাত্র ছোট্ট ঘর, যতটা ছোট হতে পারে। তিন-চারজন লোক বসলেই ভরে যায়।

তার ওপর আবার মেজানাইন ফ্লোর। শোওয়ার ব্যবস্থা ওপরে। একটা খাড়া কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। সেখানে রেলিং বা কিছু দিয়ে ঘেরা নেই। রাত্তির বেলা বাথরুমে যেতে হলে, বিছানা থেকে উঠে ভুল করে কয়েক পা হাঁটলেই ধপাস করে পড়ে যেতে হবে নিচে। আর ওই যা সিঁড়ি, মদ্যপান করার পর ওই ধরনের সিঁড়ি থেকে শতহস্ত দূরে থাকা উচিত।

প্রতি রাতে ভয়ে ভয়ে থাকতাম, ভালো ঘুম হতো না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত হাত-পা ভাঙেনি।

জাপানেই রফিক আজাদের গোঁফ চুরি গিয়েছিল।

রফিক ছিল অন্য একটা বাড়িতে। সকালবেলা দেখা হতো, আর রাত দেড়টা-দুটোয় যে-যার বাড়িতে ফেরা।

রফিকের গোঁফ বিখ্যাত। ঢাকায়, গোটা বাংলাদেশে, অমন বাহারি গোঁফ কারুর নেই। ওই গোঁফের জন্য রফিক বেশ গর্বিত, কথা বলার সময় মাঝে মাঝে চুমড়ি দেয়। সেই রফিককে এক সকালে দেখে আঁতকে উঠলাম। চেনাই যাচ্ছে না। মুখ একেবারে নির্লোম। গোঁফ উধাও!

জিজ্ঞেস করলাম, কী রফিক, তোমার গোঁফ কী হল? কেউ চুরি করে নিল নাকি? এ যে দেখছি হেড অফিসের বড়বাবুর মতন অবস্থা!

রফিক বলল, দাদা, গোটা টোকিও শহরে দেখেছেন, কোনও মানুষের গোঁফ আছে? একটা মানুষও গোঁফ রাখে না। রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটি, সবাই আমার দিকে তাকায়। যেন আমি একটা আজব প্রাণী!

কথাটা সত্যি, পৃথিবীর সব দেশেই কিছু লোক দাড়ি-গোঁফ রাখে, কিংবা শুধু গোঁফ রাখে, আর বেশির ভাগ লোকই দাড়ি-গোঁফ কিছুই রাখে না। টোকিওই একমাত্র শহর, যেখানে কোনও মানুষই গোঁফ রাখে না। পরে শুনেছি, এদেশের মানুষ সম্রাটকে খুব মান্য করে। একমাত্র সম্রাটই গোঁফ রাখেন বলে অন্য কেউ তাঁর অনুকরণ করতে পারবে না।

রফিক বলল, মানুষের দৃষ্টি আর সহ্য হচ্ছিল না। খালি মনে হতো, আমি যেন কী একটা অপরাধ করে ফেলেছি। কাল রাত তিনটার সময় ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসে বললাম, দূর শালা, নিকুচি করেছে গোঁফের। কামিয়ে ফেললাম। আমায় কি খুব খারাপ দেখাচ্ছে?

মোটেই খারাপ দেখাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, তোমার বয়েস অনেক কমে গেছে। সেইসঙ্গে তোমার তেজস্বীভাবও কমে গেছে খানিকটা। কিন্তু আর একটা যে খুব গণ্ডগোলের ব্যাপার হতে পারে? তোমার পাসপোর্টের ছবির সঙ্গে এই মুখ মিলবে না। এয়ারপোর্টে যদি আটকে দেয়!

ফেরার দিন এয়ারপোর্টে খুবই গণ্ডগোল হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তা রফিকের গোঁফের কারণে নয়। একটা দেশে ঢোকার সময় পাসপোর্ট খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেও সে-দেশ থেকে বেরিয়ে আসার সময় আর তেমন মাথা ঘামায় না। যাই হোক, আমরা শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট ফ্লাইটেই ফিরলাম। বাংলাদেশ বিমানের দু-একজন কর্মী আমাদের খাতির করে বসিয়ে দিল ফার্স্ট ক্লাসে।

টোকিওতে আমরা ঘোরাঘুরিতে ব্যস্ত ছিলাম। ফেরার পথে সুদীর্ঘ যাত্রায়, পাশাপাশি বসে গল্প করতে করতে রফিক একসময় আমায় জিজ্ঞেস করল, সুনীলদা, সেদিন পূর্বাণী হোটেলে আপনি যে-মেয়েটির কথা জিজ্ঞেস করছিলেন, নীলোফার,

ওর সম্পর্কে আপনি বিশেষ কিছু জানেন?

আমি বললাম, বিশেষ কিছু তো নয়ই। খুবই কম জানি।

রফিক বলল, ওকে আমি অনেক দিন চিনি। খুবই ভালো মেয়ে, লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট, ব্যবহারও খুব ভালো। কিন্তু ওকে ঘিরে কী যেন একটা রহস্য আছে।

রহস্য?

হ্যাঁ, তাছাড়া আর কী বলব? ভালো ফ্যামিলির মেয়ে, ইস্কুল-কলেজে বরাবর ফার্স্ট হয়েছে, তারপর রিসার্চ করেছে।

হিস্ট্রির ছাত্রী। ওর রিসার্চ গাইড ছিল শামীম? সেটুকু শুনেছি।

শামীমকে দেখেছেন তো, শান্ত, শিষ্ট, জেন্টলম্যান যাকে বলে। বউয়ের সঙ্গে খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল। তারপর ওই নীলোফার যখন বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু করল, তারপরই গেল ওর মাথাটা বিগড়াইয়া। কী অদ্ভুত পরিবর্তন! সেই শামীম এমনই প্রেমে পড়ল যে, তা আর রাখা ঢাকা রইল না। একেবারে প্রকাশ্যে। নীলু শামীমকে ভক্তিশ্রদ্ধা করত ঠিকই, খানিকটা হিরো ওয়ারশিপের ব্যাপারও ছিল, কিন্তু একজন বিবাহিত ভদ্রলোককে বিয়ে করতে যাবে কোন দুঃখে? গোপনে গোপনে অ্যাফেয়ার করার মতন মেয়েও নীলু নয়।

শামীমের এক ভাইও ওর প্রেমে পড়েছিল না? কী যেন তার নাম?

হাবিব। সেই কথাই তো বলছি। দুই ভাই-ই পড়ল এক মেয়ের প্রেমে। এর জন্য একজনের সংসার তছনছ হয়ে গেল। আনোয়ারাও বিদেশে গিয়ে বিপদ বাধিয়ে এল। আর ছোটভাই হাবিব একজনের সঙ্গে মারামারি করে এখন সে জেল খাটছে। মাঝখান থেকে নীলু বেরিয়ে এল, হাঁসের মতন, তার গায়ে একটু জলের ছিটেও লাগেনি।

তুমি যে বললে, শামীমের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিল?

ওই হাবিবটাকে আটকাবার জন্য সে-কথা শামীমই রটিয়েছিল। আমার ধারণা হয়েছিল, গোপনে রেজিস্ট্রি করেছে বোধহয়। কিন্তু মিলন যখন বলল, হয়নি, তাহলে হয়নি ঠিকই। ও ভালো জানে। তারপর কী হল শুনুন। খুব রিসেন্ট ঘটনা। আপনি বোধহয় মুরশেদকে চেনেন না। ওর বাবা একসময় আমাদের কালচারাল মিনিস্টার ছিলেন। মুরশেদ নিজেও বাংলাদেশ টিভিতে ভালো কাজ করে। সে পড়ল নীলোফারের প্রেমে। নীলোফারও একইরকমভাবে ওর প্রেমে পড়েছিল কি না জানি না, তবে মুরশেদের বাড়িতে ওকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। মুরশেদেরও একটা ছোটভাই আছে, তার নাম আফরোজ, সে গিটার বাজিয়ে গানটান গায়। বেশ নাম হয়েছে। আমি বললাম, ছোটভাই আছে? আসলে এখন নাই। এই আফরোজ তার দাদার সামনেই নীলোফারকে ফর্মালি বিয়ের প্রস্তাব দেয়। তাতে বাধা দেয় মুরশেদ। কথা কাটাকাটি হয়েছিল দুই ভাইয়ে, নীলোফার ছি ছি করে বেরিয়ে গিয়েছিল। পরদিনই আত্মহত্যা করে আফরোজ। গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলেছে। নীলোফার

এখন আর মুরশেদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না।

প্রায় একই রকম ঘটনা। দুই ভাই একই মেয়ের প্রেমে। দুজনেরই জীবন ব্যর্থ।

সেইদিন পূর্বাণী হোটেলের লাউঞ্জে দেখলেন না। নীলোফারের সঙ্গে ছিল দুটি ছেলে। ওরা দুই ভাই কি না জানি না। কিন্তু চেহারা-টেহারা তো একইরকম। আবার সেই দুজন। আবার কিছু একটা ঘটে যেতে পারে।

খুবই দুঃখজনক ঘটনা। কিন্তু এতে মেয়েটিকে দোষ দেওয়া যায় না। অন্যরা ওর প্রেমে পড়লে ও কী করবে?

জানেন সুনীলদা, একসময় আমারও একটু ইচ্ছা হয়েছিল নীলোফারের সঙ্গে প্রেম করার। সে অবশ্য দিলারার সঙ্গে বিয়ে হবার আগে। ভাগ্যিস করি নাই।

তোমারও ছোটভাই আছে নাকি, রফিক?

সে-রকম কেউ নাই। কিন্তু বন্ধুরা তো আছে। তারা যদি কেউ জেলাস হয়ে...ধরেন আমি প্রেম করছি দেখে বেলাল যদি রাগ করে...বেলাল অবশ্য আত্মহত্যা করবে না, আমাকে মারতেও আসবে না, কিন্তু আবার বিরাগী হয়ে অন্য দেশে পালিয়ে যেতে পারত।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, তুমি টাইফয়েড মেরি বলে একটি মেয়ের কথা জানো?

রফিক বলল, না।

মেরি ছিল একটি ব্রিটিশ মেয়ে। সে কোনওদিন টাইফয়েড রোগে ভোগেনি। কিন্তু সে যে-বাড়িতেই যেত, সে-বাড়িরই কোনও-না-কোনও লোকের টাইফয়েড হতো। পরে জানা গিয়েছিল, সে নিজের শরীরে টাইফয়েডের জীবাণু বহন করে বেড়াত। কিন্তু নিজে কখনও কাবু হয়নি ওই রোগে। নীলোফারও যেন অনেকটা তাই। সে একটি শান্ত, সুন্দর মেয়ে। অথচ তার জন্য মানুষ মারামারি করে কিংবা মরে যায়। অর্থাৎ সেও যেন নিজে না-জেনে হিংসার বীজ বহন করছে।

মেয়েদের জন্যে পুরুষদের মারামারি করা আশ্চর্য কিছু না। কিন্তু সবসময়ে দুই ভাই হবে কেন?

এও একরকম প্রকৃতির রহস্য।

ফেরার সময় আর ঢাকায় বেশিক্ষণ থাকতে হল না। দেড় ঘণ্টা পরের ফ্লাইটে কলকাতা।

পরের মাসেই বর্ষা নামল। সুতরাং একবার শান্তিনিকেতন তো যেতেই হবে।

আগে প্রত্যেকবার বিদেশ থেকে ফিরে এসেই আমি সাঁওতাল পরগনার কোনও অখ্যাত জায়গায় বেড়াতে যেতাম। সাঁওতাল পরগনার ছোট ছোট পাহাড় আর যেখানে-সেখানে জঙ্গল আমার খুব প্রিয়, মানুষজনও সরল, অকৃত্রিম। কোনও একটা হাটে গিয়ে সেইসব মানুষদের সঙ্গে গল্প করতে করতে হাঁড়িয়া খেয়ে বিদেশের প্রভাব

কাটিয়ে ফেলতাম।

এখন অবস্থা বদলে গেছে। ওইসব জায়গায় এখন যে-কোনও সময়ে ঝলসে ওঠে হিংসা, জ্বলে ওঠে আগুন। এখন শান্তিনিকেতনই ভালো।

অনেক সময় খবর দিয়ে যাওয়া হয় না। তখনও পর্যন্ত বাড়িতে ফোন কিংবা টিভি রাখিনি ইচ্ছে করে। খবর দেওয়া সহজও নয়।

এবারে গেলাম ট্রেনের বদলে গাড়িতে। আনন্দ পাবলিশার্সের বাদল বসুও গেলেন আমাদের সঙ্গে। শান্তিনিকেতনে তাঁর নিজস্ব কাজ আছে। তাঁর গাড়িতেই যাওয়া।

পৌঁছোলাম বিকেল সাড়ে চারটার সময়। মাঝপথে খেয়ে নিয়েছি, রাত্তিরের খাবার তৈরি করার যথেষ্ট সময় আছে।

সাধারণত গাড়ির হর্ন শুনলেই দৌড়ে আসে হিমাংশু। আজ তার পাত্তা নেই। ডাকাডাকি করতেও সে এল না খানিক বাদে এগিয়ে এল তার বউ, সমস্ত চুল উস্কো-খুস্কো, কাছে এসেও সে কোনও কথা বলে না, রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল ঘাড় নিচু করে।

কী ব্যাপার?

একটা কথাই মনে হয়। তবে কি কেউ মারা গেছে? হিমাংশু?

জলজ্যান্ত লোকটি, স্বাস্থ্য ভালো, ছটফটে, বয়েসও বেশি না, বড় জোর ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ, সে হঠাৎ মরতে যাবে কেন? আবার বলাও যায় না। এখানে মাঝে মাঝে সাপ দেখা যায়। আমি নিজেও দু-চারবার সাপ দেখেছি। একবার মেরেছিও একটাকে। কিন্তু তারা বিষাক্ত বলে মনে হয় না। পৃথিবীতে নাকি শতকরা সাতানব্বই ভাগ সাপই নির্বিষ, তবে যে-কটি বিষাক্ত, তারা একেবারে কালান্তক। সে-রকম দু-একটা তো এখানে থাকতেই পারে।

হিমাংশুর বউকে বারবার স্বাতী জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার কী হয়েছে?

সে কোনোই উত্তর দেয় না। স্বামী মারা গেলে তার তো কান্নাকাটি করা উচিত। ওরকম ঘাড় বেঁকিয়ে আছে কেন?

দু-একটা উৎসবের সময় ছাড়া এখানকার সব বাড়িই খালি পড়ে থাকে। কেয়ার-টেকার আর তাদের বউ-টউ ছাড়া অন্য জনপ্রাণী নেই।

সে-রকমই একজন কেয়ার-টেকার-পত্নী এসে জানাল, সাপের কামড় নয়, হিমাংশু কিছুক্ষণ আগে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। একটু আগে একটা সাইকেল রিকশায় চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বোলপুরে। এতক্ষণে বেঁচে আছে কি না সন্দেহ।

বোলপুর-শান্তিনিকেতনে চিকিৎসাব্যবস্থা ভালো নয়। সবাই তা নিয়ে আলোচনা করে। বেশকিছু দূরে সিয়ান নামে এক জায়গায় একটা হাসপাতাল আছে, সেটা তবু কিছুটা নির্ভরযোগ্য।

ভাগ্যিস এবার আমরা গাড়িতে এসেছি। হিমাংশুর স্ত্রীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে

স্বাতী আর বাদল তক্ষুনি চলে গেল বোলপুরে। যদি ওকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করা যায়।

বাদল এসব ব্যবস্থাপনায় বেশ দক্ষ। আমি অপদার্থ। সুতরাং আমার যাবার কোনও মানে হয় না। তাছাড়া আমি হাসপাতাল-জাতীয় স্থান যথাসম্ভব এড়িয়ে চলি।

এ-বাড়িতে কাপড় কাচা, বাসন মাজার কাজ করে শেফালি। সে থাকে কাছেই। আমাদের আসার খবর পেলেই চলে আসে।

তার কাছ থেকেই জানা গেল কাহিনিটি। আমার জন্য চা বানিয়ে এনে সে হিমাংশুর আত্মহত্যার কারণটি যখন জানাল, তখন এমন দুশ্চিন্তার মধ্যেও আমার হাসি পেয়ে গেল।

প্রেম?

আমার মধ্যবিত্তেরা নিম্নসমাজের মানুষদের বেঁচে থাকাটাকে মনে করি নিছক জৈবিক। সেখানেও প্রেম-ট্রেমের মতন বিলাসিতা থাকতে পারে, তা আমরা কল্পনাও করি না।

আমরা যখন থাকি না, বছরের মধ্যে প্রায় তিনশো দিনই থাকি না, তখন হিমাংশু নিয়ম করে দুপুরবেলা দুঘণ্টা থাকে না। কোথায় যায়, তাও বলে না। হিমাংশুর স্ত্রীর ধারণা, সে-সময় হিমাংশু কারুর সঙ্গে প্রেম করতে যায়। এই নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া হয়। আজ সেই ঝগড়া তুঙ্গে উঠেছিল, এইরকম অবস্থায় পুরুষরা স্ত্রীদের ধরে খুব পেটায়। হিমাংশু তা করেনি, রাগে-দুঃখে সে অনেকখানি পেস্টিসাইড খেয়ে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেছে।

হিমাংশুর স্ত্রীর নাম জ্যোৎস্না। যিনি এই নাম রেখেছেন, তিনি দূরদর্শী ছিলেন না। বেচারির গায়ের রং বেশ ময়লা, শরীরে রূপ বা স্বাস্থ্য দুটোবই অভাব। ওপরের অনেকগুলো দাঁত উঁচু। তবু সে দুটি সন্তানের জননী। হিমাংশুর স্বভাবটি মোটামুটি শান্ত, তার বউয়ের গলার আওয়াজটি ঝগড়াটে ধরনের। তার নিজের শরীরে অনেক কিছুব অভাব আছে বলেই সে ঝগড়া করে নিজের দাবি জানায়।

শেফালি স্পষ্টতই হিমাংশুর পক্ষে, সে জ্যোৎস্নাকে পছন্দ করে না। তার মতে, হিমাংশু প্রেম-ট্রেম কিছু করে না। ওর বউ ওকে মিথ্যে সন্দেহ করে। আসলে দুপুরে হিমাংশু অন্য একটি বাগানে পার্টটাইম চাকরি করে, পাছে সেটা আমরা জেনে ফেলি, তাই সে-চাকরির কথা সে কারুকে জানাতে চায় না। নিজের বউকে জানিয়েছে নিশ্চয়ই, বউ তা বিশ্বাস করে না। অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে এতদিনে জানাজানি হয়ে যেত না? কটা লোকই বা থাকে এখানে? এখানে কিছুই গোপন থাকে না।

স্বাতী আর বাদল ফিরে এলো সন্ধের পর। অজ্ঞান হিমাংশুকে ওদের গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সিয়ান হাসপাতালে। ডাক্তাররা বলেছেন, তার বাঁচার আশা

খুবই কম।

এরপর দুদিন সকাল ও বিকেলে স্বাতী ও বাদল হাসপাতালে যাওয়াআসা করল। টাকা-পয়সা যা লাগে, সবই দেওয়া হল। আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে জ্ঞান ফিরল হিমাংশুর। তখনও যম ও ডাক্তারের টানাটানি চলছে।

শেষ পর্যন্ত বেঁচেই উঠল হিমাংশু, ফিরে এল পাঁচ দিন পরে।

একেবারে নির্ঘাৎ মৃত্যুর কাছ থেকে ফিরে আসা। তবু সে-রকম কোনও হৈচৈ বা উৎসব হল না। কেউ তাকে দেখতেও এল না। গাড়ি থেকে নেমে লজ্জা লজ্জা মুখ করে ঢুকে গেল নিজেদের ঘরে।

আমি স্বাতীকে বললাম, আজকের দিনটাতেও রান্নাবান্না তোমরাই চালিয়ে নাও। ওকে ডেকে কিছু বলার দরকার নেই। ও বেচারি নিশ্চয়ই মরমে মরে আছে। আজ বিশ্রাম নিক। ওর বউকে বলে দাও, আজ যদি ও আবার ঝগড়া করে, ওকে আমরা পুলিশে ধরিয়ে দেব।

শেফালির মারফত হিমাংশুর বউকে আমি আগেই জানিয়ে দিয়েছি। আমাদের অনুপস্থিতিতে হিমাংশু যদি কোথাও পার্ট টাইম চাকরি করে, তাতে আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। আমরা আর কতই বা মাইনে দিই। কিন্তু অতিরিক্ত উপার্জন তো ও করতেই পারে। আমরা থাকলেও দুপুরে দু-ঘণ্টা ওর ছুটি।

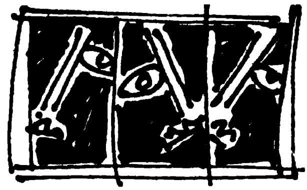
লিখতে লিখতে ক্লান্তি লাগলে আমি মাঝে মাঝে ঘরের পাশের ছাদে কিছুক্ষণ পায়চারি করি। চশমা খুলে গাছপালার দিকে তাকিয়ে চোখে খানিকটা সবুজের ঝাপটা লাগাই।

ছাদ থেকে দেখলাম। হিমাংশু একা একা ঘুরছে বাগানে।

আমার খেয়াল হল, আত্মহত্যার চেষ্টার পরেও বেঁচে ওঠা কোনও মানুষকে আমি আগে কখনও দেখিনি। কীরকম মনের অবস্থা হয় ওদের? অজ্ঞান অবস্থায় হিমাংশু কি মৃত্যুকে দেখতে পেয়েছিল?

কোনওরকম সাড়া না দিয়ে আমি একটু আড়াল থেকে লক্ষ করতে লাগলাম ওকে। কেমন যেন মুখখানা বদলে গেছে। এ যেন আমাদের চেনা হিমাংশু নয়। মাঝে মাঝে ও এক-একটা ফুলগাছের চারার সামনে বসে পড়ছে। এই চারাগুলো ও লাগিয়েছে নিজের হাতে। এইসব চারায় ফুল ফোটা ওর আর দেখার কথা ছিল না। চারাগুলির ওপরে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে হিমাংশু কি ওদের কাছে ক্ষমা চাইছে? হতেও পারে।

একমাত্র প্রকৃতির কাছেই মানুষের ক্ষমা চাওয়া সব থেকে সার্থক।



২১

যথাসময়ে আনোয়ারা একটি কন্যাসন্তান প্রসব করল।

খবরটা আমরা কানাঘুষোয় আগেই জেনেছিলাম, মাসখানেক বাদে সে নিজের হাতে লিখে একটা চিঠি পাঠাল স্বাতীকে। সে-চিঠিতে কিছু বানান ভুল ও ভাষার ভুল আছে বটে, কিন্তু সারল্যের জোর ও তেজ জাজ্বল্যমান।

আমার পরম প্রিয় স্বাতী ভাবী :

এই পত্রে তোমাকে একটি সুসংবাদ জানাতেছি। বিগত ১৯ ভাদ্র (ইং ৫ সেপ্টেম্বর) আমি মা হয়েছি, আমার কোল জুড়ে এসেছে একটি মেয়ে। সেই দিনটায় খুব বৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু আমার তেমন কিছু অসুবিধা হয় নাই। তারিখ ছিল আরও দশ দিন পর, কিন্তু ঐদিন সকালে প্রবল ব্যথা শুরু হয়। আমার গাড়ি নাই, রাস্তায় এক রিক্সাচালক খারাপ ব্যবহার করায় আমি একাই হেঁটে চলে যাই নার্সিং হোমে। অবশ্য খুব দূরে না। সেই দিবাগত রাতেই মেয়ে আমার এই দুনিয়ার বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়। ওজন একটু কম ছিল, এখন ঠিক আছে। এখন আর বেশি কাঁদে না। আমার মুখের দিকে পিটপিট করে চেয়ে থাকে আর হাসে।

মেয়ের নাম রেখেছি রাবেয়া। আমি ডাকি মায়া। রাবেয়া নামটা সে এখনও চেনে নাই, কিন্তু মায়া বলে ডাকলেই ঘাড় ঘুরায়ে তাকায়। চোখ দুটি ভারি সুন্দর, ঠিক যেন আমার মায়েরই মতন। এ মেয়ের রূপ আমার মায়ের মতনই হবে। মা ওকে দেখে যেতে পারলেন না। শুনেছেন বোধহয়, কয়েক মাস আগে আমার মায়ের ইন্তেকাল হয়েছে। অবশ্য মা...

(এর পরের দুটি বাক্য ঘষে ঘষে কাটা।)

স্বাতী ভাবী, আমার আরও বেশি আনন্দ হয়েছে কেন জানেন? আমার বিয়ে হয়েছে নয় বছর ছয় মাস, কিন্তু এর মধ্যে আমার বাচ্চা কাচ্চা হয় নাই।

অনেক ডাক্তার দেখাইছি, পীর-ফকিরদের কাছেও গেছি, কেউ কিছু করতে পারে নাই। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আমার কইত বাঁজা (আপনারাও কি বাঁজা বলেন, না অন্য কিছু?)। আমি অন্য দেশে যাবার আগে এক বিজ্ঞ ডাক্তার বলেই দিল, শামীমের

সবকিছু ঠিকঠাক আছে, দোষ আমারই, আমার প্যাটে নাকি মরা ডিম থাকে, সুতরাং সন্তানের আশা নাই। তাইলে এখন আমার মেয়ে কি আকাশ থেকে পড়ল? সেই ডাক্তারের এখন একবার হাতের কাছে পাইলে আমি তার নাকটা কাইট্টা দিতাম।

আমি ধানমন্ডিতে বাসা ভাড়া করে থাকি। মেয়েকে নিয়ে একাই থাকতে পারব, আমার আর কারুর প্রয়োজন নাই। আপনি ও সুনীলদা দোয়া করবেন। আশীর্বাদ করবেন। এই পৃথিবীতে যেমন অসততা আছে, তেমন তো মঙ্গলও আছে। আপনারা আমার প্রণাম নিবেন। আল্লা হাফেজ।

ইতি
আপনার স্নেহধন্যা
আনোয়ারা

চিঠিটা স্বাতী আর আমি পাশাপাশি বসে একসঙ্গেই পড়লাম।

স্বাতী গভীর আবেগের সঙ্গে বলল, সত্যি খুব ভালো খবর। মেয়েটার জন্য যা দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। মেয়েটার সাহস আছে, স্বীকার করতেই হবে।

আমি বললাম, ওকে যখন প্রথম প্রথম আমরা দেখেছি, তখন বোঝাই যায়নি। ও-মেয়ের মধ্যে এতটা শক্তি আছে। ওর এই কন্যাসন্তানের জনক কে, তা একবারও উল্লেখ করেনি। সমাজও কতখানি বদলেছে দ্যাখো। ঢাকা শহরেও সারোগেট মাদার মেয়েকে নিয়ে একলা থাকতে পারে। সমাজ সেটা মেনে নেয়।

স্বাতী বলল, বড় বড় শহরে সমাজ বলে কিছু টের পাওয়া যায় নাকি? সমাজ তো এখনও টিকে আছে শুধু গ্রামে।

কথাটা অনেকটা সত্যি, কিন্তু পুরোটা নয়। অনেক শহরের মধ্যেও ছোট ছোট গ্রাম গজিয়ে ওঠে। গ্রাম ছেড়ে যারা শহরে আসে, তারা তাদের জীবন থেকে গ্রাম্য গন্ধ একেবারে মুছে ফেলতে পারে না, অন্তত এক প্রজন্মে। আমার মতন মানুষও তো বহুকাল গ্রামছাড়া, তবু এখনও গ্রাম সম্পর্কে নস্টালজিয়ায় ভুগি। কবিতা-টবিতায় গ্রামের কথা এসে যায় বারবার।

স্বাতী পুরোপুরি শহুরে মেয়ে। কলকাতা শহরেই জন্ম, কর্ম, লেখাপড়া। কোনওদিন গ্রামে গিয়ে থাকেনি। এখন অবশ্য শান্তিনিকেতন হয়েছে।

ওর সঙ্গে আমার ব্যবহারের কিছু কিছু তফাত আমি বুঝতে পারি। মাঝে মাঝে আমার খুব সাধারণ কথা শুনেও স্বাতী বলে, তুমি হঠাৎ এত রেগে উঠছ কেন?

আসলে রাগের কোনও ব্যাপারই নেই, কোনও কারণও নেই। কিন্তু কোনও কোনও কথায় আমার গলার আওয়াজ জোর হয়ে যায়। আমার বাবা-কাকাদেরও এমন হতো। এটা সেই গ্রাম্যস্বভাবের রেশ।

আনোয়ারা তার চিঠিতে ধানমন্ডির বাসাবাড়ির কথা উল্লেখ করলেও তার চিঠিতে

কোনও ঠিকানা নেই। সুতরাং উত্তর দেওয়া যাবে না।

তবু স্বাতী ওকে একটা চিঠি লিখল বেলাল চৌধুরীর ঠিকানায়। বেলাল নিশ্চয়ই পৌঁছে দেবে।

অনেকদিন কামালের কোনও দেখা নেই, সে চলে গেছে মালয়েশিয়াতে। কামাল ঢাকায় থাকলে প্রায়ই কলকাতায় আসে, তার কাছ থেকে অনেক খবর পাওয়া যায়।

কয়েকদিন পর কুয়ালালামপুর থেকে কামাল ফোন করলে আমাদের কাছ থেকেই সে প্রথম আনোয়ারার খবর শুনল। কামাল এর মধ্যে আনোয়ারার জন্য অনেক দৌড়োদৌড়ি করেছে, নিজের পয়সাও খরচ করেছে। বেহালার কাছে এক নার্সিং হোমে অজ্ঞান অবস্থায় আনোয়ারাকে কামালই আবিষ্কার করেছিল অবিশ্বাস্য অধ্যবসায়ে।

এ-খবর শুনে সে কিন্তু মোটেই উচ্ছ্বসিত হল না।

বরং কেমন যেন চুপসে গিয়ে বলল, মেয়ে হয়েছে? এটা কি ভালো হল? এ-মেয়েকে কি সে পালতে পারবে? বাপের ঠিক নাই।

স্বাতী তাকে মৃদু ধমক দিয়ে বলল, কেন মানুষ করতে পারবে না? ও যথেষ্ট শক্ত মেয়ে। আজকাল তো বিদেশে স্পার্ম ব্যাঙ্ক হচ্ছে। কোনও মেয়ে ইচ্ছে করলে, বিয়ে না করে, কোনও পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখেই মা হতে পারবে!

কামাল সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গ বদলে তার এক নতুন ব্যবসার কথা বলতে শুরু করল। মুরগি রান্না করার এক বিশেষ ধরনের মশলা সে নিয়ে যাবে ঢাকায়। কেন্টাকি ফ্রায়েড চিকেনের মতন, এই মুরগি খেতেও ঢাকায় লাইন লেগে যাবে।

আমি মনে মনে বললুম, আবার কামালের এক লোকসানের ব্যবসা। এ-পর্যন্ত পঁচিশ-তিরিশ রকম ব্যবসার চেষ্টা করেছে কামাল। প্রত্যেকটিই বেশ আকর্ষণীয়, কিন্তু প্রত্যেকটিতেই অর্থদণ্ড ছাড়া আর কোনও রুপোলি রেখা দেখা যায়নি। তবুও ওর উৎসাহ অদম্য।

কামালের ফোন ছেড়ে দেবার পর স্বাতী জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় নাকি হাজার হাজার, না, লক্ষ লক্ষ বাঙালি মেয়েকে রেপ করেছিল পাকিস্তানি আর্মি? তা কি সত্যি?

আমি বললাম, যা রটে, তা কিছু তো সত্যি হয় বটেই। লক্ষ লক্ষ না হোক, বেশ কয়েক হাজার এরকম ঘটনা ঘটেছে নিশ্চয়ই। কিছু চিহ্ন তো আমি নিজেই দেখেছি!

স্বাতী ভুরু কুঁচকে বলল, তুমি নিজেই দেখেছ মানে? তুমি রেপ, ইয়ে, রেপ ভিকটিমদের দেখেছ?

তা দেখিনি, কিন্তু চিহ্ন দেখেছি। তোমার মনে আছে, বাংলাদেশ যুদ্ধ যখন চলছিল, তার মধ্যেই আমরা একটা দল গিয়েছিলাম সাতক্ষীরায়? পাক আর্মি ঢাকায় সারেন্ডার

করে ১৬ ডিসেম্বর, তার চার-পাঁচদিন আগেই খবর পাওয়া গিয়েছিল, এই দিকের ফ্রন্টে পাক আর্মি হেরে গিয়ে পশ্চাদপসরণ করেছে। কিছু বন্দি হয়েছে ইন্ডিয়ান আর্মির কাছে, আর কিছু পালিয়েছে। মোটকথা, সাতক্ষীরার দিকে একজনও আর্মি নেই। এর মধ্যে কলকাতায় পাকিস্তানের হাই কমিশন অফিস দখল করে নিয়েছে বাংলাদেশের সবুজ-সোনালি পতাকা উড়িয়ে দেবে। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল আমাদেরও কয়েকজনকে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় গিয়েছিলেন মনে আছে। ফিরে এসে তিনি *ক্ষমা নেই* নামে একটা সাংঘাতিক উত্তেজক লেখা লিখেছিলেন। শক্তি আর সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ও ছিল আমার সঙ্গে।

স্বাতী বলল, আমি কেন যাইনি? আমাকে কেন নিয়ে যাওনি?

তোমাদের নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ছিল না। আমাদের দলে একটিও মেয়ে ছিল না। খুবই রোমাঞ্চকর ছিল সেই যাত্রা। ইন্ডিয়ান আর্মি আমাদের যেতে নিষেধ করেছিল। তখনও-সেখানে কিছু পাক আর্মি লুকিয়ে থাকতে পারে, তারা বেপরোয়া হয়ে গুলি চালাতে পারে। তাছাড়া গুজব ছিল, রিট্রিট করার সময় পাক আর্মি প্রধান রাস্তায় মাইন পুঁতে রেখে গেছে, যে-কোনও সময় আমাদের গাড়ি উড়ে যেতে পারে। খুবই ঝুঁকি ছিল ঠিকই।

তোমরা যাবার সময় এসব কথা কিছুই বলোনি আমাকে।

সব কথা স্ত্রীকে জানিয়ে অনুমতি নিতে হলে বিবাহিত পুরুষদের পক্ষে কোনও অ্যাডভেঞ্চার করাই সম্ভব নয়। বাড়িতে বসে শুধু গল্প-কবিতা লেখা যায়। স্ত্রী-ভক্ত অনেক বাঙালি লেখকই সেইজন্য সীমান্ত পেরিয়ে একবারও ওদিকে যায়নি।

বুঝেছি, সেইজন্যই তুমি সেইসব লেখকদের মতন ভালো কিছু লিখতে পারোনি? সবসময়ে বাবা-মুখো হলে লেখায় কনসেনট্রেট করা যায় না! যাই হোক, বলো, ওখানে গিয়ে কী দেখলে?

অনেক কিছুই দেখেছি। অনেক ট্র্যাজিক কাহিনিও শুনতে হয়েছে। যাই হোক, প্রত্যক্ষ প্রমাণ যা দেখেছি, সেইটুকুই বলি। তখন বাঙ্কার, ফক্স হোল এইসব শব্দ লোকের মুখে মুখে ঘোরে। আমি সেই প্রথম বাঙ্কার ও ফক্স হোল নিজের চোখে দেখলাম। আমাদের তো যুদ্ধ সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞান শুধু উপন্যাস ও ইতিহাস পড়ে। ওখানে, সাতক্ষীরা যাবার পথে, ভোমরা বলে একটা গ্রামে দেখলাম, রাস্তার ধারে বাঙ্কার। তার মধ্যে পড়ে আছে, মেয়েদের ব্রা, শায়া আর রক্তমাখা ছেঁড়া শাড়ি। একটা আধটা নয়, অনেক। এগুলোকেই তো বলে টেল টেল সাইন।

অত্যাচার করার পর সব মেয়েকেই কি ওরা মেরে ফেলত?

তা বোধহয় না। অনেক মেয়েই ইজ্জত হারাবার পরেও বেঁচে ছিল শুনেছি।

তাদের কি তাদের বাড়ির লোকরা ফেরত নিয়েছিল? কেউ কেউ প্রেগন্যান্টও হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই? সেইসব অবৈধ সন্তানদের ভাগ্যে কী হল?

এটা আমি ঠিক বলতে পারব না। এ-সম্পর্কে আমি কিছু পড়িনি। তবে, এইসব নিয়ে আর খোঁচাখুঁচি না করাই তো ভালো। সেই হতভাগ্য মেয়েদের ব্যাপারটা যত ভুলে যাওয়া যায়, ততই তো ভালো।

তা হয়তো ঠিক।

একটুক্ষণ চিন্তা করে স্বাতী আবার বলল, আরেকটা কথা আমার মনে পড়ছে। ইন্ডিয়ান আর্মি যখন মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জয়ী হয়ে এগোতে লাগল, তখন তারাও কি অসহায় মেয়েদের নিয়ে ফূর্তি করেনি? সব ভিক্টোরিয়াস আর্মিই তো এরকম করে, ইতিহাসে পড়েছি। ইন্ডিয়ান আর্মিই বা কেন শুদ্ধ ধোয়া তুলসীপাতা হবে?

আমি বললাম, তা ঠিক। সব যুদ্ধেই বিজয়ী সেনাবাহিনী উল্লাসে কিছু কিছু লুটপাট করে, স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের দেখলে অনেকদিনের বুভুক্ষু যৌনক্ষুধা মেটায়। তাদের ওপরওয়ালাও এসব জেনেও চোখ বুজে থাকে, যেন এ-সবই যুদ্ধজয়ের ট্রফি। কিন্তু একটা কথা ভুলে যেও না, তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী একজন মেয়ে, ইন্দিরা গান্ধী। তিনিই যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনও মহিলা কি এতবড় একটা যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন? ইন্দিরা গান্ধীর কঠোর নির্দেশ ছিল, ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজনও যদি কোনও মহিলার ইজ্জতহানির চেষ্টা করে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে কোর্ট মার্শাল করা হবে। সেইজন্যই বোধহয়, বাংলাদেশ যুদ্ধে ইন্ডিয়ান আর্মির কেউ ওখানকার কোনও মেয়েকে রেপ করার সাহস পায়নি! লুটপাট কিছু করলেও করতে পারে।

স্বাতী বলল, তাহলেই বুঝতে পারছ, পৃথিবীর সব দেশেই প্রধানমন্ত্রী কিংবা প্রেসিডেন্ট মেয়েদেরই হওয়া উচিত। তাহলে যুদ্ধ হলেও মেয়েদের সম্ভ্রম নষ্ট হবে না। যুদ্ধ হলেও তা হবে অনেকটাই মানবিক।

তাতে আমার কোনওই আপত্তি নেই। আমার বাড়িতে আমি তো একজন মহিলা প্রধানমন্ত্রীর অধীনেই আছি। এখন আমার দেশ কিংবা পৃথিবী যদি মেয়েদের নির্দেশেই চলে, তাতে আমার তো কিছু হেরফের হচ্ছে না। বেশ তো!

স্বাতী আমার থুতনি ধরে নেড়ে দিয়ে বলল, এখন এ-বাড়ির প্রধানমন্ত্রীর আদেশ, হুইস্কির বোতল-ফোতল সরাও, লক্ষ্মী ছেলের মতন খেতে বসো।

দেরি করে খাওয়াই আমার অভ্যেস। কিছুক্ষণের জন্য স্বাতীকে অন্যমনস্ক করার জন্য আমি বললাম, আরও একটা ব্যাপার আছে। আমি *পূর্ব-পশ্চিম* নামে একটা এলেবেলে উপন্যাস লিখেছি, কেউ সেটাকে বিশেষ পাত্তা দেয়নি, সে যাই হোক, সে-উপন্যাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনেকখানি বর্ণনা আছে। একেবারে ঢাকায় পাক-সেনাপতি নিয়াজীর আত্মসমর্পণ পর্যন্ত। তাতে আমি খানিকটা স্বাধীনতা নিয়েই লিখেছিলাম, সব দেশের বিজয়ী সেনাবাহিনীর মতনই ভারতীয় সৈন্যবাও জয়ের

উল্লাসে মত্ত হয়ে কিছু কিছু লুটপাট করেছে, মেয়েদের ধরেও টানাটানি করেছে। সে-লেখা পড়ে কাদের সিদ্দিকীর মতন কয়েকজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আমাকে চিঠি লিখেছিলেন যে, তাঁরা ভারতীয় সেনাদের ওরকম কোনও অসভ্যতা করতে দেখেননি। খুবই আশ্চর্য ব্যাপার, তাই না? সে-চিঠি আছে আমার কাছে।

স্বাতী খানিকটা অসহিষ্ণুভাবে বলল, তুমি যা-ই বলো আর তাই বলো, আমি মোটেই ইন্ডিয়ান আর্মিকে ক্লিন চিট দিতে রাজি নই। তারা এখন কাশ্মীরে কী করছে? মণিপুরে, নাগাল্যান্ডে? মাঝে মাঝেই তো তাদের বর্বরতার খবর বেরোয়। আর্মির লোকগুলো নিজেদের পরিবার-পরিজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাসের পর মাস ব্যারাকে কাটায়। সেই জোয়ান জোয়ান পুরুষগুলো নারীসম্ভোগের জন্য বুভুক্ষু হয়ে থাকে। সামান্য সুযোগ পেলেই কোনও মেয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মেয়েদের ওপর অত্যাচার করা তো খুব সহজ, তাতে কোনও বীরত্ব লাগে না। আর্মি রাখাটাই অন্যায়।

পৃথিবীর সব দেশ থেকে আর্মি তুলে নিলে কেমন হয়?

পৃথিবীতে মোট কটা দেশ আছে? একশ আটাত্তরটা বোধহয়। সেই সবকটা দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা এক জায়গায় বসে যদি চুক্তি করে, আর কেউ কারুর সঙ্গে যুদ্ধ করবে না, কেউ অন্য দেশের জমি দখল করবে না, যার যা সীমানা আছে, তাই-ই থাকবে, এমনকী কাশ্মীরেও যতটা অংশ পাকিস্তানে আছে, সে-রকমই থেকে যাবে, বাকিটা ভারতে, তাহলে আর সেনাবাহিনী রাখার তো দরকারই নেই। কত টাকা বেঁচে যাবে বলো তো!

সেই টাকায় পৃথিবীর সমস্ত ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অন্ন জোগানো যেত। সমস্ত অসুস্থ মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া যেত।

তারপরই আমি অট্টহাস্য করে বললাম, এই কথাটা শুধু তুমি আর আমি বুঝি, কিন্তু পৃথিবীতে আর কেউ বোঝে না কেন বলো তো!

স্বাতী সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলল, তুমি আমাকে ঠাট্টা করছো? নিশ্চয়ই আরও অনেকেই এইরকম কথা ভাবে।

শুধু তারাই ভাবে, যাদের হাতে কোনও ক্ষমতা নেই। পৃথিবীর সব রাষ্ট্রনায়করাই জানে, ক্ষমতা ধরে রাখতে গেলে নিজের তাঁবে সামরিক বাহিনী রাখতেই হবে। নইলে আরেকজন সেটা কেড়ে নেবে। মানুষের ইতিহাসে এই কাড়াকাড়ি চলছে অনবরত। যুদ্ধ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। নানানভাবে যুদ্ধ তো লেগেই আছে।

মানুষ জাতটাই পচে গেছে। অ্যাটম বোমা ফেলে পুরুষমানুষ জাতটাই ধ্বংস করে দিলে ভালো হয়।

এই দ্যাখো, তুমিও যুদ্ধের কথা বলছ! এইভাবেই পৃথিবীটা চলবে। একদিকে খুনোখুনি, আরেকদিকে শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞানের অগ্রগতি!

তোমরা অন্তত মেয়েদের ওপর বলাৎকার, ধর্ষণ আটকে দিতে পারো না?

আমার হাতে নাই ভুবনের ভার। আমি শুধু ওইরকম কর্ম নিজে করব না, এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। চলো, এবার খাবার দাও। আর বেশি কথা বললে আমার নেশা হয়ে যাবে।

আনোয়ারাকে খোঁজাখুঁজির সময় রশিদ অনেক সাহায্য করেছিল, তাই তাকেও জানালাম খবরটা। মাঝখানে কিছুদিন ওর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না।

রশিদ বলল, মেয়েটি অ্যাবোরশান করাতে চায়নি। সেটা ওর পারসোনাল ডিসিশান। এর জন্য যদি পরে ওকে কোনও অসুবিধেয় পড়তে হয়, সেটা ওকেই ফেস করতে হবে। ডিফিকাল্ট, খুবই ডিফিকাল্ট। এখন কথা হচ্ছে, ওকে কি সেই দেশে কেউ রেপ করেছিল, না নিজেই কোনও অ্যাফেয়ারে জড়িয়ে পড়েছিল? সেটা কি জানা গেছে?

আমি বললাম, না। আমি তো কিছু জিজ্ঞেস করিইনি. ও নিজেও তখন স্বাতী কিংবা খুকুমাকে কিছু বলেনি।

এই দুটোর মধ্যে একটা তফাত আছে, বুঝতে পারছ? একজন রেপিস্টিকে সব মেয়েই ঘৃণা করে। সেই ঘৃণার সন্তানকে ও নিজে লালন-পালন করবে? আর যদি নিজেরই দুর্বলতায় কোনও লোকের সঙ্গে ইনভল্‌ভড হয়ে পড়ে, কিছুদিনের অ্যাফেয়ার হয়, তারপর সেই পুরুষটি কেটে পড়তে পারে, কিন্তু আনোয়ারা তো জানবে, যতই সাময়িক হোক, এ-মেয়ে তার ভালোবাসার সন্তান।

ওভাবে না দেখলেও চলে, রশিদ। রেপিস্ট লোকটা ঘৃণ্য হতে পারে, কিন্তু বাচ্চাটা তো নির্দোষ। সে তো এই সমাজ-সংসারের রীতিনীতি না জেনেই পৃথিবীতে এসেছে। ওর বাবার কথা ও হয়তো সারাজীবনেও জানবে না।

ওর বাবার পরিচয় ওর নিজের মধ্যে লেখা থাকবে। সে যাই হোক, ওই বাচ্চাটাকে নিয়ে আনোয়ারা নিজের জীবনটা কীভাবে সামলাবে, সেটা অবজার্ভ করাই একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হবে। তুমি মাঝে মাঝে খবর নিয়ে আমাকে জানিয়ো তো! ওর হাজব্যান্ড কীভাবে নিয়েছে ব্যাপারটা?

ওর হাজব্যান্ড তো কন্ডিশান দিয়েছিল, আনোয়ারা যদি অ্যাবোরশান করায়, তাহলে ও আনোয়ারাকে ফেরত নিতে রাজি আছে।

ভালোই প্রস্তাব দিয়েছিল। ওর হ্যাজব্যান্ডকে উদারই বলতে হবে।

আনোয়ারা সে-কন্ডিশানে রাজি হয়নি। হাজব্যান্ডের সঙ্গে একবারও দেখা করেনি। ও শর্ত মেনে আবার স্ত্রী হবার বদলে মা হতে চেয়েছে।

দেখা যাক, ব্যাপারটা কোনদিকে গড়ায়।

কয়েকদিন পর সকালবেলা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে স্বাতী আমায় জিজ্ঞেস করল, ধুবুলিয়া জায়গাটা কোথায়?

প্রতিদিন গোটা পাঁচেক কাগজ আসে আমাদের বাড়িতে। বিছানায় বসে চা খেতে

খেতে অনেকক্ষণ ধরে কাগজ পড়ি। দুজনের হাতে দুরকম কাগজ। প্রত্যেকদিনই আমার মনে হয়, কেন শুধু শুধু এত খবরের কাগজ পড়ে সময় নষ্ট করা? রোজ তো প্রায় একইরকম খবর থাকে। তবু, নেশার মতন পড়ে যাই।

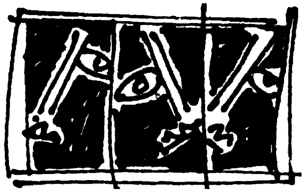
স্বাতী দুবার প্রশ্ন করার পর আম বললাম, ধুবুলিয়া? খুব সম্ভবত নদীয়া জেলায়। একসময় ওখানে উদ্বাস্তুদের একটা বড় ক্যাম্প ছিল, সেইজন্য নামটা শুনেছি। যাইনি কখনও।

কী করে ধুবুলিয়ায় যেতে হয়, তুমি জানো?

চেষ্টা করলে জানা যেতে পারে। কিন্তু হঠাৎ ধুবুলিয়া সম্পর্কে কৌতূহল হল কেন?

ধুবুলিয়া থানার পাশাপাশি দুটো গ্রাম। রুকুনপুর আর চরকাষ্ঠশালী। নামদুটো খুব সুন্দর নয়? কিন্তু সেখানে যা ব্যাপার-স্যাপার চলছে, তা মোটেই সুন্দর না। দুটো গ্রামে দুরকম ঘটনা। রুকুনপুরের জলে আছে আর্সেনিক। সেখানকার মানুষদের হাতে-পায়ে ঘা হয়। তাই ওই গ্রামের মেয়েদের বিয়ে হতে চায় না। যদি-বা বিয়ে হয়, কদিন বাদেই তারা ফেরত চলে আসে। আজকের কাগজ বেরিয়েছে, ইনসান শেখের সঙ্গে আসিকা নামের একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। মাত্র একবছর পরেই ইনসান আসিফার পায়ের আঙুলে ঘা দেখে তাকে বাপের বাড়ির কাছে ফেরত দিয়ে গেছে। ওই বউকে সে আর নেবে না। যদিও আর্সেনিকের ঘা ছোঁয়াচে নয় মোটেই। আর চরকাষ্ঠশালীর বাসন্তী নামে একটি মেয়েকে হাটের দিনে চারজন লোক জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে পাটক্ষেতে ফেলে দিয়ে গেছে। বাসন্তী কিন্তু মরেনি। সে কোনওক্রমে ফিরে এসেছে বাড়িতে। কিন্তু তার ভাইরা তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। বারবার তাকে বলছে, তুই মরলি না কেন? মাত্র সতেরো বছর বয়েস, বাসন্তী বসে আছে তাদের বাড়ির সামনে এক গাছতলায়। তার আর কোথাও যাবার জায়গা নেই। এর মধ্যে বৃষ্টিও নেমেছে। সে কী খেয়ে বেঁচে আছে, সে-কথা লেখেনি।

আমি ওই আসিফা আর বাসন্তীকে একবার দেখে আসতে চাই। নারীসেবা সঙ্ঘ থেকে মলয়াদিকেও বলব যেতে, যদি কিছু সাহায্য করা যায়। তুমি আমাদের নিয়ে যাবে?



২২

সকালবেলা সেজেগুজে আমরা তৈরি। স্বাতী হঠাৎ বড় বড় পাঁচ প্যাকেট বিস্কুট আনিয়ে সঙ্গে নিতে চায় কেন জানি না। এছাড়া বেশ কয়েকটা পুরোনো শাড়ি-ব্লাউজ-সায়া পুঁটলি বেঁধে নিয়েছে। গ্রামে গিয়ে সেখানকার জল পান করা বিপজ্জনক, আজকাল আর্সেনিক দূষণের কথা খুব শোনা যাচ্ছে, তাই কয়েকটি জলের বোতলও সঙ্গে যাবে।

মলয়াদির এসে পড়ার কথা সাড়ে আটটার মধ্যে। প্রায় ন'টা বাজতে চলল, তাঁর দেখা নেই। এরপর রোদ যেমন চড়া হবে, তেমনি গাড়ির ভিড়ও বাড়বে। ধৈর্য হারিয়ে মলয়াদিকে ফোন করতে যাচ্ছি, তখনই ফোন বেজে উঠল। মলয়াদিরই কণ্ঠস্বর। দুঃসংবাদ। মলয়াদির ড্রাইভার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। খুব জ্বর, যে যেতে পারবে না। লোকটি বেশ হাসিখুশি ধরনের, কখনও অভিযোগ করে না, অর্থাৎ সে নিতান্তই অপারগ। কয়েকদিন আগে আমাদের মহেন্দ্রও দেশে গেছে, তাই মলয়াদির গাড়ির ওপরই ভরসা করে ছিলাম।

অর্থাৎ দু'দুটো গাড়ি আছে, কিন্তু চালকের অভাব। দোয়াত আছে, কালি নাই। আমি গাড়ি চালাতে শিখেছিলাম বটে, কিন্তু আমার ওপর কেউ ভরসা করে না। আমি ড্রাইভিং শিখেছি শুধু ড্রাইভিং জানি, একথাটা বলার জন্য, আর খুব বিপদে পড়লে যাতে হাসপাতাল পর্যন্ত যেতে পারি। কিন্তু গাড়ি চালিয়েছি খুব কম। প্রথম একটা সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি কেনার পরই ড্রাইভার রেখেছি। তখন অনেকে বলেছিল, তোমাদের এত ছোট সংসার, ড্রাইভার রাখার কী দরকার, তুমিই শিখে নাও! আমি বলেছি, না, আমি আমার বউয়ের ড্রাইভার হতে চাই না। আমার বউ যদি নিজে মার্কেটে কেনাকাটা করতে যেতে চায়, তখন আমি যদি নিয়ে না যাই, ঘোর অশান্তি হবে। আর যদি তাকে নিয়ে যাই, তাহলে আমাকে বাজারের বাইরে পেশাদারি ড্রাইভারদের মতন ঠায় বসে থাকতে হবে। ওই সময়টাতে আমি কলম হাতে নিয়ে টেবিলে বসলে ড্রাইভারের মাইনের চেয়ে বেশি রোজগার করতে পারব আশা করা যায়।

অনেক বাড়িতেই দেখেছি, ড্রাইভার নিয়ে নানা ঝামেলা হয়। ঘন ঘন ড্রাইভার বদলও করে অনেকে। আমাদের ড্রাইভার মহেন্দ্র কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের পরিবারের অন্তর্গত হয়ে গেল। তাকে স্বাতী ইচ্ছেমতন বকুনি দিতেও পারে। সে জানে, বউদি তো দাদাবাবুকেও প্রায়ই বকুনি দেয়, দাদাবাবু গায়ে মাখে না, সুতরাং সেও সব মেনে নেয়। সে রয়ে গেছে তিরিশ বছর।

তাহলে কী করা যায়? স্বাতী যা দেখতে যেতে চাইছে, তা দেরি করলে আর কিছু না দেখারই সম্ভাবনা বেশি। একেবারে গ্রামঞ্চলে, ট্রেনে যাওয়ারও সুবিধে নেই।

আমি জামা খুলে ফেলতে যাচ্ছি, এই সময় সৌমিত্র মিত্রর প্রবেশ। যে-কোনো সমস্যার কথা শুনলেই সে বলে, নো প্রবলেম। নাম ও পদবির মধ্যে দু'বার মিত্র, এ অতি দুর্লভ ব্যাপার। যার যখনই কোনো প্রয়োজন কিংবা সমস্যা দেখা দেয়, তখনই মনে পড়ে সৌমিত্রর কথা। শোনামাত্রই সৌমিত্র বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই বলে, নো প্রবলেম! এক সময় এরিক মারিয়া রেমার্কের একটি উপন্যাস, *অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট* বেশ জনপ্রিয় ছিল। সে-উপন্যাসের একটি চরিত্রের নাম কাটাসিনস্কি, তাঁর সঙ্গে সৌমিত্রর কিছুটা মিল আছে, সেও যেন এক মধুসূদন দাদা।

সৌমিত্র এসেছিল আমার কাছে চিঠি সই করাতে, সমস্যাটা শুনে যথারীতি বলল, ব্যবস্থা হয়ে যাবে, তবে শুধু ড্রাইভার দিতে পারব না। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে ড্রাইভারসমেত একটা গাড়ি এসে যাবে।

তারপর সে জিজ্ঞস করল, ধুবুলিয়া যাচ্ছে কেন? ওখানে কী আছে?

আসিফা আর বাসন্তী নামে দুটি মেয়ের কাহিনী শুনে সৌমিত্র কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল।

তারপর বলল, ওদের নিয়ে কিছু লিখবেন? নাকি কিছু সাহায্য করতে চান?

লিখব কি না তা তো জানি না। আমি তো রিপোর্টারের কাজ করি না! এমনিই দেখতে যাওয়া, স্বাতীরই বেশি কৌতূহল।

স্বাতী বলল, শুধু কৌতূহল নয়, পারলে কিছু সাহায্য করারও চেষ্টা করব।

সৌমিত্র বলল, এরকম হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কেস আছে, গ্রামবাংলায় মেয়েদের ওপর যে-রকম অত্যাচার হয়, ক'জনকে আপনি সাহায্য করতে পারবেন?

স্বাতী বলল, লক্ষ লক্ষ মেয়েদের জন্য কিছুই করতে পারব না। কিন্তু যদি একজন-দুজনের জন্যও কিছু একটা করা যায়, আমরা অনেকেই যদি একজন-দুজনের জন্য—

সদাব্যস্ত সৌমিত্র একটুক্ষণ থমকে গিয়ে বলল, দুটি মেয়েকে বাড়ির বাইরে গাছতলায় বসিয়ে রেখেছে, অবস্থাটা দেখার জন্য আমারও যেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু উপায় নেই, আমার একটা জরুরি মিটিং আছে—

বেরিয়ে যাবার আগে সৌমিত্র আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিচুগলায়

বলল, সুনীলদা, সাবধানে যাবেন, ওখানেও, মানে, বাইরে কোনও লোক গিয়ে গ্রামের মেয়েদের সাহায্য করতে চাইলে স্থানীয় লোকেরা অনেক সময় তো ভালো চোখে দেখে না। ঝঞ্ঝাট করতে পারে। ধুবুলিয়া থানার ওসিকে একটা টেলিফোন করে দেব?

না। পুলিশের সাহায্য নিতে চাই না। গ্রামের লোক যদি আপত্তি জানায়, ফিরে আসব। পুলিশ পেছনে নিয়ে গ্রামে ঢোকা আরো খারাপ।

এক ঘণ্টার মধ্যে সৌমিত্রর পাঠানো গাড়ি এসে গেল। মলয়াদি এর মধ্যে ট্যাক্সি করে পৌঁছে গেছেন। সঙ্গে তাঁর এক বান্ধবী। মলয়াদি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপিকা, আর তাঁর বান্ধবী অরুণিমা বসু একজন ব্যারিস্টার।

মলয়দি খুবই ধনী পরিবারের মেয়ে। সুন্দরী এবং বিদুষী হওয়া সত্ত্বেও সারাজীবনে বিয়েই করলেন না। এখন বোধহয় সে-বয়েস পেরিয়ে গেছে। অবশ্য বিয়ের কি সত্যি বয়েস আছে? কয়েকদিন আগে কাগজে পড়লাম, এক পঁয়ষট্টি বছরের মহিলা বিয়ে করেছেন এক বত্রিশ বছরের যুবককে। তাহলে মলয়াদির এখনও অনেক বছর চান্স আছে।

সংসারী হননি বলেই মলয়াদি সমাজসেবায় এতখানি সময় দিতে পারেন। 'নারীর অগ্রগতি' নামে প্রতিষ্ঠানটি তিনিই ধরে রেখেছেন, ওই প্রতিষ্ঠানে পঞ্চাশটি অসহায় রমণী আবাসিক হয়ে নানারকম হাতের কাজ শেখে।

অরুণিমা বসুকে আমি আগে দেখিনি। প্রথম দর্শনেই মনে পড়ল বনলতা সেনের কথা। জীবনানন্দ দাশের বনললতা সেন নামে কাব্যগ্রন্থে যে-রকম ছবি আছে, সেই মুখের সঙ্গে খুব মিল। যদিও জীবনানন্দ দাশ নাকি ওই মলাট দেখে বলেছিলেন, এ তো রাজকুমারী অমৃত কাউরের ছবি।

রাজকুমারী অমৃত কাউর কে, তা লোকে ভুলে গেছে। স্বাধীনতার পর কিছুদিন ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন এই পাঞ্জাবি মহিলা। তিনি ছিলেন খুবই রোগা, তাই লোকেরা ঠাট্টা করে বলত, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিজেরই তো স্বাস্থ্যের এই অবস্থা, তাহলে দেশের মানুষের স্বাস্থ্যের অবস্থা কী হবে, তা তো বোঝাই যাচ্ছে!

রোগা চেহারা হলেও রাজকুমারী বলে কথা। মহিলার মুখের রেখা খুবই ধারালো আর চোখদুটি টানা টানা। গায়ের রং হাতির দাঁতের মতন। এই মুখের সঙ্গে বনলতা সেনের কী সম্পর্ক, তা বলা দুষ্কর। বস্তুত, বনলতা সেনের কোনও মুখ থাকাই উচিত নয়, প্রত্যেক পাঠক আলাদভাবে কল্পনা করে নেবে। যেজন্যে আমি নীরার কবিতায় কোথাও কোনও নারীর মুখ আঁকা নিষেধ করে দিয়েছি।

অরুণিমা বসুকে দেখে বনলতা সেনের কথা মনে পড়ল, কারণ সত্যজিৎ রায়ের ছবির মতন টিকোলো নাক আর টানাটানা চোখ আর পিঠ-ছাওয়া লম্বা চুল। আজকাল সব মেয়েই তো চুল ছোট করে ছাঁটে, বিশেষত শহুরে উচ্চবর্গীয় নারীদের এমন চুল খুবই দুর্লভ।

তাহলেও এই মহিলাকে কাব্যের নায়িকা বলা যায় না। কোনও ব্যারিস্টারের সঙ্গে কি কবিতার সম্পর্ক থাকে?

মলয়াদি খোলামেলা স্বভাবের মানুষ, সে-তুলনায় অরুণিমা কম কথা বলেন। এক একজনের ঠোঁট দেখলেই আমি বুঝতে পারি, তিনি বাংলা বইটই পড়েন কি না। খুব সম্ভবত এই মহিলার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের একেবারেই চেনাশুনো নেই। ইনিও মলয়াদির সঙ্গে সমাজসেবার কাজে যুক্ত। বিবাহিতা কি না বোঝার উপায় নেই। আজকাল অনেক বিবাহিতাই সিঁথিতে সিঁদুর লাগান না। স্বাতীও সিঁদুর বাদ দিয়েছে অনেকদিন আগেই। মাঝে মাঝে আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে সিঁথিতে একটু লিপস্টিক ঘষে নেয়।

সৌমিত্রর কাছ থেকেই মোটামুটি ধুবুলিয়ার রাস্তা জেনে নিয়েছিলাম। দমদম এয়ারপোর্ট পার হতেই এক ঘণ্টা লেগে গেল।

ড্রাইভারের নাম দুলাল মণ্ডল। মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ, তার দাড়ির অপরিপাট্য দেখলে মনে হয়, সে দাড়ি কামাবার খরচ তো বাঁচায়ই কখনও কাঁচি দিয়েও দাড়ি ছাঁটে না। মজার ব্যাপার এই, তার গলার আওয়াজ মেয়েদের মতন। অমন একখানা দাড়িওয়ালা মুখে নারীকণ্ঠ।

সরকারি কাজে সৌমিত্রকে অনেক গাড়ি ভাড়া করতে হয়। তেমন কোনও গাড়ি আমাদের পক্ষে ব্যবহার করা অনুচিত। সৌমিত্র তা জানে। এ-গাড়িটা সরকারি নয়, একটি কারখানার, সেখানকার মালিক সৌমিত্রর বন্ধু, তিনি এই গাড়ি আমাদের ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন, তিনি আমার লেখাটেখা পড়েছেন, একটা চিরকুটে লিখে পাঠিয়েছেন যে, পুরো ট্যাঙ্ক পেট্রল ভরা আছে।

ড্রাইভার দুলাল ধুবিলিয়ার রাস্তা চেনে।

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। নতুন বর্ষায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হচ্ছে কোনও না কোনও সময়ে। অনেকদিন টানা গরমের পর এই বৃষ্টি শরীর জুড়িয়ে দেয়। রাস্তার ধারের গাছপালাগুলো দেখলেই বোঝা যায়, এই ধারাস্নানে তারা খুশি খুশি।

এমনিতে মনে হবে, আমরা যেন বেড়াতে বেরিয়েছি পিকনিকের মেজাজে। আসলে আমরা দেখতে যাচ্ছি দুটি দুঃখী, বিড়ম্বিত মেয়েকে।

অরুণিমা একসময় স্বাতীকে করল, আপনি যে কাগজে পড়েছেন, একটি ধর্ষিতা মেয়েকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, সে একটা গাছতলায় বসে আছে, সেটা কবেকার খবর?

স্বাতী বলল, আমি তো পড়েছি কালকের কাগজে। মেয়েটি কবে থেকে বসে আছে, তা লেখেনি।

অরুণিমা বলল, মফঃস্বলের খবর তো টাটকা হয় না। চার-পাঁচ দিনের বাসি হতে পারে। এতদিন মেয়েটি এই বৃষ্টির মধ্যে গাছতলায় বসে থাকতে পারবে?

মলয়াদি বললেন, ওদের বৃষ্টিভেজা অভ্যেস আছে।

স্বাতী বলল, মেয়েটি ওখানে থাক বা না থাক, পরিবেশটা তো অন্তত দেখা হবে। সেই বাড়ির লোকদের সঙ্গে কথা বলব।

অরুণিমা বলল, এই গ্রামের অন্য কোনও পরিবারেও মেয়েটি আশ্রয় পেতে পারে। গ্রামের সবাই কী নিষ্ঠুর হৃদয়হীন হয়, একটা মেয়ে গাছতলায় রাত কাটাচ্ছে, তাকে বাড়িতে ডেকে নিতে পারে না?

মলয়াদি বললেন, নিষ্ঠুরতার প্রশ্ন নয়। আমি তো এইরকম অনেক মেয়ের সঙ্গে কথা বলছি। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে ধর্ষণ সম্পর্কে সংস্কার। ধর্ষিতা হলেই কোনও মেয়েকে খুব নোংরা আর অপবিত্র মনে করা হয়। বাড়িতে স্থান দিলে অকল্যাণ হবে সেই বাড়ির।

অরুণিমা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আর যেসব পুরুষ ধর্ষণ করে, তারা নোংরা কিংবা অপবিত্র হয় না? তাদের কোনও শাস্তিও হয় না।

মলয়াদি বললেন, ধরা পড়লেও অনেক সময় সেইসব পুরুষদের শাস্তি হয় না, ছাড়া পেয়ে যায়। যদিবা শাস্তি হয় বাইচান্স, তাও নামমাত্র, তিন বছর জেল। তারপর আবার ড্যাং ড্যাং করে বেরিয়ে আসে।

আমি ওদের আলোচনায় যোগ দিতে চাইনি, তবু ফস্ করে বলে ফেললাম, এখন শাস্তিটা বেড়ে দশ বছর হয়েছে আমাদের দেশে।

তিন নারী একসঙ্গে তাকাল আমার দিকে।

ওদের সঙ্গে আমিই একমাত্র পুরুষ (ড্রাইভারকে বাদ দিচ্ছি, সে আলোচনায় যোগ দেয় না)। পুরুষজাতির যত দোষ, সব এখন আমার কাঁধে।

অরুণিমা জিজ্ঞেস করল, এ পর্যন্ত কারুর অতদিন জেল হয়েছে? আমি জানি, হয়নি। যদি না তার সঙ্গে মার্ডার চার্জও থাকে। সে-চার্জও প্রমাণ করা খুব শক্ত, কারণ কোনও সাক্ষী তো থাকে না।

মলয়াদি বললেন, গত মাসে একটা রেপ কেস নিয়ে কী হয়েছিল মনে আছে? বিপক্ষের উকিল প্রমাণ করে দিল যে মেয়েটি দুশ্চরিত্র, প্রায় প্রস্টিটিউট, সুতরাং লোকটি কোনও দোষ করেনি। উকিলরা অনেক রকম মিথ্যেকে সত্যি করে দিতে পারে। তব ধরে নিচ্ছি, মেয়েটি যদি প্রস্টিটিউটও হয়, তবু তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করা তো ধর্ষণই। সেটা অপরাধ নয়?

অরুণিমা বলল, উকিল-ব্যারিস্টাররা মক্কেলকে ছাড়াবার জন্য অনেক মিথ্যেকেও সত্যি করে দেয়, ঠিকই। আবার এমনও কেউ কেউ আছে, যারা এই ধরনের গিল্টি মক্কেলদের কেস ছোঁয়াই না।

মলয়াদি বললেন, তুমি এ-ধরনের কেস নাও না আমি জানি।

অরুণিমা বলল, শুধু আমার কথা বলছি না। আমার সিনিয়রদের মধ্যেও এখন

অনেকে আছেন... তুমি যে-কেসটার কথা বলছ, তাতে লোয়ার কোর্টে লোকটা ছাড়া পেয়ে গেলেও হাইকোর্টে সে শাস্তি পেয়েছে।

স্বাতী বলল, রেপ করার পরেও ওরা মেয়েটিকে গলা টিপে খুন করে কেন?

মলয়াদি বলল, তার কারণ, পরে যাতে মেয়েটি ওই রেপিস্টকে চিনিয়ে দিতে না পারে। আর যাতে কেউ তাকে আইডেনটিফাই করতে না পারে।

অরুণিমা বলল, এক হিসেবে মেয়েটি মরে গিয়ে বেঁচে যায়। নইলে বাকি জীবনটা তাকে ওই কলঙ্ক মাথায় নিয়ে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়! এই তো যে-মেয়েটিকে আমরা দেখতে যাচ্ছি, তার কী অবস্থা! এর থেকে মৃত্যুও ভালো নয়?

মলয়াদি বললেন, না! বেঁচে থাকাটাই বড় কথা। নোংরা পরিবেশ থেকে দূরে চলে গিয়েও সুস্থভাবে বাঁচা যায়। দেখো, আমরা যে সেখানে যাচ্ছি, তা কিন্তু নিছক কৌতূহল মেটাতে নয়। স্বাতীর কাছে ঘটনাটা শুনেই আমি মন ঠিক করে ফেলেছি। ওই বাসন্তী নামের মেয়েটিকে তার বাড়ির লোক না চায় না নিল! আমি ওকে সঙ্গে নিয়ে আসব। আমাদের সঙ্গে নিলে, হাতের কাজ শিখে ও একটা নতুন জীবন পাবে। আমাদের ওখানে তিনটি রেপ ভিকটিম আছে, তাদের সঙ্গেও সবাই সহজ ব্যবহার করে।

অরুণিমা বলল, আমিও ঠিক করে এসেছি, মেয়েটিকে যদি তোমরা পুনর্বাসন দিতে পারে, আমি স্পন্সর জোগাড় করে দেব। সে ওর খাওয়া-থাকার সব খরচ দেবে।

মলয়াদি বলেনে, যে-মেয়েটি চর্মরোগ হয়েছে বলে তার স্বামী তাকে ফেরত দিয়ে গেছে, তাকেও অফার দেব। সেও যদি আসতে চায়, নিয়ে আসব কলকাতায়। আমাদের সমিতিতে যত এইসব মেয়েদের সংখ্যা বাড়বে, ততই বাড়িটা বড় করারও উৎসাহ আসবে। পাশে খানিকটা জমি আছে। সে-জমির মালিককে আমরা চাপ দিচ্ছি, জমিটা দান করার জন্য। শেষ পর্যন্ত হয়ত হাফ দাম দিতে হবে।

রানাঘাটের কাছে একটা পাঞ্জাবিদের ধাবায় থেমে গরম গরম রুটি-মাংস খেয়ে নেওয়া হল। সেখানে কেউ কেউ বিয়ার পান করছিল, আমি এক বোতলের ইচ্ছা প্রকাশ করতেই তিন নারী একসঙ্গে ধমক দিল আমাকে। গ্রামের মধ্যে সমাজসেবার কাজে গেলে ওসব নাকি একেবারে চলে না। অথচ ওরা তো দিব্যি লিপস্টিক মেখে আর ভুরু এঁকে গ্রামে যাচ্ছে।

ধুবুলিয়া পেরিয়ে রুকুনপুর গ্রাম আগে পড়ল।

মুসলমানপ্রধান গ্রাম, ঢোকার মুখেই একটা মসজিদ, আর একটু দূরেই পাশাপাশি দুটি মাজার। কয়েকখানা পাকা বাড়ির দেওয়ালে কলেরা নিবারণ, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও আর্সেনিক দূষণ বিষয়ে বড় পোস্টার।

আর্সেনিক দূষণ নিশ্চয়ই নতুন কিছু নয়, বহুকাল ধরেই ভূগর্ভে এই বিষ মিশে

আছে জলে। আর্সেনিক মারাত্মক বিষ, কিন্তু জলের সঙ্গে মিশে থাকে বলে তাতে মানুষ মরে না, শরীরের নানান জায়গায় ঘা হতে পারে। আগেও নিশ্চয়ই এমন হতো, লোকে নিয়তি বলে ধরে নিত। এখন তা নিয়ে হইচই হয়। আগে লোকে বাধ্য হয়েই পুকুরের জল খেত, হঠাৎ এক সময় সরকারের খেয়াল হল যে পুকুরের জল নিরাপদ নয়, নানারকম পেটের রোগ আর কলেরা হতে পারে। তাই গ্রামে গ্রামে টিউবওয়েল বসাবার অভিযান শুরু হল। পুকুরের জল একেবারে নির্মল। যেসব গ্রামে টিউবওয়েল বসেছে, সেসব গ্রামে কলেরার উপদ্রব কমে গেছে। হায় রে, গ্রামের মানুষের বিপদ শুধু একদিক দিয়ে আসে? এখন জানা যাচ্ছে টিউবওয়েলের জলেই আর্সেনিক থাকে, পুকরের জল বা সারফেস ওয়াটার সেদিক থেকে অনেকটা আর্সেনিকমুক্ত!

দুপুর হয়ে গেছে, গ্রামের রাস্তা অনেকটা সুনশান। আমাদের গাড়ি দেখে কয়েকটা কুকুর পাশে পাশে ছুটতে লাগল।

এখানে কীভাবে আমরা স্বামী-পরিত্যক্তা আসিফা নামের মেয়েটির খোঁজ করব? বাড়ি-বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেস করা যায় না।

এখন আমার মনে হল, খবরের কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতাটির নাম জেনে আসা উচিত ছিল। তাকে সঙ্গে নিয়ে এলে সুবিধে হতো।

এক জায়গায় গাছতলায় বসে তাস খেলছে কয়েকজন। আর কয়েকজন পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে। দর্শকদের মধ্যেই একজন চেঁচিয়ে বলল, আরে আরে, রং মারো, রং মারো!

গাড়িটা থামতে বলে, আমি একলা হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালাম খেলুড়েদের পাশে। কেউ কোনও কৌতূহল দেখালও না।

একটু পরে আমি দর্শকদের মধ্যে একজনকে বেছে নিলাম। লুঙ্গি ও নীল গেঞ্জি পরা, রোগা-হ্যাংলা, মুখে সবজান্তার ভাব আছে।

তার কাঁধ ছুঁয়ে বললাম, ভাই, তোমার সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে পারি?

সে ঘুরে তাকিয়ে বলল, রিপোর্টার?

আমি কয়েক পা সরে এসে পকেট থেকে বার করলাম সিগারেটের প্যাকেট। তার দিকে বাড়াতেই সে প্রথমে একটা, তারপর আরও একটা নিল। দ্বিতীয়টা গুঁজে রাখল কানে।

তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রিপোর্টাররা এখানে আসছে বুঝি খুব?

সে বলল, রোজ। গণ্ডায়, গণ্ডায়।

তারা কী জানতে আসে?

আপনারা যেজন্য এসেছেন। আর্সেনিক। এমনভাবে কথা বলে, যেন এখানে আর্সেনিকের মহামারী লেগেছে। মানুষ তো কেউ মরেনি।

তোমার নাম কী ভাই?

দায়ুদ খান। আপনারা আসিফা বিবির সাথে কথা বলতে চান তো? হবে না।

কী হবে না?

জনে জনে এসে তার সাথে কথা বলতে চায়। শোনেন স্যার, ওই ইনসান শ্যাখ হারামজাদা একদিন চুপি চুপি এসে বউরে এখানে ফেলায়ে রেখে পালায়ে গেছে। কিন্তু আসিফা বিবির বাপ-মায়ে তো তারে ত্যাগ করে নাই। আসিফার বাপ তাজুদ্দিন ইস্কুল মাস্টার, তিনি মেয়েকে মাথায় করে রাখবেন। আসিফা বিবি এখন আর বাইরের লোকের সাথে কথা কইতে রাজি নয়।

ঠিক আছে। তাহলে আসিফা এখন ভালো আছে।

জি। কোনও অসুবিধা নাই।

আচ্ছা ভাই দায়ুদ, চর কাষ্ঠশালী গ্রামটা এখান থেকে কতদূরে?

বেশি দূরে না। সেখানে বুঝি আপনারা বাসন্তীর সাথে দেখা করতে চান! কোনও লাভ নাই। অনেক রিপোর্টার ছুটেছে। কিন্তু গাছতলা ফাঁকা। বাসন্তী নাই সেখানে।

তাহলে সে কোথায়? কোনও অড়িতে আশ্রয় পেয়েছে?

না।

তার নিজের বাড়ির লোক মেনে নিয়েছে?

না।

তাহলে সে কোথায় আছে?

আছে এক জায়গায়।

সত্যি করে বলো তো দায়ুদ, সে বেঁচে আছে?

দায়ুদ এবার হাসল। ঝিলিক দিল চোখে। তারপর বলল, বেঁচে থাকবে না কেন? মেয়েমানুষের কড়া জান। সহজে যায় না।

তাহলে সে আছে কোথায়?

খানিকটা রহস্য করে সে বলল, আছে!

তার সঙ্গে কথা বলা যাবে না?

মনে হয় না। কী জানি।

আমি তার হাত ধরে বললাম, ভাই দায়ুদ, আমরা তবু একবার ওই গ্রামে যেতে চাই। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে? তোমাকে আবার নামিয়ে দিয়ে যাব।

দায়ুদ বলল, চলেন, আমার আপত্তি নাই। গাড়িতে একটু হওয়া খেয়ে আসব। আর একটা সিগ্রেট দ্যান স্যার।

২৩



গ্রামের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা। আমার বাল্যস্মৃতিতে সব গ্রামের রাস্তাই কাঁচা, বর্ষাকালে প্যাচপেচে কাদা হয়। এখানে দেখছি পিচ-বাঁধানো, কোথাও কোথাও গর্ত আর খোঁদল থাকলেও পাকা রাস্তাই বলা উচিত।

গ্রামের এইটুকু উন্নতি হয়েছে ঠিকই।

একদিককার বাড়িগুলোতে টিনের চালের বদলে টালির ছাউনি। মাঝে মাঝে দেখছি একটা-দুটো দোতলা সিমেন্টের বাড়ি। আগে আমি গ্রামে মাটির দোতলা বাড়ি দেখেছি, যেগুলির নাম মাঠকোঠা, সে-রকম এক বাড়ির দোতলায় থেকেছিও একবার। এখন গ্রামে মাঠকোঠা আর দেখা যায় না। তার বদলে ইট-সিমেন্ট এসেছে। এসব কোনও বাড়িই পুরোনা নয়। তাতে কি বোঝা যায়, গ্রামগুলো আগের থেকে সমৃদ্ধ হয়েছে? তাহলে এখনও কেন অনাহারে মৃত্যুর কথা শোনা যায়? কেন এত মেয়ে পাচার হয়।

কিছু কিছু লোকের হাতে টাকা-পয়সা এসেছে ঠিকই। চাষবাসের অবস্থাও ভালো। কিন্তু তাতে ভূমিহীন কৃষকদের কী লাভ?

এক জায়গায় এক ব্যক্তি হাত তুলে আমাদের গাড়িটা থামাল।

বেশ বড়সড় চেহারা, চেক লুঙ্গি ও সাদা ফতুয়া পরা, মাথায় ছাতা। মুখে দাড়ির বহর দেখলে মোল্লা বনে মনে হয়।

দায়ুদ লোকটিকে সেলাম জানাল লোকটি কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, এ-গাড়ি কার? কোথায় যায়?

দায়ুদ বলল, এনারা চর কাষ্ঠশালী যেতে চান। রাস্তা জানেন না, তা আমি দেখায়ে দিচ্ছি!

তিনি আবার বললেন, চর কাষ্ঠশালীতে যাবে কেন? কী দরকার?

দায়ুদ বুদ্ধি করে আসল কথাটি গোপন করে বলল, সেখানে এনাদের চেনা মানুষ আছে।

মোল্লা সাহেব (হয়তো তিনি মোল্লা নন, ওরকম দাড়ি থাকলেই কি মোল্লা হয়?

তাঁর ব্যক্তিত্ব আছে বেশ) বললেন, চর কাষ্ঠশালীতে যাবে তো এই গ্রামের রাস্তা দিয়ে যেতে হবে কেন? তুই একেবারে ভিতরে নিয়ে এসেছিস কোন আক্কেলে? পয়সা পেয়েছিস বুঝি?

দায়ুদ চুপ করে গেল।

অরুণিমা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি পুলিশ?

লোকটি ভুরু কুঁচকে বললেন, কেন, পুলিশ হতে লাগবে কেন?

অরুণিমা বলল, পুলিশই তো হাত দেখিয়ে গাড়ি থামায়। নইলে রাস্তা দিয়ে তো যে-কেউই যেতে পারে।

লোকটি বলল, রাস্তা দিয়ে যে-কেউই যেতে পারে, বললেই হল।

অরুণিমা বলল, রাস্তা বানানো হয় তো মানুষের যাওয়া-আসারই জন্যে। আমরা গণতান্ত্রিক দেশের মানুষ, দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলাফেরা করার স্বাধীনতা সবারই আছে। আপনারও আছে, আমাদেরও আছে।

লোকটি বলল, এই গ্রামের মধ্য দিয়ে যাওয়া যাবে না। অন্য পথ দেখুন।

অরুণিমা জিজ্ঞেস করল, রাস্তাটা কি গ্রামের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে? কী গো দায়ুদ?

দায়ুদ দু'দিকে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ রাস্তা এখানেই শেষ নয়।

অরুণিমা বলল, তাহলে যেতে পারব না কেন?

লোকটি বলল, বলছি তো হবে না। এই ড্রাইভার, গাড়ি ঘুরাও!

তিনি গাড়ির গায়ে দু'ঘা চাপড় মারলেন।

অরুণিমা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তাকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম, ঠিক আছে। গাড়ি ঘুরিয়ে দিচ্ছি, অন্য রাস্তা আছে যখন।

অরুণিমা বিরক্তভাবে বলল, এর কী মানে হয়? উনি এরকম জোর করবেন কেন? ওঁর কী অধিকার আছে?

আমি ফিসফিস করে বললাম, চেপে যাও না!

অচেনা জায়গায় এসে গ্রামের মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করা তো মূর্খামি।

সরু রাস্তা, তবু অতি কষ্টে ব্যাক করে গাড়ি ঘোরাবার পর আমি লোকটিকে বলসাম, নমস্কার। ভালো থাকবেন।

কিছু দূর আসার পর দায়ুদকে জিজ্ঞেস করলাম, লোকটি কে ভাই? কোনও মোল্লা সাহেব নাকি?

দায়ুদ বলল, না। আমার এক চাচা, ইরফান আলি।

তাহলে কি পঞ্চায়েত প্রধান?

তাও না। গত নির্বাচনে হেরে গেছেন। এখানে পঞ্চায়েত প্রধান বিবি নুরুন্নেসা।

তাহলে এখন কী করেন?

তেমন কিছু না। গুড়ের ব্যবসা আছে।

এই গ্রামের সঙ্গে কি চর কাষ্ঠশালী গ্রামের রেষারেষি কিংবা ঝগড়া আছে?

না, না, সে-রকম কিছু নাই। ওই গ্রামে হাট বসে না। মানুষেরা এখানে সওদা করতে আসে।

মলয়াদি জিজ্ঞেস করলেন, এবার আমাদের কতটা ঘুরে যেতে হবে?

দায়ুদ বলল, খালপাড় দিয়ে যেতে হবে। মাইল পাঁচ-সাত বেশি ঘুরা হবে।

অরুণিমা বলল, শুধু শুধু এতটা ঘুরে যাবার কোনও মানে হয়?

আমি বললাম, একজন মহিলার কাছে ইলেকশনে হেরে গিয়ে লোকটির নিশ্চয়ই মেজাজ খাট্টা হয়ে গেছে। বাইরের লোকের কাছে ক্ষমতা দেখিয়ে ওর খানিকটা ইগো স্যাটিসফ্যাকশন হল। এইটুকুতে যদি একজন মানুষ কিছুটা আনন্দ পায় তো পাক না।

স্বাতী আমাকে একটু খোঁচা মারার জন্য বলল, বাঃ, তুমি কি সরল ব্যাখ্যা দিলে। তুমি কি সবজান্তা?

মলয়াদি আমার সমর্থনে বললেন, আহা, ও লেখক মানুষ, ও তো এসব বুঝবেই। একটা মেয়ের কাছে লোকটি হেরে গেছে, বেশ হয়েছে!

অরুণিমা বলল, নুরুন্নেসা বিবির সঙ্গে একবার দেখা করলে হতো। ওঁকে কংগ্রাচুলেশান জানাতাম।

আমি বললাম, তাতে তোমার ফিমেল ইগো স্যাটিসফায়েড হতো।

কিছুটা অতিরিক্ত পথ হলেও খালধারের রাস্তাটা দৃশ্যত মনোরম। জেলেরা মাছ ধরছে। ছোট ছোট নৌকোর পাশে ভাসছে একটা তালগাছের ডোঙা। এই ডোঙা দেখলাম অনেকদিন পর।

একজন জেলে তার জলে টেনে তোলার পর দেখল অনেকগুলো রুপোলি রঙের ছোট ছোট মাছ। পুঁটি নয়, খুব সম্ভবত চাপিলা কিংবা বাঁশপাতা। এই মাছও খুব দুর্লভ, কলকাতার বাজারে পাওয়া যায় না।

খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, গাড়ি থামিয়ে কিছু মাছ কিনে নিতে।

ইচ্ছেটা দমন করতে হল। নইলে বকুনি খেতে হতো স্বাতীর কাছে। ও অত মাছের ভক্ত নয়, সবরকম মাছ খায়ও না। টিপিক্যাল ঘটি। আমার টাটকা মাছ দেখলেই কিনতে ইচ্ছে করে। অবশ্য কলকাতায় ফিরে রাত হবে। ততক্ষণে এই মাছ আর টাটকা থাকবে না।

চর কাষ্ঠশালী গ্রামটিতে ঢোকার মুখেই একটা বড় বটগাছ-তলায় পুরোনো শিবমন্দির।

এরকম মন্দির বা মসজিদ দেখলেই গ্রামটির মোটামুটি পরিচয় বোঝা যায়। মন্দির বানানো হতো এই উদ্দেশ্যে যে, মন্দিরের দেবতা এই গ্রামের মানুষের রক্ষা করবেন।

তবু গ্রামে দুর্ভিক্ষ হয়, মড়ক হয়। মন্দিরের দেবতা একটি নির্দোষ, নির্যাতিত মেয়েকে রক্ষা করতে পারেন না।

গ্রামের লোকদেরও ঠাকুর-দেবতা সম্পর্কে ভক্তি-শ্রদ্ধা খানিকটা কমে গেছে মনে হয়। মন্দিরটার দেয়ালে চলটা-ওঠা, ওপরের দিকে বটগাছের শিকড় ফাটল ধরিয়েছে। শিবের মাথায় রোজ জল চড়ে কি না তাই বা কে জানে, বেচারি শিবঠাকুরকে বোধহয় প্রায়ই তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকতে হয়।

এই তুলনায় আগে গ্রামের মসজিদটির রক্ষণাবেক্ষণ ভালো। নতুন রং করা হয়েছে।

খালের ধারেই শ্মশান, সেখানেও একটি ছোট কালীমন্দির। শ্মশানে কোনও চুল্লি এখন জ্বলছে না, মন্দিরের পাশে একটা খাটিয়ায় বসে দুই ব্যক্তি খুব তৃপ্তির সঙ্গে গাঁজা কলকেতে টান নিচ্ছে, আর তাদের সামনেই একটা কুকুর এমন উৎসুকভাবে চেয়ে আছে, যেন সে-ও গাঁজার ভাগ চায়।

রাস্তাটা গ্রামের মধ্যে ঢুকে এসেছে, এখানে আমাদের কেউ বাধা দিল না।

একটা মাটির বাড়ির সামনে দায়ুদের নির্দেশে গাড়ি থামল।

তারপরই সে বলল, এই তো দ্যাখলেন বাড়ি, এবার আমি যাই?

আমি বললাম, সে কী! এখনই যাবে কেন? আমরা তো তোমাকে তোমাদের গ্রামে ফের পৌঁছে দেবও বলেছি। শুধু শুধু হাঁটবে কেন এতটা।

দায়ুদ বলল, এখন ফিরব না। আসলামই যখন, এই গ্রামে আমার এক দোস্ত আছে, তার সঙ্গে দেখা করে যাব!

আমি বললাম, দাঁড়াও এত ব্যস্ত হবার কী আছে?

মাটির বাড়ির পাশের একটা জায়গা মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ভেতরে ঘোয়ালঘর আছে মনে হয়। সে-রকম একটা গন্ধ নাকে আসে।

উল্টোদিকে একটা ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছ। খবরের কাগজের রিপোর্টে বোধহয় অন্য গাছের কথা লিখেছিল। সেই গাছতলাটা এখন ফাঁকা।

দায়ুদকে জিজ্ঞেস করলাম, বাসন্তী নামের মেয়েটি এই গাছতলায় বসেছিল? বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেয়নি।

জী।

ক'দিন বসেছিল?

চাইর দিন'

রাত্তিরে ছিল?

রাইতে আবার কোথায় যাবে? পরনে শুধু একটা ছেঁড়া শাড়ি। তখনো তার রক্তস্রাব হতিছে। আর কুঁই কুঁই করে কান্দে।

তুমি দেখতে এসেছিলে?

জী।

এই চারদিন সে কিছুই খায়নি?

কেউ তো তারে খাবার দেবে না। তারে গ্রাম-ছাড়া করতে চায়। খাবার পাইলে সে যাবে কেন?

তারপর সে কোথায় গেল?

গেছে কোথাও!

সে মরেনি, বেঁচেই আছে?

জী।

তুমি জানো সে-কথা, কিন্তু কোথায় গেছে, জানো না?

দায়ুদ চুপ করে গেল।

অরুণিমা বলল, জানে, ও ঠিকই জানে।

মলয়াদি বললেন, আমি এ-বাড়ির লোকদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

অরুণিমাও নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

দরজার বাইরে কড়া আছে। মলয়াদি সেই কড়া নাড়তেই সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল। যেন কেউ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল আমাদের।

দেখতে পেলাম, এক মাঝবয়েসি মহিলা আমাদের দু'জনকে নিয়ে গেল ভেতরে।

স্বাতীকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি গেলে না? তোমারই তো কৌতূহল বেশি ছিল।

স্বাতী বলল, আমি মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। সে তো এখানে নেই বোঝাই যাচ্ছে। মলয়াদিরা সোশ্যাল ওয়ার্ক করেন, বাড়ির লোকদের সঙ্গে ওঁরাই কথা বলতে পারবেন।

একটু থেমে সে আবার বলল, একটা অসুস্থ মেয়েকে চারদিন ধরে গ্রামের একটা মানুষও কিছু খেতে দিল না। মানুষ এত অমানুষ হয় কী করে? লোকে তো কুকুর-বিড়ালকেও খেতে দেয়।

দায়ুদ বলল, চাইরদিন পর একজন দিয়েছিল।

তাই নাকি? কে? এই গ্রামের কেউ?

না। সিদ্ধেশ্বরী।

সিদ্ধেশ্বরী? সে কে?

সবাই তো তাকে সিদ্ধেশ্বরীই বলে।

সে অন্য গ্রামে থাকে?

উঁ, হ্যাঁ, সে থাকে কুটকুটিয়ায়।

কুটকুটিয়া কোনও গ্রামের নাম?

আসলে ঘোষবাবুর হাটতলা। তার পাশের জায়গাটাকে লোকে বলে কুটকুটিয়া। সিদ্ধেশ্বরী এসেছিল আরো দুই-তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে। তার চোপাকে সবাই ভয়

করে। আমি দেখি নাই, শুনেছি, সবাই শুনেছে, সিদ্ধেশ্বরী দপদপিয়ে এসে বাসন্তীর ধার বসল। তাকে কলা আর পাটালি গুড় খাওয়াল। তারপর বাসন্তীকে জিজ্ঞাসা করল, তুই আমার সঙ্গে যেতে পারবি? বাসন্তী তার সঙ্গে চলে গেল।

স্বাতী বলল, এই মহিলাকে তো দারুণ মনে হচ্ছে। ওঁর সঙ্গেই তো আমাদের দেখা করা উচিত।

আমি দায়ুদকে জিজ্ঞেস করলাম, কুটকুটিয়া কোথায় তুমি নিশ্চয়ই জানো। বাসন্তী সেখানে আছে, তুমি সে-কথা আমাকে বলেছিল না কেন?

স্যার, আমার কথা ছিল এই বাড়িটা দেখিয়ে দেওয়ার। আমি আর যাব না। আরেকটা সিগ্রেট দেবেন?

তোমাকে পুরো প্যাকেটটাই দিতে পারি, আমার কাছে আরো আছে। তোমাকে যদি পঞ্চাশটি টাকা দিতে চাই, চা-বিস্কুট খাওয়ার জন্যে, তুমি কিছু মনে করবে? নেবে?

তা নিতে পারি। কিন্তু আমি কুটকুটিয়ায় যাব না।

কেন?

গ্রামের মানুষ আমাকে দোষ দেবে।

তুমি বিয়ে করছ, দায়ুদ?

জী।

ক'টি ছেলেমেয়ে?

দুইটা।

বেশ। তুমি কোনও কাজ করো?

রেডিও সারাই।

বাঃ, সেটা তো ভালো কাজ। স্বাধীন ব্যবসা? তুমি...

শোনেন স্যার। আপনি যতই বলেন, আমি কিন্তু আপনাদের কুটকুটিয়া নিয়ে যেতে পারব না।

তুমি কেন যেতে পারবে না, বুঝেছি। যেতে হবে না। তুমি আমাদের ড্রাইভারকে রাস্তাটা বুঝিয়ে দাও, আমরা জিজ্ঞেস করতে করতে চলে যাব।

স্বাতী আমাকে জিজ্ঞেস করল, ওই সিদ্ধেশ্বরী নামে মহিলার কোনও আশ্রম আছে? সেখানে বাসন্তীকে নিয়ে গেছে?

আমি বললাম, আশ্রম? তা আশ্রমও বলতে পারো।

মলয়াদি আর অরুণিমা সেই মাটির বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলেন।

মলয়াদি বললেন, উঃ টাফ কাস্টোমার। কিছুতেই মুখ খুলল না।

অরুণিমা বলল, আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি। মাদুর পেতে বসতেও দিল, কিন্তু বাসন্তী সম্পর্কে কোনও কথাই শুনবে না, নামটাও উচ্চারণ করবে না। এখন বাড়িতে পুরুষমানুষ নেই, সবাই মহিলা। কিন্তু সবাই এক জোট। ওদের বাড়ি

থেকে বাসন্তীকে মুছে দেওয়া হয়েছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওই মহিলাদের মধ্যে কি বাসন্তীর মা-ও ছিল?

হ্যাঁ, ছিল।

মা হয়েও তিনি মেয়েকে আশ্রয় দিলেন না? তাহলেই দেখছ, মেয়েরা কত নিষ্ঠুর হয়।

অরুণিমা বলল, এসব তো পুরুষদের বানানো নিয়ম-কানুন! মেয়েরা তা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

মলয়াদি বললেন, বাসন্তীর একটা ছোট বোন আছে। লতা। যতদূর বুঝলাম, বাসন্তীকে এ-বাড়িতে ঠাঁই দিলে লতার আর বিয়ে হবে না, সেটাই ওদের আসল ভয়।

অরুণিমা বলল, আশ্চর্য ব্যাপার। একটা মেয়ে দোষ করল, তার জন্যে অন্য মেয়েটির বিয়ে হবে না কেন?

আমি বললাম, দোষ করেছে মানে? তাকে যদি কয়েকজন জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে, তাহলে সেটা মেয়েটা দোষ?

অরুণিমা কথাটা বলে ফেলে লজ্জায় পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি শোধরাবার জন্যে বলল, না, মেয়েটির দোষ নয়। সবটাই সামাজিক সিস্টেমের দোষ!

আমি ওদের সিদ্ধেশ্বরী-উপাখ্যানটা শোনালাম।

মলয়াদি দারুণ উৎসাহের সঙ্গে বলেলেন, এ তো দারুণ ব্যাপার। এক্ষুনি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। যদি ফেরার জন্যে খুব দেরি হয়ে যায়, রাত্তিরে বহরমপুর বা কৃষ্ণনগরের কোনও হোটেলে রাত্তিরে থেকে যাব।

দায়ুদ এর মধ্যেই হাওয়া হয়ে গেছে।

ড্রাইভার দুলাল গাড়িটা ঘুরিয়ে নিতে নিতে বলল, মনে হল ঘণ্টাখানেকের পথ। এর মধ্যেই তো বিকেল হয়ে গেল।

হোক। আমরা এতদূর এসেছি যখন, বাসন্তীকে না দেখে যাব না। আসিফা নামের মেয়েটিকে তার স্বামী পরিত্যাগ করলেও সে তার বাবার কাছে আশ্রয় পেয়েছে। তবু ভালো। আসিফার হয়েছে চর্মরোগ। আর বাসন্তীর নষ্ট হয়েছে ধর্ম। চর্মরোগের চেয়েও ধর্মরোগ আরও মারাত্মক।

অরুণিমা বলল, এরকম একেবারে ভেতর দিকের গ্রামে আগে কখনও আসিনি। এদের সঙ্গে আমাদের জীবনের কত তফাত। অথচ আমরা একই দেশের মানুষ।

মলয়াদি বললেন, এইসব গ্রামের মানুষদের আধুনিক জীবনে তুলে-আনা প্রায় একটা হারকিউলিয়ান টাস্ক বলা যেতে পারে। কবে যে সেটা সম্ভব হবে, কে জানে?

অরুণিমা বলল, প্রথমেই দরকার কুসংস্কারগুলো দূর করা।

স্বাতী বলল, তার আগে দুবেলা খাওয়া ব্যবস্থা আর অসুখে চিকিৎসার বন্দোবস্তও করতে হবে।

মলয়াদি বললেন, আগে-পরে নয়। সব একসঙ্গে। প্রত্যেকটা সমস্যার সঙ্গে অন্য সমস্যারও সম্পর্ক আছে।

স্বাতী বলল, দ্যাখো, কচুরি-ফুলগুলো কী সুন্দর!

আমার হাসি পেয়ে গেল। গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা করতে করতে হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার ক্ষমতা শুধু মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব।

রাস্তার এক পাশের জলাভূমিতে ফুটে আছে অনেক কচুরি-ফুল। ফুলগুলো দেখতে বেশ ভালো লাগলেও এই ফুলের জন্যেই একসময় ম্যালেরিয়া ছড়িয়েছে গ্রাম-বাংলায়।

আমার মনে পড়ে গেল একটা গান। বাচ্চা বয়েসে ব্রতচারী সঙ্ঘে এই গান লিখেছিলাম।

আমি গানটা গেয়ে উঠলাম :

চল, আয় কচুরি নাশি।
এই রাক্ষুসী যে বাংলাদেশের দিচ্ছে গলায় ফাঁসি।

বাকিটা মনে নেই। তখনও দেশ ভাগ হয়নি। এই গানের বাংলাদেশ হচ্ছে আবহমান কালের বাংলা।

সঙ্গের মহিলারা এই গান শোনেনি। আমাকে বাকিটা গাইতে বললেও আমি এই দু-লাইনই আবার শোনালাম।

তারপর বললাম, ব্রতচারীর আরেকটা গান শুনবে? অনেকটা মনে আছে :

আমার ঠাকুরের নাই কোনও আচার
ও গো সে নাই কোনও ধাম
নাই কো জাত বিচার
কেউ বলে আল্লা হো আকবর
কেউ বলে বনমালী, শ্যাম, নটবর
আবার যীশু নামে বেথলেমেতে
হল গো প্রচার
আমার ঠাকুরের নাই কোনও আচার...

এই গানটা সমস্ত ইস্কুল আর মাদ্রাসার ছেলেমেয়েদের শেখানো উচিত নয়?

দুলাল বলল, কী যে বলেন স্যার। ওসব এখন কেউ মানে না।

মলয়াদি বললেন, জনপ্রিয় গায়করা তো এখন অনেক পুরনো গানের রি-মেক করে। এইসব গানও রি-মেক করলেই পারে। লোকে শুনবে!

ঘোষবাবুর হাটতলায় পৌঁছোতে পৌঁছোতে প্রায় সন্ধে হয়ে গেল।

আজ হাটবার নয়, তাই একেবারে শুনশান। একটিমাত্র চায়ের দোকান খোলা। আমাদেরও বিকেলের চা-পান হয়নি।

গাড়িতে বসেই ছোট ছোট কাচের গেলাসে চা-পান করা হল। তারপর একজনকে

জিজ্ঞেস করলাম, কুটকুটিয়া কোথায়?

সে হাত দিয়ে একটা দিক দেখিয়ে দিল। এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে কয়েকটা কুঁড়েঘর। জমিটা সেখানে কিছুটা ঢালু হয়ে গেছে।

কুঁড়েঘরগুলো দুদিকে সার দেওয়া, মাঝখানে একটা সরু পথ। একেবারে ঢোকার মুখে একটা বাঁশের মাচায় বসে আছে দুজন পুরুষ।

তিন মহিলাই তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেল গলির দিকে। আমি বসেই রইলাম গাড়িতে।

জানতাম কী হবে। মহিলাদের সঙ্গে ওখানকার পুরুষদের কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেছে। ওরা এই মহিলাদের ভেতরে যেতে দেবে না।

স্বাতী যাকে বলেছে আশ্রম, সেটা এক ধরনের অনাথ আশ্রম হলেও সেখানে মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ।

একটু বাদে অরুণিমা ফিরে এসে আমার প্রতিই অভিযোগের ভঙ্গিতে বলল, এ কী অন্যায়? ওই লোকগুলো আমাদের কিছুতেই ভেতরে যেতে দেবে না বলছে। বাসন্তী ওখানে আছে কি না, তাও বলছে না। এ কী মগের মুলুক। পুলিশে খবর দিলে হয় না?

আমি বললাম, পুলিশে খবর দিলে পুলিশরা হাসবে।

কেন?

পুলিশদের মাঝে মাঝে হাসতে ইচ্ছে করে না?

এগিয়ে গিয়ে মলয়াদি আর স্বাতীকে বললামে, তোমরা গাড়ির কাছে যাও। গাড়িটাকে একটু দূরে সরিয়ে রাখতে বলো।

লোকদুটির কাছে গিয়ে বললাম, কী গো দাদারা, আমি ভেতরে যাব। আগে কিছু নজরানা দিতে হবে নাকি?

একজন বলল, দ্যান দশটা টাকা, যদি ইচ্ছা হয়!

দুজনকে দুটি দশ টাকার নোট দিয়ে বললাম, বুঝতেই তো পারছ, আমি বসবার জন্য আসিনি। শুধু সিদ্ধেশ্বরীর সঙ্গে দুটো কথা বলব।

একজন বলল সিদ্ধেশ্বরী মাঙ্‌না আপনার সঙ্গে কথা বলবে কেন?

আমি বললাম, মাঙ্‌না কেন হবে? সিদ্ধেশ্বরী যা রেট এক ঘণ্টার দিয়ে দিব। তারপর আমি শুধু কথাই বলি কিংবা বসতে চাই, সেটা আমার ইচ্ছে। সিদ্ধেশ্বরীর রেট কত?

পঞ্চাশ।

ঠিক আছে। আমি একশো-ও দিতে রাজি আছি। তোমরা দাদারা আমার সঙ্গের এই মেয়েদের একটু ছেড়ে দাও না। ওরা শুধু কৌতূহল মেটাবে। আমি কথা দিচ্ছি। আমরা কোনও গোলমাল করব না।

সিদ্ধেশ্বরীকে জিজ্ঞেস করে এসো। ওকে বলবে, কলকাতা থেকে খুব নাম করা একজন লোক আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছে।

আপনার নাম কী বলব?

ওই তো মুশকিল, খুব নামকরা লোকেরও নাম শুনলে অনেকে চিনতে পারে না। তবে, এটা বলতে পারো, আমি এ-রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সেজদা। আমার কোনও খারাপ উদ্দেশ্য নেই। এই মহিলারা আমার আত্মীয়।

লোকটি দৌড়ে ফিরে এলো এক মিনিটের মধ্যে।

বলল, ঠিক আছে। চলে যান, ডান পাশের তিন নম্বর ঘর।

হাতছানি দিয়ে ডাকলাম মহিলাত্রয়কে।

কাছে এসে মলয়াদি খানিকটা ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, আমাদের আটকে দিয়েছিল, আর তোমার কথায় রাজি হল কেন?

কারণ আমি পুরুষমানুষ, আর মুখ্যমন্ত্রীর সেজদা।

স্বাতী ভ্রুভঙ্গি করে বলল, ও যেখানে-সেখানে এরকম উলটো-পালটা পরিচয় দেয়।

সদলবলে গিয়ে ঢুকলাম ডান দিকের তৃতীয় ঘরটিতে।

সে-ঘর শুধু একটি মাত্র চওড়া খাট, আর কোনও আসবাব নেই। দেয়ালে একটা ছোট আয়না।

খাটের ওপর বসে আছেন সিদ্ধেশ্বরী। বেশ বড়মাপের চেহারার রমণী, বছর পঞ্চাশেক বয়সে, মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা, লাল পাড় শাড়ি পরা, বুকে ব্লাউজ নেই, শুধু ব্রা।

মুখখানা অসুন্দর নয়, তেমন কিছু সুন্দরও নয়, কিন্তু এমন একটা ব্যক্তিত্বের তেজ আছে যে দেখলেই মনে হয়, ঠিক জায়গায় জন্মালে এ-মহিলা রাজেন্দ্রাণী হতে পারত। সব মানুষই এর কথা মান্য করতে বাধ্য।

সোজাসুজি চোখে আমাদের সবাইকে একবার দেখে নিয়ে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার?

আমি বললাম, আপনার রেট তো ঘণ্টায় পঞ্চাশ টাকা। আগে টাকাটা দিয়ে দিই?

দিন।

রাজা-রানিদের কাছে গেলে যেমন নজরানা দিতে হয়, সেই ভঙ্গিতে আমি পঞ্চাশটা টাকা ওঁর কাছে বিছানার ওপর রাখলাম।

আপনারা কাগজের লোক?

না। এমনিই দেখতে এসেছি। আমি মুখ্যমন্ত্রীর সেজদা-ওই নই, ওইরকম কিছু না বললে আপনার মাস্তানরা সবাইকে আসতে দিচ্ছিল না। আমরা এসেছি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে।

কী জন্যে?

আপনি বাসন্তীকে উদ্ধার করে এনেছেন।

সে বেটি তো মরতে বসেছিল। হারামজাদারা তাকে এক ফোঁটা জলও দেয়নি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করে, তার মত নিয়ে এখানে এনিছি। আমার নামে কেস চলবে না।

না, না, কেস হবে কেন? আমরা সে-কথা ভাবিও নি। আপনি খুব বড় কাজ করেছেন। আমি মনে করি, বাড়িতে লাথি-ঝাঁটা খাওয়ার চেয়ে কোনও মেয়ের স্বাধীনভাবে উপার্জন করা অনেক ভালো। আর বাসন্তীর তো কোনও বাড়িতেও জায়গা জুটছিল না।

এখনও ওর শরীর সারেনি। কাজ শুরু করতে দিইনি।

আমার সঙ্গের নারীরা বাস্তব জগৎ সম্পর্কে এমনই অনভিজ্ঞ যে, এখনও ঠিক বুঝতে পারেনি কোথায় এসেছে। আজকাল অনেক সিনেমাতেও তো বেশ্যালয় দেখানো হয়। তবে সেসব অনেক উচ্চাঙ্গের বেশ্যালয়, সেখানে ঘুঙুর, তানপুরা বাজে। এখানে ওসব কিছু নেই। শুধুই মাংসের কারবার। সিদ্ধেশ্বরী নিজের ব্লাউজ খোলার ঝঞ্ঝাটও রাখেনি।

মলয়াদি জিজ্ঞেস করল, এখানে কি কোনও ট্রেনিং দেওয়া হয়?

সিদ্ধেশ্বরী একটু হাসির ভাব করে বললেন, না, ওসব লাগে না। নিজে নিজেই শিখে যায়।

আমাকে এবার ইংরিজিতে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে হল।

তিন মহিলার তিন রকম প্রতিক্রিয়া হল।

মলয়াদি সবিস্ময়ে বললেন, ব্রথেল?

স্বাতী মুখ নিচু করে রইল, নিঃশব্দে।

অরুণিমা বলল, ওর মরতে আর জায়গা হবে কোথায়? কেউ নেবে না।

মলয়াদি বললেন, আমরা নিতে পারি। আমাদের একটি নারী-কল্যাণ সমিতি আছে। সেখানে আমরা অনেক অসহায় মেয়েদের রাখি, হাতের কাজের ট্রেনিং দিই, তারপর নিজেরা সৎভাবে রোজগার করতে পারি।

সিদ্ধেশ্বরী মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, আমরা বুঝি এখানে অসৎ কাজ করি? তাই না?

বালিশের তলা থেকে একটা সস্তা সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা ধরিয়ে সিদ্ধেশ্বরী বললেন, আমার মেজাজ খারাপ করে দেবেন না। ভালোয় ভালোয় সরে পড়ুন। ওসব ভাবের কথা ঢের শুনিছি। আড়কাঠিরা অনেক ভালো ভালো কথা বলে মেয়েগুলোকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যায়। তারপর বিক্কিরি করে দেয় কাঁহা কাঁহা মুলুকে। অত্যাচারের চোটে তো দু-চারটে মরেও যায়।

মলয়াদি বললেন, না, না, আমাদের রেজিস্টার্ড সোসাইটি। প্রায় তিরিশটি মেয়ে থাকে। আমাদের হাতের কাজের প্রদর্শনী উদ্বোধন করেছেন গভর্নর।

সিদ্ধেশ্বরী বলল, শোনেন দিদি, তিন-চারটে জানোয়ার মেয়েটারে খুবলে খেয়েছে। তারপর মড়া ভেবে ফেলে রেখে গেছে। কড়া জান বলেই মরেনি, ঘষটাতে ঘষটাতে গিয়েছিল নিজের বাড়িতে। সেখান থেকেও মারতে মারতে বার করে দিয়েছে। দিনের পর দিন কিছু খেতে পায়নি, তখন কোথায় ছিলেন আপনারা? তখন এই রেন্ডি সিদ্ধেশ্বরীই ওকে তুলে ধরেছিল। এখনও ওর সারা শরীরে ঘা, উঠে দাঁড়াতে পারে না। হোমিওপ্যাথি ডাক্তার এনে ওর চিকিৎসা করাচ্ছি। যতদিন না ও সুস্থ হয়, ততদিন ওর খরচ আমি দেব। তবু যদি আপনারা ওকে দিয়ে যেতে চান, আমি বাধা দেবার কে? যান, ওকে জিজ্ঞেস করুন গিয়ে।

সিদ্ধেশ্বরী গলা চড়িয়ে ডাকল, কুলসম, কুলসম।

পাশের একটি দরজা দিয়ে এসে ঢুকল একটি ছিপছিপে তরুণী।

সিদ্ধেশ্বরী বলল, কুলসম, এনাদের নিয়ে যা তো বাসন্তীর কাছে। দেখিস যেন বেশি কথা না বলে!

সে-ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা গেলাম অন্য একটি ঘরে।

মেঝেতে একটা চাটাই পাতা, তার ওপর শুয়ে আছে বাসন্তী, তার বয়েস বোধহয় ষোলো-সতেরোর বেশি নয়। রক্তশূন্য মুখ। আমাদের দেখে সেই মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল।

সে ব্যাকুলভাবে বলল, কী করে কুলসম, কী কী? আমি যাব না, আমি আর কোথাও যাব না।

খানিকটা কলাপাতার ওপর রুটি-তরকারির ভুক্তাবশিষ্ট পড়ে আছে। মাছি ভনভন করছে সেখানে।

মলয়াদি তার পাশেই হাঁটু গেড়ে বসে কোমল গলায় বললেন, তোমার কোনও ভয় নেই। আমরা তোমাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাই। সেখানে তুমি থাকার জায়গা পাবে, খাবার-টাবার...

বাসন্তী মাথা নাড়তে নাড়তে বলতে লাগল, না, না, আমি আর কোথাও যাব না।

মলয়াদি আবার বোঝাতে লাগলেন।

বাসন্তী কিছুই শুনবে না। সে বলল, সিদ্ধেশ্বরী মা-কে ছেড়ে আমি আর কোথাও যাব না। না, না, না।

আমি মলয়াদিকে বললাম, চলুন, ও যা চায়, সেটাই করতে দিন।

বেরিয়ে আসার পর দেখলাম, সিদ্ধেশ্বরী তার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

অরুণিমা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, এই মহিলার পা ছুঁয়ে আমার প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে।

আমি বললাম, সেটা বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। হাত তুলে নমস্কার করাই যথেষ্ট।



২৪

বেশ কিছুদিন দেখা হয়নি রশিদের সঙ্গে। শক্তিও গিয়ে বসে আছে শান্তিনিকেতনে, সেখানে সে এখন ভিজিটিং প্রফেসার।

শক্তির এই ব্যাপারটা যে শোনে, সে-ই বিস্ময়ে ভুরু তোলে।

শক্তি কবি হিসেবে যতটা বিখ্যাত, প্রায় ততটাই তার মদ্যপান ও বাউণ্ডুলেপনার খ্যাতি। সেই শক্তি এখন পড়াচ্ছে শান্তিনিকেতনে? তার মানে, একেবারে শান্ত-শিষ্ট হয়ে সে স্বভাব-চরিত্র একেবারে বদলে ফেলল নাকি?

শান্তিনিকেতন নামের সঙ্গেই যেন জড়িয়ে আছে শুদ্ধ সাত্ত্বিক ব্যাপার। এখানে মদ্যপানের প্রশ্নই ওঠে না, কেউ অবৈধ প্রেম করে না, সবাই মেপে মেপে কথা বলে। আসলে যে তলায় তলায় এরকম অনেক কিছু হয়, তাও অনেকেই জানে। রবীন্দ্রনাথ নিজে মদ ছুঁতেন না, কোনওদিন পান-তামাক-সিগারেট খাননি, এইসব ব্যাপারে তিনি ঠাকুর পরিবারের অন্য অনেকের থেকে আলাদা। তিনি জন্মরোমান্টিক, অনেক মেয়ের সঙ্গেই তার মধুর সম্পর্ক ছিল কিন্তু কখনও তিনি শালীনতার গণ্ডি অতিক্রম করেননি। অন্তত সে-রকম কোনও প্রমাণ কোথাও নেই। সেইজন্য শরৎচন্দ্র মজা করে বলেছিলেন, আমরা অনেক কিছু করেছি, ধরাও পড়ে গেছি। কিন্তু গুরুদেব ধরাটি পড়লেন না।

রবীন্দ্রনাথের বড় ছেলে রথীন্দ্রনাথ অবশ্য এই শান্তিনিকেতনেই পরকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেই বিবাহিতা বান্ধবীকে নিয়ে তিনি বিশ্বভারতী পরিত্যাগ করতেও বাধ্য হন।

শান্তিনিকেতনের রক্ষণশীলতা এখন অনেকটা বদলেছে। উপচার্যরা আসেন বাইরে থেকে। সেই সময় উপাচার্য ইতিহাসবিদ সব্যসাচী ভট্টাচার্য, তিনি বেশ মুক্তমনা মানুষ, তিনি মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে বিদেশ থেকে অনেক পণ্ডিত ও লেখকরা আসেন, কিন্তু জীবিত বাঙালি কবিদেরও যুক্ত করা হবে না কেন?

রিটায়ার করার আগে তিনি সুপারিশ করে গেলেন, শক্তিকে ও আমাকে অন্তত দু'মাসের জন্য শান্তিনিকেতনে পড়াবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হোক। সেই অনুযায়ী

চিঠি এল আমাদের কাছে।

আমাদের সুবিধেমতন বছরের যে-কোনও সময়েই আমরা যোগ দিতে পারি। শক্তি আগেই যোগ দিয়ে আমাকে বলল, তুমি এখন এসো না। আমার টার্ম শেষ হলে, তারপর তুমি এসো।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন, আমরা দু'জনে একসঙ্গে থাকলেই তো বেশ মজা হবে।

শক্তি গম্ভীরভাবে বলেছিল, জানো না, এক জঙ্গলে বাঘ আর সিংহ একসঙ্গে থাকতে পারে না?

আমি হেসে ফেলেছিলাম, কে বাঘ, আর কে সিংহ? আমার অবশ্য কোনওটিতেই দাবি নেইৠ

শক্তি বেশ ভালোই চালাচ্ছে, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়, আর কেনওরকম উচ্ছৃঙ্খলতার অভিযোগও তার নামে ওঠেনি।

আমি নিজের কুটিরে থাকার জন্য মাঝে মাঝেই ওখানে যাই, তাই শক্তির সঙ্গে দেখা হয়। রশিদ কী একটা সরকারি কাজে বেশ কিছুদিন ধরে রয়ে গেছে জলপাইগুড়িতে। ফোনও করে না, তার কোনও সাড়াশব্দও নেই।

একদিন রশিদের স্ত্রী ফোন করল আমাকে।

হ্যাঁ, আমাকেই।

নাসিমের সঙ্গে স্বাতীর খুব ভাব। প্রায়ই ওরা টেলিফোন গল্প করে অনেকক্ষণ। নাসিম একটা স্কুলে পড়ায়, মাঝে মাঝে চলে আসে আমাদের বাড়িতে। কোনও কোনও দিন দুপুরে আমাদের সঙ্গে খেতে বসে যায়।

বিহারের এক খানদানি মুসলমান পরিবারে জন্ম নাসিমের। বাংলা ভালোই শিখে নিয়েছে, আর আমাদের বাড়িতে ডাঁটা চচ্চড়ি আর মাছের ঝোল খেতেও ও বেশ ভালোবাসে।

নাসিমের অল্পবয়েসের আঁকা কিছু ছবি আমি দেখেছি। বড় শিল্পী হবার সম্ভাবনা ওর মধ্যে ছিল। কিন্তু বিয়ের পর আঁকা একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। রশিদের মতন এক দুর্দান্ত প্রকৃতির স্বামীকে সামলাবার পর বোধহয় আর নিজের কোনও শখ বজায় রাখা যায় না।

সেই নাসিম আমাকে ফোন করাবে কেন? আমার সঙ্গে তো ওর ভাব নেই। ভাব নেই মানে, ঝগড়াও নেই।

নাসিম খুবই রূপসী, গায়ের রং যাকে বালে দুধে-আলতায়। স্বভাবটি খুবই শান্ত ধরনের। কখনও গলা চড়ায় না। এত বছরের বিবাহিত জীবনে স্বামীর সঙ্গে কখনও কি ঝগড়া হয়নি? তখনও গলা চড়ে কি না জানা যায় না। আমাদের কাছে মাঝে মাঝে রশিদের নামে অভিযোগ করে, তাও খুব মিনমিনে গলায়, দেখো না, ও আমাকে

কখনও বাইরে বেড়াতে নিয়ে যায় না। কিংবা, রশিদ আমাকে কোনওদিন একটাও শাড়ি কিনে দেয়নি।

রশিদ অবশ্য অন্যদের সামনেই স্ত্রীকে বেশ জোরে ধমক দেয়। নাসিমের অভিযোগের উত্তরে বলে, রুপিয়া দিয়া, তুম শাড়ি কিন লেও, যিতনা মর্জি, আমাকে কেন কিনতে হবে?

এক এক সময় নাসিমের প্রতি রশিদের ভাষা আরো কর্কশ হলে আমরাই রশিদকে ধমকাই। আমাদের বউদের সঙ্গে ওরকম ভাষায় কথা বলার সাহসই আমাদের নেই।

তা শুনে রশিদ সগর্বে বলে, তোমাদের কথা ছাড়ো। হিন্দুরা ডরপুক। খাঁটি মুসলমান কখনও হেন-পেক্‌ড হয় না। বউদের সবসময় তাঁবে রাখতে হয়।

নাসিম সবসময় শান্ত ও মৃদুস্বরে কথা বললেও মাঝে মাঝে কুটুস কুটুস করে রসিকতা করতে পারে।

রশিদ যখন আমার গল্প নিয়ে সিনেমা করার জন্য খেপে উঠেছিল, তখন নায়িকা নির্বাচন করেছিল শাবানা আজমীকে। স্বাতী বলেছিল, রশিদ, তোমার স্ত্রী এত সুন্দরী, তাকেই নায়িকা করছ না কেন?

রশিদ কিছু উত্তর দেবার আগেই নাসিম বলেছিল, আমায় নেবে না, আমার গায়ের রং যে ফর্সা। শাবানা কালো। রশিদের কালো মেয়ে পছন্দ।

রশিদের সঙ্গে স্বাতীর বেশ ভাব আছে। অনেক সময় ঝগড়াও হয়, স্বাতী নানা ব্যাপারে রশিদের বাড়াবাড়ি দেখলে বকুনি দিতে ছাড়ে না, আবার খানিকটা মাখো মাখো ভাবও আছে। রশিদ ওর অনেক প্রাণের কথা স্বাতীকেই বলে।

আমার সঙ্গে নাসিমের সে-রকম সম্পর্ক হয়নি। কেন হয়নি, তা ব্যাখ্যা করা যায় না। সাধারণ কথার্বাতা ছাড়া নাসিমের সঙ্গে আমি ইয়ার্কি-ঠাট্টাও করতে পারি না। নাসিম ফোন করলে যদি আমি ধরি, দু-একটা কথার পরই ও স্বাতীকে চায়।

সেই নাসিম ফোনে বলল, তোমার সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা আছে সুনীল। তুমি একবার বিকেলে আসবে আমাদের বাড়িতে। স্বাতীকে জানাবার দরকার নেই।

এক বন্ধুর স্ত্রী এমন জরুরি তলব করতে পারে দুটি কারণে। এক, বন্ধুটির কোনও বিপদ হয়েছে বা শরীর খারাপ হয়েছে। দুই, বন্ধুর অনুপস্থিতিতে গোপনে প্রেম করতে চায়।

দ্বিতীয়টি অনায়াসে বাতিল করা যায়। আমার সঙ্গে সে-রকম সম্পর্ক স্থাপনের কোনও প্রশ্নই নেই। প্রথমটিই সম্ভব। কিন্তু তাহলে স্বাতীকে জানাতে নিষেধ করল কেন?

রাজি হয়ে গেলাম দেখা করতে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত অনেকবার চিন্তা করতে লাগলাম, নাসিমের এই আহ্বানের ঠিক কী কারণ হতে পারে। রশিদের কোনও অসুস্থতার খবরও তো শুনিনি!

যেতে যেতে সন্ধে হয়ে গেল।

বেল বাজাবার পর দরজা খুলে দিল নাসিম নিজে।

কোনও কাজের লোকের দেখা পাওয়া গেল না। দুই মেয়েও বাড়িতে নেই, কোথাও গেছে। ফ্ল্যাটটা বড় বেশি নিস্তব্ধ।

বাইরের ঘরে এসে বসবার পর নাসিম জিজ্ঞেস করল, তুমি চা খাবে?

আমি বললাম, না, একটু আগেই খেয়ে এসেছি।

নাসিম বলল, রশিদ ওর ড্রিংক্সের আলমারিতে তালা দিয়ে গেছে। চাবি নেই আমার কাছে।

আমি বললাম ড্রিংক্সের দরকার নেই।

এরপর নাসিম একবারে চুপ। আমি তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে।

কিছুক্ষণের অস্বস্তিকর নীরবতার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার, নাসিম? রশিদের কিছু হয়েছে?

এর উত্তরে নাসিম যা বলল, তা আমার সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না।

নাসিম এমনিতে বুদ্ধিমতী, আবার খুবই সরল। ওর কথার মধ্যে অনেক সময় পারম্পর্য থাকে না।

আমার ওই প্রশ্নের উত্তরে দুঃখী দুঃখী, ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, সুনীল, তুমি একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করবে? করো না। তাহলে আমার খুব উপকার হয়।

আমার হো হো করে হেসে ওঠা উচিত ছিল।

নাসিমের মতন এক সুন্দরী রমণীর সুপারিশে আমি অন্য একজনের সঙ্গে প্রেম করব? তাতে ওর কী উপকার হবে?

হাসি চেপে আমিও সরল মুখ করে বললাম, নাসিম, আমি প্রেম করার জন্য কোনও মেয়ে খুঁজছি, তা তোমাকে কে বলল?

নাসিম বলল, তোমরা পোয়েটরা তো সবসময় প্রেম করো। একটার পর একটা। এ-মেয়েটা বেশ সুন্দর দেখতে।

বেশ। বুঝলাম, একটা সুন্দর মেয়ে। আমি তার সঙ্গে প্রেম করলে তোমার কী উপকার হবে?

তাহলে সে-মেয়েটা রশিদকে ছেড়ে যাবে। সে এখন রশিদকে এমনভাবে জড়িয়ে আছে, রশিদটা তো বোকা, বুঝতে পারছে না।

ও, এই ব্যাপার। আমি প্রেম করে সেই মেয়েটাকে রশিদের কাছে থেকে ছাড়িয়ে আনব। কিন্তু, তুমি তো স্বাতীর বন্ধু। তুমি নিজের স্বামীকে বাঁচাবার জন্য স্বাতীর স্বামীকে কেন মেয়েটার দিকে ঠেলে দিচ্ছ?

নাসিম ব্যস্ত হয়ে বলল, না, না, স্বাতীর কোনো বিপদ হবে না। তুমি মেয়েটাকে রশিদের কাছ থেকে সরিয়ে আনবে, তারপর দু'দিন বাদে তাকে ছেড়ে দেবে। তুমি

তা পারবে। আমি জানি, তুমি স্বাতীকে ছেড়ে কোনওদিন কোথাও যাবে না। কিন্তু রশিদ বড্ড ইমোশনাল ও এক একবার একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে অন্ধ হয়ে যায়। আগেও দু-একবার হয়েছে। একবার একটা মেয়ের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করছে, আমার ভয় হচ্ছে। মেয়েটা এ-বাড়িতে প্রায়ই আসত। এখন মনে হচ্ছে, সে নর্থবেঙ্গলেও গেছে রশিদের কাছে। তুমি আমার এই রিকোয়েস্ট রাখো প্লিজ!

ঠিক আছে মেয়েটার সঙ্গে প্রেম করব না প্রেমের অভিনয় করব, তা পরে দেখা যাবে। মেয়েটা কে?

বেশ ভালো নাম। মধুছন্দা। তুমি তাকে চেনো? ভালো গান করে।

এরকম কোনও মেয়েকে চিনি বলে তো মনে পড়ছে না।

একটা ছবি আছে। দেখো।

নাসিম উঠে গিয়ে একটা ফটোগ্রাফ নিয়ে এল। একটা সোফার ওপরে রশিদ আর একটি যুবতী পাশাপাশি বসে আছে। খানিকটা ঘনিষ্ঠভাবেই বলা যায়। দু'জনেই কিছু একটা বই দেখছে।

ভালো করে দেখার পর চিনতে পারলাম।

এ তো সে-ই গায়িকাটি, রশিদদের চুঁচড়োর বাড়িতে দেখেছি। স্বামীর সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়েছিল। স্বামীটি পেঁচি মাতাল ও বিশ্রী ভাষায় কথা বলে। পরে অবশ্য ওই স্বামী-স্ত্রীর আবার ভাবও হয়ে গেছে দেখেছি।

রশিদ এই মেয়ের প্রেমে পড়বে, আমার বিশ্বাস হয় না।

মেয়েটি গানের জগতে স্থান পাবার আশায় রশিদকে আঁকড়ে ধরতে পারে। কিন্তু ওর স্বামীর তো তাতে বাধা দেবার কথা। ও স্ত্রীকে সমসময় সন্দেহ করে। তবে কি স্বামীর সঙ্গে ওর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে?

আমি নাসিমকে জিজ্ঞেস করলাম, এই মধুছন্দা যে এখন নর্থবেঙ্গলে আছে, তা তুমি জানলে কী করে?

নাসিম বলল, খবর পেয়েছি। মেয়েটা গেছে ওখানেই। ওই জন্যই তো রশিদ ওখানে বসে আছে, ফিরছে না। আমার জন্য না হোক, ও কি মেয়েদের কথাও ভাববে না?

নাসিম কান্নার উপক্রম করতেই আমি বললাম, আরে, এখনই এত উতলা হচ্ছ কেন? আমরা বন্ধুরা আছি কী করতে? সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখো না, আমি এমন প্রেম করব মেয়েটার সঙ্গে...

যদিও জানি, রশিদের সঙ্গে প্রেমের প্রতিযোগিতার নামতে গেলে আমি প্রথম রাউন্ডেই হেরে ভূত হয়ে যাব। রশিদের অতি সুঠাম, রূপবান চেহারা। মেয়েরা তো প্রথমে রূপটাই নাকি দেখে। তাছাড়াও পুলিশের একজন বড় কর্তা হিসেবে ও অনেক ক্ষমতাবান। আমার তুলনায় গান-বাজনাতেও অনেক বেশি সমঝদার। ওই মেয়েটির

যদি গানের জগতে প্রতিষ্ঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহলে রশিদই ওকে সাহায্য করতে পারে। এইসব ছেড়ে মধুছন্দা আমার সঙ্গে প্রেম করতে চাইবেই বা কেন? নাসিম তা বুঝবে না।

অবশ্য, রশিদের সঙ্গে আমার প্রেমের প্রতিযোগিতায় নামার প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের বন্ধুত্ব সে-রকম নয়।

নর্থবেঙ্গলে রশিদের ফোন নাম্বার আমার কাছে নেই। এরকম সময়ে সৌমিত্র মিত্রই প্রধান ভরসা। ও চেষ্টা করলে আমেবিকার প্রেসিডেন্টেরও পার্সোনাল ফোন নাম্বার জোগাড় করে দিতে পারে।

আধঘণ্টার মধ্যে সৌমিত্র দুটো ফোন নাম্বার জানিয়ে দিল রশিদের। সৌমিত্র আরো খবর দিল, শিলিগুড়িতে তিনদিন ধরে উত্তরবঙ্গ সংগীত-সম্মেলন চলছে, রশিদ তার সভাপতি, আজই তার শেষ দিন।

মধুমিতা না মধুছন্দা নামের মেয়েটি যদি নর্থবেঙ্গলে গিয়ে থাকে, তাহলে তার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। ওখানকার সংগীত-সম্মোলনে গাইবার সুযোগ পাওয়ার জন্য মেয়েটি তো রশিদকে ধরাধরি করতেই পারে। সেটা স্বাভাবিক।

রশিদকে টেলিফোনে পেলাম সকাল দশটায়।

বোঝাই গেল, ওর সদ্য ঘুম ভেঙেছে। সারারাত কাটিয়েছে গান-বাজনা শুনে। গলা এখনো ভারি।

রশিদ প্রায়ই অভিযোগ করে যে, আমি নিজে থেকে ওকে ফোন করি না, রশিদই ফোন করে সবসময়।

আজ আমি ওকে ফোন করেছি, তাও নর্থবেঙ্গলে, তাই প্রথমে ও বেশ ভয় পেয়ে বলল, কী ব্যাপার? কী হয়েছে? কলকাতায় কারুর কিছু...

আমি বললাম, না, না, সেসব কিছু না। অল ইজ ওয়েল ইন হেভেন অ্যান্ড আর্থ। তোমার অনেকদিন খবর নেই। লং টাইম নো সি। এতদিন ধরে নর্থবেঙ্গলে কী করছ?

মন দিয়ে কাজ করছি। এখানে একটা কমিশন বসেছে। আমি তার চেয়ারম্যান। ড্রিংকিং ইজ আন্ডার কন্ট্রোল। বন্ধু-বান্ধব না থাকলে আমি কোনওদিনই বেশি ড্রিংক করি না, তুমি জানো? তোমরা চলে এসো এখানে। শক্তিকে নিয়ে এসো। শক্তি শান্তিনিকেতনে, অনেকটা কাছাকাছি।

ঠিক আছে, যাব। তোমাকে আর কতদিন থাকতে হবে?

আরো প্রায় তিন সপ্তাহ।

ওখানে একটা মিউজিক কনফারেন্স হয়ে গেল। তুমি তার সভাপতি ছিলে?

ইয়েস। জানলে কী করে?

খবরের কাগজে বেরিয়েছে। কেমন হল?

বেশ জমেছিল। ট্রিমেন্ডাস রেসপন্স। প্রচুর অডিয়েন্স। এখন থেকে প্রতিবছর হবে।

তার মানে, সব মিলিয়ে তুমি খুব ব্যস্ত।

ইউ ক্যান সে দ্যাট। এখানে খাটতে হচ্ছে খুব।

অল ওয়ার্ক অ্যান্ড নো প্লে? কবিতা লেখা হচ্ছে না, প্রেম-ট্রেম হচ্ছে না?

আরে দূর! সবসময় লোকজন ঘিরে থাকে। নো প্রাইভেট টাইম। লেখা কিংবা প্রেম কিছুই সম্ভব নয়!

তোমার এ-কনফারেন্সে মধুমিতা চান্স পেয়েছিল?

মধুমিতা? কোন মধুমিতা?

চুঁচড়োয় তোমার বাড়িতে যে-মেয়েটি গান গাইতে এসেছিল।

মধুছন্দা! হ্যাঁ, চান্স পেয়েছে, ভালো গেয়েছে। তুমি তার কথা জানলে কী করে?

কাগজে বেরিয়েছে বোধহয়।

ওই মধুছন্দা এখানে দশদিন আগে থেকে আছে। কোনও থাকার জায়গা-টায়গা ঠিক করে আসেনি। সব ভালো হোটেল এখন বুকড্। বিপদে পড়ে গিয়েছিল, আমাকে এসে ধরল– আমার কোয়ার্টারটা তো খুব বড়, অনেক ঘর, একতলা, দোতলা। একতলার একটা ঘরে থাকতে দিয়েছি।

সে তো ভালোই। ড্যামজেল ইন ডিসট্রেস, তাকে তো সাহায্য করাই উচিত। রশিদ, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? নেহাৎ কৌতূহল। ওই মধুছন্দার একজন মাস্তানগোছের স্বামী ছিল, সে আবার খুব জেলাস টাইপের, সে তার বউকে একা আসতে দিল? নাকি ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে?

মধুছন্দা তো একা আসেনি। শোনো সুনীল, ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং। ওই ছেলেটা, কী যেন নাম সুজয়, সে হঠাৎ বদলে গেছে। বউয়ের সঙ্গে সে এসেছে, যে-কোনও মূল্যে, বাই এনি মিন্স, বাংলায় কী যেন বলে, যেন-তেন-প্রকারেণ সে বউকে গায়িকা হিসেবে দাঁড় করাবেই। তার জন্য বউকে যদি দেহদানও করতে হয়, তাতেও ওর আপত্তি নেই। সবসময় গদগদ ভাব।

রশিদ, ম্যান টু ম্যান একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। আর কেউ জানবে না। ওই দেহদানের ব্যাপারটা কি তোমার সঙ্গে হয়ে গেছে?

ইজিলি হতে পারত। নো প্রবলেম। এক বাড়িতে থাকছি। ওর বরটার রি-অ্যাকশান দেখার জন্য একদিন আমি ওকে কোলে বসিয়েছিলাম। তাতেও সুজয়েব মুখের হাসি মোছেনি। এক নম্বর ভেড়ুয়া বনে গেছে। কিন্তু ফ্র্যাংকলি বলছি, ওই মেয়েটার প্রতি আমি একটুও ফিজিক্যালি অ্যাট্রাকটেড বোধ করিনি। দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি ট্রু। কী রকম যেন। তুমি এত কথা জিজ্ঞেস করছে কেন, সুনীল? তুমি যদি ইন্টারেস্টড হও, তুমি এখানে চলে এসো। আমি মেয়েটাকে তোমার হাতে তুলে দেব, ইন আ গোল্ডেন প্ল্যাটার। তুমি যত ইচ্ছে ওর সঙ্গে প্রেম করতে পারো। ইভ্ন ফিজিক্যালি!

আমি হাসতে লাগলাম। একই মেয়ের সঙ্গে আমাকে প্রেম করতে বলছে রশিদ

আর নাসিম। রশিদ নিশ্চয়ই নাসিমের কথা জানে না।

রশিদ জিজ্ঞেস করল, তুমি আসছ? তাহলে মেয়েটাকে আরো কিছুদিন এখানে রেখে দিতে পারি।

ধ্যাৎ।

জানি, ও-মেয়েটা ঠিক তোমার টাইপও নয়। ন্যাকা। কেরিয়ারের জন্য যে-মেয়েরা পোশাক খুলে ফেলতে পারে, তাদের ছুঁতে ইচ্ছে করে না। আমি এবার ওদের কাটিয়ে দেব।

ঠিক আছে রশিদ, আবার পরে কথা হবে।

দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমাকে আসল খবরটাই তো দেওয়া হয়নি। আনোয়ারা নামে এক বাংলাদেশি মহিলার কথা তোমার মনে আছে? একসময় তুমি তার খুব খোঁজখবর নিতে? তুমি কি জানো, সে এক অদ্ভুত মামলায় জড়িয়ে পড়েছে?

মামলা? না, জানি না। তুমি জানলে কী করে নর্থবেঙ্গলে বসে?

বাংলাদেশ থেকে আমরা তিনজন গায়ক-গায়িকা আনিয়েছিলাম এখানকার কনফারেন্সে। ওদের মধ্যে মীর্জা আলি বেগ বেশ ভালো ঠুংরি গায়, অনেকটা আবদুল করিম খাঁ-র ঘরানার। লোকটা খুব আড্ডাবাজ, আমার সঙ্গে বেশ জমেছিল। নানান গল্প করতে করতে একসময় বলল, সৌদি আরব থেকে একজন লোক এসে বাংলাদেশের এক মহিলার বাড়িতে হামলা করেছিল। সেই মহিলাই আনোয়ারা। মীর্জার কী রকম কাজিন হয়।

হামলা মানে?

আনোয়ারার মেয়েকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল জোর করে। সে দাবি করেছে, সে-ই মেয়েটার বাবা। আনোয়ারা অবশ্য অস্বীকার করেছে সে-কথা। লোকটা নাছোড়বান্দা। ওদের দেশের নিয়ম নাকি সন্তানের ওপর বাবারই একমাত্র অধিকার। মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল প্রায়। আনোয়ারা চ্যাঁচামেচি শুরু করতেই অনেক লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল। তারপর লোকটিকে ধরে জমা করে দেওয়া হয় থানায়। এখন মামলা চলছে।

লোকটি বলছে, সে ওই মেয়ের বাবা। খবর পেল কী করে?

পেয়েছে কোনওভাবে। তাই ছুটে এসেছে সৌদি আরব থেকে।

আনোয়ারা অস্বীকার করছে? ওই লোকটি সত্যিই মেয়ের বাবা কি না, তা বোঝা যাবে কী করে? একমাত্র মা-ই তো ঠিক বলতে পারে।

ভুল। সেটা আগেকার দিনে ঠিক ছিল। এখন সিম্‌পল ডি এন এ টেস্ট করলেই বলা যায়। যাকে বলে অকাট্য প্রমাণ।

সেই টেস্ট করা হয়েছে?

নট ইয়েট। মামলার সময় বিচারক অর্ডার করবেন, তার পর হবে!

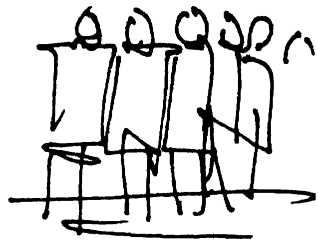
আনোয়ারার কথা অনেকদিন মনে ছিল না, আবার ফিরে এল মাথার মধ্যে। মানবিক কৌতূহল ছাড়াও গল্পের পরিণতি জানার কৌতূহলও কম নয়। গল্পটা আবার জট পাকিয়ে গেল।

ওই লোকটি কি মিছিমিছি একটি মেয়ের পিতৃত্বের দাবি করার জন্য ছুটে এসেছে দূর দেশ থেকে? আনোয়ারা মেয়েটিকে দিতে না চাক, সেই সম্পর্ক অস্বীকার করছে কেন?

এ-গল্প জানার জন্য ঢাকায় যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। অন্য কোনও উপলক্ষও নেই। তবু কৌতূহলটা রয়ে গেল।

নাসিম আমাকে যে-প্রস্তাবটা দিয়েছিল, সেটা কোননদিনই স্বাতীকে জানানো ঠিক হবে না। তাতে ওদের দু'জনের বন্ধুত্বের সম্পর্কে চিড় ধরতে পারে। কিংবা, অনেকদিন কেটে গেলে হাসতে হাসতে গল্প করা যেতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও অনেক কথা গোপন থেকে যায়।

২৫



এতদিনে আনোয়ারের কাহিনি বাংলাদেশের অনেকগুলি সংবাদপত্রে স্থান পেয়েছে।

এর আগে আনোয়ারার একা চুপি চুপি দেশত্যাগ, বেশ কিছুদিন সৌদি আরবে অজ্ঞাতবাস, এবং একসময় ফিরেও আসা, এসব খবর শুধু কিছু পরিচিত মানুষজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন এই একটি নাটকীয় ঘটনা প্রকাশ্যে এসে পড়ায় তা সংবাদপত্রের লোভনীয় খাদ্য হয়ে উঠেছে।

ধানমণ্ডির এক বাড়ি থেকে একজন লম্বা-চওড়া পুরুষ একটি শিশুকন্যাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে, তারপর ছুটতে লাগল। মেয়েটি ভয় পেয়ে তারস্বরে কাঁদছে। আর পেছন পেছন ছুটে আসছে আলুথালু শাড়ি পরা এক যুবতী, সেও চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে শুধু বলছে, না, না, না। এক একবার সেই যুবতী একেবারে কাছে এসে বাচ্চাটাকে কেড়ে নিতে চাইছে, লোকটি এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিয়ে ছুটছে আরও জোরে...।

এ তো সিনেমার মতন দৃশ্য। ভিড় জমে গেছে রাস্তার দু'ধারে।

সাধারণত লোকেরা এইসব দৃশ্য দূর থেকেই উপভোগ করে। নিজেরা অংশগ্রহণ করতে চায় না।

চার-রাস্তার মোড়ে এসে সেই লোকটি জোর করে একটি গাড়ি থামিয়ে তাতে উঠে পড়ার চেষ্টা করল। আনোয়ারা এসে টেনে ধরেছে তার পিঠের জামা, তখন কিছু মানুষ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটির ওপর।

লোকটি গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল প্রায়, অত্যুৎসাহী জনতা তাকে টেনেহিঁচড়ে বার করে আনল, শুরু হল মার।

ছেলে-ধরা শব্দটা চালু আছে, মেয়ে-ধরা কেউ বলে না। যাই হোক, শিশু-চোর তো বটেই। এদের ওপর সাধারণ মানুষের জাতক্রোধ থাকে। একবার ধরা পড়লে এদের খতম হয়ে যেতে বেশিক্ষণ লাগে না।

লোকটির ভাগ্যবশত কাছেই ছিল একজন ট্রাফিক পুলিশ, সে ছুটে এসে কোনওক্রমে সরিয়ে দিল মারকুট্টো লোকগুলোকে। আনোয়ারা তার মেয়েকে ফিরে

পেয়েও পাগলের মতন চ্যাঁচাচ্ছে।

বিদেশিটির মুখ ও কপালের পাশ দিয়ে গড়াচ্ছে রক্ত, দুটো দাঁত ভেঙে গেছে, তবু তার তেজ একটুও কমেনি, সে তখনও দাবি জানাচ্ছে দুর্বোধ্য ভাষায়। তিন-চারজনে মিলে জোর করে তাকে একটা প্রাইভেট গাড়িতে চাপিয়ে থানায় নিয়ে যাওয়া হল।

পরদিন সব কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় সকন্যা আনোয়ারার ছবি। কোনও কোনও কাগজে রাবেয়ার মুখখানি ইনসেটে এক কোণে, আর আনোয়ারার পূর্ণাঙ্গ দু'কলম। কোনও তরুণীর আঙ্গিক আকর্ষণীয় হলে পূর্ণাঙ্গ ছাপাই নিয়ম। ছবি তোলার সময়েও আনোয়ারার চোখে জল।

ফেনীতে নৌকোডুবিতে সতেরো জনের প্রাণহানির সংবাদ ছাপা হয়েছে ওই খবরের নীচে।

একবার এরকম একটা মুখরোচক সংবাদ পেলে সাংবাদিকরা শুরু করে ফলোআপ, অন্তর্তদন্ত। খুঁজে বার করে ঘটনার পটভূমিকা। আনোয়ারার শ্বশুরবাড়ি একটি উচ্চবিত্ত পরিবার, অনেকেই চেনে, এই পরিবার সম্পর্কে মানুষের কৌতূহলও বেশি হবেই।

কোনও সাংবাদিকের কাছেই শামীম একটি বারও মুখ খোলেনি। তার একটাই মন্তব্য, নো কমেন্ট!

আমি অনুমান করতে পারি, শামীমের মতন একজন ভদ্র আর স্পর্শকাতর মানুষের পক্ষে এরকম একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া কতখানি বেদনাদায়ক। কী সুন্দর দাম্পত্য সম্পর্ক ওদের, হঠাৎ সব কেন এমন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল? অবশ্য আমরা শুধু বাইরেরটাই দেখি, ভেতরের কথা কতটুকু জানি!

সৌদি আরবের সেই লোকটির নাম হামিদ। তাকে আদালতে তোলার পর বিচারক তিন সপ্তাহ পুলিশের হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তার কাছ থেকে এখনও বিশেষ কিছু কথা আদায় করা যায়নি। তবু খবরের কাগজে সত্যি-মিথ্যে মিশিয়ে কিছু তো বেরুবেই। সে আনোয়ারার মেয়েটির প্রকৃত পিতা না ভাড়াটে গুণ্ডা, তা ঠিক বোঝা গেল না।

নিউজউইক পত্রিকার এক সংখ্যায় একটি বড় রচনা বেরিয়েছিল, অন্যরকম নারী-পাচার বিষয়ে। আরব আর মধ্যপ্রাচ্যের হঠাৎ বড়লোক দেশগুলির কিছু কিছু ছেলে ফুর্তি করতে যায় ইওরোপ-আমেরিকায়। হাতে প্রচুর টাকা, বেহিসেবিভাবে ওড়ায়। আর ভোগবাদী দেশগুলিতে টাকা ছড়ালে কী না পাওয়া যায়, সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় যুবতী মেয়ে। শুধু ভোগ নয় ঐসব ধনী ব্যক্তিরা শ্বেতাঙ্গিনীদের বিয়েও করতে চায়।

বিয়ে করার পর সেইসব মেয়েরা এক রূপকথার জগৎ দেখার মোহে চলে আসে

স্বামীর দেশে। সেখানে এসে অবশ্য তাদের সবরকম স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যায়। ইচ্ছেমতন বাইরে বেরুতে পারে না। ইচ্ছেমতন পোশাক পরতে পারে না। পার্টিতে যাওয়া, নাচ-গান সব বন্ধ। পশ্চিমি জগতের মেয়েদের এই জীবন অসহ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু তারা নিজেরাই তো ইচ্ছে করে এসেছে। পালাবারও উপায় নেই।

তারপর তাদের কারুর কারুর সন্তান হয়। এর মধ্যে তাদের স্বামীদের তো আরও বিয়ে করতে বাধা নেই। পুরোনো স্ত্রীদের মধ্যে কেউ যদি স্বাস্থ্যবান পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়, তাহলে সেই সন্তানটিকে রেখে দিয়ে স্ত্রীটিকে মুক্তি দেওয়া হয়। অর্থাৎ বার করে দেওয়া হয় সেই দেশ থেকে। সেইসব দেশের আইন-অনুযায়ী সন্তানের ওপর পূর্ণ অধিকার শুধু তার বাবার।

এইরকম অনেক ভাগ্যহীনা তরুণী শ্বেতাঙ্গিনী সন্তানের অধিকার চেয়ে মানবাধিকার কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। এখনও কোনও লাভ হয়নি।

আনোয়ারার ঘটনাটা অবশ্য আলাদা।

সে স্বেচ্ছায় তার স্বামীকে ছেড়ে, নিজের দেশ ছেড়ে, অনেক টাকা রোজগারের আশায় ওরকম এক দেশে গিয়েছিল, যদিও আড়কাঠিদের পাল্লায় পড়ে প্রতারিত হয়েছে। সেখানে সে জীবিকার জন্য কী কাজ পেয়েছিল কিংবা কেউ তাকে আটকে রেখেছিল, তা কেউ জানে না। সে কারুকে বলেনি। কিন্তু সে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে অক্ষত অবস্থায়, শুধু গর্ভে এনেছে এক অবৈধ ভ্রূণ। কেউ তাকে ধর্ষণ করেছে কিংবা সে নিজেই কারুর সঙ্গে শরীরের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল, তাও জানা যায়নি। সব দায় সে নিজেই নিতে চায়।

কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে, একজন তার পিতৃত্ব দাবি করতে এতদূর ছুটে এসেছে। কিন্তু লোকটি এরকম গোঁয়ার্তুমি করছে কেন? জোর করে একটা বাচ্চা মেয়েকে তার মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া যায়? তাও প্রকাশ্য দিবালোকে?

আরও একটা ব্যাপারে খটকা লাগে।

ওইসব দেশে শুধু পুরুষসন্তানদেরই কদর। ছেলের বাবা হলেই শুধু পিতৃত্বের গর্ব বোধ করে। মেয়েরা এলেবেলে।

আনোয়ারা যখন চলে আসে, পালিয়ে আসুক কিংবা কোনওভাবে ছাড়া পেয়ে, তখন তার কোনও সন্তান ছিল না সঙ্গে। গর্ভে যে-ফুলটি ছিল, তার পরিচয়ও জানা ছিল না কারুর। তবু, এখন একটি কন্যাসন্তান জন্মেছে বলে ফিরিয়ে নেবার দাবি জানাতে এসেছে! যতই আশ্চর্যজনক হোক, এমন তো হতেই পারে। ওদেশেরও তো দু'একজন মানুষের কন্যাসন্তান সম্পর্কে দুর্বলতা থাকতে পারে। সব মানুষই তো সমান হয় না। আর দেশ হিসেবে সব মানুষকে বিচার করাও ঠিক না।

তবে এমন অদ্ভুত উপায়ে কি মেয়েকে ফেরত নেওয়া যায়? লোকটির কাণ্ডজ্ঞান

বলতে কিছু নেই বোঝা যাচ্ছে।

এর মধ্যে ঢাকা যাওয়ার কোনও উপলক্ষ ঘটেনি, এইসব ঘটনা আমি টুকরো টুকরোভাবে শুনেছি অন্যদের মুখে।

শুধু একটা ব্যাপারে আমার কৌতূহল রয়ে গেল। আনোয়ারা কিছুতেই তার মেয়ের ওপর অধিকার ছাড়বে না। সে কোনও পুরুষের সাহায্য ছাড়াই নিজের মেয়ের লালন-পালন করবে, এরকম কথা সে স্বাতীকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল। খুব সম্ভবত তার টাকা-পয়সার কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু অন্য অনেক সামাজিক সমস্যা তো এড়ানো যায় না। ধানমণ্ডিতে সে একটা ভাড়া বাড়িতে থাকে, সে-বাড়ির অন্য লোকজন কীভাবে নিয়েছে তাকে? এরপর যখন মামলা চলবে, তখন তার চরিত্র নিয়ে নিশ্চিত আরও অনেক কটাক্ষ হবে।

আজকাল পত্রিকার ঢাকার প্রতিনিধি সুন্দর হক মাঝে মাঝে কলকাতায় আসে। প্রেসক্লাবে কয়েকবার দেখা হয়েছে ছেলেটির সঙ্গে। তার নিজস্ব মোবাইল সেটের ব্যবসা আছে, আবার সাংবাদিকতাতেও আগ্রহ খুব। একটা ছোটগল্পের বইও প্রকাশ করে ফেলেছে।

সুন্দর হক তার বইটি দিতে এল আমার বাড়িতে।

নামটি আকর্ষণীয়, আলপিনে বিদ্ধ ভ্রমর। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আমি বললাম, ঢাকায় তো গিয়ে দেখি, উকিল, ডাক্তার, স্থপতি বা ব্যবসায়ী, সবাই কবিতা লেখে। গল্প-লেখক খুব দুর্লভ। তুমি আগে কবিতা লেখোনি?

সে একটু অবজ্ঞার সুরে বলল, নাহ্।

কেন, লেখোনি কেন? কবিতা পড়ো না?

পড়ি, কিন্তু যে-সে সবাই কবিতা ল্যাখে দেখেই ঠিক করেছি, আমি কখনও...এত কবিতা দেশের পক্ষে ভালো না! তাই নাকি? কবিতা কম বা বেশি লেখার পরও দেশের কি কিছু আসে যায়?

যায়। যারা কবিতা লেখে তারা শুধু নিজেকে ভালোবাসে। সব কবিই নার্সিসাস। তারা দেশের কথা ভাবে না।

এটা একটা নতুন কথা শুনলাম তোমার কাছে।

সুনীলদা, আপনি শুধু কবিতা না লিখে গল্প-উপন্যাসও লিখতে শুরু করেছিলেন কেন?

কী জানি! হয়তো পেটের দায়ে। কিংবা গল্প-টল্প লেখা যে এমন কিছু শক্ত নয়, সেটা প্রমাণ করার জন্য।

বাপরে, এতগুলান পাতা লিখলেন কী করে?

আরম্ভও তো করেছি অনেক আগে, তোমার থেকেও অনেক কম বয়েসে। আমার প্রথম লেখা যখন ছাপা হয়, তখন আমি সদ্য স্কুল ছেড়েছি।

আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করব? আপনি যে এত লিখেছেন, সবই কি আপনার নিজের অভিজ্ঞতা?

তুমি কি আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছ? আমার কথা বহুবার বলা হয়ে গেছে। বরং তোমার কথা বলো। তুমি যে-গল্পগুলো লিখেছ, এর কাহিনি তুমি কোথায় পেয়েছে?

দেখুন, আমার গল্পগুলোকে বলতে পারেন ডকু-ফিচার। কোনওটাই নিছক কল্পনা নয়, কিছু না কিছু বাস্তব ঘটনার ভিত্তি আছে। আমি কোনও না কোনও কেস স্টাডি করি। এই যে আমার নাম গল্পটা, 'আলপিনে বিদ্ধ ভ্রমর', এটা একটা বিখ্যাত জোড়াখুনের ঘটনা। বছর তিনেক আগে চট্টগ্রামে এই খুনের ব্যাপার নিয়ে খুব হইচই পড়ে গিয়েছিল, মাস দু'এক ধরে খবরের কাগজে নানান তথ্য ছাপা হয়েছে।

শুধু খবরের কাগজ পড়ে ঘটনাটা লেখো. নাকি নিজেও তুমি সেইসব লোকজনদের সঙ্গে কথা বলো?

ওই গল্পটা লেখার সময় আমি চিটাগাং শহরে এগারোদিন ছিলাম। প্রায় ডিটেকটিভের মতন নিজেও ইনভেসটিগেট করেছি।

বাঃ, খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। আজই পড়ে দেখার আগ্রহ হচ্ছে!

আমি এখন এইরকম একটা কেস স্টাডি করছি। আপনি জানেন কি, রিসেন্টলি ঢাকায় একটা ঘটনা নিয়ে সব কাগজে লেখালেখি হচ্ছে। একজন ম্যারেড মহিলা সৌদি আরবে চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। একসময় ফিরে আসলেন প্রেগন্যান্ট হয়ে। তার একটা মেয়েও হয়েছে। তারপর...

আমি সুন্দরের চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, মেয়েটির নাম আনোয়ারা?

সুন্দর একটু অবাক হয়ে বলল, আপনি শুনেছেন ব্যাপারটা?

আমি আর স্বাতী যে আনোয়ারার জীবনকাহিনির সঙ্গে খানিকটা যুক্ত, তা আর জানালাম না।

শুধু বললাম, ঢাকার পত্রপত্রিকা আমি প্রায়ই পড়ি। বিদেশ থেকে একজন এসেছিল তার মেয়েকে চুরি করতে, তাই না? সে-লোকটি তো ধরা পড়েছে।

হ্যাঁ, পুলিশ কাস্টোডিতে আছে।

তুমি ওই আনোয়ারার সঙ্গে নিজে কথা বলেছ?

ভদ্রমহিলা কারুর সঙ্গে দেখা করতে চান না। এ-পর্যন্ত কোনও সাংবাদিক ওঁর এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ নিতে পারেনি। শুধু আমিই কোনওরকমে ম্যানেজ করে একবার দেখা করেছি। প্রথমে ওঁর এক আত্মীয়, মানে ওঁর বড় বোনের ছেলের বন্ধু সেজে ফোন করেছিলাম, তাতে পাত্তাই দেননি। কোনও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেই ওঁর সম্পর্ক নাই। তারপর কুরিয়ার সার্ভিসের চিঠি দেবার নাম করে সোজা ওঁর ফ্ল্যাটের দরজায় নক করেছি। তখন আর ফেরাতে পারেননি। ভেতরে বসিয়ে কথা বলেছেন।

কাগজে যেসব রিপোর্ট বেরিয়েছে, তাতে একটা ব্যাপার কিন্তু পরিষ্কার হয়নি।

যে-লোকটি এসেছে বাচ্চা মেয়েটাকে চুরি করে কিংবা জোর করে নিয়ে যেতে, সে-ই কি মেয়েটির বাবা? তুমি কি এটা জানতে পেরেছ?

না, দাদা। কিছুতেই ও-বিষয়ে কিছু বলতে চাননি। সৌদি আরবে গিয়ে উনি কী কাজ করতেন, তাও জানাতে চান না। আমার ধারণা, উনি নার্স ছিলেন।

সেটা তো সম্মানজনক কাজ। না বলার কী আছে?

তবু, বুঝছেন, কোথাও একটা খোঁচ আছে। হাসপাতালের নার্স আর কারুর বাড়ির প্রাইভেট নার্স হওয়ার তফাত নেই? এনিওয়ে, আমি ঢাকা থেকে আসার ঠিক দুইদিন আগে আরেকটা ব্যাপার হয়েছে। কারা যেন ওঁকে টেলিফোনে থ্রেট্‌ন করেছে, এই মামলা চালালে ওঁর ঘোর বিপদ হবে। ওই সৌদি লোকটার নামে সব অভিযোগ তুলে নিতে হবে।

টেলিফোনে ভয় দেখিয়েছে? কারা?

নিজেদের পরিচয় দেয়নি।

কোন ভাষায় কথা বলেছে?

বাংলায়। ভয় দেখিয়েছে যে, আর মুখ খুললে তার শিশুকন্যাটিও বাঁচবে না। সে নিজেও খুন হবে। তার বাড়ির সামনে এখন পুলিশ পোস্টিং, আমাকেও আর ভেতরে যেতে দেয়নি।

আনোয়ারাও বাইরে বেরুতে পারে না?

না। একটা কাজের মেয়ে আছে, সে-ই বাজার-টাজার করে দেয়।

পুলিশ পাহারায় কতদিন থাকবে?

সেই তো কথা। ঢাকা শহরে আর কেউ যোগাযোগ রাখে না তার সঙ্গে। তাকে হেল্‌প করার আর কেউ নাই। আমার ধারণা, যারা ভয় দেখাচ্ছে, তারা ডেঞ্জারাস লোক। সত্যি সত্যি খুন করে দিতে পারে।

তোমার ধারণা, কারা ভয় দেখাচ্ছে?

তারা আমাদেরই এখানকার মানুষ। মানুষ না, শয়তান। যারা ভুলিয়ে ভালিয়ে এ-দেশের মেয়েদের বিদেশে পাচার করে, তারাই। এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশি প্রচার হলে সাধারণ মানুষের মধ্যে সৌদি আরব সম্পর্কে খারাপ ধারণা হতে পারে। তাতে তাদের কারবারের ক্ষতি। তাছাড়া, অনেকের কাছে সৌদি আরব একটা পবিত্র দেশ, সে-দেশ সম্পর্কে কোনও বদনাম তারা সহ্য করতে পারে না।

সুন্দর যখন প্রথম আসে, ওর কাছে আনোয়ারার কথা জিজ্ঞেস করার কথা আমার মনেও আসেনি। কথায় কথায় সেই প্রসঙ্গ এসে গেল। মেয়েটি আবার একটা বিপদে পড়েছে।

আরও কিছুক্ষণ গল্প করার পর বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়াল সুন্দর হক। নিজের ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে নেবার পর আবার বলল, আমি এই কেসটার সব পয়েন্ট নোট

করে রাখছি। একটা বড় গল্প হতে পারে, অবশ্য শেষটা কী হবে, তা বলা যাচ্ছে না।

আমি ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গে বললাম, তুমি শুধু গল্প লেখার জন্য আনোয়ারার জীবনটা স্টাডি করছ?

আমার কণ্ঠস্বরে খানিকটা আহত হয়ে সুন্দর বলল, আমরা আর কী করতে পারি বলুন। এরকম অনেক সামাজিক সমস্যা আছে, তাতে কতটুকু সাহায্য করা আমাদের পক্ষে সম্ভব? বরং লেখালেখি করে যদি মানুষকে এইসব সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করা যায়।

আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম। ওভাবে ছেলেটিকে খোঁচা মারা আমার উচিত হয়নি। ও তো ঠিকই বলেছে। আমরা কী সাহায্য করতে পারি? আমিও তো নিছক গল্পের কৌতূহল মেটাচ্ছি মাত্র। কিছুই তো সাহায্য করিনি। এমনকী আনোয়ারা যখন কলকাতায় থেকে যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করছিল, তখনও আমরা কোনও দায়িত্ব নিতে না চেয়ে ওকে জোর করে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি।

কিছুক্ষণ মনটা ভার হয়ে রইল। তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়লাম অন্য কাজে।

অনেকে বলে, লেখকরা খানিকটা স্বার্থপর হয়। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। এক এক সময় লেখার যখন খুব চাপ থাকে, তখন নিজের বাড়ির কথা, বন্ধু-বান্ধবদের কথাও মনে থাকে না। স্বাতীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার কথা, আমার খেয়াল নেই, একটা লেখা শেষ করার জন্য মগ্ন। মনে মনে একটা যুক্তি খাড়া করি, ডাক্তার আমাদের চেনা, স্বাতী তো নিজেই সেখানে চলে গেলে পারে। স্বাতীও জেদ ধরে আছে, কিছুতেই সেখানে একা যাবে না।

আমার মাথায় এটা ঢোকে না যে, ডাক্তারের কাছে নিজের মুখে নিজের অসুখের কথা বলতে সঙ্কোচ হওয়াই স্বাভাবিক। আমার সঙ্গে যাওয়াই উচিত। আবার একথাও ঠিক, তাড়াহুড়ো করে কিংবা অবহেলার সঙ্গে একটা রচনা শেষ করলে কি পাঠকরা বুঝবে যে, স্ত্রীর শরীর খারাপ ছিল বলেই আমার সেই লেখাটা উতরোয়নি। পাঠকরা কিংবা সমালোচকরা এরকম কোনও কৈফিয়ত গ্রাহ্য করে না।

এর মধ্যে আমাদের বিবাহবার্ষিকীর দিনটাও ভুলে গেছি!

মধ্যবিত্ত বাঙালিরা খানিকটা বিলিতি কায়দায় এই দিনটিতে স্ত্রীকে কিছু না কিছু উপহার দেয়। বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে খাওয়া-দাওয়া হয়। এই বিশেষ দিনটি ভুলে যাওয়া কোনও স্বামীর পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। স্ত্রীরা ঠিক মনে রাখে।

এ-কারণে কয়েকদিন ধরে স্বাতীর সঙ্গে আমার খানিকটা মন কষাকষি চলছে। কথাবার্তা হচ্ছে ভাববাচ্যে।

এইরকম সময়েই স্বাতীর মনে পড়ে, কবে কোথায় আমি কোন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বেশি হেসে হেসে কথা বলেছি। কিংবা, চলন্ত ট্রেনের কামরায় দূর থেকে উঠে

এসে একটি চালিয়াৎ ধরনের মেয়ে শুধু আমার সঙ্গেই গল্প করেছে, পাশে-বসা স্বাতীকে চিনতেই পারেনি। ইত্যাদি।

এইসব বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে গেলেই আরও অনেক দূর গড়ায়। আবার সব অভিযোগ মেনে নিলেও বিপদ বাড়ে। সুতরাং অনবরত অন্যদিকে কথা ঘোরাবার চেষ্টা করতে হয়।

এর মধ্যেও স্বার্থপরতা কাজ করে। যে-লেখাটা অসমাপ্ত রয়েছে, সেটা নিয়ে চিন্তা চলতেই থাকে।

পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হবার পর পাড়ি দিলাম শান্তিনিকেতন।

এ-সময় আবহাওয়া খুব ভালো। তেমন গরম নেই, বিকেলের দিকে হু-হু হাওয়া। ফুল ফোটে অজস্র।

বাড়ির পাশের ছোট পুকুরটায় উৎপল জাল ফেলে মাছ ধরে। প্রথম প্রথম আমি ছিপ ফেলেও মাছ তুলেছি, এখন আর তেমন সময় পাই না। ছোট পুকুর, কিন্তু মাছ হয়েছে অনেক। জ্যান্ত জ্যান্ত মাছ তুলে ভাজা কিংবা ঝোল করে খাওয়া এক দারুণ বিলাসিতা। এতে আমি আমার বাল্যকালের গ্রামীণ জীবনের খানিকটা স্বাদ পাই। দোতলার জানলা দিয়ে, লিখতে লিখতেও মাছ ধরার দিকে চোখ চলে যায়।

শক্তি এখন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক। খবর পেয়ে চলে এল সকাল সাড়ে দশটায়।

এক-দেড়মাস এখানে থেকেই শক্তির বেশ স্বাস্থ্য ফিরেছে। সংযমী জীবন যাপন করছে নিশ্চিত, চোখ-মুখ বেশ উজ্জ্বল। কিছুদিন আগে শক্তিকে খানিকটা কাহিল দেখেছি।

শক্তি বলল, এর মধ্যে ও চেকআপ করিয়েছে, হার্ট আর লাংস বেশ ভালো আছে। শুধু একটা গ্যাসের সমস্যা ছাড়া আর সবকিছু চমৎকার। এখানে অধ্যাপনার তিনমাস শেষ হয়ে গেলেও ও অনেকটা সময় শান্তিনিকেতনেই কাটাবে ঠিক করেছে। এখানে কিছুটা জমি কিনে বাড়ি বানাবে।

আমি বললাম, এক্ষুনি বাড়ি বানাবার দরকার কী? এ-বাড়িতেই তো থাকতে পারো।

শক্তি বলল, তা ঠিক, তোমাদের বাড়ি তো সারা মাসে অনেকদিনই খালি পড়ে থাকে।

আমি বললাম, আমি যখন আসব, তখনও তো তোমার থাকার অসুবিধে নেই। একস্ট্রা ঘর আছে।

শক্তি বলল, সকালবেলাটায় দু'জনেই লিখব। তুমি এক ঘরে, আমি অন্য ঘরে। ভ্যান গগ আর পল গগ্যাঁর মতন।

আমি বললাম, উপমাটা ঠিক হল না। ওঁদের দু'জনের মধ্যে বড্ড ঝগড়া আর

মারামারি হতো। আমাদের অবশ্য তা হবে না।

শক্তি হা হা করে হেসে বলল, তোমার সঙ্গে মারামারি?

পকেট থেকে একটা রামের পাঁইট বার করে শক্তি চুপিচুপি বলল, অনেকদিন দুই বন্ধু একসঙ্গে মাল খাইনি। এখানে আমি অনেক সংযমে আছি। ক্যাম্পাসের মধ্যে মাল-ফাল খাওয়াও ঝামেলার ব্যাপার। তোমার বাড়িতে এখন কেউ আসবে না, উৎপলকে গেলাস দিতে বলো।

দরজার কাছে যে স্বাতী এসে দাঁড়িয়েছে, তা শক্তি দেখতে পায়নি।

স্বাতী আমার বন্ধুদের মধ্যে শক্তিকে বিশেষ পছন্দ করে, ওর অনেক দুরন্তপনায় প্রশ্রয় দেয়। তবে, সপ্তাহের মাঝখানে সকাল সাড়ে দশটায় মদ্যপান মোটেই সমর্থন করে না।

স্বাতী চোখ পাকিয়ে বলল, অ্যাই, এখন রাম খাওয়া হবে? মোটেই না!

শক্তি বলল, এই তো ছোট একটা বোতল, কতদিন খাইনি বলো? আজ আর আপত্তি কোরো না। সুনীলের সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। আমি কয়েকটা পরিকল্পনা করেছি, নতুনভাবে কাজ শুরু করতে হবে।

স্বাতী বলল, মদ্যপান না করে বুঝি কথা বলা যায় না?

শক্তি বলল, এই একটু চুমুক দিতে দিতে—

আরেকটু হলেই সম্ভবত স্বাতী রাজি হয়ে যেত। কিন্তু এখন আমার স্বাতীকে খুশি করার পালা চলছে। আমি বেশি বেশি সাধু সেজে দৃঢ় গলায় বললাম, না শক্তি, এখন ওসব চলবে না। আমার একটা জরুরি লেখা আছে।

শক্তি বলল, আর কত লিখবে? সারাজীবনই তো ক্রীতদাসের মতন লিখে যাচ্ছ! সত্যি তোমার সঙ্গে অনেক জরুরি কথা আছে।

আমি বললাম, সেসব কথা সন্ধেবেলা হবে।

স্বাতী বলল, এখন বই-টই পড়ুন। পুকুরে মাছ ধরা হচ্ছে। দুপুরে এখানে খাবেন। তারপর ঘুমোবেন। মীনাক্ষী কবে আসছে?

শক্তি আরও দু'তিনবার অনুরোধ করল।

আমার প্রবল আপত্তি দেখে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তাহলে হবে না? ঠিক আছে, দেখি দুপুরে যদি আসতে পারি, অন্য একটা কাজ আছে।

হনহন করে বেরিয়ে গেল শক্তি। আমি তার গেট পেরিয়ে যাওয়া অপস্রিয়মান চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

দুপুরে আর এল না শক্তি।

সন্ধেবেলা এক কবিতা পাঠের আসরে দেখা হল। কিন্তু বিশেষ কিছু কথা হল না। অনেক লোকজন থাকলে শুধুই সাধারণ কথা হয়।

পরদিনই আমাদের ফিরতে হল সকালের ট্রেনে। আবার আমার সাতদিনের মধ্যেই

শান্তিনিকেতনে ফিরে আসার কথা, তখন শক্তির সঙ্গে নিরিবিলিতে বসা যাবে।

তারও পরের দিন ভোরবেলা আমার ঘুম ভেঙে গেল টেলিফোনের ঝনঝনানিতে। কেউ একজন ফোন করছে শান্তিনিকেতন থেকে।

সে বলল, আপনি খবরটা শুনেছেন?

কী খবর?

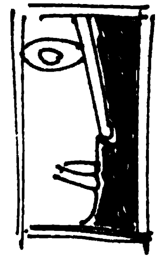
শক্তিদা আর নেই!

অ্যাঁ? কী বললে?

শেষ রাতে...খুবই ম্যাসিভ অ্যাটাক, ডাক্তার দেখাবারও সুযোগ পাওয়া যায়নি।

এরপর কয়েক মুহূর্তের জন্য সম্ভবত আমার জ্ঞান ছিল না। বাকিটা মনে নেই। আমার বালিশে মাথা, হাতে তখনও টেলিফোন, স্বাতীও জেগে উঠে ভয় পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করছে, কী হয়েছে? কী হয়েছে?

চোখ মেলার পর আমার প্রথমেই মনে হল, শক্তি আমাকে কী বিশেষ জরুরি কথা বলতে চেয়েছিল? তা আর কোনওদিন জানা হবে না।



২৬

বিকেলের মধ্যেই শক্তিকে নিয়ে আসা হল শান্তিনিকেতন থেকে। এই প্রথম শক্তি নিজে এলো না, তাকে নিয়ে আসতে হল।

কিন্তু যাকে আনা হল, সে কি শক্তি? আমরা অভ্যেসবশত মানুষের শরীরকেও তার নামে ডাকি। আসলে শরীরের কোনও নাম হয় না, প্রাণেরই নাম হয়। আমার শরীরটা যেমন আমি নই, যেদিন আমি নই, যেদিন আমি শেষ নিশ্বাস ফেলব, তখন এটা শুধু একটা শরীর হয়েই থাকবে। আমরা যখন বলি, অর্জুনের বুকের পাটা আছে, কিংবা সুরাইয়ার ফিগারটা দারুণ, তখনই বোঝা যায়, অর্জুন ও সুরাইয়া ওদের ভেতরের মানুষটার নাম। তেমনি, শক্তি চট্টোপাধ্যায় চলে গেছে শান্তিনিকেতন থেকে, কলকাতায় ফিরে এসেছে শুধু তার দেহ।

সেই মুখ আমার আর দেখতে ইচ্ছে করে না। শক্তির এই অকস্মাৎ প্রস্থান আমাকে এমন ধাক্কা দিয়েছে যে, আমি প্রায় কথাই বলতে পারছি না। কতদিনের সুখ-দুঃখের সম্পর্ক! ইচ্ছে করছে সারাদিন চুপচাপ শুয়ে থাকতে। তবু যেতেই হয়।

রাজকীয় সম্মানে সেই মবদেহ নিয়ে যাওয়া হল কেওড়াতলা শ্মশানে। সেখানে প্রচুর জনসমাগম। আমরা কয়েকজন পুরোনো বন্ধু বসে রইলাম খানিকটা দূরে।

রশিদ ছিল কলকাতার বাইরে, খবর পেয়ে পৌঁছোল অনেকটা দেরি করে। আমাদের কাছে এসে ভুরু কুঁচকে রাগের সঙ্গে বলল, ব্যাটা চলে গেল? কিছু না বলে কয়ে, এমন হুট করে চলে গেল? শালা, ট্রেইটর! ঠিক আছে, ওকে বাদ দিয়েই আমরা রাম খাব!

ইলেকট্রিক চুল্লিতে শরীরটা ঢুকে যাবার পর আমাদের আর বসে থাকার কোনও মানে হয় না। রাত প্রায় আটটা বাজে।

শ্যামল গাঙ্গুলি বলল, এখন আমার বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না। চল, সুনীল, তোর বাড়িতে গিয়ে বসি।

রশিদ বলল, তোমরা যাও, আমি সন্দীপনকে ধরে নিয়ে আসছি তোমার ওখানে।

বয়েসে অনেক ছোট কবি জয়দেব বসু জুটে গেল আমাদের সঙ্গে। খানিকটা যাবার

পর সে বলল, সুনীলদা, আপনি তো হুইস্কি ছাড়া কিছু খান না। আজ একটু রাম খেলে হয় না। শক্তিদার অনারে। শক্তিদা তো দারুণ রামভক্ত ছিলেন।

শ্যামল বলল, হ্যাঁ, আজ রামসন্ধ্যা হবে!

বাড়ির কাছাকাছি একটা দোকান আছে। গাড়ি থামিয়ে আমি নেমে গেলাম সেখানে। কিনলাম একটা বড় রামের বোতল।

ফিরে এসে গাড়িতে উঠতে যাব, হাত থেকে খসে পড়ল বোতলটা। একেবারে চুরমার। খুবই চমকে ওঠার মতন ঘটনা।

জয়দেব বলল, সুনীলদা, এর আগে কখনও আপনার হাত থেকে বোতল পড়ে গিয়ে ভেঙেছে?

কোনওদিন না!

জয়দেব বলল, আপনি তো রামের বোতলও কেনেন না। তার মানে কী বুঝলেন? শক্তিদাকে বাদ দিয়ে আমরা রাম খেতে যাচ্ছি, তা শক্তিদার সহ্য হল না। তাই শক্তিদার আত্মাই আপনার হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল।

জয়দেবের চোখের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, তোমার তাই মনে হয়?

আমি আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। কোনও অলৌকিক ব্যাপারই কিছুতেই মেনে নিতে পারি না।

আবার ফিরে গেলাম সেই দোকানে। সঙ্গে আর টাকাকড়ি বিশেষ নেই। কিন্তু মালিক আমায় চেনে, ধার দিতে কোনও আপত্তি নেই।

আরেকটা বোতল নিয়ে ফিরে এলাম গাড়ির কাছে।

শ্যামল বলল, দেখিস, সাবধান। শক্তি ধারেকাছেই আছে। এটাও না ফেলে দেয়।

আমি বোতলটা নিয়ে দোলাতে লাগলাম। একবার শূন্যে ছুড়ে লুফে নিলাম দু'হাতে।

শ্যামল আঁতকে উঠছে। কিন্তু আর কিছুই হল না। অক্ষত দ্বিতীয় বোতলটি নিয়ে ঢুকলাম বাড়িতে।

কয়েক মিনিট পরেই এল রশিদ। সন্দীপন আসতে চায়নি। সে শক্তির স্ত্রী-ছেলেমেয়ের সঙ্গে থেকে গেছে।

রশিদ এখনও রাগে গজগজ করেছে। গেলাসে অনেকটা রাম ঢেলে বলল, দ্যাখ শালা, তোকে বাদ দিয়ে আমরা রাম খাচ্ছি! তুই যেখানে তাড়াহুড়ো করে চলে গেলি, সেখানে রাম পাবি?

রশিদও কি আত্মায় বিশ্বাস করে? সে এমনভাবে কথা বলছে, যেন শক্তির অশরীরী অস্তিত্ব রয়েছে কাছাকাছি। নাকি, এসব কথার কথা! মৃত্যুর পর তো মানুষ কোথাও যায় না। মৃত্যু মানেই চিরসমাপ্তি। এটাই সবচেয়ে নিষ্ঠুর সত্য।

জল না মিশিয়েই পুরোটা এক চুমুকে শেষ করল রশিদ। তার ফর্সা মুখখানা লাল

টকটকে হয়ে গেল।

জয়দেব একটার পর একটা শক্তির কবিতা মুখস্থ বলে যাচ্ছে। এ ছেলেটির স্মৃতিশক্তি অসাধারণ।

রশিদ একসময় উঠে গেল বাথরুমে। তারপর আর ফেরে না। এতক্ষণ তো লাগার কথা নয়। স্বাতীও রয়ে গেছে শক্তির স্ত্রী মীনাক্ষীর কাছে, অন্য ঘরেও কেউ নেই।

উঠে গিয়ে দেখি, বাথরুমের দরজা খোলা। পাশের অন্ধকার বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে রশিদ, তার সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। রশিদ প্রচণ্ড শব্দ করে হাসে, তার কান্না একেবারে নিঃশব্দ।

সে এক জবরদস্ত পুলিশ অফিসার, অন্যদের সামনে কাঁদবে না।

অন্য কারুর কান্না দেখলে আমি আর নিজেকে সামলাতে পারি না। কিন্তু এখন আমার চোখে জল এলো না।

রশিদকে না ডেকে আমি সরে এলাম সেখান থেকে।

শক্তিকে আমি স্বপ্নে দেখলাম ঠিক ছ'দিন বাদে। প্রথম তিন-চারদিন প্রায় সারাক্ষণই শক্তির প্রসঙ্গ নিয়ে জড়িত ছিলাম, ওকে নিয়ে লিখতেও হয়েছে, তখন কিন্তু স্বপ্ন দেখিনি। তারপর আমাকে দিল্লি যেতে হল। সেখানে স্বপ্নে ফিরে এল শক্তি।

পুরোনো কোনও স্মৃতি নয়, মৃত্যুর পরের শক্তি। খুব শান্ত ভাব, কথা বলছে নরমভাবে। ওর নতুন বইটির বিষয়ে। মাঝে মাঝেই বলছে, আমি বেশিক্ষণ তোমার কাছে থাকতে পারব না। একটু বাদেই চলে যেতে হবে। আমি জিজ্ঞেস করছি, কোথায় যেতে হবে? শক্তি বলল, বাঃ, এখন যেখানে আছি। সেখানে তো শরীর থাকে না। তাই বাইরে এসে বেশিক্ষণ শরীর ধরে থাকা মুশকিল! বাদলকে তুমি বইটার ব্যাপারে বলে দিও, বইটার টাইটেল পেজে যেন কোনও ছবি না থাকে।

এমনই বিশ্বাসযোগ্য সেই স্বপ্ন যে, ঘুম ভাঙার পরেও কিছুক্ষণ মনে হয়, যেন সত্যিই শক্তি এসে বসেছিল আমার সামনের চেয়ারে।

তারপরই আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। সব স্বপ্নই তো মানুষের নিজের কল্পনা, নিজের সৃষ্টি। এদিকে আমি বড়াই করি যে, আত্মা মানি না, পরলোক মানি না, স্বর্গ-নরক মানি না। তাহলে ওভাবে শক্তিকে দেখলাম কী করে? যেন সে পরলোক থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে! এসব বহুকালের সংস্কার, অবচেতনে গেড়ে বসে থাকে।

তাহলে, আমার কল্পনাতেই শুধু বারবার শক্তিকে সশরীরে ফিরিয়ে আনা যায়।

শক্তির এইভাবে চলে যাওয়ার ফলে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে এমন এক শূন্যতার সৃষ্টি হল যে, বেশ কিছুদিন আমরা ভালো করে কথাই বলতে পারিনি। রশিদ নিজের কাজে ডুব দিয়েছে, মদ্যপান একেবারে বন্ধ।

দিল্লি থেকে ফিরে দেখি, বাড়িতে বসে আছে বেলাল। মৃদুস্বরে কথা বলছে স্বাতীর সঙ্গে।

একটা কোনও পত্রিকার কাজ নিয়ে এসেছে বেলাল, কিন্তু খুব সম্ভবত শক্তির সংবাদ শুনে ও ঢাকায় বসে থাকতে পারেনি। বেলাল একসময় কলকাতায় এক উদ্দাম বোহেমিয়ান জীবন কাটিয়েছে, সেইসময় শক্তি আর ইন্দ্রনাথই ছিল ওর প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী। আমি ততটা নয়। আমি কখনও পুরোপুরি বোহেমিয়ান হতে পারিনি। গদ্য লেখা শুরু করার পরেই ফেঁসে গেছি। গদ্য অনেকটা সময় কেড়ে নেয়।

আমি স্বাতীকে বললাম, বেলাল শুকনো মুখে বসে আছে। ওকে বোতল-টোতল বার করে দাওনি?

স্বাতী কিছু বলার আগেই বেলাল লাজুক মুখ করে বলল, সুনীলদা, আমি পানটান করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি।

আমি স্তম্ভিত। বলে কী? পৃথিবীটা হঠাৎ বদলে গেল নাকি? এরপর কী শুনব, বাঘ-সিংহরাও নিরামিষ খেতে শুরু করেছে? এই বেলালকে আমি সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত সুরার সংসর্গে থাকতে দেখেছি।

সত্যি ছেড়ে দিয়েছ, বেলাল?

একেবারে ছাড়িনি। ঢাকায় তো প্রায়ই সন্ধেবেলা...আমি সব জায়গায় গিয়ে বলি, ব্ল্যাক লেবেল ছাড়া অন্য কোনও হুইস্কি আমি ছোঁব না। অনেক জায়গতেই ব্ল্যাক লেবেল থাকে না। তাই ছুঁই না।

যদি ব্ল্যাক লেবেল থাকে?

দু'এক পেগ খাই। বেশি না। আমার ইচ্ছেটাই চলে গেছে।

সেটা তো তোমার ঢাকার নিয়ম। আমার বাড়িতে তো ব্ল্যাক লেবেল নেই। অত দামি জিনিস আমি পাব কোথায়। সাধারণ দিশি জিনিস আছে। এখানে এসে নিয়ম ভাঙবে না?

না, সুনীলদা। থাক!

বেলালের প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা কতখানি তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য আমি বোতল আর গেলাস নিয়ে বসলাম। চোখের সামনে দেখেও কি ও সংযম রক্ষা করতে পারবে?

আমি পান করতে লাগলাম আর বেলাল একেবারে ব্রহ্মচারী হয়ে শুধু জল খেতে খেতে গল্প করতে লাগল। সিগারেট টানাও ছেড়ে দিয়েছে বেলাল।

স্বাতী আমাকে লাঞ্ছনা দিয়ে বলল, দেখলে, দেখলে, বেলালের মনের জোর দেখলে? শুধু তুমিই ছাড়তে পার না।

আমি বললাম, ছোটবেলায় মা আমাকে বলতেন, দ্যাখ দ্যাখ, ওই যে পাশের বাড়ির সত্যময়, তোর সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে। প্রত্যেক বছর ফার্স্ট হয়। তুমি পারিস

না কেন? সারাজীবনই আমাকে এই গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। আমি অন্যাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কখনও পারি না।

বেলাল আমার পক্ষ সমর্থন করার জন্য বলল, স্বাতীদি, সুনীলদা তো দিনের বেলা খান না। ওঁর সংযম আছে। আমরা শুরু করলে তো মাত্রাজ্ঞান থাকত না, তাই আমাদের কন্ট্রোল করা দরকার।

স্বাতী বলল, ও রবিবার দিনদুপুরেও–

কথা ঘোরাবার জন্য বেলাল বলল, সুনীলদা, আপনার কি এখন খুব কাজ? না থাকলে ভাবছিলাম, একবার বেলপাহাড়ি ঘুরে এলে হয় না? ইন্দ্রদাকেও ডেকে নেব।

স্বাতী জিজ্ঞেস করল, বেলপাহাড়ি যাবে কেন? কী আছে সেখানে?

আমি ঠিক বুঝেছি। বেলাল ঢাকায় ফিরে যাবার আগে বেলপাহাড়িতেই আমাদের এক দারুণ অ্যাডভেঞ্চার হয়েছিল। বেলাল, ইন্দ্রনাথ, শক্তি আর আমি একসঙ্গে। টানা চার দিন। সেই বেলপাহাড়িতে গিয়েই বেলাল শক্তির স্মৃতিচারণা করতে চায়।

আমি বললাম, তা যাওয়া যেতে পারে। ইন্দ্রনাথকে খবর দিতে হবে। সে এখন বেশির ভাগ সময় শান্তিনিকেতনেই থাকে।

স্বাতী জিজ্ঞেস করল, বেলপাহাড়ি কোথায়?

বেলাল বলল, ঝাড়গ্রাম ছাড়িয়ে, কাঁকড়াঝোড় জঙ্গলে যাওয়ার পথে। সুন্দর, ছোট্টমতন পাহাড়ি শহর।

স্বাতী বলল, ও যেখানে তোমরা একবার সারারাত মাঠের মধ্যে শুয়েছিলে? সকালবেলা গ্রামের লোক তোমাদের ঘিরে ফেলেছিল?

বেলাল হাসতে হাসতে বলল, হ্যাঁ। তবে এখন আর মাঠে শুয়ে রাত কাটানো যাবে না। অত মহুয়াও পান করা যাবে না। বয়েস হয়ে যাচ্ছে তো!

আমি বললাম, আকাশের বাজপাখিরা এখন ডানা গুটিয়ে বাসায় ফিরে আসছে। গতবারে ঢাকায় গাজী শাহাবুদ্দিনদের বাড়িতে খেতে বসে বেলাল বলেছিল, চিংড়ি মাছ খাব না। ওতে খুব কোলেস্টেরোল বাড়ে! আগে কি আমরা এসব কথা চিন্তা করতাম?

স্বাতী বলল, এখন তো সাবধান হওয়াই উচিত। জান বেলাল, তোমার সুনীলদা এখনও চিংড়ি-টিংড়ি সব খায়! এখন রেড মিট খাওয়া ঠিক নয়। তবু ও বিদেশে গেলেই বিফস্টেক খায়।

বেলাল বলল, শক্তিদা বিফ খেতেন না। তাতে কী লাভ হল?

স্বাতী জিজ্ঞেস করল, গাজীদের খবর কী? বীথির পায়ের ব্যথা এখন কী রকম?

এখন অনেকটা ভালো।

আর রফিক, দিলারা?

ওরাও ভালো আছে। রফিক ঢাকার বাইরে চাকরি করতে গেছে। দেখা হয় কম।

বটু আর কাজলদের সঙ্গেও বেশি দেখা হয় না। ওরা দুজনেই তো এখন ধর্ম নিয়ে খুব মেতে আছে। শামসুর রাহমান আপনাদের কথা জিজ্ঞেস করেন প্রায়ই।

স্বাতী অনেকেরই কথা জিজ্ঞেস করল, কিন্তু একবারও উচ্চারণ করল না আনোয়ারার নাম। তা কি ইচ্ছে করেই? আনোয়ারার দুর্ভাগ্যের কথা আর মনে আনতে চায় না?

আমিও আনোয়ারার প্রসঙ্গ আর তুললাম না। যদিও কৌতূহল রয়েই গেল।

পরদিন দুপুরে বেলালকে নিয়ে গেলাম কলেজ স্ট্রিটে।

কলকাতায় এসে বেলাল একবার না একবার বইপাড়া আর কফি হাউসে তো যাবেই। আমারই বরং আজকাল ওদিকে বেশি যাওয়া হয় না। কলকাতার বইপাড়ার অনেক খবর বেলাল আমার চেয়েও বেশি রাখে।

আমাদের যৌবনকালে এই কফি হাউসের যত জৌলুস ছিল, এখন আর তেমন নেই। তবু, এখানকার কফির যে স্বাদ, তা আর অন্য কোথাও পাই না।

কফি হাউসে আমার পরিচিত মানুষের সংখ্যা এখন বেশ কমে গেছে, বেলালকে অনেকে চেনে। ওকে দেখেই অনেকে উঠে এল আমাদের টেবিলে। এরা বেলালকে এত ভালোবাসে যে, প্রায় প্রত্যেকেই বলতে লাগল, বেলালদা, এবার একদিন আমাদের বাড়িতে থাকবেন তো?

কাউন্টারের ডান পাশে একটা টেবিলে একলা এক ব্যক্তি বসে আপনমনে একটা বই পড়ছেন। তাঁকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। প্রথমে মনে হয়, এ কি চোখের ভুল? খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা ওই লোকটিকে ওই একই টেবিলে বসে থাকতে দেখছি গত তিরিশ বছরেরও বেশি সময় থেকে। চেহারাও কিছু বদলায়নি। একইরকম দাড়ি, বাড়েও নি, কমেও নি। ওঁর টেবিলে অন্য কেউ বসে না। ওই মানুষটির কি কোনও বন্ধু নেই, আর কোথাও যাবার জায়গা নেই? দিনের পর দিন শুধু কফি হাউসে এসে একা বসে থাকা!

আমি ওঁর নাম জানি না। কোনওদিন ওঁর সঙ্গে কথাও বলিনি।

বেলালকে জিজ্ঞেস করলাম, ওই লোকটিকে চিনতে পারছ?

বেলাল ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে বলল, যখনই আসি, ওঁকে দেখতে পাই। এখানকার পার্মানেন্ট মেম্বার। কিছু কিছু মানুষেব·বোধহয় পরিবর্তন হয় না। নীচে সিঁড়ির কাছে সিগারেট বিক্রি করে যে-ইসমাইল, তাকেও দেখলাম একইরকম আছে। একইরকম হাসে। পার্থ নামের একটি ছেলে সেই খোঁচা খোঁচা দাড়ির দিকে চেয়ে বলল, বর্ধনদার কথা বলছেন? উনি প্রত্যেকদিন তো আসবেনই, কারুর সঙ্গে কথা বলেন না। ওঁকে কেউ কোনওদিন একটাও কথা বলতে শোনেনি।

আমি বললাম, তোমরা কেউ কথা বলার চেষ্টা করো না কেন?

পার্থ বলল, আমি চেষ্টা করিনি, তবে সোমনাথ করেছিল। কেউ ভাব জমাতে

গেলে উনি কিছুক্ষণ মুখের দিকে চেয়ে থাকেন, তারপর উঠে বাথরুমে চলে যান। এখন আর ওঁকে কেউ বিরক্ত করে না।

কেউ যদি কথা না বলে থাকে, তাহলে জানলে কী করে যে, ওঁর নাম বর্ধনদা?

ওঁর প্রসঙ্গ উঠলে সবাই ওই নামটাই বলে। বেয়ারারাও বলে। এও শুনেছি, উনি একসময় থিয়েটারে অভিনয় করতেন। শম্ভু মিত্রের দলে।

তার মানে বোবা নন। এককালের অভিনেতা, এখন একেবারে মূক। কী বই পড়েন দেখেছ? একই বই?

পার্থ হেসে বলল, তা জানি না। উনি কিন্তু ঠিক পাগলও নন। প্রতিদিন প্রায় তিন ঘণ্টা থাকেন। তিন কাপ কফি খান, ঠিক ঠিক দাম দিয়ে যান। তাই বেয়ারারাও ওঁকে ঘাঁটায় না।

বেলাল বলল, আমরা সবাই একসময় মরে যাব। উনি তখনও কফি হাউসে আসবেন। রহস্যময় মানুষ!

এখানেই খবর পাওয়া গেল, ইন্দ্রনাথ এখন কলেজ স্ট্রিটেই আছে।

খানিক বাদে উঠে আমরা গেলাম সুবর্ণরেখায়।

ইন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের দোকানে পাওয়া যায় নতুন বই আর নানারকম ক্যাসেট। কলেজ স্ট্রিটের আদি দোকানটি পুরোনো ও দুষ্প্রাপ্য বইয়ের। এখান থেকেই বেরুত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আর নির্মাল্য আচার্যর সম্পাদনায় *এক্ষণ* পত্রিকা।

ইন্দ্রনাথ দুজন গবেষক-অধ্যাপক চেহারার ব্যক্তির সঙ্গে মন দিয়ে কীসব আলোচনা করছে। দুটিমাত্র চেয়ার, আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হল। বেলাল দেখতে লাগল বই। আমার এইসব বইতে হাত দিলেই মন খারাপ হয়ে যায়। *পদবীর ইতিহাস* কিংবা *বিস্মৃত রাজধানী* জাতীয় বই দেখলেই মনে হয়, কেন এইসব বই এখনও পড়িনি? এক জীবনে কত বই পড়ব? অনেক বাকি থেকে যাবে।

লোক দুটি প্রস্থান করলে আমি প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম, ইন্দ্রনাথ তোমার এখানে আগে তিনটে চেয়ার ছিল না?

ইন্দ্রনাথ বলল, আরে ভাই, আর বলো না। এই ডানদিকে আরেকটা চেয়ার ছিল। শক্তি এসে ঠিক ওই চেয়ারটাতেই বসত। এখন সেই চেয়ারটার দিকে তাকালেই মনে হয়, ঠিক যেন শক্তি বসে আছে। বারবার এরকম ভুল হবার পর চেয়ারটাকেই সরিয়ে দিয়েছি। কবে এলে, বেলাল?

বেলাল বলল, ইন্দ্রদা, চলুন একবার বেলপাহাড়ি যাই।

ইন্দ্রনাথ ভুরু কুঁচকে একটুখানি চুপ করে থেকে বলল, এখন বেলপাহাড়ি? পাগল নাকি? সেখানে চতুর্দিকে শক্তির স্মৃতি ম ম করছে!

বেলাল বলল, সেইজন্যই তো! সুনীলদা রাজি হয়েছে।

না, না, ওখানে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। বরং আগেরবারের সেই চমৎকার

স্মৃতিটাই নষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া, আমরা সেবারে বেলপাহাড়ি গিয়েছিলাম কোন্ সময়ে? অক্টোবরের গোড়ায়। খুব গরম নয়, শীতও পড়েনি। এখন রোজ বৃষ্টি পড়ছে, এর মধ্যে মাঠে শুতে পারবে? ওসব আর পোষাবে না ভাই! বেলাল, তুমি নাকি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছ?

এটা এমনই গুরুত্বপূর্ণ খবর যে, ঢাকা থেকে ইন্দ্রনাথের কানে আগেই পৌঁছে গেছে।

আমি বললাম, একেবারে ছাড়েনি। ব্ল্যাক লেবেল কিংবা তার চেয়ে উঁচু প্রিমিয়াম স্কচ, অথবা খালাসিটোলার বাংলা খায়।

ইন্দ্রনাথ বলল, তোমাদের বাংলাদেশে সবাই দামি দামি স্কচ খায়। আমরা ভাই গরিব ইন্ডিয়ান, আমরা এসব পাব কোথায়? আমাদের খালাসিটোলার বাংলাই যথেষ্ট।

বেলাল বলল, খালাসিটোলার বাংলা তো ঢাকায় পাওয়া যায় না, তাই খাওয়া না-খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এখানে এসে খালাসিটোলায় তো যেতেই হবে।

ইন্দ্রনাথের চেয়ারের পাশে একটা লম্বা বইয়ের প্যাকেট, খবরের কাগজ দিয়ে মোড়া, সুতলি দড়ি দিয়ে বাঁধা। সেটার দিকে বারবার আমার চোখ চলে যাচ্ছে।

ইন্দ্রনাথ, ওগুলো কী বই?

ঢাকা থেকে এসেছে, এখনও খুলে দেখা হয়নি। ওখানকার বাংলা অ্যাকাডেমির পাবলিকেশন।

প্যাকেটটা খোলো তো। আমি একটু দেখব।

ইন্দ্রনাথ দড়ির বাঁধন খোলার পর বইগুলোর বদলে আমি খবরের কাগজটা তুলে নিলাম। তাতে একটি মেয়ের ছবি অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছিল। এবার দেখলাম পুরো ছবিটা।

আমার চোখ ভুল করেনি। এটা আনোয়ারার ছবি। একটি বাড়ির দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আনোয়ারা, দু'পাশে দুজন পুলিশ। তলায় ক্যাপশন রয়েছে, অ্যাসিড বাল্‌বের শিকার আনোয়ারা বেগম।

বেলালের দিকে কাগজটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, তুমি এই খবরটা জানো?

বেলাল একনজর দেখেই বলল, পুরোনো খবর। সপ্তাহখানেক আগের।

কেউ অ্যাসিড বাল্‌ব মেরেছে ওর মুখে?

খুব জোর বেঁচে গেছে। কেউ অ্যাসিড বাল্‌ব ছুড়ে ওর মুখেই মারতে চেয়েছিল। কিন্তু মুখে লাগেনি। লেগেছে ডান কাঁধে। অনেকটা ঝলসে গেছে। এই ছবিতে তা বোঝা যাচ্ছে না।

সুন্দর হককে তুমি নিশ্চয়ই চেনো। সে আমাকে বলেছিল, আনোয়ারা এখন বাড়ি থেকে আর বেরোয় না।

তা ঠিকই। কিন্তু দিনের পর দিন কি কেউ বাড়ির মধ্যে চুপ করে বসে থাকতে

পারে? বেরিয়েছিল একদিন দুপুরে। কয়েকটা শয়তান নিশ্চয়ই নজর রাখছিল ওর বাড়িতে। রাস্তায় তখন অনেক লোক, তারই মধ্যে...

কেউ ধরা পড়েনি?

এইসব কেসে কেউই ভয়ে কাছে আসে না। ওরা এলোপাথাড়ি ওইসব ছুড়তে ছুড়তে পালিয়েছে। সুনীলদা, ওই মেয়েটার বাঁচা মুশকিল। ওর পেছনে অনেকে লেগেছে।

কেউ কিছু সাহায্য করতে পারে না?

কে সাহায্য করবে বলুন। একটি অবৈধ সন্তান নিয়ে ও জেদ করে একা থাকছে। প্র্যাকটিক্যালি একঘরে হয়ে আছে, আত্মীয়-স্বজন কারুর সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা কি সত্যি সত্যি সভ্য হয়েছি, সুনীলদা? চতুর্দিকেই তো অসভ্যদের উৎকট চিৎকার শুনতে পাই।

ইন্দ্রনাথ বলল, মাইরি, পুরুষমানুষ হয়ে মেয়েদের গায়ে হাত তোলে কী করে বলো তো? তারা কি পুরুষ, না ভেড়ুয়া? মায়ের পেট থেকেই যে তারা জন্মেছে, তাও মনে থাকে না?

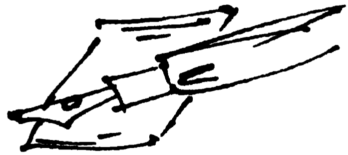
আমি বললাম, যারা ওইসব করে, তাদের মাতৃস্মৃতি থাকে না। রমণ-সুখ কাকে বলে, তাও তারা জানে না। তারা শুধু এক ধরনের জৈবজীবন যাপন করে।

ইন্দ্রনাথ টেবিলে একটা ঘুসি মেরে বলল, ধুর শালা! এসব কথা শুনলে... তাহলে দোকান বন্ধ করি? চলো, খালাসিটোলায় যাই।

বেলাল বলল, খালাসিটোলায় আমাদের গুরু ছিলেন কমলদা। তারপরেই চ্যাম্পিয়ন ছিলেন শক্তিদা। ওঁরা দুজনেই আর নেই।

আমি বললাম, লাইফ গোজ অন। দা কিং ইজ ডেড, লং লিভ দা কিং। লং লিভ কমলদা অ্যান্ড শক্তি!

আমরা বেরিয়ে পড়লাম সান্ধ্য অভিযানে।



২৭

মানুষের জীবনে এমন অনেক অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়, যা কোনও কাজে লাগে না। মস্তিষ্কে নাকি দশ বিলিয়ন কোষ আছে, তার অর্ধেকও ভর্তি হয় না সারা জীবনে। অনেক মানুষই প্রবীণ বয়সে পৌঁছে গল্প-উপন্যাস-কবিতার বদলে প্রবন্ধের বই-ই বেশি পড়েন। আমার বাবাকেও দেখেছি, শেষ জীবনে শুধু দর্শন, ইতিহাস, মহাকাশ-বিজ্ঞানের বই-ই পড়তেন বেশি। আয়ু যখন ফুরিয়ে আসে, তখন এইসব জ্ঞানের প্রয়োগ হবে কী করে বা কোথায়?

এ যেন অনেকটা বাড়ি বানাবার অভিজ্ঞতার মতন।

শান্তিনিকেতনে আমাদের বাড়িটা যখন তৈরি হচ্ছিল, তখন এ-কথা আমার প্রায়ই মনে হতো।

আমাদের উদ্বাস্তু পরিবার, ভাড়া-বাড়িতেই কাটিয়েছি বহু বছর। আমার বাবা ভাড়া-বাড়ির সামান্য ছোট ফ্ল্যাটের বাসিন্দা হয়ে এবং জ্ঞানী মস্তিষ্ক নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। আমাকেও বাসা বদল করতে হয়েছে অনেকবার। তারপর যখন কিছুটা সচ্ছল অবস্থায় পৌঁছেছি, তখন স্বাতীর শখে খানিকটা জমি কেনা হল শান্তিনিকেতনে।

সেই জমিতে প্রথম দিন পা দিয়ে আমার মনে হয়েছিল, এবার তাহলে এদেশের এক টুকরো মাটির ওপর আমার অধিকার জন্মাল। এতদিন তো প্রকৃত অর্থে উদ্বাস্তুই ছিলাম। বিহার কিংবা আসামে যখন বাঙালখেদা কিংবা বহিরাগত-বিরোধী আন্দোলন হয়েছে, তখন আমার মনে হতো, আমাদের পরিবারকেও তো যে-কোনওদিন বহিরাগত বলে ঘোষণা করে দিতে পারে। কখনও আওয়াজ উঠতে পারে, যাও, যেখান থেকে এসেছ, সেখানে ফেরত যাও! পশ্চিম পাকিস্তানে যারা ভারত থেকে গেছে, তারা মুসলমান হলেও সেখানকার সমাজ তাদের ভালোমতন গ্রহণ করতে পারেনি, প্রায়ই মারামারি হয়। এ-ব্যাপারে বাংলাদেশের অবস্থা তো ঠিক জানি না।

শান্তিনিকেতনের আবাসটি নির্মাণ করতে অনেক সময় লেগেছে। কারণ, হাতে কোনও টাকা ছিল না, তাই কোনও ঠিকাদারকে ভার দিতে পারিনি। তাছাড়া তারা

কত বেশি টাকা খরচ করিয়ে দেবে, তাই-ই বা কে জানে! আমার একটা উপন্যাস নিয়ে তখন টিভি সিরিয়াল শুরু হয়েছিল, তারা যখন-যেমন কিছু টাকা দিত, সেই টাকায় ইট-সিমেন্ট-বালি কেনা হতো, ডেকে আনা হতো মিস্তিরিদের দৈনিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে।

বাড়ি তৈরির কোনও অভিজ্ঞতাই তো ছিল না। মিস্তিরিদের সঙ্গে থেকে থেকে ঠেকে শেখা হল অনেক কিছুই। মালপত্র কিনতাম নিজেরাই। বাড়িটি যখন পুরোপুরি একটা আকার নিল, ততদিনে আমি বাড়ি তৈরির ব্যাপারে এক্সপার্ট হয়ে উঠেছি। এক হাজার ইটের দাম কত আর কোথায় সস্তায় পাওয়া যায়, তা আমি জানি। শুধু সস্তা হলেই হয় না, ইটের কোয়ালিটি চিনতে হয়। কতরকম সিমেন্ট কম্পানি, তার মধ্যে কোনটা বেশি নির্ভরযোগ্য, তা বুঝে গেছি। সিমেন্টের সঙ্গে বালি মেশাবার পরিমাণ দেখতে হয় নিজে দাঁড়িয়ে। ছাদ ঢালাইয়ের পর ঠিক কতদিন পরে খুলতে হয় পট্টি, তাও জানি, গ্রিলের অর্ডার দেবার পর পরীক্ষা করে নিতে হয়। ছাদ ঢালাইয়ের আদর্শ সময় বর্ষা শুরু হবার ঠিক মুখে মুখে, নইলে জল ঢালতে হয় প্রচুর।

বাড়ি তো তৈরি হয়ে গেল। এরপর?

বেশির ভাগ মানুষই তো একটার বেশি বাড়ি বানায় না। আমারও জীবনে আর দ্বিতীয় বাড়ির সম্ভাবনা নেই। তাহলে গৃহনির্মাণের এত অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি কী করব? আর কোনও কাজেই লাগবে না। এ যেন জীবনেরই প্রতীক।

অন্য যারা বাড়ি বানাচ্ছে, তাদের কিছু উপদেশ দিতে গেলে তারা বিরক্ত হয়। তারা অন্যভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে। যেমন, অল্পবয়েসিদের আমাদের অভিজ্ঞতা-অনুযায়ী ধূমপান, মদ্যপান কিংবা প্রেম-বিষয়ে কিছু বলতে গেলে, তারা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বার করে দেয়।

অধিকাংশ মানুষই জীবনে একটার বেশি বাড়ি বানাতে পারে না। সেই একটা বাড়িও ঠিকঠাক মনের মতন সর্বাঙ্গসুন্দর করা খুবই কঠিন। কষ্টে-সৃষ্টে জোগাড় করতে হয় টাকা, তাও প্রাথমিক বাজেট যা থাকে, তা ছাড়িয়ে যাবেই। তখন ধার করতে হয়, এমনকী বউয়ের গয়নাও বিক্রি করতে হয়। নইলে জানলা-দরজা বসানো যায় না। একটা বাড়ির সঙ্গে মানুষের অনেক স্বপ্ন মিশে থাকে। চাকরি কিংবা জীবিকার জন্য যাদের নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে হয়, তারা পরিণত বয়েসে পৌঁছে প্রভিডেন্ট ফান্ড কিংবা যাবতীয় সঞ্চয় দিয়ে কোনও জায়গায় বানায় একটা বাড়ি। একটু মফস্বলের দিকে সেইসব বাড়ির একটা করে নামও থাকে। যেমন 'আশ্রয়', 'শান্তির নীড়', 'পথের শেষ', 'মৃণাল-চন্দনা' (অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর নাম), 'শেষের কবিতা', 'হংস বলাকা' ইত্যাদি। আমি সকালবেলা বেড়াতে বেরিয়ে এইসব নতুন বাড়ির নাম লক্ষ করি। সব নামের মধ্যেই রয়েছে খানিকটা স্বপ্নের ছোঁয়া। একটানা পরিশ্রমের

জীবন শেষ করে, এই নতুন বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সুখে বাস করার স্বপ্ন। কিন্তু রিটায়ার করার আগেই যে কারুর কারুর সব নিশ্বাস খরচ হয়ে যায়!

একটা বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকি। আমাদের প্রায় একই সঙ্গে এই বাড়ি তৈরি করছিলেন নীতীশ রায়। আগেই মুখচেনা ছিল, এখানে এসে প্রায় বন্ধুত্ব হয়ে গেল। একজন মানুষ সবসময়ই যেন বেশ আমোদে থাকে, হইচই করে কথা বলে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে দু'লাইন গানও গেয়ে উঠতে পারে, নীতীশ রায় সেইরকম। প্রায় ফাঁকা জমিতে, পাশাপাশি নয় অবশ্য, আমাদের দুজনেরই ইঁট-কাঠ-লোহার আবাস গড়ে উঠছে। নীতীশ রায় প্রায়ই আমার বাড়িটা দেখতে আসেন। আমাকে বলেন, সামনের বারান্দাটা একটু বড় করলেন না? দোতলায় ক'খানা ঘর করছেন, কুয়োতে পাম্প বসাচ্ছেন তো ইত্যাদি পরামর্শ দেন। পশ্চিম বাংলা সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারি, কিছু অতিরিক্ত উপার্জন কিংবা পারিবারিক টাকা-পয়সা আছে নিশ্চয়ই, ওঁর বাড়িটি আমাদের তুলনায় অনেক বড় এবং শৌখিন। আমার মতন ওঁর ছেলেও পড়াশুনো করতে গেছে বিদেশে। শেষ পর্যন্ত ওঁর বাড়িটা হল প্রাসাদের মতন। নীতীশ রায়ের আবার বাগানের শখ, কলকাতা থেকে নানারকম দুর্লভ গাছের চারা এনে লাগিয়েছেন, নিজের হাতে সেইসব গাছে জল দেন, আমাকে প্রায় বলেন, আর ঠিক দেড় বছর পর রিটায়ার করব, বুঝলেন, ততদিনে এই গাছগুলো বড় হবে, ফুল ফুটবে, আমি আর কলকাতাতে যাবই না। এখানেই জমিয়ে বসব! আপনি ঘনঘন আসবেন তো, নাকি অন্যদের মতন বাড়ি করে ফেলে রাখবেন? এখানকার বাতাস কত টাটকা, একবার এলে আর ফিরতে ইচ্ছেই করে না। নিলামে দুটো ঝাড়বাতি কিনেছি, সন্ধের পর সেই আলো জ্বেলে গানের আসর বসাব।

নীতিশ রায় আর রিটায়ার করতে পারলেন না। চাকরি শেষ হওয়ার ঠিক দু'মাস আগে, হৃদয়ে এক প্রবল ধাক্কা, মাঝরাত্তিরে ডাক্তার পাওয়া যায়নি, ভোরের আগেই নিশ্বাস শেষ।

বাড়িটা বেশ কিছুদিন খালিই পড়েছিল। শুনেছি ওঁর স্ত্রী কানপুরে চলে গেছেন এক দিদির কাছে। গত মাসে বিক্রি হয়ে গেল এই বাড়ি, 'কুসুম কানন' নীতীশ রায়ের নিজের নাম দেওয়া। তাঁর নিজের হাতে লাগানো সব গাছই কিছুটা বড় হয়েছে, ফুল ফুটেছে প্রচুর।

নীতীশ রায়ের অতৃপ্ত আত্মা এই বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, এরকম অনায়াসে লেখা যেত, যদি আমার আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকত। না, তা নেই। তবু যেন মনে হয়, নীতীশ রায়ের স্বপ্ন যেন এখানকার বাতাসে এখনও ভাসে। মানুষ মরে, কিন্তু স্বপ্ন মরে না। আমরা সবসময় তো টের পাই না, কিন্তু গাছেরা টের পায়। এই গাছগুলি নীতীশ রায়কে মনে রেখেছে।

এদিককার নতুন বাড়িগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় নাম, 'মূর্খের স্বর্গ'।

ছিমছাম মাঝারি গোছের বাড়ি, লোহার গেটের পাশে, প্রথমে বাংলায় লেখা মূর্খের স্বর্গ, তলায় ফুল্‌স প্যারাডাইজ। সামনের দিকের বারান্দায় একটি ইজি চেয়ারে একজন প্রৌঢ় মানুষকে বসে থাকতে দেখি, সবসময় একা, সামনের ছোট টেবিলে একটা দাবার ছক পাতা। একা একা দাবা খেলা যায়? নাকি তিনি দিনের পর দিন কোনও খেলার সঙ্গীর প্রতীক্ষায় বসে থাকেন?

মাঝে মাঝেই ওঁর সঙ্গে আলাপ করার কথা ভাবি। কিন্তু কথা বলা হয় না। ওই বাড়ির সামনে দিয়ে যখন হেঁটে যাই, ভদ্রলোক একবারও চোখ তুলে তাকান না, তাই আমারও সঙ্কোচ হয়। আলাপ হলে বলতাম, আপনি ঠিক নামই দিয়েছেন, স্বর্গে তো সবাই মূর্খ। স্বর্গে কোনও ছাপাখানা নেই। বইয়ের দোকান নেই, লাইব্রেরি নেই। অন্তত সে-রকম কোনও বর্ণনা কোনও ধর্মগ্রন্থেই পাওয়া যায় না।

আমাদের এই পল্লীটির নাম ফুলডাঙা। এখানকার সবচেয়ে দ্রষ্টব্য বাড়িটি অর্ঘ্য সেনের। সে আমারই বয়েসি, অনেক দিনের পরিচয়। ছাত্রবয়েস থেকেই গায়ক হিসেবে তার নাম ছড়িয়েছে, বিশেষত অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্তের গানে সে অতুলনীয়। তার গলার কাজ ও গানের মেজাজ সত্যিই আলাদা।

বিয়ে-টিয়ে আর করল না অর্ঘ্য, স্বভাবটি শিল্পীসুলভ, খানিকটা পাগলাটে। তার বাড়ি এ-পাড়ায় একেবারে প্রথম দিকের, আকারে ও প্রকারে খুবই বিচিত্র। বাড়িটি দোতলা, কিন্তু কেমন যেন আধখানা কাটা মতন, এবং কুচকুচে কালো রঙের। এমন পুরোপুরি কালো রঙের সিমেন্টের বাড়ি আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। সামনের দরজার ঠিক ওপরেই একটা মস্তবড় লাল টিপ, কালোর ওপর অমন লাল খুব ক্যাটকেটে দেখায়।

অনেকেই ওই বাড়ির রং ও চেহারা পছন্দ করে না। কেউ কেউ বলে ভূতের বাড়ি। রিকশাওয়ালাদের আমার বাড়ি চেনাবার জন্য বলতে হয়, ওই যে কালো রঙের ভূতের বাড়ির পাশেই। রশিদ প্রথম দিন আমাদের বাড়ির বারান্দায় বসে ওই বাড়িটা দেখে খুব চটে গিয়েছিল। বলেছিল, ইস ওদিকে তাকানোই যাচ্ছে না। আই সোর! অর্ঘ্য এটা কী করেছে! মানুষের চক্ষুকে পীড়া দেবার কোনও রাইট নেই ওর! একদিন ডিনামাইট দিয়ে ওই বাড়িটা আমি উড়িয়ে দেব!

স্বাতী অর্ঘ্যর গানের ভক্ত। সুতরাং রশিদের কথার প্রতিবাদ করে বলেছিল, কেন, আমার তো বেশ ভালো লাগে। বেশ অন্যরকম!

অর্ঘ্যকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, আপনি বাড়িটার অমন বিচ্ছিরি কালো রং করেছেন কেন, অর্ঘ্য খুবই সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়, বেশ করেছি!

অর্ঘ্যর একটা ছোট্ট, পোর্টেব্‌ল হারমোনিয়াম আছে। প্রায়ই সেটা গলায় ঝুলিয়ে চলে আসে আমাদের বাড়িতে। আড্ডার মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শোনাতেও ওর ক্লান্তি নেই। আমার লেখক-বন্ধুদের অনেককেই অর্ঘ্য চেনে। তাদের সঙ্গে সে

সমানতালে আড্ডা দিতেও পারে। কারণ, অর্ঘ্য দারুণ পড়ুয়াও বটে। আর কোনও গায়কের আমি অর্ঘ্যর মতন এমন সাহিত্যপাঠের পরিচয় পাইনি।

একদিন সকালবেলা অর্ঘ্য এল কয়েকখানা সাদা কাগজ আর কয়েকটা মোটা মোটা কলম নিয়ে। কলম মানে জটার, যা দিয়ে পোস্টার লেখা হয়।

বারান্দায় বসে বলল, আমার বাড়ির বয়েস দশ বছর হয়ে গেল, এতদিন কোনও নাম দিইনি। এবার একটা নাম দিতেই হচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন, দিতেই হচ্ছে কেন? সবাই তো অর্ঘ্য সেনের কালো বাড়ি বলেই চেনে।

অর্ঘ্য বলল, না, ওতে হয় না। এখানে তো কোনও বাড়ির নম্বর কিংবা রাস্তার নাম নেই। বাড়ির নামেই ঠিকানা। সেইজন্যেই বাড়ির নাম দিতে হয়। নইলে চিঠিপত্র ঠিক মতন আসে না। এবার–

এই পর্যন্ত বলেই থেমে গিয়ে অর্ঘ্য আমার দিকে একটুক্ষণ কটমট করে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, শোনো, তোমার কাছ থেকে আমি কোনও সাজেশ্‌শান নিতে আসিনি। আমার বাড়ির নাম তোমাকে ঠিক করে দিতে হবে না। আমি তোমাকে দুটো নাম বলব, তুমি তার একটা বেছে নেবে। তুমি নিজে কোনও নাম বলতে পারবে না।

অন্যের বাড়ির নাম ঠিক করে দেবার ব্যাপারে আমার তেমন কোনও আগ্রহ নেই। তবু অর্ঘ্যর কথার ভঙ্গি শুনে কৌতূহলি হয়ে বললাম, আমি কোনও নামই বলতে পারব না? তাহলে তুমি আমার কাছে এসেছ কেন?

অর্ঘ্য বলল, এসেছি, তার কারণ আছে। আমি আমার বাড়ি নিজের ইচ্ছেমতন বানিয়েছি, নামও আমিই ঠিক করব। অন্য কেউ নাম দিতে যাবে কেন? দুটো নাম বলছি, তুমি তার একটা বেছে দাও!

আমি বললাম, শুনি, কী দুটো নাম?

অর্ঘ্য বলল, খোঁয়াড় অথবা অর্ঘ্য সেনের খোঁয়াড়।

আমি হেসে ফেলতেই অর্ঘ্য ধমক দিয়ে বলল, হাসছ? এটা সিরিয়াস ব্যাপার।

একটুক্ষণ চিন্তা করে বললাম, তাহলে 'অর্ঘ্য সেনের খোঁয়াড়'টাই ভালো।

অর্ঘ্য বলল, ঠিক আছে। কাগজ-কলম এনেছি। তুমি ওই নামটা গোটা গোটা অক্ষরে লিখে দাও। আমি তোমার হাতের লেখাটাই পাথরে বসাব ঠিক করেছি।

অগত্যা বেশ কায়দা করে লিখে দিলাম। 'অর্ঘ্য সেনের খোঁয়াড়'। দু'দিন বাদেই সেটা পাথরে খোদাই হয়ে গেল।

এ-কাহিনির এক বিন্দুও বানানো নয়। যে-কেউ এসে আমার বাড়ির প্রায় উল্টোদিকে অর্ঘ্য সেনের কালো বাড়ির গেটে আমার হাতের লেখায় ওই নেমপ্লেট দেখে যেতে পারে।

আমাদের বাড়ির নাম দিয়ে কোনও সমস্যাই হয়নি।

বাড়ি শেষ হবার আগেই আমার মা নাম ঠিক করে দিয়েছিলেন, 'একা এবং কয়েকজন'। এটা আমার প্রথম কবিতার বইয়ের নাম। একটা উপন্যাসেরও নাম। আরও তো কত বই লিখেছি। তবু মা এই নামটাই বেছে নিলেন কেন? মা জানেন, তাঁর এই ছেলে একা থাকার বদলে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়েই কাটাতে বেশি ভালোবাসে। এ-বাড়িতেও প্রায় সময়ই বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কেউ না কেউ এসে থাকে।

বাড়িটা বাসযোগ্য হবার পর মাকে নিয়ে এসেছিলাম একবার। বাড়ির চেয়েও সংলগ্ন পুকুরটি দেখে মা বেশি খুশি।

মা ফরিদপুরের মেয়ে। বাচ্চা বয়েস থেকেই সাঁতার জানেন। এখন এত বয়েসেও পুকুরে নেমে এপার-ওপার করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন। কলকাতার এই বয়েসি কোনও মহিলার সাঁতার জানার প্রশ্নই ওঠে না।

আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম, পুকুরে অনেক মাছ আছে। মা, ছিপ ফেলে মাছ ধরবে নাকি?

মা লজ্জা পেয়ে গেলেন।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় দেখেছি, আমার তরুণী মা তাঁর গ্রামের সখীদের সঙ্গে পাছ-পুকুরে ছিপ হাতে মাছ ধরছেন। প্রায় মিনিটে মিনিটে চটাস চটাস করে উঠছে রুপোলি পুঁটি মাছ। কখনও কালোর ওপর সোনালি ডোরা-কাটা ট্যাংরা, একদিন একটা বেশ বড় সাইজের ফলি মাছ ওঠায় কী আনন্দ!

মা এই পুকুরের চারপাশটা ঘুরে দেখতে দেখতে নানান গাছে হাত বুলোতে লাগলেন। যেন মনে মনে ফিরে গেছেন আমগ্রাম নামের সেই গ্রামে। দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ। সেই গ্রামের বাড়ি আর তাঁর কোনওদিন দেখা হবে না।

কামরাঙা গাছটায় কয়েকটা ফল ফলেছে এরই মধ্যে। মা থমকে দাঁড়িয়ে গভীর বিস্ময়ে বললেন, ওমা, সত্যি কামরাঙা! কতদিন দেখিনি।

একটা কামরাঙা ছিঁড়ে দেখতে লাগলেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। অন্যমনস্ক মুখ।

আমার মায়ের গায়ের রং খুব ফর্সা ছিল বলে তাঁর মামাতো, মাসতুতো ভাইবোনেরা তাঁকে ডাকত, রাঙাদি। আমি যেন অনেকদিন পর আমার মায়ের বদলে সেই রাঙাদিকে দেখতে পেলাম।

স্বাতীর মা অবশ্য আসতে পারেননি এ-বাড়িতে।

এ-বাড়িটা প্রধানত স্বাতীরই স্বপ্নের নির্মাণ। মানসনেত্রে ভবিষ্যতের বাড়িটি দেখে প্রাথমিক নক্‌শাটাও সে এঁকেছে, তারপর তার এক জামাইবাবুর সাহায্য নিয়ে তার পাকা রূপ দেওয়া হয়েছে। সোনাদি নামে এক রাজমিস্তিরি সেই নক্‌শার রূপকার।

বাবা-মাকে এনে এই বাড়ি দেখাবার ইচ্ছে তো স্বাতীর হবেই। কিন্তু আমার বাবা যেমন এ-বাড়ির বিন্দু-বিসর্গের কথা কিছু না জেনেই চলে গেছেন পৃথিবী থেকে, তেমনি স্বাতীর মা-ও এ-বাড়ি সম্পূর্ণ হবার কথা জেনে যেতে পারেননি।

কলকাতায় এক সন্ধ্যায় খুব ঝড় উঠেছিল। দোতলায় এক জায়গায় বসে চা পান করছিলেন অনেকে বসে। ছাদের একটা দরজা খোলা। দড়াম দড়াম করে আওয়াজ হচ্ছে মাঝে মাঝে। স্বাতীর মা ওপরে উঠে গেলেন সেই দরজা বন্ধ করে দিতে। বাড়িতে অনেক লোক, তিনি অন্য কারুকে ওই কাজটা করে দিতে বলতে পারতেন। অন্য কেউ লক্ষও করেনি, উনি কখন ওপরে উঠে গেছেন। স্বাতীর মা দু'হাত দিয়ে চেপে দরজা বন্ধ করতে গেলেন, প্রবল হাওয়ার দাপটে সেই দরজা ফিরে এসে ধাক্কা মারল তাঁর বুকে।

শরীরে কোনও রোগ ছিল না, বয়েসের ছাপ ছিল না, তবু ঝড়ের আঘাতে তিনি সেই যে জ্ঞান হারালেন, কয়েকদিনের মধ্যেও আর ফিরল না। বেঘোরে প্রাণ যাওয়া যাকে বলে। নম্র, মৃদুভাষী মহিলাটি হারিয়ে গেলেন নিঃশব্দে।

বছরখানেক পরে স্বাতীর বাবাকে নিয়ে আসা হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। তিনি তেজস্বী পুরুষ, নানা বিষয়ে গুণী, একসময় প্লেন চালিয়েছেন শখে, নিজস্ব কারখানার মালিক হয়ে কয়েকটি ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিনামূল্যে অনেক ওয়্যারলেস সেট বানিয়ে দিয়ে সাহায্য করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের। এখন আকস্মিক স্ত্রী-বিয়োগের পর দুর্বল হয়ে পড়েছেন খুব।

তখনও শান্তিনিকেতনে আমাদের বাড়িটি পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি। দোতলায় ছাদহীন দেয়াল, সিঁড়ি অসম্পূর্ণ, শুধু একতলায় দুটি ঘর ও রান্নাঘর, বাথরুম। স্বাতীর বাবার সঙ্গে স্বাতীর দিদি-জামাইবাবু, আরও কয়েকজন এসেছেন। কোনওরকমে গাদাগাদি করে থাকা। বাবাকে যত্ন করে তাড়াতাড়ি করে খাইয়ে, শোওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য স্বাতী ও তার বোনেরা ব্যস্ত। আমি সেখানে অনুপস্থিত। আমি তখন রাশিয়ার কয়েকটি শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

সে-রাতে দারুণ কৌতুক ও করুণ রসের এক ঘটনা ঘটেছিল।

স্বাতীরা যখন বাবাকে নিয়ে ব্যস্ত, হঠাৎ তার মধ্যে উপস্থিত কবি রফিক আজাদ আর তার স্ত্রী ও কবি দিলারা!

রফিকরা ঢাকা থেকে এসে কলকাতায় আমাদের খোঁজ করেছে। আমাদের ফ্ল্যাট তালাবন্ধ। লিফটম্যান জানিয়েছে যে, বউদিরা গেছেন শান্তিনিকেতন। রফিকরা বিকেলের ট্রেন ধরে রাত্তিরবেলা সেখানে গিয়ে হাজির। অন্য সময় হলে সবাই মিলে এক সঙ্গে হই-হুল্লোড় করা যেত, কিন্তু সেদিন একে তো স্থানাভাব, তাছাড়া রফিক সাহেব এর মধ্যেই বেশ নেশা করে ফেলেছেন। স্বাতীর জামাইবাবু এবং অন্য বোনের স্বামীরাও মদ্যপান করে, রফিককেও চেনে। ওঁরা ঠিক করেছিলেন, শ্বশুরমশাইকে খাইয়ে-দাইয়ে শুইয়ে দিয়ে গোপনে বোতল খুলবেন। কিন্তু রফিকবাবু তো তা বুঝতে পারছেন না। সুনীলদার বাড়িতে পান-টানের ব্যাপারে কোনও রাখঢাক তো সে আগে দেখেনি। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সবাই জোরে জোরে কথা বলে। রফিক অন্যদের ফিসফিস

কথাবার্তা শুনে কিছুই বুঝতে পারছে না। তার আবার খিদেও পেয়েছে এর মধ্যে। ওরা বাবার কাছ থেকে রফিককে লুকোবার জন্য একবার এ-ঘরে, একবার অন্য ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। রফিকের জড়ানো গলার আওয়াজ চাপা দেবার জন্য চালিয়ে দেওয়া হল গানের ক্যাসেট।

কিন্তু এইরকমভাবে কতক্ষণই বা লুকিয়ে রাখা হবে। আর রাত্তিরে ওরা ঘুমোবেই বা কোথায়? একমাত্র উপায় কোনও গেস্ট হাউসে নিয়ে যাওয়া। তখনও এত বেশি গেস্ট হাউস হয়নি। হুট করে কোথাও জায়গাও পাওয়া যায় না।

বাবা এবার খেতে বসবেন। এর মধ্যে আর রফিকদের আপ্যায়ন করা সম্ভব নয়। স্বাতী একটা টিফিন কেরিয়ারে ওদের জন্য খাবার ভরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এর মধ্যে আবার বৃষ্টি নেমেছে।

রফিক-দিলারা শান্তিনিকেতনের রাস্তাঘাট কিছুই চেনে না, তাছাড়া ঘুটঘুটে অন্ধকার। দু'খানা সাইকেল-রিকশা কোনওক্রমে জোগাড় করে স্বাতী চলল, অগতির গতি ইন্দ্রনাথের বাড়িতে।

রতনপল্লীতে ইন্দ্রনাথের বাড়িতে কখনও সে নিজে, কখনও তার ছোট ভাই বিমল এসে থাকে। আরও তিন-চারজনের অনায়াসে জায়গা হতে পারে। আমাদের বাড়ি তৈরি করার আগে আমরা ইন্দ্রনাথের বাড়িতে অনেকবার থেকেছি। খবর না দিয়েও যখন-তখন এসে উঠেছি। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের এমনই সম্পর্ক।

সে-বাড়ির বাগানের গেট সবসময় খোলা থাকে। কিন্তু মূল দরজার বাইরে তালা ঝুলছে!

কোথাও কোনও আলো নেই, মানুষের প্রাণের শব্দ নেই।

ইন্দ্রনাথ আর বিমল দুজনেই সপ্তাহের মধ্যে অর্ধেক দিন কলকাতায় থাকে। বাকি সময়টা শান্তিনিকেতনে। তাহলে, ওরা এখন কলকাতায়।

এতেও নিরুদ্যম হল না স্বাতী। রফিকদের জন্য একটা কিছু ব্যবস্থা তো করতেই হবে। এর মধ্যে রফিকের কিছুটা নেশা কেটে গেছে। তার এখন কাঁচুমাচু অবস্থা। দিলারা তো আগে থেকেই অস্বস্তিতে রয়েছে। বউদি, হঠাৎ এসে পড়ে তোমাদের খুব বিপদে ফেলে দিয়েছি, এই কথা বলছে বারবার।

ননী নামে একটি তরুণী এবং তার মা, তাঁর কোনও নাম নেই, তিনি শুধু ননীর মা, এই দুজন ইন্দ্রনাথদের বাড়িতে কাপড় কাচা, বাসন মাজা, রান্নাবান্নার কাজ করে। স্বাতী জানে, ননীর মায়ের কাছে রাখা থাকে এই বাড়ির এক সেট চাবি।

বৃষ্টির বিরাম নেই, তারই মধ্যে স্বাতী কাছাকাছি এক বস্তিতে ননীর মায়ের খোঁজ করতে লাগল। সৌভাগ্যবশত পাওয়া গেল ননীর মাকে। তিনি স্বাতীকে ভালোই চেনেন, সুতরাং তার হাতে চাবি দিতে আপত্তি করলেন না।

ফিরে এসে স্বাতী তালা খুলে রফিকদের নিয়ে গেল ভেতরে। বড় ঘরটিতে বিছানা

পাতাই আছে। আলো জ্বেলে ওদের চিনিয়ে দেওয়া হল বাথরুম। ফ্রিজে আছে জলের বোতল।

টিফিন কেরিয়ারটা নামিয়ে দিয়ে স্বাতী বলল, তোমরা খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ো। আমি কাল সকালে চা-টা পাঠিয়ে দেব। দুপুরের ট্রেনে আমার বাবা আর কয়েকজন ফিরে যাবেন। তারপর তোমরা আমাদের বাড়িতে এসে থাকবে। কোনও অসুবিধে হবে না।

দিলারা ভয়ার্ত গলায় বলল, বউদি, চারিদিক নিস্তব্ধ, আশেপাশে আর কোনও বাড়ি নাই মনে হয়। আমরা কার বাড়িতে থাকছি, চেনাশুনা নাই। রাত্তিরে কোনও বিপদ হবে না তো?

স্বাতী বলল, না না, শান্তিনিকেতনে কোনও বিপদ হয় না। এটা আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাড়ি, পরে তাকে সব বুঝিয়ে বলব।

দিলারা তবু বলল, রাত্তিরে যদি কেউ আসে।

স্বাতী বলল, দশটা বেজে গেছে, এখন আর কেউ আসবে না। যদি কেউ আসেও তোমরা দরজা খুলবে না। তোমরা আর বাইরে বেরিও না। কোনও ভয় নেই। সকালেই আমি আসব।

দরজা, এমনকী সব জানালাও বন্ধ করে দিল ওরা। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে, একটু পরে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

ইন্দ্রনাথের এই বাড়িটির একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। মার্কস এঙ্গেল্সের নাম আমরা সবাই শুনেছি। সেই এঙ্গেল্স সাহেবের এক নাতনির মেয়ে বিয়ে করেছিলেন এক বাঙালি ভদ্রলোককে। একসময় জার্মানি ছেড়ে সেই দম্পতিটি চলে আসেন শান্তিনিকেতনে। জার্মান মহিলাটি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও জীবনদর্শনে মুগ্ধ। ঠিক করেছিলেন, দুজনে সারাজীবন এখানেই থাকবেন।

সেই মহিলাই শখ করে নিজস্ব পরিকল্পনায় বানিয়েছিলেন এই বাড়ি। সাধারণ বাড়ির মতন নয়, কোনও কোনও জায়গায় তিন কোনা। কোথাও এমন একটা দেওয়াল, যার অবস্থানের ঠিক মর্ম বোঝা যায় না। প্রধান শয়নকক্ষটির এক দেওয়ালের কাছে একটি সাঁওতাল রমণীর আবক্ষ মূর্তি। হয়তো ওই মহিলার নিজেরই ভাস্কর্য। কিন্তু শয়নকক্ষে সেটি রাখার কী মানে হয়? অন্ধকারে সেদিকে তাকালে হঠাৎ বুক কেঁপে ওঠে। স্বাতী অবশ্য রফিক-দিলারাকে মূর্তিটি দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল, যাতে তারা ভয় না পায়।

যাই হোক, অকস্মাৎ তাঁর স্বামীর মৃত্যু হতে সেই জার্মান মহিলার আর এখানে মন টেকেনি। তিনি ভাঙা মন নিয়ে ফিরে যান নিজের দেশে। এ-বাড়ির অধিকার দিয়ে যান স্বামীর আত্মীয়দের। তাঁরা থাকেন কলকাতায়, এ-বাড়ি সম্পর্কে তাঁদের কোনও আগ্রহ ছিল না। শান্তিনিকেতনে নিজের দোকান চালু করার পর ইন্দ্রনাথ

এই বাড়িটা ভাড়া নেয়। কয়েক বছর ভাড়া দেবার পর বর্তমান মালিকরা প্রায় জলের দরে বাড়িটা বিক্রি করে দেন ইন্দ্রনাথকে। তাও একসঙ্গে পুরো টাকা দিতে হয়নি। যখন যেমন পেরেছে, দিয়েছে।

এক বিদেশিনী নিজের স্বপ্ন দিয়ে বাড়িটা বানিয়েছিলেন বলে ইন্দ্রনাথ আর সে-বাড়ির কোনও রদবদল করেনি। যেমনটি ছিল, তেমনই আছে।

সেই রাতে রফিক-দিলারা রাতের খাবার খেয়ে, দরজা এঁটে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল বটে, কিন্তু এ-কাহিনিতে যবনিকাপাত হল না।

মাঝরাত্তিরে গুনগন করে গান গাইতে গাইতে কে যেন এল বাগানের মধ্য দিয়ে। সদর দরজার সামনে এসে সেই গায়ক পকেট থেকে চাবি বার করে তালা খুলতে গিয়ে দেখে, তালা নেই, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

কয়েক মুহূর্ত সে ভুরু কুঁচকে থমকে রইল। এ-সময় তো বাড়ির মধ্যে কারুর থাকার কথা নয়। ইন্দ্রনাথকে সে কলকাতায় দেখে এসেছে। চোর-টোর নাকি?

দরজায় দুম দুম করে সে ধাক্কা দিল।

প্রথম কয়েকবার কেউ সাড়া দিল না।

তারপর সে হেঁকে বলল, ভেতরে কে? দরজা খোলো!

এবার রফিক জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? এখন দরজা খোলা হবে না!

সে বলল, বাঃ, বেড়ে ব্যাপার তো! এটা আমার বাড়ি, আর ভেতর থেকে একজন জিজ্ঞেস করছে, তুমি কে? আমি বিমল! দরজাটা খোলো শিগগির!

রফিকের দোষ নেই। স্বাতী তাকে ইন্দ্রনাথের কথা বলে গেছে, কিন্তু তাড়াহুড়োতে ইন্দ্রনাথের ভাইয়ের কথা উল্লেখ করে যায়নি।

রফিক বলল, ও নামে আমরা কারুকে চিনি না। দরজা খোলা হবে না!

বিমল রেগে গিয়ে বলল, দরজা খোলা হবে না মানে? এ কী মগের মুল্লুক? কে না কে বাড়িতে ঢুকে বসে আছে। দরজা ভেঙে ফেলব বলছি!

রফিক বলল, স্বাতীদি আমাদের এখানে রেখে গেছেন। স্বাতীদি বলেছেন...

স্বাতীর নাম শুনে বিমল একটু থমকে গেল। কোন দৈববলে স্বাতী এখানকার চাবি জোগাড় করেছে, তা তার মাথায় ঢুকল না। তবে, স্বাতীর পক্ষে সবই সম্ভব।

বিমল বলল, স্বাতীদি রেখে গেছেন? ঠিক আছে। থাকুন। দরজাটা একবার খুলুন, আমি ভেতরে যাব।

রফিক বলল, মাপ করবেন, আপনাকে চিনি না। এত রাতে দরজা খুলতে পারব না। ভেতরে আমার স্ত্রী আছেন।

বিমল বলল, কী মুশকিল! আমি তো বলছি আপনারা থাকুন। আমি শুধু একবার ভেতরে যাব, আবার বেরিয়ে আসব। এক মিনিট। আপনার স্ত্রীর দিকে আমি তাকাবও না।

রফিক বলল, কাল সকালে আসবেন, এখন দরজা খোলা সম্ভব নয়!

বিমল তার নিজের বাড়িতে একবারমাত্র এক মিনিটের জন্য ঢুকতে চাইছে। রফিক কিছুতেই দরজা খুলতে রাজি নয়।

খানিকক্ষণ তর্কাতর্কি করার পর বিমল ব্যর্থ হয়ে গজগজ করতে করতে ফিরে গেল।

পরদিন সকালে এসে রফিকদের মুখে সব শুনে স্বাতী বলল, এমা, ছি ছি, একবারও দরজা খোলোনি? তোমরাই বা বুঝবে কী করে? বিমল অতি শান্ত, ভালো মানুষ! অত রাতে, খুব সম্ভবত দার্জিলিং মেলে ফিরেছে।

তখনই স্বাতী ছুটে গেল ওদের বইয়ের দোকান সুবর্ণরেখায়। কাউন্টারে বসে আছে বিমল।

স্বাতীকে দেখেই কৃত্রিম ক্রোধের সঙ্গে বলল, স্বাতীদি, আপনি কাল রাতে কী করেছেন জানেন? আপনি কি ম্যাজিশিয়ান? চাবি পেলেন কোথায়? আমার বাড়ি জবর-দখল?

স্বাতী একেবারে মরমে মরে গিয়ে বলল, বিমল, তোমার কাছে মাপ চাইছি। তোমার খুবই অসুবিধে হয়েছে। কিন্তু আমার কোনও উপায় ছিল না, বাড়িতে বাবা রয়েছেন, সব মিলিয়ে ন'জন লোক, রফিকদের কোথায় শুতে দেব? তাছাড়া রফিক একটু খেয়েটেয়ে ছিল, বাবার সামনে যাতে, মানে, আমি সত্যি খুবই দুঃখিত। তুমি রাত্তিরে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঘুমোলে?

বিমল বলল, শান্তিনিকেতনে কি আমার শোবার জায়গার অভাব? সেজন্য না। আপনার নাম শোনার পর, বললাম তো থাকুন আপনারা, আমি শুধু একবার ভেতরে ঢুকব, তাও দিলেন না!

স্বাতী বলল, শুধু একটা রাত, আজ দুপুরেই আমাদের বাড়ি অনেকটা খালি হয়ে যাচ্ছে, আজ আর তোমার কোনও অসুবিধে হবে না।

বিমল বলল, একটা রাত কেন, পাঁচটা রাত, দশটা রাত থাকুক না আমাদের বাড়িতে, কোনও অসুবিধে নেই। শুধু একবার দরজাটা খুললে... ভদ্রলোক বললেন, ঘরের মধ্যে ওঁর স্ত্রী আছেন। আমি কি বাঘ না ভাল্লুক, ওঁর স্ত্রীকে খেয়ে ফেলতাম?

স্বাতী বলল, ওরা তো ভয় পেতেই পারে। অচেনা জায়গা, তোমার নামটা বলা হয়নি, নাম বললেও, যদি কোনও বদ লোক, মানে, তোমার বুঝি ঘরের মধ্যে দরকারি কোনও জিনিস ছিল?

বিমল এবার হেসে বলল, হ্যাঁ, ছিলই তো। খুব দরকারি জিনিস। আধ বোতল রাম। রাম আগে আমি একটুখানি মোটে খেয়েছি, বাড়িতে ফেরার সময় ভাবতে ভাবতে আসছি, ফিরে গিয়ে বাকিটা খাব। তাতে রাত্তিরে ভালো ঘুম হবে। তা ওই ভদ্রলোক কিছুতেই বোতলটা নিতে দিলেন না!

কাছে এসে বিমল বলল, যা হয়েছে হয়েছে, আপনাকে আর অত লজ্জা পেতে হবে না। কমপেনসেশান হিসেবে একদিন দুপুরে মোচার ঘণ্ট আর চিতল মাছের পেটি খাওয়াতে হবে, সঙ্গে পুরো এক বোতল রাম। সুনীলদাকে চিঠি লিখে দিন, যেন বিদেশ থেকে ভালো রাম নিয়ে আসেন!

সকালবেলাতেও অবশ্য বিমলের সেই আধবোতল রাম পাওয়া যায়নি। বোতলটা ছিল, কিন্তু ভেতরের পদার্থের যথারীতি সদ্ব্যবহার করে ফেলেছিল রফিক।

আমাদের একা এবং কয়েকজনে এরকম আরও অনেক জনের কাহিনি আছে।

এ-বাড়ির রাজমিস্তিরির নাম সোনাদি। সকলেই নাম শুনে ভাবত, কোনও মেয়ে বুঝি। কোনও মেয়ে কি রাজমিস্ত্রি হয়? আমি তো এ-পর্যন্ত দেখিনি। সে আসলে এক মধ্যবয়েসি জোয়ান পুরুষ। তার নাম সোনাউদ্দি, লোকে সংক্ষেপ করে নিয়েছে সোনাদি। তার ভাই মনিরুদ্দি, তাকে কিন্তু কেউ মনিদি বলে না। সে মনিরুদ্দিই আছে।

এ-অঞ্চলে সব রাজমিস্তিরি এবং বাড়ি তৈরির মিস্তিরিই মুসলমান।

আমাদের আয়ান রশিদ *দা সেভেন্‌থ ম্যান* নামে একটি তথ্যচিত্র তুলেছিল কলকাতার মুসলমানদের বিষয়ে। নামের তাৎপর্য এই যে, কলকাতার প্রতি সাতজন মানুষের মধ্যে একজন মুসলমান। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সম্রাট বাহাদুর শাহ আর নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ আর টিপু সুলতানের বংশধর, কিছু কিছু সম্ভ্রান্ত, খানদানি মুসলমানও আছেন। আর অধিকাংশেরই জীবিকা দর্জির কাজ কিংবা বাড়ি তৈরির মিস্তিরির কাজ।

এই দুটি পেশা কী করে মুসলমানদের একচেটিয়া হল, তার ঐতিহাসিক কারণ আমি জানি না। কলকাতা শহরে এমন কোনও বাড়ি নেই, যাতে মুসলমানদের হাতের স্পর্শ লাগেনি। উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত প্রাসাদোপম বাড়িগুলোও মুসলমান মিস্তিরিদের তৈরি।

প্রত্যেক বাড়ি তৈরির পেছনেই কোনও না কোনও স্বপ্ন থাকে। তবে সেই স্বপ্ন বাড়ির মালিকের। আর যারা নিজের হাতে সেই স্বপ্নের বাস্তব রূপ দেয়, তারা সেই স্বপ্নের অন্তর্গত নয়। কিংবা তাদেরও বোধহয় কিছু স্বপ্ন থাকে। কী জানি।

আমাদের এই সোনাদি মানুষটি ধীর, স্থির। শান্তভাবে কথা বলে। দেখলেই বোঝা যায়, সে যে-কাজটি হাতে নেয়, সেটা সে নিখুঁতভাবে করতে ভালোবাসে। শুধু পয়সার জন্য নয়। এই ধরনের মানুষই শিল্পী হয়।

একদিন সোনাদিকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি কতগুলো বাড়ি বানিয়েছ?

সোনাদি বলল, গোনাগুন্‌তি নাই, তা চল্লিশ-পঞ্চাশখানিক হবে!

যদি পঞ্চাশটা বাড়ি বানিয়ে থাকে, তার এখন যা বয়েস এবং স্বাস্থ্য, তাতে সে আরও পঞ্চাশটা বাড়ি বানাতে পারবে মনে হয়। মোট একশোটি পাকা দালান-কোঠার সে নির্মাতা।

এরা মুর্শিদাবাদের লোক, প্রায় সারা বছরই এই অঞ্চলে কাজ করে। শুধু বর্ষার সময় নিজেদের গ্রামে ফিরে যায়।

একবার আমি বহরমপুর থেকে বাসে চেপে কান্দি যাচ্ছি, মাঝপথে এক জায়গায় সোনাদি উঠল সেই বাসে। আমাকে দেখে নমস্কার জানাল।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বাড়ি এদিকেই নাকি?

সে বলল, আজ্ঞে। চল্লিশ মিনিটের পথ। কাতানিয়ার চরে।

আমি যাচ্ছিলাম বন্ধু সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গ্রামের বাড়িতে। সেখানে সে একটি স্কুল-প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করছে, সেটা দেখার জন্য। খুব তাড়াহুড়ো নেই। কী খেয়াল হল, নেমে পড়লাম সোনাদির সঙ্গে তার গ্রামের স্টপে।

সোনাদি খুব খাতির করে নিয়ে গেল তার বাড়িতে।

টালির চাল দেওয়া কয়েকখানা ঘর একসার দেওয়া। সোনাদিদের যৌথ পরিবার, সবাই থাকে একসঙ্গে। কিছু ধান-জমি আছে। একখানা ভ্যানগাড়ি করে আনা হয়েছে কিছু টালি। এই বর্ষার আগে একখানা ঘরের চালে পুরোনো টালি বদলে নতুন টালি বসানো হবে।

সোনাদির ঘরের দাওয়ায় বসে একটা বড় পেতলের বাটিতে দুধ-মুড়ি-কলা খেতে খেতে অবধারিতভাবে আমার একটা কথা মনে পড়ল।

সোনাদি পেশায় রাজমিস্তিরি। কত কায়দায়, কতরকম পাকা বাড়ি সে বানিয়েছে। নক্‌শা দেখে দেখে নিপুণভাবে সেই বাড়ি সে গড়ে তুলতে পারে। অথচ তার নিজের পরিবার থাকে টালির ছাদের বাড়িতে।

আমাদের বাড়ি কিংবা যেসব বাড়ি বানিয়েছে সোনাদি, পরে কখনও সেইসব বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার কী মনে হয়? সে-মনের খবর আমি কোনওদিন জানতে পারব না।

ইদানীং সোনাদিকে আর শান্তিনিকেতনে দেখতে পাই না। সে হয়তো অন্য কোনও টাউনশিপে কাজ পেয়েছে।

এখন রাজমিস্তিরি হিসেবে নবীর খুব নাম। এর বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। বুদ্ধিমান, চটপটে স্বভাবের। সে একটা মোটরবাইকে চেপে ঘোরে। এর আগে আমি অনেক মিস্তিরিকে শুধু সাইকেলে চেপে আসতে দেখেছি। এই প্রথম শব্দ করা মোটরবাইকে এক রাজমিস্তিরি। হাতে ঘড়ি তো এখন সকলেরই থাকে, নবী আবার দু'চারটে ইংরিজি কথাও বলে।

কাজের ব্যাপারে সে বেশ নির্ভরযোগ্য। নতুন যারা বাড়ি বানাচ্ছে, তাদের মুখে শুনেছি। খরচ বাঁচাবার নানারকম ভালো পরামর্শও দেয় নবী। একদিন ট্রেন ধরতে হবে বলে আমি সাইকেল-রিকশা খুঁজছি, নবী নিজে থেকে এগিয়ে এসে আমাকে তার মোটরবাইকের পেছনে চাপিয়ে স্টেশনে পৌঁছে দিল।

সোনাদির নিজের বাড়িটা আমি দেখেছিলাম বলেই কৌতূহলবশে আমি নবীকে তার বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম।

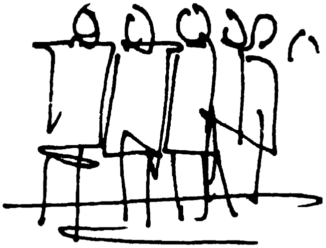
নবীর বাড়ি সিউড়ির কাছে একটি গ্রামে। বাড়িতে তিনটে গরু আছে। পরিবারের জনসংখ্যা আটজন। গোয়ালঘর, রান্নাঘরে টালির চাল। নিজস্ব টিউবওয়েল আছে। এক ছেলে কলেজে পড়ে।

গত বছর সে বাড়ির একখানা ঘর পাকা করেছে। ঢালাই করা ছাদ। সেই ছাদের ওপর আরেকটা ছোট ঘর। সেটাও পাকা। তবে ঘরের বাইরের দেয়ালে এখনও রং করা হয়নি। রঙের হঠাৎ দাম বেড়ে গেছে।

একসময় নবী লাজুকভাবে আমাকে বলল, এই সিজিনে স্যার, ওপরের ছোট ঘরটায় একটা পাখা বসিয়েছি। ছেলেটা ওই ঘরে বসে পড়াশুনো করে, গরমে তার খুব কষ্ট হয়।

আমি বললাম, বাঃ!

কয়েক হাজার বছরের মধ্যে এইটুকু উন্নতিই বা মন্দ কী!



২৮

শান্তিনিকেতন থেকে ফেরার পথে ট্রেনে প্রথম এক ঘণ্টা কাটে গান শুনে ও খবরের কাগজ পড়ে। বাকি সময়টা ঘুমিয়ে।

গায়করা সবাই চেনা। এদের মধ্যে কার্তিক বাউল আমাদের বাড়িতে এসেও গান শুনিয়ে গেছে। রোগা-পাতলা চেহারা, দেখলে মনে হয় বাচ্চা ছেলে, তা নয় অবশ্য। অসম্ভব তার গলার জোর, চলন্ত ট্রেনের আওয়াজ ছাপিয়ে যায় তার গান। কার্তিক বাউলকে দেখে কিংবা ব্যবহারে বোঝা যাবে না যে, সে একাধিকবার বিলেত-আমেরিকা ঘুরে এসেছে। কেউ তাকে ওই বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে লাজুকভাবে বলে, হ্যাঁ, ওই একবার...। অর্থাৎ সাহেবদের দেশ দেখে সে এমন কিছু অভিভূত হয়নি।

একবার নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটিতে বঙ্গ সম্মেলনে সে আমন্ত্রিত হয়েছিল। সেবারে সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। বঙ্গ সম্মেলন এখন বৃহৎ আকার ধারণ করেছে। আট-দশ হাজার নারী-পুরুষ আসে, নানা রকমের অনুষ্ঠান হয় ছোট-বড় বিভিন্ন কক্ষে। কেউ কেউ আমন্ত্রিত হয়েও পাঁচ-দশ মিনিটের বেশি মঞ্চে সুযোগই পায় না।

সেবারে দেখি কার্তিক বাউল ভিড়ের মধ্যে মুখ চুন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাকে দেখে জলে-পড়া মানুষের মতন দৌড়ে আমার সামনে এসে বলল, দাদা, দেখুন তো, আমাকে মোটে দুখানা গান গাইতে দিয়েছে, আর ডাকছেই না। এত দূর দেশে এসে শুধু দুটি গান শুনিয়ে ফিরে যাব?

আমি বললাম, কার্তিক, তুমি হচ্ছ বাউল। তোমাকে মঞ্চে উঠে গান গাইতে হবে কেন? তুমি তো যেখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে গান গাইতে পারো। এই হলটার চারপাশে নানা রকম দোকান রয়েছে। তুমি মাঝখানে দাঁড়িয়ে তোমার দো-তারা বাজিয়ে গান শুরু করে দাও! তারপর দেখো কী হয়।

প্রায় ম্যাজিকের মতন ব্যাপার হল।

সে গান শুরু করতেই আস্তে আস্তে ভিড় জমতে লাগল। কার্তিকের মাইক লাগে

না, খালি গলাতেই দারুণ জোর। কিছুক্ষণের মধ্যেই এমন হল, মূল অনুষ্ঠানের চেয়েও কার্তিকের গানের শ্রোতার সংখ্যা বেশি।

আমি প্রথমে কয়েকটা খুচরো ডলার ছুড়ে দিলাম তার সামনে। সেই দৃষ্টান্তে আরও অনেক ডলার পড়তে লাগল তার সামনে। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে গান শোনাল কার্তিক। তার সামনে ছড়িয়ে থাকা ডলারের নোট আর খুচরোগুলি গুনে দেখা গেল প্রায় হাজার ডলার। কার্তিক সরলভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করল, এতে কত টাকা হয়?

আমি জানলাম, দেশে ফিরে গিয়ে এতে তোমার প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা হবে।

সে সঙ্গে সঙ্গে বলল, তাইলে এবার আমার ঘরের ছাদে নতুন টালি বসাবো। আর যদি একটা টিউকল হয়—

আবার এখন শান্তিনিকেতনের ট্রেনে সে গান গেয়েই দিনে পঞ্চাশ-ষাট টাকা উপার্জন করে।

কার্তিক কোনওভাবে জেনেছে যে, আমি কবিতা-টবিতা লিখি। একদিন সে আমাকে বলল, দাদা, আমাদের জন্য দু'একখানা নতুন গান লিখে দিন না।

আমি অবাক। আমি ওদের জন্য গান লিখব কী করে, আমি কি বাউল? বাউল গানে বিশেষ একটা দর্শন থাকে। রূপকের গূঢ় অর্থ থাকে। আমার কবিতা তো সে-জাতের নয়। তাছাড়া আমার ধারণা, এইসব বাউল গানই অনেক কাল ধরে প্রচলিত, রচয়িতার নামও জানা যায় না।

আমার সে-ধারণার কথা শুনে কার্তিক বলল, কেন, অরুণদা তো প্রায়ই আমাদের গান শিখিয়ে দেন।

অরুণদা অর্থাৎ শ্রীরামপুরের অরুণ চক্রবর্তী। সে-ও একজন কবি। কিন্তু সে যে এইসব গান লেখে, তা আমার জানা ছিল না। অবশ্য অরুণের মুখভর্তি বিশাল দাড়ি, অনেক সময় সে গেরুয়া রঙের পোশাকও পরে। সুতরাং তাকে প্রায় বাউল বলে মনে হতেও পারে। আমাকে দেখে কেউই কুক্ষণের বাউল ভাববে না।

কার্তিকের গলায় একটা গান শুনে আমার খুব ভালো লেগেছিল। তুই লাল পাহাড়ির দেশে যা। রাঙা মাটির দেশে যা/হেথায় তোরে মানাইছে না গো/এক্কেবারে মানাইছে না গো..., ঠিক বাউল না, অনেকটা সাঁওতালি গানের মতন। আমি *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে এক প্রবাসী তরুণের মুখে এই গানটা ব্যবহার করেছিলাম। এখন এই গানটি খুবই জনপ্রিয়।

এক কবিতাপাঠের আসরে অরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা। সে আমার কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, সুনীলদা, আপনার উপন্যাসে আমার গানটা দেখে খুব আনন্দ হল।

তখনও আমি জানতাম না, ওই লালপাহাড়ির গান অরুণের লেখা। তাকে বললাম, ঠিক আছে অরুণ, আমার ওই উপন্যাসের যদি আর একটা সংস্করণ হয়, তাতে তোমার নাম দিয়ে ঋণ স্বীকার করব।

খাঁটি বাউলের মতনই অরুণ বলল, না, না, নাম দিতে হবে না। আপনার ভালো লেগেছে। এটাই তো আমার কাছে গর্বের ব্যাপার। এখন ও গান শুধু আমার নয়, সকলের।

আমি বললাম, ও গানের কোন লাইনটা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে, জানো? 'হেথায় তোরে মানাইছে না গো'। আমাদের অনেককেই অনেক জায়গায় বে-মানান মনে হয়।

এবারেও কার্তিকের গান শোনার পর ওর সঙ্গে দু-চারটে কথা বলছি, কার্তিক আবার অনুরোধ করল, দাদা লিখলেন না আমাদেব জন্য? রোজই শুধু কয়েকখানা গান ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতে ভালো লাগে না। যারা নিয়মিত প্যাসেঞ্জার, তারাও নতুন গান চায়।

আমি বললাম, দেখব চেষ্টা করে, যদি তোমাদের মতন কিছু লিখতে পারি।

সামনের সিটে বসে একজন এসব কথা শুনছিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে কার্তিককে বলল, ভাই, আমার অনেক কবিতা লেখা আছে, তুমি তার দু-চারখানা নিয়ে গান করবে? বেশ ভালো গান হবে। একখানা গান আছে মা সরস্বতীর ওপরে। আর একখানা—

কার্তিকের মুখটা শুকনো হয়ে গেল। হয়তো অনেক স্থানীয় কবিই তাকে এই অনুরোধ করে। কিন্তু যার তার গান নিতে সে মোটেই রাজি নয়। সে গম্ভীরভাবে সেই কবিটিকে বলল, ঠিক আছে, দেবেন। দেখব।

আরে না দাঁড়িয়ে সে আমাকে বলল, চলি দাদা, বউদি ভালো আছেন তো?

কার্তিক চলে যাবার পরেও সেই কবিটি আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েই রইল। ঢ্যাঙা চেহারা, সাদা শার্ট পরা, তেল চুকচুকে চুল। মোটেই কবিসুলভ নয়।

হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে সে বলল, ভালো আছেন স্যার? আমায় চিনতে পারছেন? আমার নাম রামপ্রসাদ দাস।

নাম শুনেই মনে হল, বাংলা ভাষার যে-অসংখ্য কবিদের আমি চিনি না, নামও শুনিনি, এই লোকটি সেই দলের।

এসব ক্ষেত্রে 'না, চিনতে পারছি না' বলার বদলে হালকা গলায় বলতে হয়, ও, আচ্ছা!

রামপ্রসাদ দাস বলল, সে-ই যে আপনি আমাদের থানায় এসেছিলেন?

বিভিন্ন কারণে কোনও কোনও থানায় আমাকে যেতে হয়েছে বটে, কিন্তু থানার সঙ্গে কবির কী সম্পর্ক?

জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের থানা মানে, কোন থানায় বলো তো?

সে বলল। মেমারির থানায়। আপনি এসেছিলেন, আপনার সঙ্গে আয়ান রশিদ খান সাহেব আর শক্তি চট্টোপাধ্যায় ছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল। সেই থানার অ্যাকাউন্ট্যান্ট একজন কবি ছিল বটে। এই কবিটি আমাদের বারবার অনুরোধ করছিল একটা বটগাছ দেখে যাবার জন্য। আমরা গিয়েছিলাম নারীপাচার চক্রের খোঁজখবর নিতে, শুধু শুধু বটগাছ দেখতে যাব কেন? শেষ পর্যন্ত এর পেড়াপিড়িতে যেতেই হয়েছিল, এবং একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছিলাম। মস্তবড় একটা পুরোনো বটগাছের মগডালের দুদিকে পা ঝুলিয়ে বসেছিল একজন মানুষ। পাগল নয়, সে একজন খুনি। তার মেয়েকে ধর্ষণের পর খুন করে যারা ফেলে রেখে গিয়েছিল, তাদের একজনকে একদিন হাটের মধ্যে চিনতে পেরে সে মাছকাটা বঁটি দিয়ে তার গলা কেটে দেয়। এক্ষেত্রে সে খুনি হলেও কি অপরাধী? তবু আইন এমন নির্বিকল্প যে, পুলিশ তাকে ধরবেই।

তাই সে-লোকটি গাছের ওপর বসেছিল, দিনের পর দিন। পুলিশ ইচ্ছে করেই তাকে ধরেনি। ওখানকার দু-একজন পুলিশের কথা শুনে মনে হয়েছিল, তারাই চুপি চুপি রাত্তিরবেলায় লোকটিকে খাবার দেয়। পুলিশের এরকম মানবিক দিকের পরিচয় পাওয়াও তো একটা অভিজ্ঞতা।

আমি কবিটিকে জিজ্ঞেস করলাম, সেই লোকটির কী হল? সেই যে লোকটা বটগাছের ওপর থাকত? পুলিশ শেষ পর্যন্ত তাকে ধরেছে?

সে বলল, সেই ভবাই মণ্ডল? না, স্যার, পুলিশ তাকে ধরেনি। গাছের ওপরেই ছিল দেড় মাস, বহু লোক তাকে দেখতে আসত। তারপর একদিন সকালে দেখা গেল, সে গাছতলায় মরে পড়ে আছে। আসল ব্যাপার কী, রাত্তিরে ঘুমের সময় সে নিজেকে বেঁধে বাখত গাছের একটা ডালের সঙ্গে। সেদিন কোনও রকমে বাঁধন খুলে গিয়েছিল। ধপাস করে অত উঁচু থেকে পড়ে গেছে। এর চেয়ে পুলিশের হাতে ধরা দিলে তো আরও কটা দিন বাঁচতে পারত।

আমার পাশের সিটটি খালি, আমি তাকে বসতে বলিনি, সে নিজেই বলল, একটু বসতে পারি স্যার?

রেলের আসন, আমি তো আপত্তি জানাতে পারি না।

বসেই সে বলল, অনেক দিন পর আপনাকে দেখলাম স্যার, আমার কী ভাগ্য। আমার কয়েকটা কবিতা একটু দেখে দেবেন স্যার?

এই ভয়ই পাচ্ছিলাম।

রাস্তায়-ঘাটে কারুর কবিতা শোনা কিংবা পড়ে দেখা আমার একেবারে অসহ্য। তবু কিছু কিছু নাছোড়বান্দা কবির পাল্লায় পড়তেই হয়। তাদের মেজাজ দেখিয়েও কোনও লাভ হয় না।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমার সঙ্গে বুঝি সবসময় কবিতা থাকে?

একগাল হেসে সে বলল, হ্যাঁ স্যার। রাখি, মাঝে মাঝেই নিজেরই পড়তে ইচ্ছে করে। আবার হঠাৎ কিছু মাথায় এসে গেলে এক জায়গায় বসে পড়ে লিখে ফেলি। ট্রেন জার্নির সময় স্যার, আমার অন্য কোনও বই-টই পড়তে ইচ্ছে করে না।

পকেট থেকে সে কবিতা বার করার উদ্যোগ করতেই আমি খুব মিষ্ট করে বললাম, ভাই রামপ্রসাদ, সবসময় তো কবিতা পড়ার মুড থাকে না। আমার বাড়িতে একটা বেতের চেয়ার আছে। শুধু সেই চেয়ারটায় বসলেই আমার কবিতা পড়তে ভালো লাগে। তুমি বরং তোমার কিছু কবিতা পোস্টে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিও, পড়ে দেখব!

রামপ্রসাদ তবু বলল, অন্তত একটা পড়ে দেখুন!

আমি বললাম, না। মুড নেই, এখন যদি পড়ি, হয়তো তোমার একটা ভালো কবিতাও খারাপ লেগে যেতে পারে। তাহলে আর কোনওটাই পড়া হবে না। তুমি বাড়িতেই পাঠাও!

সে বলল, একদিন আপনার বাড়িতে গিয়ে ওই বেতের চেয়ারটা দেখে আসতে পারি?

বললাম, তা আসতে পারো। তবে রবিবার সকাল ছাড়া অন্য কোনও দিন আমি কারুর সঙ্গে দেখা করি না।

এ-আলোচনা সমাপ্ত করার জন্য আমি মুখ ফেরালাম জানালার বাইরে প্রকৃতির দিকে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সে দুবার খুক খুক করে কাশি দিয়ে বলল, স্যার, একটা খুব জরুরি কথা আছে, দয়া করে শুনবেন?

মুখ ফিরিয়ে বললাম, খুব জরুরি যদি হয় তাহলে শুনব। কিন্তু সংক্ষেপে।

রামপ্রসাদ বলল, পাল্লা রোডে পুলিশের এস আই ইমতিয়াজ আলি খুন হয়েছে, কাগজে দেখেছেন নিশ্চয়ই? অবশ্য শুধু একটা কাগজে বেরিয়েছে—

কেউ খুন হলে সেটা খুবই দুঃখের কথা। কিন্তু আমি তো কাগজে সব খুনোখুনির খবর পড়ি না। আর এটা আমার পক্ষে জরুরি কথা হবে কেন? আমি তো ওই পুলিশ ভদ্রলোককে চিনতাম না।

না, স্যার। আপনারা মেমারিতে এসেছিলেন মেমারিতে মেয়েপাচারকারীদের সন্ধানে, তাই না? ততদিনে পাখি উড়ে গেছে। ওরা আগেই খবর পেয়ে যায়। আপনি পাল্লা রোড কোথায় জানেন?

জানব না কেন? বর্ধমানের কাছেই।

এই পাল্লা রোডেই এখন মেয়ে-স্মাগলারদের নতুন আখড়া হয়েছে। আপনি যদি রশিদ খান সাহেবকে নিয়ে কালকেই একটা ঝট্‌কা সফরে এসে পড়েন, তাহলে

ওদের ধরে ফেলা যায়। ওরা পনেরো-কুড়িটা মেয়েকে আটকে রাখে সবসময়। কিছু কিছু চালান হয়ে যায়। আবার নতুন আসে। লোকাল থানায় প্রথমে খবর দেবারও দরকার নেই। জায়গাটা আমিও চিনিয়ে দিতে পারি। পালের গোদা রহমৎ শেখ ওখানেই থাকে।

তুমি কবিতা লেখো আর থানার হিসেবপত্তর রাখো। তুমি এসব জানলে কী করে?

ওই ইমতিয়াজ ছিল আমার বন্ধু। একেবারে ডাকাবুকো পুলিশ। কোনওদিন ঘুষ খায়নি। হ্যাঁ স্যার, সত্যি বলছি, ছোটবেলা থেকে ওকে চিনি। আমাদের ইয়ে সাহেবের মতন, নাম করতে চাই না, অনেকেই তো স্মাগলারদের কেনা হয়ে আছেন, কিন্তু ইমতিয়াজ মেয়েদের বে-ইজ্জতি কোনওদিন সহ্য করতে পারে না। সে উঠে পড়ে লেগেছিল ওদের ধরার জন্য। আমি তাকে সাবধান করে বলেছিলাম, তুই বেশি বেশি মাথা গলাতে যাস না, ওসব বড় বড় রাঘব বোয়ালদের ব্যাপার। ও শুনল না। দেখলেন তো, খুন হয়ে গেল। ওই রহমৎই ওকে খুন করিয়েছে। আপনি স্যার একটা ব্যবস্থা করুন।

ট্রেনে সিগারেট টানা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। এইসময় একটা সিগারেটের ধোঁয়ার জন্য ভেতরটা উসখুস করতে লাগল।

আনোয়ারা নামের মেয়েটি যখন উধাও হয়ে গিয়েছিল, তখন তার সন্ধান করার সূত্রে আমি বেশ কয়েকটা জায়গায় টুঁ মেরেছিলাম। নারী-পাচারকারীদের সম্পর্কে জেনেছিলামও অনেক কিছু। এখন আনোয়ারা ফিরে গেছে ঢাকায়। এখন তার সমস্যা অন্য রকমের। সে-সম্পর্কে আমার করার কিছুই নেই।

নারী-পাচার একটা বীভৎস বাস্তব সত্য। দিন দিন তা বাড়ছে। কিন্তু পাচারকারীদের পেছনে ছুটে বেড়ানো তো আমার কাজ নয়। পুলিশও এ-কাজ মন দিয়ে করে না, তাও ঠিক। রশিদ ট্রান্সফার হয়ে গেছে উত্তরবঙ্গে, পাল্লা রোড থানা তার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। অন্য দু-একজন চেনা পুলিশ অফিসারকে এ-খবর জানিয়েও কি কিছু লাভ হবে? ইমতিয়াজ নামের পুলিশটির খুন হওয়ার খবর শুনেও খটকা লাগছে। এইসব স্মাগলাররা সাধারণত খুনটুনের সঙ্গে জড়াতে চায় না। পুলিশ খুন হলে পুলিশ বিভাগ তৎপর হয়ে ওঠে, এই খুনিকে তারা ধরবেই। পুলিশ কি এবার রহমৎ শেখের মতো ক্ষমতাবান স্মাগলারকে ধরবে শেষ পর্যন্ত?

রামপ্রসাদকে বললাম, এই জরুরি খবরটা আমাকে জানাবার জন্য ধন্যবাদ। দেখা যাক, কী করা যায়। এখন ভাই আমি একটু ঘুমোব।

চোখ বুজে অন্য পাশে ফিরলাম।

পাতলা তন্দ্রার মধ্যে বারবার মনে পড়তে লাগল সেই গানটা : তুই লাল পাহাড়ির দেশে যা/রাঙামাটির দেশে যা/হেথায় তোরে মানাইছে না গো/এক্কেবারে মানাইছে না গো...।

মনে হল, ট্রেনটা কলকাতার দিকে নয়, ছুটছে মধ্য প্রদেশের জঙ্গল ভেদ করে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট টিলা। প্রচুর পলাশ ফুল ফুটেছে। আমি লাল পাহাড়ির দেশে যাচ্ছি।

দুদিন পরেই কাগজে পড়লাম, রহমৎ শেখ ধরা পড়েছে আর পাল্লা রোডের এক বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে সতেরোজন তরুণী ও কিশোরী মেয়েকে। যাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আনা হয়েছে বিক্রির উদ্দেশ্যে।

এ-সংবাদ অপ্রত্যাশিত নয়। অন্যান্য অনেক খুনের ঘটনা চাপা পড়ে গেলেও পুলিশ-খুনের আসামি ঠিক চটপট ধরা পড়ে যায়। রহমৎ শেখ এই ভুলটা করতে গেল কেন? নারী-পাচারের ডেরাটি ভেঙে দিয়েও পুলিশ দেখাল, এই ব্যাপারে পুলিশ নিষ্ক্রিয় নয়, তারা ওইসব মেয়েকে উদ্ধারও করে। যতই ঘুষ-টুষের ব্যাপার থাক, মাঝে মাঝে এরকম কর্তব্যপরায়ণতা দেখাতেই হয়। অবশ্য এতেও ওই কারবার বন্ধ হবে না। রহমৎ শেখ তো আর একা নয়, ওর মতন আরও কতজন আছে তা কে জানে!

এখন দেখতে হবে, রহমৎ শেখের কতটা শাস্তি হয়। বেশ কিছুদিন ঝুলিয়ে রেখে আর ঠিক মতন সাক্ষ্য-প্রমাণ না-দিয়ে পুলিশ মামলাটা দুর্বল করে দেয়, বিচারক অনেক সময় খালাস দিয়ে দেন। অথবা মাত্র দু-তিন বছরের কারাদণ্ড। স্মরণকালের মধ্যে কোনও নারী-পাচারকারীর কঠিন শাস্তির কথা শোনা যায়নি।

আর একটা ব্যাপারও হতে পারে, পুলিশ-খুনের জন্য ইমতিয়াজের সহকর্মীরা খেপে আছে। বিচারের জন্য অপেক্ষা না করে তারাই জেলখানার মধ্যে মারধর করে রহমৎ শেখকে মেরে ফেলতে পারে। তারপর তার গলায় একটা দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে বলা হবে, আসামি আত্মহত্যা করেছে। এটা নির্ভর করছে, রহমৎ শেখের টাকার জোর কতটা। দশ-কুড়ি লাখ টাকা খরচ করতে পারলে নাকি সবরকম অভিযোগ থেকেই মুক্তি পাওয়া যায়। ওইরকম 'আত্মহত্যার' কেস হয় সাধারণ শ্রেণির অপরাধীদের মধ্যে। তাদেরই ফাঁসি হয়। একটাও খুব ধনী লোকের ফাঁসি হয়েছে কখনও?

রহমৎ শেখের সঙ্গে ধরা পড়েছে বাবুলাল আর পারভিন বিবি। সব নারী-পাচারচক্রের পাণ্ডাদের মধ্যেই দু-একজন মহিলা। রশিদ এখানে থাকলে ওই পারভিন বিবির সঙ্গে একবার দেখা করতাম।

পরক্ষণেই এ-চিন্তাটা তাড়িয়ে দিলাম মন থেকে। কী হবে এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে। এইসব বিষয় নিয়ে গল্প লেখার ইচ্ছেও হয় না আমার।

রশিদের কথা মনে পড়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রশিদের ফোন। এ যেন টেলিফোন নয়, টেলিপ্যাথি। উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরেছে কিছুক্ষণ আগে, দুদিন পরেই তাকে লন্ডনে যেতে হবে। গলার স্বরে চাপা খুশি ও ব্যস্ততার ভাব, তবু এর মধ্যে

একবার দেখা করতে তো হবেই। আজই সন্ধ্যায়।

রশিদ লন্ডন যাচ্ছে গৌতম ঘোষের সঙ্গে। নিজে ফিল্মের পরিচালক হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা রশিদের ঘুচে গেলেও এখন সে গৌতম ঘোষের বিভিন্ন ফিল্মে কিছু কিছু সহযোগিতা করে। উর্দু বা হিন্দি সংলাপ ঠিক করে দেয়। কাহিনি-চিত্র বানাবার ফাঁকে ফাঁকে গৌতম দু-একটা তথ্যচিত্রও বানায়। সেগুলি খুবই উচ্চাঙ্গের। কয়েক বছর আগে গৌতম বানিয়েছিল শানাই বাজাবার জাদুকর ওস্তাদ বিসমিল্লা খানের জীবনী-চিত্র। তাতে রশিদের সঙ্গে বিসমিল্লার ছিল দীর্ঘ সাক্ষাৎকার।

মজার ব্যাপার, সেই সাক্ষাৎকারে আমরা বিসমিল্লার প্রায় সব কথা বুঝতে পারলেও রশিদের অনেক কথাই বুঝতে পারিনি। এমনই তার বিশুদ্ধ, চোস্ত উর্দু। বিসমিল্লার ভাষা বেনারসের হিন্দি মেশানো।

সম্প্রতি গৌতম হিমালয়ের ওপরে প্রাচীন সিল্‌ক রুট নিয়ে একটা তথ্যচিত্র বানাবার জন্য বহুদিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরেছে, প্রচুর খেটেছে। সেই ছবির ইংরেজি ধারাভাষ্য লিখছে রশিদ। ও ইংরেজি ভাষাটা সম্ভবত উর্দুর চেয়েও ভালো জানে, উচ্চারণও চমৎকার।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের প্রযোজনায় সেই তথ্যচিত্রটি এখন প্রায় প্রস্তুত হয়ে গেছে। প্রস্ফুটন ও ধারাভাষ্য বসানোর কাজ হবে লন্ডনের কোনও স্টুডিওতে। ওদের দুজনকে থাকতে হবে প্রায় তিন সপ্তাহ।

রশিদ আমাকে বলল, তুমিও চলো না আমাদের সঙ্গে। ওখানে বেশ আড্ডা হবে।

আমি বললাম, পাগল নাকি? বিনা কাজে আমি লন্ডনে যাব শুধু তোমাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে? অত রেস্তো আমার নেই।

রশিদ বলল, তুমি তো তোমার প্রাণের বন্ধু ভাস্করের বাড়িতে থাকবে, কোনও খরচই লাগবে না। আর প্লেন ভাড়াটা ম্যানেজ হয়ে যাবে। ভাস্করকে জানালে সে তোমাকে একটা টিকিটও পাঠিয়ে দিতে পারে।

সে প্রশ্নই ওঠে না। আমি বরং রশিদকে সাবধান করে দিলাম, তুমি এবার ঠিক মতন ছুটি-টুটি নিয়েছ তো? মনে আছে, আগের বারের সেই গোলমালের কথা?

কয়েক বছর আগে রশিদ হুট করে চলে গিয়েছিল ঢাকায়। সেখানে কয়েকদিন প্রচুর আড্ডা ও পানাহার করে ফেরার পরই অফিস থেকে শো-কজ নোটিস পেয়েছিল। চাকরি প্রায় যায়-যায় অবস্থা। বিনা অনুমতিতে দেশের বাইরে যাওয়া তার পক্ষে অপরাধ। বিশেষত পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসার হিসেবে পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশে যেতে তার স্পেশাল পারমিশন নেবার কথা। সেবারে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে শুধু মৃদু বকুনি খেয়ে রক্ষা পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ও তো কবিতা লেখে। তাই অতসব নিয়ম-কানুন মানার কথা ওর মনে থাকে না।

রশিদ বলল, সেবারে এক ব্যাটা ডিআইজি আমার নামে চুকলি কেটেছিল, নাইলে

কিছুই হতো না। এবারে আমি আগে থেকে চিফ মিনিস্টারের কনসেন্ট নিয়ে নিয়েছি।

রশিদ আর গৌতম একই হাউজিং এস্টেটে থাকে। রশিদের তিনতলা, গৌতমের চারতলা। সান্ধ্য আড্ডা বসল গৌতমের অ্যাপার্টমেন্টে। এরা দুজনেই রাতপাখি, রাত দুটো-তিনটের আগে আড্ডা ভাঙে না। গৌতম তবু নিজের স্ত্রীকে কিছুটা মানে, রশিদ তো একেবারে পাত্তাই দেয় না নাসিমকে। স্বাতী আমাকে সীমারেখা বলে দিয়েছে, ঠিক মধ্যরাত্রি। সবাই জানে, আমি আমার বউকে কী রকম ভয় পাই।

গৌতম পরিকল্পনা করছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* নিয়ে ফিল্ম তৈরি করার। বাংলাদেশের এক প্রযোজক আগ্রহী। শুটিং হবে সেখানেই। খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা। সবচেয়ে কঠিন হোসেন মিঞার চরিত্রে সঠিক অভিনেতা খুঁজে পাওয়া।

এই নিয়ে আলোচনা চলছে। এইসময় রশিদের কাজের লোক এসে বলল, তার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে, সাহেব কি দেখা করবেন?

রশিদ হাত নেড়ে বলল, নেহি, নেহি, ভাগাও ভাগাও!

কাজের লোকটি বলল যে, সে ওপরে উঠে এসেছে, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

রশিদ বিরক্ত হয়ে বলল, কেন ওপরে এনেছো? বোল দেও, আজ মুলাকাত নেহি হোগা। কাল সুবে আনা।

লোকটি চলে যাবার একটু পরেই দরজার কাছ থেকে কেউ ডাকল, রশিদ ভাই, রশিদ ভাই!

রশিদ বলল, মনে হচ্ছে বাংলাদেশের কেউ। এক মিনিট, আমি ভাগিয়ে দিয়ে আসছি।

যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রশিদ আবার ফিরে এল একজন আগন্তুককে সঙ্গে নিয়ে। রশিদের মুখে বিরক্তির বদলে প্রফুল্লভাব।

আগন্তুকটি দীর্ঘকায়, সুপুরুষ। তবে তার একটি হাত ভাঙা, প্লাস্টার করা, একটা স্লিং ব্যান্ডেজ নিয়ে ঝোলানো। অন্য হাতে একটি বিমানের প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ, তার ভেতরের বস্তুটি নির্ভুলভাবে চেনা যায়। আর সেটাই রশিদের খুশির কারণ।

রশিদ পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, এর নাম মোজাম্মেল, মোজাম্মেল হক। বাংলাদেশের জার্নালিস্ট। সবাই ওকে সুন্দর নামে ডাকে। দ্যাখো ও আমাদের জন্য একটা ব্ল্যাক লেবেল নিয়ে এসেছে।

আমি ওকে দেখেই চিনেছি, বললাম, ও তো লেখেও সুন্দর হক নামে। ওর বইয়ের নাম আলপিনে বিদ্ধ ভ্রমর।

সুন্দর বলল, নমস্কার, সুনীলদা। আপনি আমার বইয়ের নাম মনে রেখেছেন?

গৌতম বললেন, বসুন, বসুন। আপনার হাত ভাঙল কী করে?

রশিদ জিজ্ঞেস করল, কার রান্নাঘরে উঁকি দিয়েছিলে? ব্যাচিলরদের মাঝে মাঝে হাত ভাঙা আশ্চর্য কিছু না। বিশেষ করে যদি এরকম হ্যান্ডসাম চেহারা হয়।

সুন্দর একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলল, আপনাদের আড্ডার মাঝখানে এসে বিঘ্ন ঘটালাম। আমি দুঃখিত। আসলে কাল সকালেই আমি ম্যাড্রাস চলে যাব। তাই রশিদ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য—

রশিদ বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এসেছ বেশ করেছ, নো ফর্মালিটি। খালি গেলাস আছে। তুমি নিজে ঢেলে নেবে?

সুন্দর বলল, আমি ওসব খাই না। থ্যাঙ্ক ইউ। শুধু একটু পানি।

রশিদ বলল, খাও না? গুড সোল! তাহলে আর না ধরাই ভালো। হাতটা কতখানি ভেঙেছে? ফ্র্যাকচার?

সুন্দর বলল, কমপাউন্ড ফ্র্যাকচার।

রশিদ বলল, সেজন্য ম্যাড্রাস যেতে হবে কেন? অর্থোপেডিক ট্রিটমেন্ট, ঢাকাতে ভালো হয় না?

সুন্দর বলল, হয়। কিন্তু আমার বাম চোখেও ইনজুরি হয়েছে। রক্তপড়া বন্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু ওই চোখে দেখতে পাই না। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। চোখের চিকিৎসা তো ম্যাড্রাসেই ভালো, তাই না?

রশিদ বলল, তা ঠিক। কিন্তু কী হয়েছিল, খুব জোরে আছাড় খেয়েছিলে? একবার আমারও হাত ভেঙেছিল।

সুন্দর বলল, না, আছাড় খাইনি। অন্ধকারের মধ্যে দু-তিনজন এসে আমায় পিটিয়েছে, বোধহয় আমাকে মেরেই ফেলতে চেয়েছিল। কোনওরকমে আমি দৌড় দিয়া পলাইছি।

মেরে ফেলতে চেয়েছিল? তোমাকে? তোমার মতন একটা ভালো ছেলেকে? তারা কারা?

এখনও জানি না। তবে জানতে পারব ঠিকই।

আমার দিকে তাকিয়ে সুন্দর বলল, সুনীলদা চেনেন। আনোয়ারা নামে একজন মহিলা সম্পর্কে আমি দুটো আর্টিকেল লিখেছিলাম কাগজে। সেইজন্য কারা যেন টেলিফোনে আমাকে হুমকি দিয়েছে। তারপর এই—



২৯

আমি আনোয়ারার খবর রাখতে চাই বা না চাই, কিছু কিছু খবর ঠিকই কানে এসে যায়। ঢাকা এখন আর তেমন দূর নয়। এখন অনেকের মনে নেই, এক সময় বাংলাদেশের জন্মের আগে, পূর্ব পাকিস্তানের আমলে, ঢাকায় ফোন করতে হলে প্রথমে লাইন পেতে হতো লন্ডনের। মাথার পেছন দিয়ে কান ছোঁয়ার মতন। চিঠিপত্রও বিনিময় হতো না। দু'দিকের বাঙালিকে সম্পূর্ণ পৃথক করার চরম অবস্থা পৌঁছেছিল ১৯১৯ থেকে ১৯১৯-এর মধ্যের বছরগুলোতে।

আনোয়ারার খবর আমি আর জানাতে চাই না কেন? চেনাশুনো সব মানুষের জীবন-কাহিনি সম্পর্কেই তো সকলের আগ্রহ থাকে। ওই মেয়েটি সম্পর্কে আমি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি, কারণ, ওর কাহিনি বড় বেশি ট্র্যাজিক। সমাজ যাদের অবৈধ বলে, সেরকম একটি সন্তানকে নিয়ে মেয়েটি বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে, কিন্তু ওর ওপর আক্রমণ আসছে অনেক দিক থেকে। কিন্তু তাকে সাহায্য করার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা বা উপায় আমার নেই। শুধু শুধু ওর বিপদ আর বেদনার কথা শুনে আমার মন ভারী করার কী দরকার। তার চেয়ে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলাই তো ভালো।

সুন্দর হক নামে ছেলেটির অবস্থা দেখে আমার দু'রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। অজ্ঞাত আততায়ীরা ওকে এমনভাবে মেরেছে যে, ওর একটা চোখ বোধহয় একেবারে নষ্টই হয়ে যাবে। আনোয়ারার সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটাই ওর অপরাধ? তক্ষুনি আমার মনে হয়েছিল, পরের ফ্লাইটেই চলে যাই ঢাকায়, দেখা করি আনোয়ারার সঙ্গে। তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকব, দেখি কে আমাকে মারতে আসে!

বলাই বাহুল্য, এটা ছেলেমানুষি চিন্তা। আমার কি আর মারামারি করার বয়েস আছে নাকি? তাও অন্যদেশে গিয়ে?

দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ভয়। ওরে বাবা, সুন্দরকে অমনভাবে মেরেছে, আমি এরপর ঢাকায় গেলে আর আনোয়ারার কোনও খোঁজ-খবরই করব না। ও কোথায় থাকে, তা জানলেও যাব না সে-রাস্তায়। সাধ করে কে আর মার খেতে চায়?

ঢাকায় যাওয়াও ইদানীং কমে গেছে। আগে কোনও অনুষ্ঠানে ডাক পেলেই ছুটে

যেতাম। এখন এড়িয়ে যাই। যদিও ঢাকার বন্ধু-বান্ধব, শুভার্থীদের সঙ্গে আড্ডা মারার প্রবল ইচ্ছেটা রয়ে গেছে।

আসল সত্যি কথাটা হল, আমি আনোয়ারাকে যতই মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করি, তা কি সম্ভব? মেয়েটা যে-লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত সে জিতবে না হারবে, সেই পরিণতি জানার কৌতূহল থাকবে না? কোনও মানুষের জীবনই তো শেষ পৃষ্ঠা-ছেঁড়া বই নয়! আগাথা ক্রিস্টির একটা উপন্যাস পড়তে গিয়ে একবার দেখেছিলাম, শেষের চারটে পাতা নেই। সেই বইয়ের আর একটি কপি জোগাড় করার জন্য আমার প্রায় পাগলের মতন অবস্থা হয়েছিল।

একটা লেখার প্রয়োজনে কালিদাসের *শকুন্তলা* নাটকটি আমাকে নতুন করে পড়তে হল। পড়তে পড়তে একটা নতুন উপলব্ধিতে কিছুক্ষণ বিস্মিত হয়ে বসে রইলাম একা একা।

কালিদাসের রচনার সঙ্গে কি আনোয়ারার কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে? আছে। পড়ছি এক বিশ্ববিখ্যাত নাটক, তারই মাঝখানে মনে পড়ে গেল আনোয়ারার কথা।

শকুন্তলায় মা মেনকা নামে এক অপ্সরা, আর বাবা বিশ্বামিত্র ঋষি। ঋষিকে যৌন প্রলোভন দেখিয়ে তাঁর সাধনা থেকে বিচ্যুত করার জন্যই দেবতারা পাঠিয়েছিলেন ছলাকলাপটিয়সী সেই দিব্যাঙ্গনাকে। কার্যসিদ্ধির পর সন্তানটিকে ফেলে রেখে মেনকা হাওয়া হয়ে গেল। বাচ্চাটি বর্ধিত হতে লাগল কন্বমুনির আশ্রমে।

অর্থাৎ শকুন্তলা একটি অবৈধ সন্তান। তা নিয়ে তখনকার দিনে কেউ মাথা ঘামায়নি। কালে কালে শকুন্তলা হয়ে উঠল এক অসামান্য রূপলাবণ্যময়ী যুবতী। একদিন অরণ্যে শিকার করতে করতে সেই আশ্রমে এসে উপস্থিত হল রাজা দুষ্মন্ত। কন্বমুনি তখন আশ্রমে নেই, অতিথির সেবা-যত্নের ভার শকুন্তলার ওপরে। শকুন্তলাকে দেখেই রাজা একেবারে মুগ্ধ। রাজারা সবাই বহুভোগী, যে-কোনও নারীর ওপরেই তাদের অধিকার বর্তে যায়। আর রাজা দুষ্মন্ত বিশেষ করে অতি প্রেমিক পুরুষ, প্রায় লম্পটই বলা যায়। শকুন্তলাকে দেখে তিনি উপভোগের আবেগ দমন করতে পারছেন না, আবার জোর-জবরদস্তি করাও তাঁর মর্যাদার পক্ষে অনুপযুক্ত। রাজারা যত ইচ্ছে বিয়ে করতে পারতেন, সুতরাং একটা বিয়ের ছুতো করে শকুন্তলাকে অধিকার করা যেতেই পারত। কিন্তু কন্বমুনি অনুপস্থিত। তাঁর অনুমতি ছাড়া সেটা সম্ভব নয়।

কন্বমুনি ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য নেই রাজা দুষ্মন্তর। তখন গান্ধর্ব বিবাহ নামেও একটা প্রথা ছিল। নিভৃতে দুজনে মালাবদল করলেই বিয়ে হয়ে গেল। এটা আসলে বিয়েই নয়। সহবাস সম্মতি বলা যেতে পারে। অর্থাৎ ধর্ষণ না করে রাজা ওই সরল আশ্রমবালাটিকে সিডিউস করে শয্যাসঙ্গিনী হতে রাজি করালেন।

কামনা-বাসনা তৃপ্ত করে রাজা ফিরে গেলেন রাজধানীতে। শকুন্তলা গর্ভবতী হয়ে পড়ার পর কন্বমুনি তাকে পাঠিয়ে দিলেন রাজার কাছে। দুষ্মন্ত এর মধ্যে ওই প্রেম

পর্বটি ভুলে মেরে দিয়েছেন।

মহাভারতের শকুন্তলা বৃত্তান্ত ও কালিদাসের নাটকের কাহিনিতে বেশ কিছুটা তফাত আছে। মহাভারতে, আশ্রমেই শকুন্তলার পুত্রের জন্ম হয়, ছ'বছর বয়েস পর্যন্ত সেখানেই সকলের আদর পেয়ে বর্ধিত হয় শিশুটি। তার নাম ভরত, আর সিংহের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করত বলে তার আর একটি নাম সর্বদমন। সেই ছ'বছরের ছেলের হাত ধরে শকুন্তলা এসে উপস্থিত হন রাজ সমীপে। সহবাসের সময় রাজা শকুন্তলাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁর সন্তানই যুবরাজ হবে। সে কথা বিশ্বাস করেই শকুন্তলা এসেছেন ছেলেকে সেই উত্তরাধিকার দিতে।

দুষ্মন্ত কিছুতেই মানতে রাজি নন যে, ওই বালকটি তাঁর সন্তান। কথা কাটাকাটি থেকে শুরু করে গালিগালাজ। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে কুলটা, স্বৈরিণী ইত্যাদি কিছুই বলতে বাকি রাখলেন না। শকুন্তলাও উলটো রাজাকে বললেন, ইতর, বিষ্ঠাভোজী শূকর ইত্যাদি।

সে যাই হোক, শকুন্তলা নিজে ছিলেন অবৈধ কন্যা, তাঁর ছেলে ভরতের জন্মও বিবাহ-বহির্ভূত সংসর্গে। কালক্রমে এই ভরত চন্দ্র বংশের রাজা হয়েছিলেন। তাঁর বংশকে বলে ভারত বংশ, তাঁরই নামে প্রাচীন এই দেশটির নাম ভারতবর্ষ, এখনকার পাকিস্তান, বাংলাদেশ যার অন্তর্গত ছিল। অথচ এখন তিনটি খণ্ডেই জন্মের বৈধতা নিয়ে এত খুঁতখুঁতনি কেন? কোনও কুমারী মাতা যদি তার সন্তানকে নিয়ে সংসার করতে চায়, তার প্রতি সমাজ খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে। আগেকার দিনের চেয়েও আমরা এত সঙ্কীর্ণমনা হয়ে যাচ্ছি! এক এক সময় বুঝতে পারি না, মানবসভ্যতা এগোচ্ছে না পেছুচ্ছে? হয়তো সভ্যতা একটা চরম বিন্দুতে উঠেছিল, এখন শুরু হয়ে গেছে পতন। বিজ্ঞানের নানারকম আবিষ্কার কিংবা গ্রহান্তরে যাত্রা, এইসব মোটেই সভ্যতার অগ্রগতির চিহ্ন নয়। প্রকৃত সভ্যতা হচ্ছে মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠা। এতরকম ধর্মীয় বিভেদে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে মানবাধিকার!

যখনই কোনও কারণে আমার মধ্যে কিছুটা নৈরাশ্যের ভাব আসে, তারপরেই আমার এমন একটা কিছু ঘটে, যার ফলে আবার সবকিছু ঝলমল করে। অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ আলোর ঝলকানি।

এবার সেই ঝলকানির নাম রাজ্জাক হাওলাদার!

দরজা খোলার পর সেই ছোটখাটো মানুষটিকে দেখে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হয়েছিল, সে কিন্তু একগাল হেসে অতিপরিচিতের মতন বলল, কেমন আছেন, দাদা? মনে আছে আমারে। আপনি আমারে দ্যাখছেন, মন্ট্রিয়েলে, ঢাকায়।

ব্যস্ততার কারণে নয়, আমি আর কীসে এমন ব্যস্ত! অনেক কিছু যে ভুলে যাই, তার কারণ, যখন গল্প-উপন্যাস লিখি, তখন সেইসব কাল্পনিক চরিত্রের সঙ্গে ঘোরাফেরা, তাদের সংসার, তাদের অন্তর্জীবনের মধ্যে থাকতে হয় বলে বাস্তবের

অনেক কিছু মনে পড়ে না।

আমি ফাঁকা ফাঁকা গলায় বললাম, তাই নাকি। দেখা হয়েছিল?

সে বলল, মনে নাই? আমি আপনার গ্রামের মানুষ। একই গ্রামে জন্ম। আপনি আমারে কইছিলেন গ্রাম-সহোদর। মাইজপাড়া গ্রাম।

এবার যেন একটু একটু মনে পড়ল। গ্রাম-সহোদর? মাইজ-পাড়া? সে-গ্রাম তো ছেড়ে এসেছি প্রায় আধখানা শতাব্দী আগে। কিছু কিছু স্মৃতি আছে অবশ্য।

বসার পর একটু সুস্থির হয়ে রাজ্জাক বলল, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এবার আপনে শুধু তারিখটা ঠিক করেন।

কী ব্যবস্থা হয়ে গেছে?

মাইজপাড়া যাওয়ার। এইখান থিকা একটা গাড়িতে যাবেন বনগাঁ বর্ডার, ওপারে আর একখান গাড়ি থাকবে। সেখান থিকা সোজা মাদারিপুর। প্লেনে ঢাকা হয়ে যাওয়ার চেয়ে এটাই অনেক ভালো।

দাঁড়াও, দাঁড়াও : আমি এখন যাব কী করে? আমার অনেক কাজ।

কাজ তো থাকবেই। সেইজন্যই তারিখ ঠিক করি নাই। আপনার মর্জি মতন যাবেন।

কিন্তু যাব কেন, রাজ্জাক?

নিজের গ্রাম দ্যাখতে ইচ্ছা করে না?

না।

কী বলেন দাদা, নিজের জন্মস্থান একবার দ্যাখতে ইচ্ছা করে না? আপনার কোনও অসুবিধা হবে না।

অসুবিধের প্রশ্ন নয়। মানে—

রাজ্জাককে বোঝানো খুব মুশকিল। এর মধ্যে বাংলাদেশে তো গেছি কতবার, কিন্তু মাদারিপুরের কাছে নিজেদের সেই গ্রাম আর দেখতে ইচ্ছে করে না। সেই সেবারে .তা ইমদাদুল হক মিলনের সঙ্গে গাড়িতে মাদারিপুরের ওপর দিয়েই গেছি বরিশাল, তবু ভেতরে তো ঢুকিনি।

পঞ্চাশ বছর আগে দেখা সেই গ্রাম নিশ্চয়ই এর মধ্যে বদলে গেছে অনেক। সেটাই স্বাভাবিক। আমি আমার বাল্যস্মৃতিটাই ধরে রাখতে চাই।

রাজ্জাক অসহিষ্ণুভাবে বলল, বউদি কোথায়?

স্বাতী আসতেই রাজ্জাক সরাসরি তাকে প্রশ্ন করল, বউদি, আপনার শ্বশুরবাড়ির গ্রাম কখনও দ্যাখছেন? শ্বশুরের ভিটায় একবার পা দিতে ইচ্ছে করে না?

স্বাতী চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে বলল, হ্যাঁ! যাওয়া যাবে সেখানে?

তারপর রাজ্জাক আমাকে ছেড়ে স্বাতীর সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হল। দুদিন ধরে ওরা এমন ষড়যন্ত্র করল যে, শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই রাজি হতে হল আমাকে।

সে-ভ্রমণের কাহিনি আমি অন্যত্র লিখেছি। এখানে আর পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই।

বিস্ময়ের কথা এই যে, রাজ্জাক এত উৎসাহের সঙ্গে, এত ব্যবস্থাপনায়, নিজের টাকা খরচ করে আমাদের নিয়ে যেতে চাইল কেন? তার তো কোনও স্বার্থ নেই।

পৃথিবীতে যখন এত স্বার্থপর, কর্কশ, হীন স্বভাবের মানুষ দেখি, তারই মধ্যে অকস্মাৎ রাজ্জাক হাওলাদারের মতন মানুষ এসে সব গ্লানি দূর করে দেয়। এরকম ভালোবাসার কাছে নিচু হয়ে যায় মাথা।

রাজ্জাকের শ্বশুরবাড়ি শরিয়তপুরে, মাইজপাড়ায় খুব কাছাকাছি গ্রাম। রাজ্জাকের স্ত্রী ফিরোজা যেমন বুদ্ধিমতী ও রূপসী, তেমনি তার স্বামীর সবরকম পাগলামিতেই তাল দেয়। তার বাপের বাড়ির মানুষজনও বেশ সজ্জন। সে-বাড়িতে এক দুপুরে প্রচুর আহারাদির পর এক ঘরে শুয়ে থেকে বিশ্রাম নিচ্ছি। হঠাৎ মনে পড়ল, আনোয়ারা এই গ্রামেরই মেয়ে না? শরিয়তপুরের নামই তো বলেছিল। যার কথা আর মনে রাখতে চাই না, তার কথা এইভাবেই তো হঠাৎ হঠাৎ মনে এসে যায়।

আনোয়ারার মা ঘুমের মধ্যেই মারা গেছেন, সে-খবর জানি। এখন আর কে আছেন সে-বাড়িতে? আনোয়ারা কি আর কখনও গ্রামের বাড়িতে আসতে পারবে? শহরের চেয়েও গ্রামেই তো ঘোঁট পাকায় বেশি। গ্রাম নিয়ে আনোয়ারার খুব গর্ব ছিল, সেই গ্রাম থেকে সে বঞ্চিত। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, আত্মীয়-বন্ধু কেউ পাশে নেই, কেউ একটু সহানুভূতি জানাতে গেলে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের কাছে প্রহৃত হয়!

তার মেয়েটা কত বড় হল? মুখে কথা ফুটেছে?

আমি অবশ্য আনোয়ারার বাড়ির কথা শরিয়তপুরে কারুকে জিজ্ঞেস করিনি। শুধু শুধু অন্যদের জড়ানোর কোনও মানে হয় না।

এর পরেও আবার কিছুদিন পরেই আনোয়ারার প্রসঙ্গ এসে পড়ে। এবার দিল্লিতে।

সাহিত্য আকাদেমির কাজের সূত্রে আমাকে প্রায়ই দিল্লিতে যেতে হয়। প্রতিবারই উঠি ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে। যে-কোনও বড় হোটেলের চেয়েও এই জায়গাটা আমার বেশি পছন্দ। খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পরিবেশও অতি সুন্দর। পাশেই বিশাল লোদি গার্ডেন্স, বহু ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে সেখানে। চতুর্দিকে ফুলের সমারোহ।

দেশ-বিদেশের অনেক লেখক-শিল্পী-অধ্যাপক এসে এখানেই ওঠেন। প্রতি দুপুরে দিল্লি শহরের শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের এখানে দেখা যায় আড্ডা দিতে। চতুর্দিকে ছড়ানো টেবিলগুলোতে হঠাৎ দেখা যেতে পারে রবিশঙ্কর কিংবা মকবুল ফিদা হুসেনকে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রকুমার গুজরাল আর তাঁর ভাই প্রখ্যাত শিল্পী সতীশ গুজরালকেও দেখেছি। শাবানা আজমি আর নাসিরউদ্দিন শাহ গল্প করছেন এক টেবিলে, সিনেমা স্টার বলে কেউ তাঁদের কাছে ভিড় জমায় না।

একটা মিটিংয়ে যাবার জন্য আমি ওপরতলা থেকে নেমে এসেছি, গেটের মুখে

চেনা এক মহিলার সঙ্গে দেখা। তাঁর নাম লরা সেন। পদবী শুনে বাঙালি মনে হলেও তাঁর মুখে আমি কখনও বাংলা শব্দ শুনিনি। দিল্লিতে এরকম কিছু কিছু মহিলা আছেন, যাঁরা সমাজের উচ্চস্তরে বিচরণ করেন। প্রায় সব পার্টিতেই তাঁদের দেখা যায়। সাজগোজের বাহার চোখে পড়বার মতন, কিন্তু আর কোনও পরিচয় জানা যায় না।

লরা সেন বললে, মিস্টার গঙ্গোপাধ্যায়, আপনারই খোঁজ করতে যাচ্ছিলাম। আজ সন্ধেবেলাতেই একটা রিসেপশান আছে, বাংলাদেশ থেকে একটা ডেলিগেশান এসেছে, সেখানে আপনাকে আসতেই হবে।

আমি বললাম, আজ সন্ধেবেলাতেই রিসেপশন, আর এখন আপনি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হঠাৎ দেখা হওয়ার পর আমাকে নেমন্তন্ন করছেন, এরকম নেমন্তন্নে আমি যাই না।

মহিলা একটু থতমত খেয়ে বললেন, না, মানে, হঠাৎই ঠিক হয়েছে, বাংলাদেশের ডেলিগেশান। আপনাদের মতন কয়েকজন উপস্থিত না থাকলে... আমাকে মিনিস্টার অফ কালচার ভার দিয়েছেন।

আমি বললাম, বাংলাদেশের ডেলিগেশান, দিল্লির অন্য ভাষার লেখকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন। আমার সঙ্গে তো দেখা হয়ই! দুঃখিত, আমি আসতে পারব না। আজ সন্ধেবেলা আমার অন্য কাজ আছে।

লরা সেন তবু বলতে লাগলেন, কয়েকজন আপনার কথা বিশেষ করে বলেছেন। আপনাকে অন্তত দশ-পনেরো মিনিটের জন্য আসতেই হবে।

এর চেয়ে বেশি খারাপ ব্যবহার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বলতেই হল, আচ্ছা ঠিক আছে, চেষ্টা করব।

মহিলাকে কাটিয়ে কোনওক্রমে বাইরে আসতেই পাশের লন থেকে একজন ডেকে বললেন, আরে সুনীল্‌, ইধার আও, এক কাপ চায়ে তো পিকে যাও!

দেখি যে একটা টেবিলে বসে আছে কেদারনাথ সিং। হিন্দি ভাষার বিশিষ্ট কবি। আমার অনেকদিনের বন্ধু। আমার মিটিং আর আধ ঘণ্টা পর, তবু একটু বসে যেতেই হয়।

কাছে যেতেই কেদারনাথ ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, ওই অর্ধউলঙ্গ মহিলাটি তোমাকে কী বলছিল? আজ সন্ধেবেলা একটা রিসেপশানে ডাকছিল তো? যেও না। ওরা শুধু নরম-পানি খাওয়াবে। আমরা বাংলাদেশিদের সঙ্গে আলাদাভাবে বসব।

আমি বললাম, আজ সন্ধেবেলা আমার অন্য একটি পার্টি আছে, সেখানে আরও সুন্দরী সুন্দরী মহিলা আসবে। বাংলাদেশিদের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে কলকাতায়।

কেদারের টেবিলে আরও দুজন পুরুষ বসে আছে। তারা আমার অচেনা বলেই আমি শুধু শুকনো ভদ্রতায় নমস্কার জানিয়েছি। টেবিলের ওপর এক পট চা রয়েছে, কেদার এক কাপ ঢেলে দিল আমার জন্য।

কেদার বাংলা বলে না। কিন্তু বাংলা ভালোই পড়তে পারে। *দেশ* পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। আমার সঙ্গে দেখা হলেই বাংলা সাহিত্যের টুকিটাকি বিষয়ের খোঁজ খবর নেয়। বাংলাদেশের আল মাহমুদের কবিতারও ভক্ত।

চায়ে চুমুক দিয়েছি, অন্য দুজনের মধ্যে একজন মৃদু স্বরে বলল, সুনীলদা, ভালো আছেন?

চমকে উঠলাম। সে হয়তো ভেবেছে, আমি ইচ্ছে করে তার সঙ্গে কথা বলিনি। কিন্তু সত্যি চিনতে পারিনি তাকে। আগে খানিকটা মোটার দিকে ধাত ছিল। এখন বেশ ছিপছিপে। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, চশমাটাও অন্য রকম। চশমা বদলালেই মানুষের মুখের চেহারা অনেকটা বদলে যায়।

শামীম! আনোয়ারার প্রাক্তন স্বামী।

আমি বললাম, হ্যাঁ শামীম, তুমি ভালো আছো তো? স্যরি, তোমাকে আগে লক্ষ করিনি। তাছাড়া, আমি তো জানতাম, তুমি দেশের বাইরে কোথাও যাওয়া পছন্দ করো না। তাই তোমাকে দিল্লিতে দেখব, তা ভাবিনি।

শামীম বলল, আজকাল মাঝে মাঝে যেতে হয়। ইউনিভার্সিটি থেকে ঠেলে পাঠায়।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কি এখানে একটা ডেলিগেশানের সঙ্গে এসেছ?

শামীম বলল, আমরা তিনজন হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের, এখানে সেমিনার মুঘল যুগের মিনিয়েচার পেইন্টিংয়ে সমাজচিত্র, এই বিষয়ে। আমার দুইজন কলিগ আবার কবিতাও লেখে, তারাই এখানকার কবিদের সঙ্গে মিট করতে চায়।

কেদারনাথ তাকে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, তুমি কবিতা লেখো না? বাংলাদেশের সবাই তো কবিতা লেখে। এমনকী তোমাদের একজন রাষ্ট্রপতি ছিল।

শামীম বলল, আমি ও-রসে বঞ্চিত। আর ওই যে রাষ্ট্রপতির কথা বললেন, তিনি অবশ্য চাকরি যাবার পর আর কবিতা লেখেন না। অন্তত কোথাও আর ছাপা হয় না।

আমার তাড়া আছে, আমাকে উঠতে হবে। তাড়াতাড়ি চা শেষ করে সকলের দিকে তাকিয়েই বললাম, চলি।

তৃতীয় ব্যক্তিটির সঙ্গে আলাপই হল না।

শামীম চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে বলল, সুনীলদা, আপনি এখানেই রয়েছেন? আপনার রুম নাম্বার জানতে পারি? যদি আপনার আপত্তি না থাকে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি?

আমার ঘরের নাম্বার জানিয়ে আমি বললাম, আমার সাহিত্য আকাদেমির কাজ আছে। ফিরে এসে বিকেল ৫টা থেকে ৭টা এখানে থাকব। তারপর আবার বেরুতে হবে। ওই সময়ে এসো। তবে কেদারনাথ সিংকে সঙ্গে এনো না।

অন্য ভাষার একজন লোক উপস্থিত থাকলে বাংলা কথা বলা যায় না। শুধু ইংরেজি

বলতে হয়। আর তাছাড়া, কেদারনাথ সিং ভালো কবি এবং ভালো মানুষ হলেও ইদানীং কড়া-পানীয়ের প্রতি ঝোঁক বেড়েছে। বিকেল থেকেই তো আর ওসব শুরু করা যায় না।

সাহিত্য আকাদেমিতেও অনেকের সঙ্গে দেখা হয়। কথায় কথায় সময় গড়িয়ে যায়। কিন্তু আমি ঘড়ির প্রতি নজর রেখেছিলাম, গেস্টহাউসে ফিরে এলাম পাঁচটা বাজার দশ মিনিট আগে।

তারপর শুরু হল প্রতীক্ষা।

দরজায় একবার বেল বাজতেই আমি দৌড়ে গিয়ে খুলে দিলাম। হাউস-কিপিং থেকে এসেছে বিছানা ঠিক করে দিতে।

একটু বাদে আবার বাইরে পায়ের শব্দ। কিন্তু আমার দরজার কাছে থামল না। একবার ফোন বেজে উঠল। অন্য লোক, এলেবেলা কথা।

আমি ঘন ঘন ঘড়ি দেখছি, সময় যেন কাটছেই না।

এক সময় আমার হাসি পেয়ে গেল। যে-কেউ দেখলে ভাবতে পারে, আমি যেন আমার প্রেমিকার প্রতীক্ষায় বসে আছি। এত ছটফটানি কীসের জন্য?

একটা গল্প জানার জন্য। আনোয়ারা আর শামীমের জীবনের গল্প। আমরা আনোয়ারার দিকের ভাষাটা জানি, শামীমের দিক থেকে হয়তো কাহিনিটা একেবারে অন্যরকম। এক সময় ওদের দুজনকে কী চমৎকার একটি হাসি-খুশি দম্পতি হিসেবে দেখেছিলাম। মাঝখানে কত কী ঘটে গেল! আজ শামীম নিজে থেকে আমার সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ দেখিয়েছে।

অপেক্ষার উত্তেজনা প্রশমনের জন্য আমি একটু পরে টিভি চালিয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। খানিকবাদে তন্দ্রা এসে গেল।

আর কেউ আমার ঘরের দরজায় বেল বাজায়নি, টেলিফোনও আসেনি। ঘুমের চটকা ভাঙতেই দেখি, সাতটা বেজে গেছে। এক্ষুনি পোশাক পালটে আমাকে তৈরি হয়ে থাকতে হবে। হিমাদ্রি নামে একজন এসে আমাকে নিয়ে যাবে এক পার্টিতে।

বারান্দার অনেকখানি চওড়া কাচের জানালার পাশে একটুক্ষণ দাঁড়ালাম। নিচের বাগান ঢেকে গেছে আবছা অন্ধকারে। দিল্লিতে সন্ধে হতে অনেক দেরি হয়। বাগানে বিন্দু বিন্দু আলো। পশ্চিমের আকাশ অরুণ বর্ণ। লোদি গার্ডেনসের গাছপালায় ডাকছে অজস্র পাখি।

শামীম হয়তো মত বদল করে ফেলেছে। লজ্জা পাচ্ছে আমাকে কিছু বলতে। আমারই-বা এত ঔৎসুক্য কেন? ওদের জীবন যে-ভাবেই এগিয়ে যাক না কেন, তাতে তো আমার কোনও ভূমিকা নেই!

লেখকরা সমসাময়িক জীবন থেকে এরকম কিছু কিছু গল্প আহরণ করে নেয়। সেসব গল্পেও তাঁদের কোনও ভূমিকা থাকে না। এটা কি লেখকদের স্বার্থপরতা?



৩০

কীসের আওয়াজ ঘুম ভেঙে গেল অনেক রাতে।

কত রাত জানি না। ফিরেইছি তো মধ্যরাত পেরিয়ে, তারপর কতক্ষণ ঘুমিয়েছি?

টেলিফোন বাজছে, বেশি রাত্রে টেলিফোনের আওয়াজ বেশি তীক্ষ্ণ মনে হয়। খাটের পাশেই ফোন, কিন্তু কোন পাশে? হোটেল-গেস্ট হাউসে হঠাৎ ঘুম ভাঙলে কোন জিনিসটা কোন দিকে ঠিক বোঝা যায় না। এক একদিন আমি বাথরুমের দরজা খুঁজে পাই না।

ফোনটা বেজেই চলেছে। হঠাৎ একটু ভয় করল। এত রাতে জরুরি ফোন, কোনও দুঃসংবাদ? নইলে দিল্লিতে এত রাতে কে আমাকে ফোন করবে?

এবারে ঘুম ছুটে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসে বেড সুইচ খুঁজে আলো জ্বালালাম। টপ করে তুলে নিলাম রিসিভারটা। হ্যালো?

কেউ একজন বলল, সরি, আপনার ঘুম ভাঙালাম? আগেও দুইবার ফোন করেছি, আপনি রুমে ছিলেন না।

কে আপনি?

শামীম। আপনার সঙ্গে দেখা করার কথা বলেছিলাম। এখন আসতে পারি?

শামীম আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল ঠিকই। সন্ধেবেলা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছি তার জন্য। আসেনি। এই কি দেখা করার সময়?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে আবার বলল, আমি আপনার একই ফ্লোরে আছি। একবার আসব? বেশিক্ষণ সময় নেব না। জাস্ট ফাইভ মিনিটস?

আমি যখন কোনও হোটেলের ঘরে একা থাকি, আমার পোশাকের ঠিক থাকে না। ওপরের গায়ে জামা-টামা পরার দরকার হয় না। অনেক সময় পাজামাও পরি না, একটা পাতলা চাদর গায়ে ঢাকা দিয়ে রাখা অভ্যেস।

তাড়াতাড়ি উঠে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে নিতে হল। সঙ্গে সঙ্গে দরজায় ধাক্কা।

শামীমকে দেখে আমি আঁতকে উঠলাম।

তার মাথায় একটা ফেট্টি—ব্যান্ডেজ বাঁধা। চুল উসকো-খুসকো, চক্ষু লাল।

টাইসমেত পুরো সুট পরা।

জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল, বসতে পারি?

হ্যাঁ, বসো। মাথায় লাগল কী করে?

শামীম অবহেলার সঙ্গে এক হাত নেড়ে বলল, ও কিছু না। বাথরুমের দরজায় গুঁতো লেগেছে। ওষুধ লাগিয়েছি।

কখন লাগল?

ওইসব কথা ছাড়েন। স্মল টক। কাজের কথা বলা যাক। আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন কেন?

কথাটা ঠিক নয়, আমি শামীমের সঙ্গে দেখা করার জন্য কোনও আগ্রহ প্রকাশ করিনি। সে নিজেই দেখা করতে চেয়েছিল। কিন্তু অনেকটা নেশা করার পর সে ব্যাপারটা উল্টে ফেলেছে।

ঢাকায় আমি যে-শামীমকে দেখেছি, সে কখনও এতটা নেশা করত না। সে ছিল নিতান্তই ভদ্র, সভ্য, সোশ্যাল ড্রিংকার।

অনেক অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি, যারা বেশি মাতাল হয়ে পড়ে, তাদের কথায় প্রতিবাদ করে লাভ হয় না। তারা মানবে না কিছুতেই। কথায় কথা বেড়ে যাবে।

তাই বললাম, হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আমার দেখা করার কথা ছিল। কিন্তু সে তো সন্ধেবেলা।

ওই যে একটা পার্টিতে ধরে নিয়ে গেল, যখন আসলাম, তখন আবার আপনি আপনার রুমে নাই। আপনারও পার্টি ছিল?

ঠিক পার্টি বলা যায় না। আড্ডা ছিল এক বাড়িতে।

ড্রিংক করেন নাই?

করেছি। তবে তোমার মতন এত বেশি না।

মুখ বিকৃত করে শামীম বলল, অ্যাঃ! ইন্ডিয়ান হুইস্কি! বিশ্রী খেতে। তবু জোর করে খাওয়াল। ঢাকায় আমরা স্কচ খাই। আপনারা এই বাজে হুইস্কি খান কী করে?

আমি বললাম, আমাদের ইন্ডিয়ায় যা তৈরি হয়, আমরা বাধ্য হয়ে তাই খাই। তোমাদের দেশে স্কচ তৈরি হয়। তাই তোমরা স্কচ খাও!

কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত কটমট করে সে চেয়ে রইল আমার দিকে।

তারপর বলল, ঠাট্টা করছেন আমার সঙ্গে? ঢাকায় স্কচ তৈরি হয়?

আমি সামান্য হেসে বললাম, ঠাট্টা করার সুযোগ পেলে করব না কেন? স্কচ হুইস্কি নিয়ে গর্ব করা কি তোমাদের মানায়?

আপনার কাছে আছে কিছু? বার করেন। ইন্ডিয়ান হলেও চলবে। আর একটু খেতে হবে।

আমি সামান্য দ্বিধা করে বললাম, আমি তো সঙ্গে কিছু রাখি না ভাই। আমি শুধু পরের পয়সায় খাই!

এত রাত্রে মদের বোতল খুললে শামীম হয়তো রাত কাবার করে দেবে। কাল সকালেই আমার জরুরি কাজ আছে।

শামীম বলল, তাইলে আমার রুম থিকা নিয়া আসি? হাফ বট্‌ল আছে মনে হয়।

না, শামীম। আমি একটু পরেই ঘুমোব। তোমার যদি কাজের কথা কিছু থাকে, তাহলে বলো। শুধু আড্ডা দেওয়ার ব্যাপার হলে কাল দুপুরে..., কাল আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ খেতে পারি।

শামীম ঝাঁপিয়ে উঠে বলল, কাজের কথা আবার কী? আপনার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আছে।

তাই নাকি? বলে ফেলো।

আপনি আর স্বাতী ভাবি এই দুজনে মিলে কেন আমাদের ফ্যামিলি লাইফটা নষ্ট করে দিলেন?

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। এ আবার কী অদ্ভুত কথা। বেশি মাতাল হয়ে পড়লে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে যায়। মুখ থেকে যা-তা কথা বেরিয়ে আসে। শক্তি যেমন মাঝে মাঝে খুব নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বিড়বিড় করে বলত, আমার সোনার পেনটা কে চুরি করেছে, আমি জানি। একদিন শালাকে ধরব ক্যাঁক করে। আমরা সবাই জানি, শক্তির কস্মিনকালেও সোনার কলম ছিল না। সুতরাং চুরি যাবার প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য যদি রূপকার্থে না হয়।

আবার অনেকের পেটের ভেতরের কোনও কথা, কারুর প্রতি রাগ বা ঈর্ষাও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় প্রকাশ পেয়ে যায়। শামীমের সত্যিই ধারণা, আমরা ওর দাম্পত্য জীবন নষ্ট করে দিয়েছি?

এরকম অভিযোগের উত্তর দেওয়াও অর্থহীন।

আবার চুপ করেও তো থাকা যাবে না। শামীম জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ঢাকাতে মৃদুভাষী, ইতিহাসের যে-অধ্যাপককে দেখেছি, তার সঙ্গে এর কত তফাত!

বিরক্তি চেপে যথাসম্ভব শান্ত গলায় আমি বললাম, শামীম, তুমি যে অভিযোগটা করলে তা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? এরকম অভিযোগের তো একটা ভিত্তি থাকবে। সেটা জানাবে কি?

আপনারাই তো মিঠুকে সৌদি আরবে পাঠিয়ে দিলেন!

আর একটা বাজে কথা। সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এর প্রতিবাদ করতেও প্রবৃত্তি হয় না। আমি বলব, না, আমরা পাঠাইনি। ও গলা তুলে বলবে, হ্যাঁ, আপনারাই পাঠিয়েছেন। এই রকমই চলবে!

কথাটা ঘুরিয়ে বললাম, আমরা তোমার স্ত্রীকে সৌদি আরবে পাঠাব, তাতে আমাদের কী স্বার্থ বলো তো? সৌদি আরবে কারুকে আমি চিনিই না। কী করে সেখানে মানুষ পাঠাতে হয়, সে-সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই।

ঢাকা থেকে পালিয়ে এসে মিঠু কলকাতায় আপনাদের বাড়িতে ওঠেনি?

তা উঠেছিল ঠিকই।

তবে? ওদেশে যাবার আগে সে কলকাতায় আপনাদের বাড়িতে গেল কেন? আপনারা সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

ব্যবস্থা সে নিজেই করে এসেছিল ঢাকা থেকে। পাসপোর্ট করিয়েছে। তোমরা তার কিছুই খবর রাখোনি। শোনো শামীম, তুমি যে অভিযোগ করছ, তার সিরিয়াসনেস তুমি বুঝতে পারছ, না শুধু মাতলামি করছ? আমি অনেকক্ষণ সহ্য করেছি। ঢাকার একটি মেয়েকে আমি সৌদি আরবে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি, তার মানে কি আমি নারী-পাচারকারী? ফের এই ধরনের কথা বললে তোমাকে ঘাড় ধরে ঘর থেকে বার করে দেব!

শামীম একটুক্ষণ উগ্রভাবে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। যেন সে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

তারপর বিড়বিড় করে বলল, আপনি আমাকে ঘাড় ধরে...

তাকে বাধা দিয়ে বললাম, আমি নিজে তোমার গায়ে হাত দেব না। সিকিউরিটি গার্ডকে ডাকব। বরং নিজেই তোমার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। এসব কথা এখন হবে না।

সে বলল, একটু পানি... পানি খেতে পারি?

আমি আঙুল দিয়ে টেবিলের ওপরের জলের বোতলটা দেখিয়ে দিলাম।

গেলাস?

গেলাশ লাগবে কীসে? বোতল থেকেই খাও।

সেইভাবেই বোতলটা থেকে ঢক ঢক করে অনেকটা পান করল শামীম।

মাতালদের মাঝে মাঝে ধমক দিতে হয়। দেখলাম, ধমকে বেশ কাজ হয়েছে।

সে বলল, সরি সুনীলদা! মাই ল্যাঙ্গোয়েজ ওয়াজ নট রাইট। আমি বলতে চেয়েছিলাম, মিঠু কলকাতায় আপনাদের বাড়িতে গেল, তবু আপনারা ওকে কেন আটকাতে পারলেন না? ওকে যদি যেতে না দিতেন—

তোমরা আটকাতে পারনি, আমরা কী করে আটকাব। আমাদের বাড়িতে সে অতিথি হয়ে এসেছিল। একটা গয়নার পুঁটুলি রাখতে চেয়েছিল। আমরা তাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেছি। সে শোনেনি। একেবারে অ্যাডাম্যান্ট। তোমার সঙ্গে তার কী ঝগড়া হয়েছিল না হয়নি, তাও আমরা জানি না। সে জোর করে চলে গিয়েছিল।

জোর করে? আপনারা তাকে ফিজিক্যালি জোর করে ধরে রাখতে পারেননি? দু-একদিন রাখতে পারলেই সব সমস্যা মিটে যেত!

ফিজিক্যালি জোর করে ধরে রাখা? তা সম্ভব নয়!

কেন?

আবার কেন জিজ্ঞেস করছ? তোমার যুক্তিবোধ একেবারে খুইয়েছ? একটি তিরিশ বছরের মহিলা, তাকে জোর করে ধরে রাখা যায়? আমরা ব্যক্তিস্বাধীনতা মানি। একজন অ্যাডাল্ট মেয়ের ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনও দাম নেই? অনেকে মেয়েদের কোনও স্বাধীনতা দিতে চায় না। তাদের ওপর জোর-জবরদস্তি করে। আমরা তার থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। তুমি হয়তো জান না। এক সময় আমার স্ত্রী স্বাতীও তেহেরানে একটা স্কুলের চাকরি নিয়ে চলে যেতে চেয়েছিল। আমি তো বাধা দিইনি। স্বামীরা যদি বিদেশে চাকরি করতে চলে যেতে পারে, স্ত্রীরাই বা পারবে না কেন? স্বাতীর শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়নি, তার কারণ অন্য, ইরানের সরকারই পালটে গেল। এখনও আমি মনে করি, কোনও স্ত্রী যদি কোনও ডিসেন্ট কাজ নিয়ে কিছুদিনের জন্য বিদেশ চলে যায়, হোয়াট্‌স রং অ্যাবাউট ইট?

এই কি ডিসেন্ট চাকরির নমুনা? ফিরে এল প্রেগন্যান্ট হয়ে!

সেটা খুবই আনফরচুনেট! কী চাকরি করতে যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, তা তো আনোয়ারা আমাদের বলেনি। তোমরাও জানতে না নিশ্চয়ই। বলেনি, কারণ ও প্রথম থেকেই ধরে নিয়েছিল, সবাই ওকে বাধা দেবে। প্রায় জন্মের পর থেকেই আমাদের দেশের, মানে, তোমাদের আর আমাদের দেশে একই ব্যাপার, মেয়েরা জেনে যায়, বুঝে যায়, তাদের স্বাধীনভাবে কিছু করার ইচ্ছেকে কেউ পাত্তা দেবে না। বকুনি দেবে, আটকাবে, এমনকী মারধরও খেতে হতে পারে। ইদানীংকালে দু-চারটি ব্যতিক্রম হয়তো আছে, কিন্তু এখনও, এমনকি শিক্ষিত, উচ্চবিত্ত সমাজেও, মেয়েদের, সেই যাকে বলে চিরাচরিতভাবে বাচ্চা বয়েসে মা-বাবার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন আর বেশি বয়েসে সন্তানের কাছে আশ্রিত হয়ে থাকতে হয়। কি, তাই না?

সেজন্য আপনি আমাকে দোষ দিচ্ছেন কেন? সমাজটাই তো এরকম!

তোমাকে আলাদাভাবে দোষ দিচ্ছি না। অবস্থাটা বলছি। এই সামাজিক অবস্থায় কোনও মেয়ে যদি বিদ্রোহ করতে চায়, সে জানবে যে অন্যদের জানিয়ে শুনিয়ে কিছু করা যাবে না। তাকে জোর করে ঘরে আটকে রাখবে। তাই সে গোপনে হুট করে বেরিয়ে যেতে চায়। তখন মাথা ঠান্ডা থাকে না। সবদিক ভেবে দেখার সময় পায় না। তাই কিছু একটা ভুল হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। আনোয়ারারও ঠিক তাই হয়েছে। সৌদি আরবে কী ধরনের চাকরি, সেখানকার মেয়েদের অবস্থা কী রকম, এমন কিছু না জেনেই সে পাড়ি দিয়েছিল। বাই চান্স বিপদে পড়ে গেছে।

সুনীলদা, আপনি বয়েসে কিছুটা বড়, খানিকটা নামটাম আছে, সেই সুযোগ নিয়ে

আপনি আমার ওপর খুব লেকচার ঝাড়ছেন! এইসব কথা কি আমি জানি না? আমি লেখাপড়া শিখিনি? হয়তো আপনার চেয়ে বেশিই শিখেছি। এসবই তো জেনারালাইজেশন! এসব শুনে আমার কী লাভ হবে?

শামীম, তুমি তবে আমার সঙ্গে কী কথা বলতে এসেছ এত রাতে?

মিঠু যখন ঢাকা থেকে চলে যায়, আমরা কেউ জানতে পারিনি। কিন্তু আপনি তো জেনেছিলেন। আপনারা বাসা থেকেই সে এয়ারপোর্টে গিয়ে প্লেন ধরেছিল। তবু আপনি তাকে আটকাতে পারলেন না কেন?

আবার সেই পুরোনো কথা। বললাম তো, আমরা স্বামী-স্ত্রী মেলে ওকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেছি। তার বেশি কিছু করা সম্ভব ছিল না।

সাইড টেবল থেকে হাতঘড়িটা নিয়ে সময় দেখে বললাম, শামীম, পৌনে দুটো বাজে, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, তুমি এখন যাও!

শামীম বলল, না। আমি এখন যাব না। আমার ঘুম পাবে না।

তোমার ঘুম না পেলেও আমার পেতে পারে না! প্লিজ, নিজের ঘরে যাও, মাথাটা ঠান্ডা করো!

আমার সংসারটা ভেঙে তছনছ হয়ে গেল। আপনি এখন আমাকে ঘুমাতে যেতে বলছেন!

এবার আমার রাগ হয়ে গেল। গলা চড়িয়ে বললাম, তোমার সংসার ভেঙে তছনছ হয়ে গেল তো তাতে আমি কী করব? তোমার বউ ঢাকায় ফেরার পর তুমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছ। সে মরুক বা বাঁচুক, তাতে তোমার কিছু যায় আসে না। তবু এখন ওকে নিয়ে এমন প্যানপ্যানানি শুরু করেছ কেন?

আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি? কে বলল আপনাকে? সে তো আমার সঙ্গে দেখাই করেনি। একবারও আমাদের বাড়িতে আসেনি। ফোনও করেনি।

তার তো ভয় হতেই পারে। লজ্জা, অপরাধবোধ... কিন্তু তুমি তো জানতে সে কোথায় উঠেছে। ঢাকা শহরে সেটা জানা কঠিন কিছু না। তুমি কেন তার সঙ্গে দেখা করোনি?

আমার উচিত ছিল তার সঙ্গে দেখা করে, খাতির করে তাকে বাড়িতে ডেকে আনা? আবার তাকে গৃহলক্ষ্মীর আসন ফিরিয়ে দেওয়া? একটা সত্যি কথা বলেন তো, স্বাতী ভাবি যদি অন্য কোথাও থেকে প্রেগন্যান্ট হয়ে ফিরে আসতেন, আপনি কি বিনা বাক্যব্যয়ে তাকে আবার বরণ করে নিতে পারতেন?

এ-প্রশ্নের কোনও উত্তর হয় না। কোনও মানুষের জীবনে সত্যি সত্যি এরকম কিছু ঘটলে তখন তার কী প্রতিক্রিয়া হবে সেটা আগে থেকে বলা যায় না। এটা একটা হাইপোথেটিক্যাল প্রশ্ন, এর উত্তর থিয়োরিটিক্যাল হতে বাধ্য।

আপনার থিয়োরিটিক্যাল উত্তরটাই শুনি।

স্বাতীর সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক, তাতে তাকে বাদ দিয়ে জীবন কাটাবার কথা আমি কখনও কল্পনাই করতে পারি না। স্বাতী যদি কখনও কোনও ডাকাতের পাল্লায় পড়ে, রেপড হয়, তারপর প্রাণে বেঁচে ফিরে এলে আমি অবশ্যই তাকে আগের জায়গাতেই রাখব। এই রেপ তো একটা অ্যাকসিডেন্ট! হাত-পা ভাঙারই মতো। আমি মেয়েদের সতীত্বের অত কিছু মূল্য দিই না।

অন্য কেউ উচ্ছিষ্ট করে দিলেও আপনি আপনার স্ত্রীকে...

অমৃত কিংবা নারী কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না, শামীম। কত পুরুষই তো স্ত্রী ছাড়াও অন্য মেয়েতে উপগত হয়, হয় না? এক নারীর জন্য এক পুরুষ, এই কনসেপ্টটাই তো কৃত্রিম! মাঝে মাঝে এই কৃত্রিম ব্যবস্থার বাইরে স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই যায়। সুযোগ-সুবিধে বেশি বলে পুরুষরা বেশি যায়।

স্বাতী ভাবির পেটে যদি অন্য কারু বাচ্চা থাকে?

সেই বাচ্চাটা রাখবে কিংবা নষ্ট করে ফেলবে, সেই স্বাতীর ইচ্ছের ওপর ছেড়ে দিতাম। ব্যক্তিগতভাবে, আমি ভ্রূণহত্যার বিরুদ্ধে। কত মানুষের তো পালিত সন্তান থাকে। আমার বাড়িতেও থাকত।

মিস্টার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আপনি একটা ভণ্ড। হিপোক্রিট! খুব উদারতার ভান দেখাচ্ছেন, তাই না? আপনি শুধু বড় বড় কথা বলতেই ভালোবাসেন! কোনও সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতা আপনার নেই!

যতই অপমানজনকভাবে উচ্চারণ করুক, শামীমের এ-অভিযোগটা তো সত্যি। এরকম সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতা আমার নেই তো বটেই!

আমি উঠে এসে ওর একটা হাত ধরে বললাম, এবার ওঠো, নিজের ঘরে যাও।

আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন? সত্য কথা বলে ফেলেছি বলে আপনার আঁতে ঘা লেগেছে?

না, তাড়িয়ে দিচ্ছি না। বরং এইভাবে বলা যায়, তোমার ভালোর জন্যই তোমাকে এখন শুয়ে পড়তে বলছি। এখানে বসে বসে শুধু শুধু কথাকাটাকাটি করলে তো কোনও কিছুরই সুরাহা হবে না।

হাত ছাড়েন! আমি নিজেই যাচ্ছি।

উঠে গিয়ে দরজার কাছে গিয়েও সে ঘুরে দাঁড়াল নাটকীয় ভঙ্গিতে। খানিকটা ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, আপনি একটা কথা শুনে রাখেন। কেউ আনোয়ারার ওপর জোর করেনি, কেউ রেপ করেনি। সৌদি আরবে সে নিজের ইচ্ছায় একজনের সঙ্গে লিভ টুগেদার করত। টানা ছয়মাস। সেই জন্যেই সে প্রেগন্যান্ট হয়।

আমি চমকে উঠে বললাম, সেকী! এটা তুমি জানলে কোথা থেকে?

ভালো সোর্স থেকেই জেনেছি। ওখানকার বাংলাদেশ এমব্যাসির একজন রেসপনসিবল অফিসার আমাকে জানিয়েছে।

সে যে ঠিক কথা বলেছে তার কি কিছু প্রমাণ আছে?

অফ কোর্স ঠিক কথা বলেছে। মিথ্যা কথা বলায় তার কোনও স্বার্থ নাই। এবার বুঝলেন তো, ডাকাতের হাতে পড়া কিংবা রেপড হওয়ার সঙ্গে এর কত তফাত? এর পরেও সেই বউকে ক্ষমা করা যায়?

আই অ্যাম সরি। শামীম। আর কী বলব!

কেন সে ওই কাজ করেছে জানেন? তার ধারণা, আমার সন্তান জন্ম দেবার ক্ষমতা নাই! তাই সে দেখতে চেয়েছিল অন্য পুরুষের...। কিন্তু আমার কাছে ডাক্তারের রিপোর্ট আছে। আই অ্যাম পারফেক্টলি অল রাইট। আমিও বাবা হতে পারি। কিন্তু দেরি তো হতেই পারে। তার আগেই সে কমিটেড অ্যাডালটারি!

ভুল করেছে আনোয়ারা। তার জন্য শাস্তিও পাচ্ছে। ওদেশেই থেকে গেল না কেন? এখন একটা বাচ্চাকে নিয়ে...হোসটাইল পরিবেশ, কেউ তার পাশে নেই। রাস্তায় বেরুলে লোকে তাকে অ্যাসিড ছুড়ে মারে, বাচ্চাটাও নিরাপদ নয়...

হঠাৎ বিরাট জোরে কেঁদে উঠল শামীম!

দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আনোয়ারার জন্য এখনও তাহলে ওর মনে দুর্বলতা আছে। সেই জন্য ও নিজেও কষ্ট পাচ্ছে কম নয়। মদ্যপান হয়তো সেই জন্যই।

সামাজিক কারণে একটা বাচ্চাসমেত এই স্ত্রীকে এখন আর ফিরিয়ে নেওয়া বোধহয় আর সম্ভব নয়। কিন্তু এককালের সেই ভালোবাসা তো থেকে যেতেই পারে। ওদের দুজনের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক এক সময় আমি দেখেছি।

কিংবা, ওর এখনকার এই কান্নাও কি আন্তরিক? মাতালের কান্নাকে বিশ্বাস নেই। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বেশি বেশি দুঃখ উথলে ওঠে। সব ভুলে যাবে কাল সকালে।

তবু আমি ওকে কাঁদতে দিলাম একটুক্ষণ। শুধু কষ্ট নয়, অনেক সময় ব্যর্থতা থেকেও কান্না আসে। যে-মেয়েটিকে এক সময় শামীম ভালোবাসত, এখন সে তাকে আর ভালোবাসতে পারছে না। তার এত বিপদের সময়েও সাহায্য করতে পারছে না। এই ব্যর্থতাবোধও চোখে জল আনে।

কয়েক মিনিট পরে ওর পিঠে হাত দিয়ে শান্তভাবে বললাম, শামীম, আর একটু বসে যাও। একটা সিগারেট খাবে।

আমি নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে ওকেও দিলাম একটা।

কান্না থামিয়ে, হাতের চেটোয় চোখ মুছে ও বসল একটা চেয়ারে। আমার মুখোমুখি। একেবারে চুপ।

তারপর আমরা আর কেউ কোনও কথা বললাম না। কথা হতে লাগল মনে মনে।



৩১

একই সরকারি বাড়ির ওপরতলা-নিচতলা গৌতম ঘোষ ও রশিদ খানের বেশ একটা যুগলবন্দি হয়েছে।

দুজনেরই খুব গান-বাজনার নেশা, দুজনেরই চলচ্চিত্র-অন্তঃপ্রাণ। নিজে স্বাধীনভাবে সিনেমা পরিচালানার শখ রশিদের ঘুচে গেছে, আমার গল্পটা নিয়ে অনেকদূর এগিয়েও শেষ পর্যন্ত আর কিছুই হল না। আরও অনেকের সঙ্গে আমিও রশিদকে বুঝিয়েছি যে, পুলিশের এত বড় চাকরি ছাড়া তার পক্ষে মূর্খামি হবে। একটা সিনেমার পরিচালনার দায়িত্ব নিলে যে-শৃঙ্খলাবোধ ও ধৈর্য লাগে, তা রশিদের নেই। সে ওসব পারবে না। এই চাকরির অনেক সুবিধে, বাড়িতে তিন-চারজন কাজের লোক, দু'তিনখানা সরকারি গাড়ি, যখন যেখানে খুশি যাওয়ার স্বাধীনতা, এসব হারালে সে অসহায় হয়ে পড়বে।

চাকরি না ছাড়লেও রশিদ সিনেমার সঙ্গে জড়িয়ে রইল। গৌতম যখন হিন্দি ছবি বানায়, তখন রশিদ চিত্রনাট্য ও সংলাপ লেখায় সাহায্য করে, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ঠিক করে, শুটিংয়ের সময়ও গৌতমের সঙ্গে থাকে। গৌতমের বাংলা ছবিতে আমিও কিছু কিছু চিত্রনাট্য ও সংলাপের ব্যাপারে যুক্ত হয়ে পড়ি। সুতরাং খানিকটা আগলাভাবে হলেও আমার কিছুটা কাজের সম্পর্ক রইল ওদের সঙ্গে। আগেকার মতন সেই উদ্দাম আড্ডার দিন আর নেই। সকলকেই এখন কাজ করতে হয়।

কাহিনিচিত্র বানাবার ফাঁকে ফাঁকে গৌতম একটা দুটো তথ্যচিত্র বানায়। তথ্যচিত্রের জন্যও তার খ্যাতি এখন আন্তর্জাতিক। শাবানা আজমি ও নাসিরুদ্দিন শাহ্-কে নিয়ে হিন্দি ছবি পার খুবই সফল হবার পর গৌতম হঠাৎ ঠিক করল শানাইয়ের জাদুকর বিসমিল্লা খানের জীবন নিয়ে একটি দীর্ঘ তথ্যচিত্র বানাবে।

রশিদের সূত্রেই এক সময় ভারতবিখ্যাত মার্গ সংগীতের গায়ক ওস্তাদ আমির খাঁর সঙ্গে আমাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। রশিদ একটা ছোট তথ্যচিত্রও বানিয়েছিল আমির খাঁয়ের ওপরে। এবার বিসমিল্লা খান।

উচ্চাঙ্গসংগীত জগতে বিসমিল্লার স্থান একেবারে অনন্য। শানাই বাজনাকে কেউ

কোনওদিন তেমন গুরুত্ব দেয়নি। আগেকার দিনে রাজা-বাদশাদের নাকি ঘুম ভাঙত শানাইয়ের সুর শুনে, তাই রাজপ্রাসাদগুলোর সামনে থাকত নহবৎখানা। সে-সব তো আমরা দেখিনি। এখন শানাই শুনলেই মনে পড়ে বিয়েবাড়ির কথা। আরো নানান উৎসবে শানাই বাজে। দূর থেকে শুনতে মিষ্টি লাগে, এই পর্যন্ত!

বিসমিল্লা খান-ই প্রথম শানাইকে জাতে তুললেন, নিজের কৃতিত্বেই তিনি পেলেন উচ্চাঙ্গসংগীতের প্রথম সারির শিল্পীদের মধ্যে শ্রদ্ধার আসন।

মানুষটিও অসাধারণ।

এই তথ্যচিত্রের ব্যাপারে অবশ্য আমার কোনও ভূমিকা ছিল না। সে-যোগ্যতাই আমার নেই। বেনারসে শুটিংয়ের সময় গৌতম আর রশিদ দুজনেই আমাকে সঙ্গে যেতে বলেছিল, কিন্তু কী সব আজেবাজে কাজে জড়িয়ে পড়ায় আমার যাওয়া হয়নি। খুবই দুর্ভাগ্যের কথা।

তবে, ওদের মুখে বিসমিল্লা সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছি।

বেনারস বা কাশী শহরটি বিসমিল্লার এতই প্রিয় যে, উনি ওই শহর ছেড়ে আর কোথাও বেশিদিন থাকতেন না। ছোটবেলা থেকেই উনি মন্দিরগুলোর গান-বাজনা মুগ্ধ হয়ে শুনতেন। কোনও কোনও মন্দিরের সিঁড়িতে তিনি বিনা আহ্বানে গিয়ে একা একাই শানাই বাজাতেন, সেখানে ভিড় হয়ে যেত।

ভারতীয় মার্গসংগীত একসময় ইওরোপ-আমেরিকায় খুব সমাদর পায়। রবিশঙ্কর, আলী আকবর প্রমুখ আমেরিকায় প্রভূত জনপ্রিয় হয়ে ওদেশে আস্তানা গাড়েন। বিসমিল্লাও তখন খ্যাতির তুঙ্গে, তাঁকে ওদেশে আমন্ত্রণ জানানো হয় অনেকবার। বিসমিল্লা বলেছিলেন, আমি আমেরিকায় গিয়ে থাকব কী করে, যদি বেনারস শহরটাকেই তুলে নিয়ে আমেরিকার কোথাও বসানো যায়, তাহলে গিয়ে থাকতে পারি!

শুটিং শেষ করে ফিরে আসার পরে গৌতম আর রশিদের মুখে বিসমিল্লার গল্প আর ফুরায় না।

তথ্যচিত্রটি শেষ পর্যন্ত খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল, শুধু রশিদের ভূমিকা নিয়ে আমরা খুব মজা করতাম।

অন্যান্য তথ্যচিত্রে রশিদ থেকেছে আড়ালে। সেটাই নিয়ম। এই প্রথম রশিদকে দেখ গেল পর্দায়।

এমনিতে রশিদ যতই স্মার্ট হোক, ক্যামেরার সামনে সে বেশ আড়ষ্ট। এই তথ্যচিত্রে রশিদের সঙ্গে বিসমিল্লা সাহেবের সুদীর্ঘ সাক্ষৎকার রয়েছে। সে বেশ সেজেগুজে বসে বহু প্রশ্ন করেছে, বেশ কঠিন আভিধানিক উর্দু ভাষায়। বিসমিল্লার উত্তরগুলো কিন্তু খুব সরল। আমরা ঠাট্টা করে বলতাম, রশিদ, বেনারসের মানুষ হয়েও বিসমিল্লা সাহেবের উর্দু আমরা সব বুঝতে পেরেছি, আর তুমি কলকাতার

মানুষ, তোমার কথা বেশির ভাগই বোঝা গেল না।

বিসমিল্লা প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ল নবাব ফারুকির কথা।

কবি ওবায়দুল্লাহ অর্থাৎ সেন্টুভাই একবার কলকাতায় এসে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল নবাব ফারুকির বাড়িতে।

তাঁর তখন ৮৮ বছর বয়েস, কিন্তু দিব্যি আঁটোসাঁটো চেহারা। আমি তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতাম না। শুনলাম, তিনি অবিভক্ত বাংলায় কিছুদিনের জন্য মন্ত্রী ছিলেন। স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর অনেকটাই বিস্মৃত। বাংলাদেশেও তাঁর অনেক বিষয়–সম্পত্তি আছে। কিন্তু তিনি কলকাতা ছেড়ে যাননি।

ওবায়দুল্লাহ কথাবার্তা বলছিল, আমি শ্রোতা মাত্র। তিনি আমায় চেনেন না, চিনবেনই বা কী করে। নবাব ফারুকির আলাপচারী মুগ্ধ হয়ে শোনার মতন। যেমন সুন্দর বাংলা, তেমনি সূক্ষ্ম রসিকতাবোধ।

তাঁর প্রতিদিনের রুটিন শুনে আমি বিস্মিত। সেই বয়েসেও তিনি প্রতিদিন বিকেলে ক্যালকাটা ক্লাবে যান বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। অর্থাৎ ওঁর কাছাকাছি বয়েসি আরো কিছু কিছু মানুষ সেখানে থাকেন। এবং সেই বয়সেও আড্ডার নেশা থাকে। শুধু তাই নয়, অন্য নেশাও আছে। প্রতিদিন তিনি ঠিক গুনে গুনে তিন পেগ রয়াল স্যালুট নামে অতিশয় মূল্যবান হুইস্কি পান করেন। সেই হুইস্কির স্বাদ নেওয়া দূরে থাক, বোতলটাও আমি আগে স্বচক্ষে দেখিনি। নবাব ফারুকি আমাদেরও সেই হুইস্কি খাওয়ালেন। এর আগে কিছু কিছু নব্য ধনী ব্যক্তিদের দেখেছি, নিজেরা দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য পানীয় গ্রহণ করলেও অতিথিদের পরিবেশন করেন সস্তার জিনিস। নবাব ফারুকির ব্যবহারে রয়েছে প্রকৃত আভিজাত্য।

কলকাতা শহরে যে-কয়েকজন মাত্র ধনী ব্যক্তির রোলস রয়েস গাড়ি আছে, নবাব ফারুকি তাঁদের একজন।

সেদিন কথায় কথায় তিনি বলেছিলেন, ঢাকা থেকে অনেকে আমায় ডাকে। আত্মীয়স্বজনরা আমায় বলে, শুধু শুধু কলকাতায় পড়ে আছেন কেন, বাংলাদেশে চলে আসুন না। আমি তাদের বলি, বাপু হে, যদি ক্যালকাটা ক্লাবটাকে আমার বন্ধু-বান্ধব সমেত ঢাকায় নিয়ে গিয়ে বসাতে পারো, তাহলে আমি যাব।

রশিদ নবাব ফারুকিকে চিনত না।

আমার কাছে গল্প শুনে বলল, চল না একবার বুড়োর সঙ্গে দেখা করে আসি। মনে হচ্ছে, খুব ইন্টারেস্টিং বুড়ো।

আমারও আবার যাওয়ার ইচ্ছে খুব। কিন্তু এমনি এমনি তো যাওয়া যায় না। আপনাকে দেখতে এসেছি বললে বোকা বোকা শোনায়।

একটা কিছু ছুতো থাকা দরকার।

তখন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। তিনি তাঁর দাদু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

দাশের ওপর একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন. আমাকেও বলা হয়েছিল কিছু লিখতে।

আমি রশিদকে বললাম, এক কাজ করলে হয়। নবাব ফারুকি তো চিত্তরঞ্জন দাশকে কাছ থেকে দেখেছেন, সেরকম খুব কম মানুষই আছেন এখন। ওঁর একটা স্মৃতিকথা জোগাড় করতে পারলে সেটা খুব মূল্যবান হবে।

সেই অনুযায়ী টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে এক বিকেলে গেলাম ওঁর বাড়িতে।

এই বয়েসেও কী আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি। ওবায়দুল্লাহর সঙ্গে একদিন কিছুক্ষণের জন্য আমায় দেখেছিলেন। ঠিক মনে রেখেছেন, আমায় দেখেই চিনতে পেরে বললেন, তুমি সেই গাঙ্গুলির ব্যাটা না? পোয়েট! ফরিদপুরের বামুন।

রশিদ সম্পর্কেও অনেক খোঁজখবর নিলেন।

আমাদের মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার পর তিনি হাসতে হাসতে বললেন, আমি লিখব? বলো কী? কত বয়েস হল, জান? নব্বই! লেখালেখি অনেক আগে যেটুকু করেছি, তাও ইংরেজিতে।

আমি বললাম, আপনার বাংলাও তো চমৎকার। আপনি মুখে বলুন, আমি লিখে নেব।

এরপর তিনি যা বললেন. সি আর দাশ, এই সিদ্ধার্থর দাদু। আমি তো ওঁর ভক্ত ছিলাম না। আমরা ছিলাম সুরেন বাঁড়ুজ্যের চ্যালা। সুরেন বাঁড়ুজ্যে সম্পর্কে কিছু জানতে চাও তো বলো।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তো আরো বহু আগেকার নেতা ছিলেন!

রশিদ অত ইতিহাস জানে না। সে জিজ্ঞেস করল, সুরেন বাঁড়ুজ্যে কে যেন?

এখন অনেকেই এরকম প্রশ্ন করবে। কে আর মনে রেখেছে সুরেন্দ্রনাথের কথা।

আমি অন্য লেখার জন্য একসময় সেই সময়ের ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছি বলে কিছুটা জানি, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবন নিয়ে আমার কখনও তেমন আগ্রহ হয়নি।

আমাদের সমনে যিনি রয়েছেন, তিনি আজও রোলস রয়েস গাড়ি চাপেন এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি নিয়ে বসে আছেন, যে-সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছে ১৯২৫ সালে।

এরপর আর বেশিক্ষণ আড্ডা জমেনি।

পুলিশের কাজকর্মে রশিদের তেমন মন নেই। প্রায়ই অফিসে যায় না। তখন পুলিশ-মন্ত্রী ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, তিনি রশিদের প্রতি বেশ কোমল ছিলেন, রশিদের ফাঁকিবাজির কথা জেনেও না জানার ভান করতেন। নিয়মমাফিক রশিদের প্রমোশন ঠিক হয়ে যাচ্ছিল, যদিও খুব গুরুত্বপূর্ণ পদ তাকে আর দেওয়া হত না।

গোলমাল বাধালো রশিদের একটি উক্তি।

সাংবাদিকরা সবাই ওকে চেনে। আনন্দবাজার পত্রিকায় রশিদের একটা বড় সাক্ষাৎকার ছাপা হল, তাতে একজন সাংবাদিক ওকে খুঁচিয়ে অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করল মজা করারই জন্য।

তাদে রশিদ বলে ফেলল, আমি তো আসলে পুলিশ নই, আমি কবি। গান ভালোবাসি, ফিল্ম ভালোবাসি। পুলিশের কুর্তাও গায়ে চাপাই না।

এটা ছাপা হওয়ার পর পুলিশ-মন্ত্রী বেশ চটে গেলেন। তিনি হয়তো সাক্ষাৎকারটা পড়তেনই না, সাংবাদিকরাই রাইটার্স বিল্ডিংয়ে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, এত উঁচু পোস্টের একজন পুলিশ অফিসার বলছেন, তিনি পুলিশই নন। কাজ করেন না। তা হলে আপনার পুলিশ দফতর চলছে কীভাবে?

ক্রুদ্ধ পুলিশ-মন্ত্রী বললেন, উনি যদি পুলিশ না থাকতে চান, তাহলে উনি চাকরি ছেড়ে দিলেই পারেন। আমরা কি ধরে রেখেছি? কবিতা লিখতে চান, তাই লিখুন। উনি কী ধরনের কবি তাও আমি জানি না। ওঁর কোনও কবিতার বই আছে?

সেবার রশিদ প্রায় সাসপেন্ড হয় হয় অবস্থা। নানান সূত্রে পুলিশ-মন্ত্রীকে ধরাধরি করে কোনওক্রমে রশিদের চাকরিটা বাঁচানো গেল।

আমরাও ওকে বকাবকি করলাম, তোমার এত সাক্ষাৎকার দেওয়ার দরকারটা কী? আর যে সত্যিকারের কবি, সে কখনও আমি কবি, আমি কবি, এরকম বলে বেড়ায় না।

আর তাছাড়া সত্যিই তো, তোমার কবিতার বই কোথায়? মাত্র দুচারখানা কবিতা লিখলেই লোকে তোমাকে কবি বলে মেনে নেবে কেন?

রশিদ কবিতা লেখে উর্দুতে। বাংলা ঝরঝর করে বলতে পারে, পড়তেও পারে। কিন্তু লিখতে শেখেনি। বাড়িতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথোপকথন হয় উর্দুতে, আত্মীয়স্বজন সবাই উর্দুভাষী। দু-একটা কবিতা ও নিজেই ইংরেজিতে অনুবাদ করে নিয়েছে। কয়েকটি সভা-সমিতিতে সেগুলোই পড়ে।

সব মিলিয়ে দেখা গেল, তার কবিতার সংখ্যা পঁচিশটির বেশি নয়। এই তার প্রায় পনেরো বছরের ফসল। কবিতা নিয়ে কথা বলতে যত ভালোবাসে, তত লেখে না।

কোনও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি, কারণ কলকাতায় উর্দু কবিতার বই কে ছাপবে? উর্দু প্রকাশক আছে দিল্লিতে কিংবা হায়দ্রাবাদে। তাদের কারও সঙ্গেই যে যোগাযোগ করেনি। সর্বভারতীয় উর্দু সাহিত্যজগতে তার তেমন পরিচিতিও নেই।

তখন আমরা ঠিক করলাম, রশিদের কবিতার একটা বাংলা অনুবাদের বই ছাপা যেতে পারে। কলকাতায় প্রকাশক জোটানো মোটেই শক্ত নয়। কিন্তু কবিতাগুলো অনুবাদ করবে কে?

কোনও একজনের ওপর এই ভার দিলে অনেক সময় লেগে যাবে। খুব তাড়াতাড়ি তার একটা বই চাই। চার-পাঁচজনের মধ্যে তার কবিতাগুলো ভাগ করে দেওয়া হল। তারা ইংরেজি অনুবাদ দেখে, আর রশিদের সঙ্গে বসে প্রতি লাইনের অর্থ বুঝে নিয়ে লিখবে বাংলায়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিজে থেকেই বললেন, তিনি গোটা পাঁচেক কবিতার অনুবাদ করে দেবেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় সর্বভারতীয় প্রধান কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য। সবকটি পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর মতন একজন কবি প্রায় নাম-না-জানা এক তরুণ কবির কবিতা অনুবাদ করতে রাজি হওয়া এক অতি মহৎ দৃষ্টান্ত।

রশিদের নিজের অতি প্রিয় কবিতার নাম 'শহর'। কলকাতা সম্পর্কে লেখা। রশিদের অনুরোধে সেটা অনুবাদ করতে হল আমাকে।

খুব সুন্দরভাবে, দামি কাগজে ছাপা হয়ে বেরুল বাংলা অনুবাদে রশিদের কবিতার বই। নাম আবলুষি ভাবনা। এ বই এক হিসেবে বিশ্বরেকর্ড। একজন কবির নিজস্ব ভাষায় লেখা কবিতার কোনও বই নেই, অথচ অনুবাদ বই বেরিয়ে গেল আগে, এরকম দৃষ্টান্ত আর কোথাও নেই।

পুলিশ-মন্ত্রীর কাছে বকুনি খেয়ে রশিদ কিছুদিন খুব মন দিয়ে কাজ শুরু করল। নিয়মিত অফিসে যায়। রাষ্ট্রপতির কলকাতা পরিদর্শন উপলক্ষে রশিদ ডিউটি দিতে গেল ময়দানে। পুরোদস্তুর পুলিশের পোশাক পরে, এমনকী কোমরের বেল্টে দু'দুটো রিভলভার। চেহারা তো সুন্দর, এরকম পোশাকেও তাকে বেশ ভালো মানায়।

কয়েক মাস পরেই সব খবরের কাগজের প্রথম পাতায় দেখা গেল রশিদের নাম। এবং ছবি। এবারের আর কবি হিসেবে নয়। এক পুলিশ অফিসারের দক্ষতার কাহিনি। কুখ্যাত ডাকাত ওমর শেখকে সদলবলে হাতেনাতে ধরেছে রশিদ। তার সঙ্গে ছিল বিরাট ফোর্স। সিনেমার মতন, দুপক্ষই গুলি চালিয়েছিল, ওমর শেখের দলের দুজন মৃত, পাঁচজন আহত, পুলিশদের মধ্যেও আহত তিনজন। তাদের মধ্যে রশিদ নিজে। অবশ্য আঘাত গুরুতর নয়।

রশিদ যে এমন রোমহর্ষক অভিযানে যাবে, তা আমাদেরও আগে ঘুণাক্ষরে জানায়নি।

কাগজে পড়লাম, ঘটনাটা ঘটেছে ব্যারাকপুরে। সেখানে ওমর শেখ ঘাঁটি গেড়েছিল বেশ কিছুদিন ধরে। যদিও তার কার্যকলাপ ছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়, অর্থাৎ ডায়মন্ড-হারবার, ক্যানিংয়ের দিকে। সেইজন্যই ব্যারাকপুরে তার আস্তানার খবর পুলিশ অনেকদিন পায়নি। সে-বাড়িটাকে সে প্রায় দুর্গ করে তুলেছিল। ভোরবেলা গিয়ে রশিদ খানের নেতৃত্বে হানা দিয়ে পুরো বাড়িটাই ঘিরে ফেলে অতর্কিতে।

কাগজের রিপোর্টে দুটি বেশ কৌতূহলজনক কথা আছে।

এই বাড়ি থেকে পুলিশ ওমর শেখ ও তার শাগরেদদের ধরেছে তো বটেই, তাছাড়াও পাঁচটি মেয়েকেও উদ্ধার করেছে। ওই পাঁচজনই ওমর শেখের রক্ষিতা। অর্থাৎ একটা ছোটখাট হারেম ছিল তার।

দ্বিতীয় ঘটনাটা হল, ওমর শেখের রিভলভারের গুলি ফুরিয়ে যাওয়ার পর পুলিশ তাকে টেনেহিঁচড়ে বাড়ির বাইরে নিয়ে আসে। আয়ান রশিদ খানের বাঁ-দিকের ঘাড়ে গুলি লেগেছে, রক্ত পড়ছে ঝরঝর করে। সেই অবস্থাতেও তিনি বাড়িটার মধ্যে ঢুকে সব ইন্সপেকশান করে এলেন। তারপর ওমর শেখকে গাড়িতে তুলবার আগে রশিদ খান তাকে একটা চড় কষালেন সজোরে।

রিপোর্টারটি মজা করে লিখেছে যে, ইস, সেই মুহূর্তটার ছবি কেউ তুলে রাখল না। রশিদ খানের রুদ্রমূর্তি আগে কখনও দেখা যায়নি।

আমারও খুব আশ্চর্য লাগল। রশিদ তো নিজের হাতে কখনও মারধর করে না। ওর কাছেই শুনেছি, এতদিনের পুলিশ জীবনে ও নিজে কখনও কারুর গায়ে হাত তোলেনি। হঠাৎ এটা কী হল?

আহত বন্ধুকে তো দেখতে যেতেই হবে। কোন হাসপাতালে আছে জানা দরকার।

নাসিমকে ফোন করলাম।

নাসিম তার স্বভাবসিদ্ধ কোমল অনুযোগের ভঙ্গিতে বলল, হস্‌পিটাল থেকে তো ছেড়ে দিয়েছে কালই। গোলি ভিত্‌রে যায়নি। ছোটা ব্যান্ডেজ আছে। কিন্তু দেখো না, বিছানায় শুয়ে শুয়ে কী না করছে? তোমরা আসোনি কেন?

আমি বললাম, খবর তো দাওনি। আজই কাগজ পড়ে জানলাম। এখন আবার কী করছে?

নাসিম বলল, তুমি চলে এসো, যত তাড়াতাড়ি পারো।

কী যেন লেখালেখির কাজ ছিল, তা ফেলেই বেরিয়ে পড়তে হল। সকাল সাড়ে নটা।

রশিদ বিছানায় শুয়ে আছে ঠিকই, তবে এমন কিছু সাংঘাতিক কাণ্ড করেনি।

সুযোগ পেলেই রশিদ অনেক দেরি করে ঘুম করে ওঠে। আজ জেগেছে তাড়াতাড়ি। বিছানার ওপর কলকাতার সবকটি সংবাদপত্র। এবং সকালে চা খাওয়ার বদলে রাম পান শুরু করেছে। বাংলায় যাকে বলে লালজল।

আমাকে দেখেই রশিদ জিজ্ঞেস করল, সুনীল, সব কটা নিউজ পেপারে ফ্রন্ট পেজে তোমার নাম কখনও উঠেছে?

আমি বললাম, নোবেল প্রাইজ তো এখনও পাইনি। আর কোনও কারণে তো লেখকরা ফ্রন্ট পেজ নিউজ হয় না।

রশিদ বলল, তাহলে তোমার থেকে আমি ওয়ান আপ?

রশিদ ওর সেই বিখ্যাত হাসিটা শুরু করল। ওর মধ্যে যে একটি শিশু আছে, সে বেরিয়ে এই হাসির সঙ্গে।

আমাকে আর জিজ্ঞেস করতে হল না। ও নিজেই পুরো ব্যাপারটা সবিস্তারে শোনাল।

আমি বললাম, এই একখানা কীর্তি যা করলে, আর তোমার চাকরি নিয়ে কোনও গোলমাল হবে না। এবার আরও কিছুদিন ফাঁকি মারতে পারো।

রশিদ বলল, কী বলছ তুমি, আর একটা গ্যাঙের সন্ধান পেয়েছি, আরও বড় একখানা পালের গোদা আছে। ইন্টারন্যাশনাল কানেকশান, সব ব্যাটাকে ধরব। দ্যাখো না!

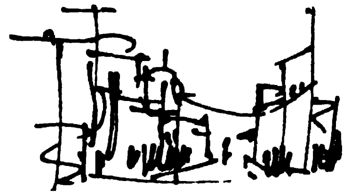
খুব ভালো কথা।

আমাকে সে বাম অফার করলে আমি বললাম, আমি তো তোমার মতন এত বড় কিছু কাজ করিনি, তাই সকালবেলা নেশা করার যোগ্যতাও অর্জন করিনি। অন্য একদিন তোমার সঙ্গে সেলিব্রেট করব। একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, তুমি এই ডাকাতটাকে চড় মারলে কেন? ওই ডাকাতটাই তোমাকে গুলি করেছিল?

রশিদ বলল, না, না, দ্যাট ডাজ'নট ম্যাটার। একটা দৃশ্য দেখে আমার এমন রাগে গা জ্বলে গেল... এজন্য সুনীল, তুমিই অনেকটা দায়ী। তুমি এক সময় আমাকে মেয়ে-পাচারকারীদের ব্যাপারে উত্তেজিত করেছিলে। এখন যত বড় খুনি কিংবা ডাকাত কিংবা পলিটিক্যাল মার্ডারারই হোক, তাদের চেয়েও আমি বেশি ঘেন্না করি এই মেয়ে স্মাগলারদের।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, এত বড় ডাকাত, এও কি মেয়ে পাচার করে নাকি? নিজের হারেম রাখে কাগজে পড়লাম।

রশিদ বলল, বাড়িটার ভেতরে ঢুকে কী দেখলাম জানো? আমার লোকেরা পাঁচটা মেয়েকে বসিয়ে রেখেছে বাইরের ঘরে। গাড়ি আসবে। সব ক'জনই ওই ওমরের রক্ষিতা। প্রত্যেকটা মেয়ের কপালের ঠিক মাঝখানে একটা গোল কালো দাগ। বড় একটা টিপের মতন। টিপ নয় কিন্তু। ও হারামজাদা নিজের রক্ষিতাদের মার্কামারা করা জন্য জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়েছে কপালে। মেয়েগুলোকে সে-কথা জিজ্ঞেস করতেই তারা কেঁদে উঠল। তুমি কখনও পাঁচটা মেয়েকে ঠিক একইভাবে কাঁদতে দেখেছ? তাই আর রাগ সামলাতে পারলাম না। থাপ্পড় মেরেছি, সেটা তো কমই ওকে সঙ্গে সঙ্গে আমার গুলি করে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছিল!



৩২

এক ঝড়-বৃষ্টির সকালে ঢাকা থেকে কামাল এসে হাজির। আগে থেকে খবর দিতে না পারলেও কামাল কলকাতা এয়ারপোর্টে পৌঁছে ফোন করে বলে, আমি আসছি। তখন রান্নাঘরে তার জন্য দু'মুঠো চাল বেশি নেওয়া হয়।

বসবার ঘরে আমি খবরের কাগজে খুলে কামালের প্রতীক্ষা করছিলাম। কামাল এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জুতো খুলতে খুলতেই বলল, ঢাকার খুব ভালো খবর আছে। তোমরা শুনলে খুব খুশি হবে।

আজকাল ভালো খবরের এত অভাব যে এরকম কোনও সম্ভাবনা কথা শুনলেই মনটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

ভেতরে এসে বলে কামাল জিজ্ঞেস করল, স্বাতী কোথায় অর্থাৎ সে সুখবরটা আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে শোনাতে চায়।

স্বাতী বাথরুমে। তার মানে অত্যন্ত পঁয়তাল্লিশ মিনিটের অনুপস্থিতি।

উৎপল এসে জিজ্ঞেস করল, কামলদা, আপনি চা খাবেন তো?

কামাল নিজের জন্য কিছু চায় না। সে বলল, আমার জন্যে বানাতে হবে না। সুনীল যদি খায়, তাহলে আমাকেও একটু দিও।

কামালের সুখবর কী হতে পারে?

অনেক সময় কামাল তার নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা দারুণ উৎসাহের সঙ্গে বলে। তাতে আমরা অবশ্য তেমন উত্তেজিত বোধ করি না। কারণ, এর আগে আমরা এরকম শ-দেড়েক ব্যবসার প্রজেক্টের কথা শুনেছি। সম্প্রতি সে মালয়েশিয়া থেকে কী একটা গোপন মশলা এনে মুর্গিভাজার দোকানের ব্যবসার কথা নিয়ে মেতেছিল, সেসব মুর্গিভাজা নাকি হট কেকের মতো বিক্রি হবে। তবে কি এবার সত্যিই সেরকম একটা দোকান খুলে ফেলেছে?

কিংবা কামাল কোনও মেধাবী ছাত্রকে বিদেশে পড়তে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে? কিংবা দাউদকান্দিতে ঝড়ে-উল্টে-যাওয়া একটা নৌকোর সব ক'জন যাত্রীই বেঁচে গেছে, তার মধ্যে আমাদের চেনা কেউ ছিল?

এসবই সুখবর নিশ্চিত।

নিজেই ফ্রিজ খুলে এক গেলাস জল খাবার পর কামাল আমাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার সঙ্গে দিল্লিতে শামীমের দেখা হয়েছিল?

হ্যাঁ।

তুমি তাকে কী বলেছিল? ঢাকায় ফিরে গিয়ে শামীম ইজ আ চেইনজড ম্যান। লাস্ট কয়েক মাস তো খুব ড্রিংক করা শুরু করেছিল, পাগলের মতো করত, এখন একেবারে বন্ধ। আর ড্রিংক টাচ করে না। কারুর সঙ্গে কথাও বলে না। প্রায় বাড়িতে চুপচাপ বলেছিল ওর ক্লোজ কেউ দেখা করতে গেলেও দেখা করেনি। সবাই ভাবছিল, পাগল হয়ে গেল নাকি মানুষটা? তা নয়, ও যেন মেডিটেশনের মধ্যে ছিল। জানলা বন্ধ করোনি? বৃষ্টির ছাঁট আসছে।

আমাদের বারান্দার দিকে একটা জানলার দুটো পাল্লাই খোলা। বৃষ্টির তোড় বেড়েছে, ভেতরে জল আসছে।

আমি বৃষ্টির সময় সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে থাকা পছন্দ করি না। কিছুটা ছাঁট আসে তো আসুক। মেঝেতে জল গড়ালেই বা ক্ষতি কী। পরে মুছে নিলেই তো হয়। তা বলে একটুও বৃষ্টি দেখব না, বৃষ্টির শব্দ শুনব না?

স্বাতী অবশ্য রাগ করে। বৃষ্টি শুরু হতেই না হতেই দমাস-দমাস করে সব দরজা-জানলা বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন আমার নিজেকে মনে হয় বন্দীর মতন।

আমার মতামত না নিয়েই কামাল উঠে গিয়ে জানলা বন্ধ করে দিয়ে এলো।

ঢাকা আর কলকাতার আবহাওয়া প্রায় একইরকম বলা যায়। উনিশ-বিশ। এখানে ঝড়-বৃষ্টি হলে ওখানেও হয়। শামীম যে চুপচাপ নিজের ঘরে বসে থাকে, বৃষ্টির সময় সে কি সব জানলা খোলা রাখে, না বন্ধ করে দেয়?

কামাল বলল, কয়েকদিন আগে কী হল জানো? ইউ ওনট্ বিলিভ ইট। কইলাম না, হি ইজ আ চেইন্‌জড ম্যান নাউ? গত শনিবার ও কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবীকে ডেকেছিল। ঠিক যেন একটা ট্রান্‌সের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। সবাইকে জানিয়ে দিল, ও আনোয়ারাকে ফেরত নেবে। মেয়েটি সমতে এই বাসায় নিয়ে আসবে। কোনও টার্মর্স নাই, কন্ডিশন নাই। নো কোয়েশ্চেন আস্কড, ঠিক আগের মতন। এটা ভালো খবর না?

ভালো খবর মানে? অনেকদিন এরকম সুসংবাদ শুনিনি। আনোয়ারার ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে সবসময় খচখচ করত। ঢাকা থেকে কেউ এলে উদগ্রীব হয়ে থাকি তার খবর জানার জন্য। আবার খারাপ শোনার আশঙ্কায় জিজ্ঞেসও করি না। সেই অ্যাসিড ছোড়ার ঘটনার পর আর কিছু জানতে চাইনি।

শামীমের যদি সুমতি হয়ে থাকে, তাহলে এবার আনোয়ারা বেঁচে যাবে। শামীমদের প্রতিষ্ঠিত পরিবার, সেখানে আনোয়ারা যদি সসম্মানে স্থান পায়, তাহলে

আর তাকে কেউ ঘাঁটাতে সাহস করবে না।

কামাল বলল, তোমার জন্যই এটা হল। তুমি দিল্লিতে শামিমকে যা বলেছিলে, তার জন্যই তো ওর মনটা নরম হয়ে গেল। তোমার অনুরোধেই আনোয়ারার জীবনটা...

আমি প্রবল বেগে মাথা নাড়লাম। এ কৃতিত্ব নিতে আমি মোটেই রাজি নই। শামীম বুদ্ধিমান, উচ্চশিক্ষিত মানুষ, তার নিজস্ব বিবেক ও বিচারবোধ আছে, সে আমার কথা মেনে নেবে কেন? তাছাড়া, আমি এরকম কথা জোর দিয়ে ওকে বলিওনি। দিল্লিতে গভীর রাতে ওর সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি হয়েছিল, ও খুবই নেশাগ্রস্ত ছিল। সেসব কথা পরদিন সকালে ওর মনে না থাকাই স্বাভাবিক। সুতরাং শামীম এখন যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটা ওর নিজস্ব। এতে আমার কোনও ভূমিকা নেই।

সেদিন শামীম কাঁদতে কাঁদতে স্বীকার করেছিল, ও এখনও আনোয়ারকে ভালোবাসে। শেষ পর্যন্ত সেই ভালোবাসারই জয় হয়েছে।

শামীমের সঙ্গে কথা বলার পর আমার মনে একটা প্রশ্ন ঘুরেছে কয়েকদিন। আনোয়ারার প্রতি ভালোবাসা অক্ষুণ্ণ থাকলে শামীম প্রথম থেকেই আনোয়ারাকে সন্তানসমেত ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করেছিল কেন?

আনেকেই তো বিধবা কিংবা বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলাকে বিবাহ করে। সে মহিলার আগেকার দু-একটি সন্তান থাকলেও আপত্তি হয় না। এরকম বিয়ে তো আজকাল হয়। অর্থাৎ যাকে বিয়ে করা হচ্ছে, সে নারী আগে একজনের শয্যাসঙ্গিনী ছিল, এটা জানা কথা, তবু তা ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয় না।

আমি লক্ষ করেছি, নারীর সতীত্ব নিয়ে বাড়াবাড়ি মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের তুলনায় হিন্দুদের মধ্যেই প্রকট। ওই দুটি ধর্মে নারীদের পুনর্বিবাহের প্রথা প্রথম থেকেই চালু ছিল। হিন্দু ধর্মে মেয়েদের একবার বিয়ে হলে তা ভাঙার কোনও উপায় ছিল না। আর মাত্র দেড়শো বছর আগেও বিধবাদের পুনর্বিবাহের কোনও অধিকার ছিল না। বিধবাদের আবার বিয়ের অধিকার না দিয়ে হিন্দুরা বাচ্চা বাচ্চা বিধবাদের ওপর হাজাররকম বিধিনিষেধ আরোপ করে কত নির্যাতনই না করেছে। বিধবা মেয়েদের মুসুরির ডাল খাওয়া পর্যন্ত বারণ ছিল।

বিদ্যাসগার মশাইয়ের উদ্যোগে হিন্দুদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ আইন চালু হল বটে, তাও কি পুরোপুরি সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে হিন্দুদের মধ্যে? গ্রামগঞ্জে এখনও বিধবা-বিবাহের সংখ্যা যৎসামান্য। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনও চালু হয়েছে, কিন্তু গ্রামগঞ্জে কিংবা গরিব ঘরের মেয়েরা নির্যাতিত হয়েও সে-সুযোগ নিতে পারে না।

একাধিক সন্তানসমেত কোনও রমণীর পুনর্বিবাহ হিন্দুদের মধ্যে এখনও খুবই কম দেখা যায়, কিন্তু মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে এ-দৃষ্টান্ত যথেষ্ট. সামাজিকভাবেও বেশ স্বাভাবিক।

তবে। এর মধ্যেও একটা সূক্ষ্ম প্রশ্ন আছে।

একজন পুরুষ যখন একজন বিধবা বা ডিভোর্সি মেয়েকে বিয়ে করে, তখন সে জানে, ওই মেয়ের আগে একজন স্বামী ছিল, তার সঙ্গে সহবাস করেছে, হয়তো সেই পুরুষের সংসারে তার গর্ভে সন্তানেরও জন্ম হয়েছে, তবু সে তা মেনে নেয়। এসব জেনেশুনেই সে অন্য পুরুষের ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করে। কিন্তু যদি কোনও পুরুষ জানতে পারে, তার বর্তমান স্ত্রী ব্যভিচারিণী, অন্য পুরুষের সঙ্গে তার যৌন সম্পর্ক আছে, তা কি কোনও স্বামী মেনে নিতে পারে? জানা মাত্র দপ্ করে জ্বলে ওঠে রাগ, লকলক করে ঈর্ষা, তখন খুনোখুনিও ঘটে যায়।

এক নারীর আগে এক স্বামী ছিল। তার সঙ্গে অবশ্যই যৌন সম্পর্ক ছিল। এবং এক বিবাহিতা নারীর এক অবৈধ প্রেমিক আছে, এই দুটির মধ্যে তফাত কি শুধু সময়ের? তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। এর মধ্যে আছে মানুষের মনের অনেক জটিল গ্রন্থি।

আনোয়ারা যখন শামীমের স্ত্রী ছিল, তাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের কোনও প্রশ্নই ওঠেনি। সেই অবস্থায় সে চলে যায় বিদেশে। সেখানে স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় যাই হোক, অন্য একজন পুরুষ তার সঙ্গে লিপ্ত হয়ে তার গর্ভে সন্তান দেয়, সেটাই শামীমের রাগের কারণ। আনোয়ারা যদি তার স্ত্রী না হয়ে অন্য একটি মেয়ে হতো, তাহলে শামীম নিশ্চয়ই তার বিপদে বেশি সহানুভূতি দেখাত।

নিজের স্ত্রীকে আবার বিয়ে করা এমন কিছু অভিনব ঘটনা নয়। আমার পরিচিতদের মধ্যেই এমন ঘটেছে। সবচেয়ে বিশ্ববিখ্যাত উদাহরণ, অভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলরের বিয়ে হয়েছে সাত কী আটবার, তার মধ্যে রিচার্ড বার্টনের সঙ্গেই দু'বার।

মুসলমানদের মধ্যে এরকম উদাহরণ অজস্র। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার সময় কোনও স্বামী যদি রাগের মাথায় তিন তালাক বলে ওঠে, এবং যদি সেখানে কোনও সাক্ষী থাকে, তাহলে আর সেই তালাক ফেরত নেওয়া যায় না। স্ত্রীকে বিদায় দিতেই হয়। পরে যদি খুব অনুতাপ হয়, দু'জনেই কান্নাকাটি করে, তাহলে স্ত্রীকে আবার স্ত্রীর সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার একটাই উপায় আছে। উপায়টি তেমন রুচিসম্মত নয়। সেই স্ত্রীকে অন্য একটি লোকের সঙ্গে বিবাহে রাজি করাতে হবে। তারপর দ্বিতীয় স্বামীটি কিছুদিন পর তালাক দিলে তবেই সে-মেয়েটি ফিরে আসতে পারবে তার প্রথম স্বামীর কাছে। দ্বিতীয় স্বামীটি যদি তালাক দিয়ে রাজি না হয়? তা নিয়ে লেখা হয়েছে অনেক গল্প।

অবশ্য মুসলমান সমাজে এখনও এই প্রথাই পুনর্বিবাহের উপায় কি না তা আমি জানি না। এ-বিষয়ে আমার জ্ঞান গল্প-উপন্যাসেই সীমাবদ্ধ। তবে খুব সম্ভবত, শিক্ষিত পরিবারের এসব চলে না। আমার চেনাশোনা দেখা কোনও পরিবারে এরকম কিছু ঘটেনি।

কয়েক মাস আগে শামীমের সঙ্গে আনোয়ারার আইনগত বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। শামীমের পরিবার থেকেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তখন অনেকে মনে করেছিল, শামীম বুঝি অন্য কারুকে বিয়ে করতে চাইছে। তা সে করেনি। সম্ভবত, আনোয়ারার গায়ে অ্যাসিড ছুড়ে মারার ঘটনার পর খবরের কাগজে তাকে অধ্যাপক শামীম আহমেদের স্ত্রী বলে উল্লেখ করা হচ্ছিল, সেটা অনেকে পছন্দ করেনি।

এখন ওদের আবার কোন মতে বিয়ে হবে? আমার কোনও ধারণা নেই।

কামালকে জিজ্ঞেস করলে সে খানিকটা অস্পষ্টভাবে উত্তর দিল, আছে, ব্যবস্থা আছে।

স্বাতী বেরিয়ে এসে এই সুসংবাদ শুনে আনন্দে বাচ্চা মেয়ের মতো হাততালি দিয়ে ফেলল। আনোয়ারাকে ও খুবই ভালোবাসে, আনোয়ারার চিন্তায় ও মাঝে মাঝে নিঃশব্দে কেঁদেছে।

কামালের কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আবার সব শোনার পর স্বাতী ঘোষণা করল, ওদের বিয়ের দিনে আমরা ঢাকায় যাব। আমি আনোয়ারাকে একবার দেখতে চাই।

দ্বিতীয়বার বিয়ের আসর জমজমাট হবে, না সংক্ষেপে সারা হবে, তা আমরা জনি না। তবে, ঢাকায় গেলে তো আমাদের থাকবার জায়গার অভাব নেই, রবাহুতভাবেও চলে যাওয়া যায়। শুধু তারিখটা জানতে হবে।

নায়ক-নায়িকার এমন পুনর্মিলন সাধারণত আজকালকার সাহিত্যে স্থান পায় না। মনে হবে যেন ইচ্ছাপূরণের গল্প। যেন আর কোনও সমস্যাই রইল না। দে লিভড হ্যাপিলি এভার আফটার! তা শিল্পসম্মত হোক বা না হোক, বাস্তব জীবনে এরকম তো ঘটতেও পারে। একটি মেয়ে তার ভুলভ্রান্তি, দুর্যোগ সব মুছে ফেলে যদি আবার নিজের সংসার ও স্বামীর ভালোবাসা ফিরে পায়, সেটাও একটা জীবনশিল্প।

আনোয়ারার কাহিনি কি এখানেই শেষ?

দুপুরবেলা বাইরে বেরুবার সময় সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ আমার একটা নাম মনে পড়ে। সব্যসাচী। ছিপছিপে চেহারার অতি সুদর্শন তরুণ সব্যসাচী রায়।

তার চেহারাটা মনে পড়তেই আমি শিউরে উঠি। দূর হও সব্যসাচী, তোমাকে আমি চাই না।

কিন্তু একবার কোনও একটা চিন্তা মাথায় ঢুকে গেলে তা আর তাড়ানো সহজ নয়। বরং তাড়াবার চেষ্টা করলে আরও যেন পেয়ে বসে।

সব্যসাচী আমার পরিচিত। কিন্তু বন্ধু নয়। অনেকদিনের চেনা, তবু ঘনিষ্ঠতা হয়নি। প্রায়ই দেখা হতো একটা জায়গায়।

সেটা একজন কবির বাড়ি। তাঁর নাম উল্লেখ না করাই উচিত। বেশ নামকরা কবি, এককালে তাঁর নতুন ধরনের কবিতা খুব হইচই ফেলে দিয়েছিল। তিনি কবিতা লিখতেন বাংলায়, সাংবাদিকতা করতেন ইংরেজিতে।

প্রায় প্রত্যেকদিনই, বিশেষত শনিবার-রবিবার সেই কবির বাড়িতে বেশ বড় আড্ডা বসত। কবি মধ্যবয়েসি, আড্ডাধারীরা প্রায় সবাই বয়েসে বেশ তরুণ। নবীন কবি, অধ্যাপক, উঠতি রাজনীতিবিদ, শিল্পী। কবি যেমন সুবক্তা তেমনই বিদ্বান, রাজনীতি সম্পর্কেও তাঁর তীক্ষ্ণ মতামত ছিল, আমরা মুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনতাম।

সেসময় কবির পারিবারিক অবস্থাও বেশ সচ্ছল ছিল, কিছু সম্পত্তি-টম্পত্তি ছিল শুনেছি। প্রতিদিনই আড্ডার সময় অন্দরমহল থেকে নানা রকম সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য আসত। বিশেষ এরকম গরম গরম মাছের কচুরির স্বাদ আমার এখনও মুখে লেগে আছে।

আড্ডা শুরু হত চা-পান দিয়ে, রাত্রি একটু গাঢ় হলে শুরু হত সুরাপান। কবি বেশ উদারহস্তে সুরা বিলি করতেন, আমরা মনে করতাম তা যেন সুধার প্রসাদ।

কিন্তু সত্যিকথা বলতে কী, আমাদের সেই বয়েসে কবির বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা, মুখরোচক নানারকম খাদ্য এবং অকৃপণভাবে সুরাপানের চেয়েও আড্ডার প্রধান আকর্ষণ ছিল কবির কন্যা নিশা। ওঃ, সে কী মেয়ে! আমরা আড়ালে তাকে বলতাম 'আগুনের ঢেলা'। বেশ কিছু পুরুষকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেওয়ার জন্যই এইরকম মেয়েরা জন্মায়।

গায়ের রং তেমন ফর্সা নয় বলেই সম্ভবত তার নাম নিশা, অমন রূপসী আর এ পর্যন্ত দেখিনি। তন্বী, শ্যামা, শিখরিদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী... কালিদাসের নায়িকার এই বর্ণনার মধ্যে শুধু 'শিখরিদশনা' বাদ দিলে অন্য সবকিছুর সঙ্গে নিশার রূপ মিলে যায়। কিন্তু শুধু রূপ থাকলেই তো হয় না। অনেক সুন্দরী মেয়েকে, তার ব্যবহারের জন্যেই কিছুক্ষণ পরে বিরক্তিকর লাগে। একটি বেশ সুন্দরী মেয়ের গলার আওয়াজ ছিল টিয়াপাখির মতন, তাকে দেখলেই আমি পালাতাম।

নিশার গলার আওয়াজ সুরেলা। ব্যবহার ভদ্র, খুবই মেধাবী ছাত্রী ছিল। তাই কখনও বোকা বোকা কথা বলত না। এসব সত্ত্বেও তাকে মনে হত রহস্যময়ী। হয়তো এটা আমারই কল্পনা। কখন সে হাসে, কখন সে উদাসীনভাবে চুপ করে যায়। তার কোনও ঠিক নেই। মোট কথা, আগুনের শিখার মতন সেই নারীর টানে কবির বাড়িতে ছুটে যেত পতঙ্গের মতো কিছু যুবা।

কবি নানা বিষয়ে গল্প বলতেন, আমরা ভেতরে ভেতরে অনুভব করতাম, এখানে সূক্ষ্মভাবে একটি স্বয়ংবর সভাও বসছে। কে নিশাকে জিতে নেবে, কিংবা নিশা কার গলায় বরমাল্য দেবে? নিশা কয়েকদিনের জন্য একজনের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা করে, আবার সরে যায়। মাঝে মাঝে কোনও একজনকে সে আড্ডা থেকে সরিয়ে ডেকে নিয়ে যায় পাশের ঘরে। সেখানে কী হয় কে জানে। কিন্তু বিনা আহ্বানে সেখানে অন্য কারুর যাওয়াটা শোভন নয়। আমি মনে মনে কত কী যে কল্পনা করতাম।

এখানে স্বীকার কার নেওয়া ভালো, আমি সেই আড্ডায় কয়েক বছর নিয়মিত

গেলেও কখনও নিশার পাণিপ্রার্থীদের প্রতিযোগিতায় যোগ দিইনি, আমার অযোগ্যতার কথা আমি নিজেই জানতাম। যদিও তখনও আমি বিয়ে-টিয়ে করিনি। কিন্তু নিতান্তই এক বেকার কবি, চেহারাও শামসুর রাহমানের মতন নয়, এলেবেলে। পারিবারিক পরিচয়ও তেমন কিছু নেই। সুতরাং নিশাকে নিয়ে অনেক কিছু কল্পনা করলেও কোনওদিন ডাকেনি পাশের ঘরে।

প্রতিযোগিতা ছিল প্রধানত তিনজনের মধ্যে।

প্রসেনজিৎ, ধীমান সব্যসাচী। এদের মধ্যে প্রসেনজিৎ ছিল দারুণ নামকরা ছাত্র, অক্সফোর্ড থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি পড়ায়। কবি এঁকে খুব পছন্দ করেন। ধীমানের মা চলচ্চিত্রের একজন অভিনেত্রী। সাধারণ নায়িকা নন, সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা, ছেলেকে তিনি লন্ডনে পড়িয়েছেন। আর সব্যসাচীও ভালো ছাত্র, তার বাবা একজন সফল ব্যবসায়ী। হিস্ট্রিতে পি-এইচ ডি করার পর সে আর কিছুই করে না। বাবার ব্যবসাও দেখে না, গান গায়।

প্রসেনজিতের পক্ষেই জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ছিল। হঠাৎ একদিন আড্ডার মাঝখানে সব্যসাচী ঘোষণা করল, সে নিশাকে বিয়ে করেছে আগামী সপ্তাহে।

কবি তাঁর মেয়ের বিয়ে সম্পর্কে কখনও কোনও মন্তব্য করেননি। সেদিন বললেন, নিশা যদি রাজি হয় তো ভালো কথা। মাই ব্লেসিংস টু ইউ।

এক সপ্তাহের মধ্যেই ওদের বিয়ে হয়ে গেল বিনা আড়ম্বড়ে। নবদম্পতি মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে চলে গেল সুইজারল্যান্ডে।

ত্রয়ীর একজনের গলায় বরমাল্য দিয়ে নিশা অন্য দুটি পতঙ্গের ডানা পুড়িয়ে দিল। প্রসেনজিতের সাংঘাতিক ডিপ্রেশানের ফলে সে সকাল থেকে শুরু করল মদ্যপান। কয়েক মাসের মধ্যেই সে পুরোপুরি অ্যালকোহলিক। তার চাকরি গেল প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে, একটা খবরের কাগজে ঢুকে সে চাকরিও রাখতে পারল না। পুরনো বন্ধুরা তাকে দেখলেই এড়িয়ে যায়। এখন শুনেছি, সে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে ফুরোনে চিঠিপত্র লেখার কাজ করে। কয়েক ঘণ্টার জন্য সে অফিসে যায়। অত দুর্দান্ত ছাত্র ছিল, এখন সে-বিদ্যে আর কোনও কাজে লাগে না।

আর ধীমান উধাও হয়ে গেল কলকাতা থেকে।

অনেকদিন পর খবর পেয়েছি, সে থাকে ভোপালে, একটি আদিবাসী ওরাওঁ মেয়েকে বিয়ে করেছে, কী কাজ করে জীবিকার জন্য, তা জানি না। সাংবাদিক হিসেবে তার যে পরিচিত হয়েছিল, তা মুছে গেছে।

কবির বাড়ির সেই সান্ধ্য-আড্ডা একেবারে উঠে না গেলেও কমে গেল আড্ডাধারীর সংখ্যা। এখন বয়স্করাই বেশি যায় সেখানে। কবির সঙ্গে একদিন আমার খুব তর্কাতর্কি হল, তাঁর উগ্র রাজনৈতিক মতামত আমার সহ্য হয়নি। আমি হট করে বলে ফেললাম, অত রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামালে আপনার দ্বারা আর কবিতা লেখা

হবে না।

তারপর থেকে আমিও আর সে-আড্ডায় যাই না।

ঠিক দু'বছর পূর্ণ হতে না হতেই নিশা আর সব্যসাচীর বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেল। কী কারণে, তা তারাই জানে। অনুপম নামে এক সাংবাদিক বন্ধু বলেছিল, ওদের বিয়েটা টিকল না কেন, জানিস? নিশা খুব চুমু খেতে ভালোবাসে। ওর মতে, প্রত্যেকটি পুরুষের চুমুর স্বাদ আলাদা। পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে নিশা এক-একদিন এক-একজনকে চুমু খেত। বিয়ের পর সব্যসাচী প্রায়ই নিশাকে গঞ্জনা দিত বলে নিশা একদিন রাগ করে...

অন্যাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ মিথ্যে গল্প ছড়িয়ে এক-একজন কী রকম আনন্দ পায়। এটা তার একটা জলজ্যান্ত উদাহরণ। সব্যসাচী আর নিশার মধ্যে কী নিয়ে ঝগড়া হতো, তা অনুপম জানবে কী করে? অনুপমকে আমি কখনো নিশার সঙ্গে পাশের ঘরেও যেতে দেখিনি।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোকেও কি নিশা কখনও...

সরাসরি উত্তর না দিয়ে অনুপম বলেছিল, কেন, তোর হিংসে হচ্ছে নাকি?

সে যাই হোক, অনেক কারণেই ডিভোর্স হতে পারে, তাতে বিশেষত্ব কিছু নেই। কিন্তু বিস্ময়কর ঘটনা ঘটতে লাগল এর পরে।

বিয়ে ভাঙার পর নিশা আর তার বাপের বাড়িতে ফিরে এলো না। সে চলে গেল জলপাইগুড়ি। সেখানকার কলেজে চাকরি নিয়ে। সব্যসাচী নানান ক্লাবের অনুষ্ঠানের ইংরেজি গান গায়, আমাদের সঙ্গে আর বিশেষ দেখা হয় না।

জলপাইগুড়ির ডিস্ট্রিট ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীনিবাসন দক্ষিণ ভারতীয় হলেও চমৎকার বাংলা জানে। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র ছিল, কলেজে বিতর্ক-প্রতিযোগিতায় তার বেশ সুনাম ছিল! সেই শ্রীনিবাসনের সঙ্গে নিশার আগে একটু একটু পরিচয় ছিল, জলপাইগুড়িতে প্রেম, তারপরেই বিয়ে হয়ে গেল আট-ন' মাসের মধ্যে।

এরপরেই অদ্ভুত ব্যাপার শুরু করে দিল সব্যসাচী। সে প্রায়ই জলপাইগুড়ি যায়। নিশার সঙ্গে দেখা করে, শ্রীনিবাসনের সামনেই নিশার হাত জড়িয়ে ধরে বলে, আমি তোমার প্রতি অন্যায় করেছি, ভুল বুঝেছি, তুমি আমায় রক্ষা করো ইত্যাদি। শ্রীনিবাসন অতি ভদ্র, সে সব্যসাচীকে বাড়ি থেকে দূর করে দেয় না। বরং খাওয়ার টেবিলে ডাকে, পানীয় দেয়। এইভাবে চলল কিছুদিন।

বাতাসে সব খবর ছড়ায়, টুকরো-টুকরোভাবে আমাদের কানে আসে। জলপাইগুড়িতে ঠিক কী ঘটেছিল, তা তো জানি না। হঠাৎ একদিন চমকপ্রদ সংবাদ দিল অনুপম, শ্রীনিবাসন নিশাকে ডিভোর্স করেছে, নিশার সঙ্গে আবার বিয়ে হচ্ছে সব্যসাচীর।

সত্যিই তাই। প্রাথমবার তেমন আড়ম্বর হয়নি। এবার বিরাট পার্টি হয়েছিলাম।

নিশাকে সে আবার কলকাতায় ফিরিয়ে এনেছে। আমি ওদের বাড়ি যাই না। নিশার সঙ্গে দেখাও হয় না। তবু একই শহরে আছি, এটা ভাবতে ভালো লাগে।

সব্যসাচীর শুধু চেহারা সুন্দর নয়, বুদ্ধি আছে, মেধা আছে, পারিবারিক টাকা-পয়সা আছে। তবু যেন কীসের একটা অভাব ওর চরিত্রে। নিশা ওকে সৃষ্টিশীল কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিল। অনুপমের খবর-অনুযায়ী, ওদের মধ্যে নাকি আবার ঝগড়াঝাঁটি শুরু করেছে। মাঝরাত্তিরে নিশাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে সব্যসাচী অত্যন্ত কুৎসিত গালাগালি দেয়, এমনকি থাপ্পড়-টাপ্পড়ও মারে! (অনুপম কি তখন খাটের তলায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থেকে সেইসব শুনেছে ও দেখেছে?) তবে কিছু সত্যতা আছে নিশ্চয়ই। ওদের আবার বিয়ে ভেঙে গেল।

নিশা এবার ফিরে এল তার বাবার কাছে। কবি তখন অসুস্থ। যদিও অগ্নিবর্ষী রাজনৈতিক লেখা লিখেছেন একটি ইংরেজি পত্রিকায়। কিন্তু তাঁর শরীর ভেঙে গেছে। সেই সান্ধ্য-আড্ডাও প্রায় বন্ধ। বাবাকে দেখাশোনা করা ছাড়াও বাড়ির কাছে একটি বস্তির ছেলেমেয়েদের জন্য ইস্কুলে যোগ দিল। নতুন কোনও পুরুষ বন্ধু হয়নি বলেই শুনেছি।

একদিন রাস্তা থেকে বদ্ধমাতাল অবস্থায় প্রসেনজিৎকে ধরে নিয়ে এল বাড়িতে। তার নেশা-টেশা ছাড়িয়ে তাকে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার অনেক চেষ্টা করেছিল নিশা। কিন্তু প্রসেনজিৎ একেবারে সংশোধনের অতীত অবস্থায় চলে গেছে। প্রায় পাগলই বলা যায়। মাঝে মাঝেই সে নিশাকে চিনতে না পেরে বলত, তুমি কে? তুমি কে?

নিশার আত্মহত্যার খবর আমি জানতে পারি সংবাদপত্রে। সে এক বিখ্যাত কবির কন্যা। সমাজের বুদ্ধিজীবী মহলের সবাই তাকে চিনত, তাই খবরের কাগজে তার মৃত্যুসংবাদ স্থান পেতেই পারে। অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খেয়েছে। কারণ নাকি মানসিক অবসাদ। আত্মহত্যার সঠিক কারণও কি কখনও জানা যায়?

আমার মতন অনেকে, যারা নিশার সঙ্গে প্রেম করেনি কিংবা করার সুযোগ পায়নি, তেমন কিছু ঘনিষ্ঠতাও হয়নি, তবু নিশার রূপ ও ব্যবহারে মুগ্ধ থেকেছে, তারা সবাই গভীর আঘাত পেয়েছিল এই সংবাদে। আমার লেখালেখি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বেশ কয়েকদিন। নিশার এই অসময়ে প্রস্থানের জন্য আমরা সব্যসাচীকেই পুরোপুরি দায়ী করেছি। সে নিশার জীবনটা নষ্ট করে দিল, নিজেও কখনও উঠে দাঁড়াতে পারল না। এখন বোধহয় দিল্লিতে থাকে, সে বুঝে গেছে, কলকাতা শহরে তার স্থান নেই।

সব্যসাচী-প্রসঙ্গেই এসে যায় মনীশের কথা। মনীশ আর প্রথমা। চমৎকার একটি দম্পতি, একজন ডাক্তার, একজন প্রফেসার। প্রথমা প্রায়ই সাহিত্যের আসর বসাত বাড়িতে, আমি কয়েকবার যোগ দিয়েছি। কেন ওদের ডিভোর্স হল জানি না, বলাই বাহুল্য, তারপর ওদের বাড়ির সেই আসর ভেঙে গেল।

মনীশের সঙ্গে আমার আর বিশেষ দেখা হয় না। তবে প্রথমা থাকে ওর দিদির ফ্ল্যাটে। আমার বাড়ির কাছেই। দিদিরা থাকে ব্যাঙ্গালোরে, ফ্ল্যাটটা খালি ছিল, তাই প্রথমার সুবিধে হয়েছে। প্রায়ই ওর সঙ্গে নিত্যনতুন পুরুষ বন্ধু দেখি। মনীশের সঙ্গেও নাকি এক নারী আইপিএস অফিসারের খুব প্রেম। এসবই উড়ো খবর।

একদিন প্রথমার সঙ্গে রাস্তায় দেখা, খুব চিন্তিতভাবে সে বলল, আপনি শুনেছেন মনীশ খুব অসুস্থ, একদিন সিঁড়িতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল।

আমি বললাম, শুনিনি তো। খোঁজ নিচ্ছি।

আমি খোঁজ নেওয়ার আগেই শুনলাম, প্রথমা মনীশের বাড়িতে গিয়ে সেবা করতে শুরু করেছে।

আজকাল তো অসুস্থ হলে কেউ বাড়িতে থাকে না, মনীশ চলে গেল নার্সিং হোমে। সেখানেও প্রতিদিন দু'বেলা যায় প্রথমা, নার্সের বদলে সে-ই মনীশকে খাইয়ে দেয়। মনীশ যেদিন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরল, সেদিনও প্রথমা গেল তার সঙ্গে। ঘরদোর গুছিয়ে দিল। তারপর আর যায় না।

দু'মাস পরে প্রথমার দিদি এল ব্যাঙ্গালোর থেকে, এসেই হার্ট অ্যাটাক। তখন মনীশ চলে এল চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করে দিতে। নার্সিং হোমে পাঠাতে হল না, বাড়িতেই রইলেন দিদি। মনীশ এসে অনেকক্ষণ বসে থাকে, গল্প করে। প্রথমার রান্না লাউ-চিংড়ি তার খুব পছন্দ, আর ঝিঙে পোস্ত, দুপুরে সেইসব খেয়ে যায়।

দিদি সেরে উঠার পরেও মনীশের যাতায়াত বন্ধ হল না। অনেক সময় প্রথমার কোনও পুরুষ বন্ধুর সঙ্গেও তার দেখা হয়ে যায়।

বন্ধু-বান্ধবরা অনেকেই বলতে লাগল, ওদের যখন পরস্পরের প্রতি এখনও টান আছে, তখন সম্পর্কটা আবার জোড়া দিলেই তো হয়। মনীশের গুরুর মতন সিনিয়র ডাক্তার অজিত বসু মনীশকে ধমক দিয়ে বললেন, এসব কী ন্যাকামি করছিস? শুধু শুধু বিয়েটা ভাঙবি কেন? পুরোনো কথা ভুলে যা! আবার থাক একসঙ্গে।

দেখা গেল, দু'জনের কারুরই তেমন আপত্তি নেই। ওদের পাকাপাকি ডিভোর্স হয়নি। লিগ্যাল সেপারেশান চলছিল, সুতরাং পুনর্বিবাহের দরকার নেই। কোর্টে একটা নোটিস দিয়ে আবার স্বামী-স্ত্রী হয়ে যেতে পারে।

প্রথমা ফিরে গিয়ে আবার সংসার পাতল। ভালোই চলল কিছুদিন, আবার শনিবার বাড়িতে সাহিত্যসভা, খাওয়া-দাওয়া। স্ত্রীর পরিকল্পনা, স্বামীর সমান উৎসাহ।

তবু সে বিয়ে টিকল না।

আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা অনুপমের মতে, মনীশ নাকি ভোর পাঁচটায় বাড়ির সদর দরজা খুলে চিৎকার করে বলেছে, গেট আউট! গেট আউট!

শুধু তাই নয়, তার গুরুর কাছে বলেছে, শি ইজ আ হোর!

কামালের কাছ থেকে ভালো খবরটা শোনার পরই এই দুটো ঘটনা মনে পড়ল

কেন? দুটি ক্ষেত্রেই আগেকার বউকে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থাটা সার্থক হয়নি।

সব্যসাচী কিংবা মনীশ কেউই ঠিক ধর্মবিশ্বাসী নয়। অনেক আধুনিক মানুষ যেমন হয়, ধর্ম নিয়ে মাথাই ঘামায় না। তবু, হিন্দু পরিবারের জন্ম, কিছু কিছু সংস্কার থেকেই যায়। এদের ক্ষেত্রেও কি সেই হিন্দুদের সতীত্ব সম্পর্কে শুচিবাই কাজ করেছে? দুটি ঘটনাতেই পুরুষ দু'জনই শেষ পর্যন্ত মানিয়ে নিতে পারেনি।

মুসলমানরা এ-ব্যাপারে অনেকটা সংস্কারমুক্ত। শামীম আর আনোয়ারা হয়তো মানিয়ে নিতে পারবে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই মানিয়ে নিতে পারবে।



৩৩

নিউ জার্সি থেকে সামাদ দম্পতি দেখা করতে এলেন এক সকালে। স্বামীর নাম ইমতিয়াজ, স্ত্রীর নাম মাসুদা। দুজনেই ভারি সুশ্রী, সঙ্গে তাদের মেয়ে, তেরো চোদ্দো বছর বয়েস, তার নাম ইলিনা। সে বেশ রোগা আর লাজুক, কথাই বলতে চায় না। এই বয়েসের ছেলেমেয়েরা সাধারণত এমনই হয়, মুখ খুলতে চায় না বড়দের সামনে। আর দু-তিন বছরের মধ্যে সে বিকশিত হবে, সম্পূর্ণ বদলে যাবে।

ওঁরা আগে থেকে ফোন করেছিলেন, আমিই আজ সকালে সময় দিয়েছি। তবু ওঁদের কথা বলার সময় আমি অস্থির বোধ কবছিলাম। আমার মন পড়ে আছে লেখার টেবিলে। সেদিনই আমার একটা বড় গল্পের শেষ কয়েকটি পৃষ্ঠা লিখতে হবে। কোনও একটা রচনার একেবারে শেষের দিকে এসে পৌঁছোলে একজন লেখকের মনের অবস্থা কী হয়, তা অন্য কারুকে বোঝানো যায় না। হয়তো মেয়েদের সন্তান প্রসবের মুহূর্তেরই মতন অনেকটা।

আমি আমার লেখার ব্যস্ততার কথা মুখ ফুটে কখনও বলতে পারি না, লজ্জা পাই। অতদূর থেকে কোনও অতিথি এলে ব্যস্ততা দেখানো শোভন নয়। আর আমি না বললে, ওঁরাই বা বুঝবেন কী করে! আমার বসবার ঘরে তখন আর একজন প্রবাসী বন্ধু উপস্থিত, টরন্টোর দীপ্তেন্দু। অন্যদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতে হয় না, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে যে-কোনও নবাগতের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় জমিয়ে নেয়। এর মধ্যেই সে সামাদ সাহেবের নাড়ি-নক্ষত্র অনেকখানি জেনে ফেলেছে।

ইমতিয়াজ সামাদ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক। বেশ পণ্ডিত লোক, তা তাঁর কথা শুনলেই বোঝা যায়। যদিও তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য জাহির করেন না, প্রকৃত পণ্ডিতদের তা দরকারও হয় না। দীপ্তেন্দু একসময় ফস করে বলে উঠল, সামাদ সাহেব, আপনি তো নোবেল প্রাইজও পেয়ে যেতে পারেন যে-কোনও দিন। আমাদের খাওয়াবেন তো? ইকোনমিক্স ফিল্ডটা অনেকটা খালি পড়ে আছে।

সামাদ স্মিতহাস্যে বললেন, কী যে বলেন, আমি বড় বড় ইকোনমিস্টদের নোখেরও যোগ্য নই। আমি সামান্য মাস্টার। আর আপনি যা বললেন, তাও ঠিক

নয়। ইকোনমিক্‌সের ফিল্‌ড মোটেই খালি নয়, বরং খুব ঠেলাঠেলি।

মাসুদা বলল, প্রফেসর অমর্ত্য সেন ওনাকে খুব স্নেহ করেন।

দীপ্তেন্দু এবার মাসুদার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, আপনিও কি কোথাও পড়ান? মাসুদা বলল, না। একটা ব্যাংকে চাকরি করতাম। এখন কিছুদিন বাড়িতেই আছি।

নিশ্চয়ই খুব ভালো রান্না করেন। শুঁটকি মাছ? টরন্টো থেকে তো নিউ জার্সি খুব দূরে নয়। একদিন গিয়ে আপনার রান্না খেয়ে আসব।

আসেন, আসেন, চলে আসেন, যে-কোনওদিন।

ঠিক যাব, সুনীলদাকেও নিয়ে যাব। আপনারা ক্ল্যাস চাউডার সুপ খান? আমি ভালো বানাতে পারি।

এইসব আলোচনা একবার শুরু হলে সহজে শেষ হয় না।

সামাদ আমাকে তাঁর লেখা দুটি বই দিতে এসেছেন। দুখানিই কাব্যগ্রন্থ।

আমি দেখার আগেই দীপ্তেন্দু একটি বই তুলে নিয়ে, বিস্ময়ে ভুরু উঁচু করে বলল, সে কি মশাই, আপনি আমেরিকায় ইকোনমিক্‌স পড়ান, আবার বাংলায় কবিতাও লেখেন!

সামাদ লাজুকভাবে বললেন, ছোটবেলার শখ। ছাড়তে পারি না।

দীপ্তেন্দু বলল, তাহলে তো আপনাকে আর নোবেল প্রাইজটা দেওয়া গেল না! কবিতা লিখবেন, আবার অর্থনীতির জন্য প্রাইজও পাবেন, দুটো তো একসঙ্গে হতে পারে না।

আমি দীপ্তেন্দুকে থামাবার জন্য বললাম, তুমি কবে থেকে নোবেল প্রাইজ দেবার মালিক হলে?

দীপ্তেন্দু সারা গাল ছড়িয়ে হাসল।

মাসুদা বলল, দুই বছর আগে ওঁর নাম শর্ট লিস্টে উঠেছিল!

সামাদ বললেন, আরে থাক না ওসব কথা। ওরকম নাম অনেকেরই ওঠে।

দীপ্তেন্দু আবার উত্তেজিতভাবে বলল, নাম উঠেছিল, তবে তো ঠিকই ধরেছি। নোবেল প্রাইজ মেটেরিয়াল। একবার যখন নাম উঠেছে, তা হলে ঠিক পেয়ে যাবেন। তবে কবিতা লেখাটা ছাড়ুন।

আমি বললাম, কেন, কবিতা ছাড়তে হবে কেন? অর্থনীতি কিংবা বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করলেও কি সাহিত্য বা গান-বাজনার চর্চা করা যায় না। অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী... আইনস্টাইন নিজেই তো বেহালা বাজাতেন।

দীপ্তেন্দু ঠোঁট উলটে বলল, সে তো শখের পিড়িং-পাড়াং।

আমি বললাম, মোটেই তা নয়। জার্মানি থেকে চলে আসার পর আইনস্টাইন পয়সা তোলার জন্য নিউ ইয়র্কে কনসার্ট হলে বেহালা বাজিয়েছেন। লোকে টিকিট

কেটে শুনতে গেছে।

দীপ্তেন্দু বলল, ও কে। সামাদ সাহেব, আপনার একটা কবিতা নিজে পড়ে শোনান।

আমি প্রমাদ গুনলাম। সকালবেলাতেই আমার কবিতা শুনতে ইচ্ছে করে না। অবসরমতন কবিতা পড়ে দেখলেই ঠিক বিচার করা যায়। তাছাড়া আমার মাথায় এখন অন্য চিন্তা।

তবু শুনতে হল। সামাদের কবিতা একেবারে এলেবেলে নয় স্বীকার করতেই হবে। গুণ আছে।

বললাম, বাঃ!

দীপ্তেন্দু বলল, সুনীলদা যখন ভালো বলছেন, আমি অত কবিতা বুঝি না, নিশ্চয়ই ভালো।

আমি মনে মনে বললাম, খারাপ লাগলেও ভালোই বলতাম। সবাই সেটাই শুনতে চায়। শুধু শুধু আমি কারুর মনে আঘাত দিই না।

প্রশংসায় উৎসাহিত হয়ে, পাতা উলটে সামাদ বলল, আর একটা শোনাব, এইটা আমার মেয়ের গত বছরের জন্মদিনে লিখেছি।

সে-কবিতার মধ্যপথে দীপ্তেন্দু বাধা দিয়ে বলল, আপনার মেয়ে বাংলা বোঝে? ওদেশে এই বয়েসি ছেলেমেয়েরা...

ইলিনাকে সে সরাসরি জিজ্ঞেস করল, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি? ইউ স্পিক বেঙ্গলি? ক্যান ইউ রাইট?

এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি, এবার সে স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, আপনি আমার পরীক্ষা নেবেন?

আমি বললাম, দীপ্তেন্দু, তোমার ছেলেরা বাংলা পড়তে পারে না। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ আমেরিকাতেই থাকুক কিংবা জার্মানিতে, তাদের ছেলেমেয়েরা সবাই মাতৃভাষা পড়তে-লিখতে শিখে যায়।

সামাদ বললেন, আনফরচুনেটলি এখন আর তা ঠিক নয়। এই জেনারেশানের অনেক ছেলেমেয়ে, যারা বিদেশে থাকে, তারা বাংলা বলতে পারলেও লিখতে শেখে না।

এই সময় স্বাতী এসে উঁকি দিল। এতক্ষণে তার স্নান পর্ব শেষ হয়েছে। মাথার ভিজে চুলে একটা তোয়ালে বাঁধা।

স্বাতীর সঙ্গে ওদের আলাপ করিয়ে দিয়ে বললাম, স্বাতী, এঁদের একটু চা-টা খাওয়াও।

দীপ্তেন্দু বলল, আমি চা খাব না। বাড়িতে ঠান্ডা বিয়ার নেই?

আমি ঠিক করলাম, স্বাতীকে এখানে বসিয়ে দু-এক মিনিট বাদে আমি লেখার টেবিলে ফিরে যাব। যেতেই হবে।

মাসুদা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ভাবি, আপনার জন্য একটা ছোট্ট জিনিস এনেছি। জানি না আপনার পছন্দ হবে কি না।

সে একটা প্যাকেট দিল স্বাতীকে। সেটা মোটেই ছোট নয়। তার ভেতর থেকে বেরুল এক ঝলমলে শাড়ি।

শাড়ি উপহার পেলে খুশি হয় না, এমন বাঙালি মেয়ে আছে নাকি? আবার একেবারে অপরিচিত কিংবা সদ্য পরিচিত কারুর কাছ থেকে উপহার নিতে সঙ্কোচও হয়। স্বাতীর মুখে সেই খুশি ও লজ্জার রঙে মেশামেশি।

সে বলল, এ কী, এতো দামি শাড়ি এনেছেন, আমাকে দেবেন কেন, অন্য কোনও কমবয়েসি মেয়েকে দিন।

মাসুদা বলল, এমন কিছু দামি না। আপনার পছন্দ হয়েছে কি না বলেন। রংটা আপনাকে মানাবে।

স্বাতী বলল, খুব সুন্দর।

শিশুর মতন কৌতূহলে দীপ্তেন্দু জিজ্ঞেস করল, এটাকে কী শাড়ি বলে? কোথায় পাওয়া যায়? আমার বউয়ের জন্য একখানা কিনতে হবে।

স্বাতী বলল, ঢাকাই জামদানি। ঢাকায় যাও, কিনে নিয়ে এসো।

মাসুদা বলল, এখন নিউইয়র্কেও পাওয়া যায়। আপনি টরন্টোতেও খোঁজ করে করে দেখতে পারেন।

শাড়ির আলোচনায় আমার কোনও আগ্রহ নেই। ভেতরে ভেতরে অস্থিরতা বাড়ছে। মাঝে মাঝে চোরা চোখে দেখছি দেয়াল ঘড়ি। বারান্দার রেলিংয়ে এসে বসেছে দুটি শালিক পাখি। ওরা রোজ বেলা এগারোটার পর আসে।

দীপ্তেন্দু বলল, আমার বউ তো শাড়িই পরে না। ও দেশে শাড়ি পরবে কখন? তবু শাড়ি জমাবার শখ। প্রত্যেকবার আমাকে বলবে...বছরে এক-দুবার কোনও বাঙালি বিয়েবাড়িতে শুধু শাড়ি পরে যায়।

স্বাতী বলল, এত ঝকমকে শাড়ি এখানেও কোনও বিয়েবাড়ি ছাড়া পরা যায় না।

দীপ্তেন্দু জিজ্ঞেস করল, কাছাকাছি কোনও বিয়ে আছে? তাহলে আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব। অনেকদিন এখানকার কোনও বিয়েতে পাত চাপড়ে খাইনি। লুচি, ছোলার ডাল, টিকিওয়ালা বেগুন ভাজা।

স্বাতী বলল, কাছাকাছি বিয়ে, মানে...এখানে নেই, ঢাকায় আছে। ঢাকায় যেতে হবে।

দীপ্তেন্দু বলল, ঢাকায় গিয়ে ঢাকাই শাড়ি পরবে? বরং বেনারসী কিংবা আর একটা কী যেন নাম, কাঞ্জিভরম।

আমি দীপ্তেন্দুকে মৃদু ধমক দিয়ে বললাম, চুপ করো, তোমাকে আর শাড়ি নিয়ে

জ্ঞান দিতে হবে না।

মাসুদা স্বাতীকে জিজ্ঞেস করল, ভাবি, আপনি ঢাকায় যাচ্ছেন? কার বিয়ে? আপনাদের কোনও আত্মীয় থাকে?

স্বাতী বলল, আনোয়ারা নামে একটি মেয়েকে আমরা খুব স্নেহ করি। অনেকটা আত্মীয়েরই মতন। তার বিয়ে। চেনেন আনোয়ারাকে?

আমি বললাম, আনোয়ারা কত আছে, ওঁরা চিনবেন কী করে? কই, চায়ের ব্যবস্থা করলে না?

স্বাতী উৎপলকে চায়ের কথা জানিয়ে আবার বলল, এই বিয়েটা খুবই স্পেশাল ধরনের, তাই আমার খুব যেতে ইচ্ছে করছে। আনোয়ারার স্বামীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল, মাঝখানে ডিভোর্স হয়ে যায়। এখন সেই আগেকার স্বামী শামীমের সঙ্গেই তার আবার বিয়ে হচ্ছে। খুব ইন্টারেস্টিং না? আমরা দুজনকেই চিনি। খুব খুশি হয়েছি। এবারের বিয়েটায় দারুণ জাঁকজমক হবে।

মাসুদা আর সামাদ পরস্পরের দিকে তাকাল।

হঠাৎ দুজনেরই মুখ শুকনো আর কঠিন হয়ে গেছে।

সামাদ বলল, এখানে আসার আগে আমরা ঢাকায় দুই সপ্তাহ ছিলাম। বেলাল চৌধুরীর কাছে ওই মহিলার কথা সবই শুনেছি।

সারা পৃথিবীতে বেলালের পরিচিত মানুষের সংখ্যার ইয়ত্তা নেই। আমেরিকাপ্রবাসী এই দম্পতি আনোয়ারার কথাও জেনে ফেলেছে। পৃথিবীটা সত্যিই ছোট হয়ে আসছে ক্রমশ।

ইলিনা এবার উঠে দাঁড়িয়ে বিরক্তভাবে বলল, আমরা এখন যাব না?

মনে হয় যেন এই মেয়েটি আমাদের বাড়িতে আসাই পছন্দ করেনি। তাকে জোর করে আনা হয়েছে।

সামাদও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়েস, এবার যেতে হবে।

স্বাতী বলল, না, না, ওই তো চা এসে গেছে। ইলিনা কি মিষ্টি খায়? নাকি ডায়েটিং করে রোগা থাকতে চায়? ওদেশের মেয়েরা—

মাসুদা আমার সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, আপনি তো সুন্দর হককে চিনতেন?

অমি বললাম, সুন্দর? হ্যাঁ, চিনি। সাংবাদিক, আর খুব ভালো গল্পও লেখে। ভেরি ব্রাইট ইয়াংম্যান।

মাসুদা খানিকটা ক্ষোভের সঙ্গে বলল, তার একটা চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আপনি শুনেছিলেন?

আমি বললাম, তার একটা চোখে খুব আঘাত লেগেছিল জানি। এখানে এসেছিল চিকিৎসার জন্য। এখন সে ভালো আছে?

মাসুদা বলল, ফর দ্যাট উয়োম্যান...

আমি বললাম, আনোয়ারা খুব অসহায় হয়ে পড়েছিল। সুন্দর ওকে অনেকরকম ভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল, সেইজন্য কারা যেন ওকে খুব মারধর করে। মাথাতেও চোট লেগেছিল।

মাসুদা বলল, সুন্দর আমার আপন মাসির ছেলে। ইলিনা ওর খুব ভক্ত ছিল, নিয়মিত চিঠি লিখত।

ইলিনা চেঁচিয়ে বলল, মা।

মাসুদা আবার বলল, দশদিন আগে সুন্দর আত্মহত্যা করেছে। ওই আনোয়ারা আমার ভাইয়ের জীবনটা নষ্ট করে দিল।

এরপর শুধু নিঃশব্দে চা পান।

সুন্দর নামের ছেলেটির সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার বেশ ভালো লেগেছিল। কিন্তু তার আত্মহত্যা করার সংবাদ শুনে দুঃখ বা বেদনাবোধের বদলে আমার খানিকটা রাগই হল।

একজন বুদ্ধিমান ছেলে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার অধিকার যে অর্জন করেছে, সে কেন আত্মহত্যা করবে? মানুষের জীবন তো একটাই, মৃত্যু একসময় আসবেই, এটা ধ্রুব সত্য, কিন্তু সেই স্বাভাবিক মৃত্যুর আগেই মানুষ কেন নির্বোধের মতো জীবন শেষ করে দেবে? অনেক সময় সংকট আসে, আবেগের প্রাবল্যে কখনও বেঁচে থাকাটা অসহ্য বোধ হয়, কিন্তু সেসবও তো কাটিয়ে ওঠা যায়। মৃত্যুর খুব কাছে গিয়ে ফিরে আসার পরেও তো অনেকের জীবন আবার আনন্দে ঝলমল করে। চরম দারিদ্র এবং চোখের সামনে সন্তানদের অনাহারে কাঁদতে দেখলে কেউ কেউ আত্মহত্যা করে, বাস্তব থেকে সেই পলায়নের তবু মানে বোঝা যায়। অন্যসব আত্মহত্যাই সাময়িক পাগলামির ফল। আমি নিজেই অবশ্য দুবার আত্মহত্যার কথা ভেবেছিলাম, একবার চেষ্টাও করেছি, কিন্তু তখন আমার বয়েস সতেরো থেকে উনিশ। সেই বয়েসে হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় জীবনটা অর্থহীন। সেই বয়েসের ছেলেরা যুদ্ধে গিয়ে প্রাণ দেওয়াটা গৌরবের মনে করে। রাজনৈতিক দলের দাদাদের নির্দেশে যখন তখন ছুটে গিয়ে নিজের প্রাণটা বাজে খরচ করে ফেলে। সেই বয়েসটা পেরিয়ে গেলে একটা নিজস্ব বিচারবুদ্ধি আসে। বোঝা যায় জীবনের মর্ম। সুন্দর হকের বয়েস অন্তত পঁয়ত্রিশ তো হবেই। তার মাথায় চোট লেগেছিল, সেই থেকে কি পাগলামি এসে গেল?

সুন্দরের মৃত্যুর জন্য ওর আত্মীয়রা আনোয়ারাকে দায়ী করছে। আনোয়ারাকে সাহায্য করতে গিয়ে সুন্দর হয়তো আনোয়ারার প্রেমেই পড়ে গিয়েছিল।

আনোয়ারা আবার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে রাজি হয়েছে শুনে সে তা সহ্য করতে পারেনি? তারপরেই পাগল হয়ে গেল? কিন্তু আনোয়ারাও সুন্দরকে ভালোবেসেছিল কি না, তা আমরা জানি না। সে তার প্রাক্তন স্বামীকেই ভালোবাসলে

সেটা কি দোষের?

সাধারণভাবে বলা যায়, অধিকাংশ পুরুষদের মৃত্যুর জন্যই মেয়েদের দায়ী করা যায় না। কারণ, পুরুষদের সব সময়ই দূরে সরে যাবার সুযোগ আছে। ব্যর্থ প্রেমিকার দেশ ছেড়ে নিরুদ্দেশে চলে গেল, এরকম উদাহরণও অজস্র। কিন্তু মেয়েদের সে-সুযোগ বা অধিকার নেই। অধিকাংশ মেয়েই প্রায় বন্দিনীর মতন এক জায়গায় পড়ে থেকে নানারকম লাঞ্ছনা, নির্যাতন সহ্য করে। কখনও তা অসহ্য হলে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বেলে দেয়, কিংবা গলায় দড়ি বেঁধে ঝোলে।

সামাদরা চলে যাবার পর আমি গিয়ে বসলাম লেখার টেবিলে। খবরটা ভুলতে পারছি না। ওরকম একটা তেজি মানুষ, ভালো লেখক, জীবনের সব সম্ভাবনা তুচ্ছ করে চলে গেল? ওর মৃত্যুর কথা জেনে কী প্রতিক্রিয়া হল আনোয়ারার? অনুতাপ বোধ করছে?

কিছুতেই আর লেখায় মন বসাতে পারছি না বলে রাগ হচ্ছে নিজেরই ওপর। শেষ পর্যন্ত আবার লেখা শুরু করতেই হল অনেকটা জোর করে। কিন্তু গল্পটার যে পরিণতি ভেবে রেখেছিলাম, সেদিকে আর যাওয়া গেল না। হয়ে গেল অন্যরকম।

জীবনেও তো এরকম হয়। যে-জীবন স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হচ্ছে, হঠাৎ তা অন্যদিকে বাঁক নেয়। সব কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। সকালবেলা ইন্দিরা গান্ধী চায়ের টেবিলে বাড়ির লোকজনের সঙ্গে অনেকক্ষণ হাসি-ঠাট্টা, গল্প করলেন, দুপুরের মধ্যে তাঁর শরীর একগাদা বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেল।

দু-দিন বাদে স্বাতী জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, আনোয়ারার এই মাসেই তো বিয়ে হবার কথা বলেছিল কামাল, তাই না? কিন্তু আমাদের তো নেমন্তন্নর চিঠি পাঠাল না?

আমি বললাম, তোমার বুঝি ঢাকাই জামদানি শাড়িটা পরার আর তর সইছে না? এদিকে তো আর কারুর বিয়েও নেই।

স্বাতী বলল, ধ্যাৎ! ও শাড়ি আমি পরবো নাকি? শাড়িটা খুবই ভালো, কিন্তু অত রঙচঙে শাড়ি আমি আর পরি না। অন্য কারুর বিয়েতে উপহার দিয়ে দেব। কিন্তু আনোয়ারার বিয়েতে আমার খুব যেতে ইচ্ছে করছে।

হয়তো ছোট আকারের উৎসব হচ্ছে। বেশি লোককে নেমন্তন্ন করবে না।

নেমন্তন্ন না করলেও তো আমরা যেতে পারি। এমনিই ঢাকায় ঘুরে এলে হয় না? অনেকদিন যাওয়া হয়নি।

কিছু একটা চিঠি ফিটি না থাকলে ভিসা পেতে নাকি অসুবিধে হচ্ছে আজকাল। তা বলে তোমাকেও ভিসা দেবে না, তা কখনও হয়? ডেপুটি হাই কমিশনার আমাদের বাড়িতে আসেন।

সেই মাহবুব সাহেব ট্রান্সফার হয়ে গেছেন, মনে নেই? বাংলাদেশে শাসকদলের

বদল হলে দূতাবাসের কর্মচারীদেরও সরিয়ে দেওয়া হয়। আগে বাংলাদেশ দূতাবাসে কত ঘনঘন নেমন্তন্ন পেতাম, গত কয়েক মাস ধরে আর আমাদের ডাকে না। এখনকার দূতাবাসের কত্তারা বোধহয় আমাকে পছন্দ করেন না।

তা বলে লোকজনের যাওয়া-আসা কি একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে নাকি? টুরিস্ট ভিসা নিয়েও যাওয়া যাবে না?

না, যাওয়া-আসা একেবারে বন্ধ হয়নি। তবে, এখন দুদেশের সরকারের মধ্যে সম্পর্ক ভালো নয়। কিছুটা মনকষাকষি চলছে। সেদিন একটা খবর দেখলাম, দুদেশের সাংবাদিকদের যাতায়াত বন্ধ। বরুণ সেনগুপ্তকে ভিসা দেয়নি। আমারও তো পাসপোর্টে লেখা আছে সাংবাদিক!

স্বাতী রাগ করে বলল, আমার পাসপোর্টে তো তা লেখা নেই। তাহলে আমি একাই ঘুরে আসি? বীথি আর গাজীদের বাড়িতে থাকব!

আমি বললাম, তা ঘুরে আসতে পারো।

স্বাতী বলল, আমি ঢাকায় গিয়ে মাজহারকে বলব, তোমাকে কোনও ফাংশন টাংশানে ডাকতে। হুমায়ুন আহমেদকেও বলতে পারি।

তখন অত উৎসাহ দেখালেও একা একা ঢাকা যাওয়ার ব্যাপারে স্বাতীর আর তেমন উদ্যম দেখা গেল না। বুধসন্ধ্যার নাটকের রিহার্সালে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ঢাকা থেকে চেনাশুনো লোকজনের আসা হঠাৎ খুব কমে এসেছে। কোনও খবরও পাই না।

দিন দশেক পর এক মহিলাকণ্ঠ টেলিফোনে চাইল স্বাতীকে। স্বাতী তখন বাথরুমে, সে-কথা জেনে মহিলাটি জিজ্ঞেস করল, আপনি কি সুনীলদা?

হ্যাঁ।

আমার কথা সম্ভবত আপনার মনে নাই, যোগাযোগ নাই অনেকদিন, আমি মিঠু। ঢাকা থেকে আসতেছি।

গলার আওয়াজ চেনা নয়। বেশ পরিশীলিত। আর মিঠু নামটা এমনই কম যে এদিকে-ওদিকে অনেকেরই হয়।

শুকনো ভদ্রতা করে বললাম, হ্যাঁ, কী খবর?

সে বলল, ভাবির সঙ্গে একবার দেখা করতে খুব ইচ্ছে হয়। কাল সকালে কি ফ্রি থাকবেন? আমি একবার আসতে পারি, এই ধরেন দশটার সময়?

খুব অসুবিধে না থাকলে আমি কারুকেই প্রত্যাখ্যান করি না। মেয়েদের ব্যাপারে একটু অতিরিক্ত সুবিধে দিতেই হয়। ঢাকার মেয়ে, এর কাছে কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে।

ঠিক আছে, এসো।

তারপরেও সে বলল, সুনীলদা, আমার সঙ্গে যদি একটি সুইডেনের মেয়ে আসে,

তাতে কি আপনার আপত্তি আছে? সে বেশিক্ষণ থাকবে না, ধরেন, পাঁচ-দশ মিনিট, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়।

না, আপত্তি নেই, এসো কাল দেখা হবে।

পরদিন সকাল দশটায় দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে অনেকদিন পর এত বড় একটা চমক পেলাম।

নীল শাড়ি পরা সোনালি চুলের এক দীর্ঘাঙ্গি মেমসাহেব, একটি বছর দু-একের বাচ্চা মেয়ে আর জিন্‌স ও টি-শার্ট পরা নারীটির মুখের চেহারা ও চুল অনেকটা পাল্টে গেলেও সে নিঃসন্দেহে আনোয়ারা।

আমি কিছু বলার আগেই মেমসাহেবটি হাত জোড় করে বাংলায় বলল, নমস্কার, আমার নাম ইনগ্রিড নোয়েল, ভিতরে আসতে পারি?

আমি বললাম, অবশ্যই, আসুন, আসুন।

আনোয়ারার দিকে তাকিয়ে বললাম, তুমি কাল ফোন করেছিলে? নাম বললে, মিঠু।

আনোয়ারা বলল, মিঠু আমার ডাকনাম। আপনি জানতেন না? এখন ওই নামটাই বেশি ব্যবহার করি।

ছোট্ট মেয়েটি নিজেই বলল, আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম মায়া। আর এই আন্টি আমাকে বলে বার্বি ডল।

ভেতরে এসে বসার পর ইনগ্রিড বলল, মিস্টার গঙ্গোপাধ্যায়, আগে আমার কাজের কথা সেরে নিই? আমার অন্য একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে সাড়ে দশটায়। আমার দুটি প্রস্তাব। আমি পাঁচ বছর ধরে বাংলা শিখছি। আমি আপনার লেখা তিনটি বই পড়েছি। সেগুলির নাম... ... আর...। এর মধ্যে... এই বইটি আমি অনুবাদ করতে চাই। আপনি অনুমতি দেবেন কি?

আমি বললাম, নিশ্চয়ই। এ তো আমার পক্ষে আনন্দের কথা।

ইনগ্রিড বললেন, খুব ভালো। আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব, আমাদের একটা এনজিও আছে, তার কথা মিঠুর কাছ থেকে শুনে নেবেন। আমরা একসঙ্গে কাজ করি। আগামী মাসের কুড়ি তারিখ আমাদের একটা সেমিনার, মানে সমাবেশ, মানে আলোচনা চক্র আছে চিটাগাঙ্ শহরে, সেখানে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনি রাজি হবেন তো? এখনই উত্তর দিতে হবে না, ভেবেচিন্তে মিঠুকে বলে দেবেন।

স্বাতী আসতেই ইনগ্রিড উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনার সঙ্গে আজ ভালো করে কথা বলা গেল না। আপনিও যদি চিটাগাঙ্ আসেন, তখন আলাপ হবে। এখন আমি যাই।

স্বাতী বলল, একটু বসুন।

ইনগ্রিড একগাল হেসে বললেন, আপনি চা খাওয়াবেন তো? আর প্লেটে করে কলকাতার বিখ্যাত রসগোল্লা। বাঙালি বাড়ির দুধ-চিনি দেওয়া চা আমি খুব পছন্দ করি, আর রসগোল্লাও আমি সুইডেনে নিয়ে যাই। কিন্তু আজ আমার সময় নেই। অন্যদিনের জন্য পাওনা রইল।

স্বাতী বলল, আপনি চমৎকার বাংলা বলেন তো।

ইনগ্রিড বললেন, কেউ আমার বাংলার প্রশংসা করলে আমার খুব আনন্দ হয়। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। কিন্তু এখন আমাকে দৌড়োতে হবে!

সত্যিই তিনি প্রায় দৌড়ে গেলেন দরজার দিকে।

স্বাতী বলল, দারুণ মহিলা। ইনি বাংলাদেশে কী করেন?

উত্তর পাবার আগেই স্বাতী আবার ছোট মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, আনোয়ারা, এই তোমার মেয়ে? ইস্, কী সুন্দর হয়েছে। চোখের রং কি নীল? না, ঠিক নীল নয় তো। অনেকটা বাদামি।

স্বাতী নিচু হয়ে মায়াকে জড়িয়ে আদর করল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, স্বাতী, তুমি এই পোশাকে আনোয়ারাকে রাস্তায় দেখলে চিনতে পারতে?

স্বাতী বলল, শুধু পোশাক নয়, চুল অত ছোট করে ফেলেছে বলে মুখটাও অনেকটা বদলে গেছে, কমে গেছে বয়েস। গলায় ওই দাগটা কীসের?

আনোয়ারা বলল, ও কিছু না। আমার দেশের মানুষ আমাকে একটু আদর করেছিল, সেই রয়ে গেছে।

আমার মনে পড়ল, কে বা কারা যেন অ্যাসিড ছুড়ে মেরেছিল আনোয়ারের দিকে। মুখটা অক্ষতই আছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার জিনিসপত্র কোথায়? তুমি কোথায় উঠেছ আনোয়ারা?

সে বলল, একটা হোটেলে।

স্বাতী জিজ্ঞেস করল। কেন হোটেলে কেন? তুমি আমাদের এখানে চলে আসতে পারলে না?

আনোয়ারা বলল, ঠিক হোটেলে না। আপনাদের নিজাম প্যালেসে একটা সরকারি গেস্ট হাউস আছে না? সেইখানে। ইনগ্রিড আপার সঙ্গে এসেছি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সরকারি গেস্ট হাউসে জায়গা পেলে কী করে?

আনোয়ারা বলল, আমরা তো সরকারি আমন্ত্রণেই আসছি। বাংলাদেশ থিকা পাঁচজন।

সরকারি আমন্ত্রণ?

জী। তিন দেশের এনজিওকে নিয়ে একটা কনফারেন্স হবে দুই দিনের, আজকের

পেপারেও তো উঠেছে, দেখেননি? আমরা তাতে যোগ দিতে এসেছি।

এনজিও? ইনগ্রিড একটা এনজিওর কথা বলছিলেন বটে, তুমি তাতে যোগ দিয়েছ? বাংলাদেশে তো শুনেছি হাজার হাজার এনজিও, তোমাদেরটা কীসের?

আমরা মেইনলি অসহায় ও নির্যাতিতা মেয়েদের নিয়ে কাজ করি। যে-সব মেয়ে বিক্রি হয়ে যায়, প্রস্টিটিউট হতে বাধ্য হয়, কেউ কেউ উদ্ধার পেয়ে ফিরে এলেও বাড়ির লোক আর নেয় না, আমরা তাদের আশ্রয় দিই, ট্রেনিং দিই। আমাদের হেড অফিস সুইডেনে। ইনগ্রিড আপা সেক্রেটারি, আমাকে সহকারী সেক্রেটারি বানিয়েছেন।

বাঃ, এ তো খুব ভালো কথা। একটা কিছু কাজ নিয়ে থাকা সকলেরই উচিত।

আমাকে এজন্য ট্রেনিংও নিতে হয়েছে। সুইডেনে ছিলাম তিন মাস।

স্বাতী বলল, তুমি সুইডেনে গিয়েছিলে? দারুণ দেশ, তাই না। আমার এখনও যাওয়া হয়নি। তখন তোমার মেয়ে কোথায় ছিল?

ওকেও সঙ্গে নিয়ে গেছিলাম। ওকে ছেড়ে আমি একদিনও থাকতে পারি না। সুনীলদা। সামনের মাসে চিটাগাঙে আমাদের যে-কনফারেন্স হবে, সেখানে কিন্তু আপনাকে আসতেই হবে।

আমি বললাম, আমি তো কোনও এনজিওর সঙ্গে যুক্ত নই। সোশ্যাল অ্যাকটিভিস্টও নই। শুধু লেখালিখি করি। আমি তোমাদের সমাবেশে গিয়ে কী করব?

আনোয়ারা বলল, আরও কয়েকজন লেখক-শিল্পীকে আমরা আহ্বান করছি। ইনগ্রিড আপা বলেন, লেখক-শিল্পীদের কথা মানুষ বেশি শোনে। তাদের কথা বিশ্বাস করে।

স্বাতী বলল, হ্যাঁ, চলো চলো। তাদের কাজকর্ম আমার দেখতে ইচ্ছে করছে। চিটাগাঙ থেকে কক্সবাজারও ঘুরে আসা যাবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি যে এইসব কাজ করছ, তাতে শামীম তোমাকে সাহায্য করছে নিশ্চয়ই?

আনোয়ারা ভুরু কুঁচকে মুহূর্তে চেয়ে রইল।

তারপর মেয়ের কাঁধে হাত রেখে বলল, মা রে, তুই কি টিভি দেখবি?

মায়া আঙুল তুলে বারান্দার দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, আমি কি ওইখানে যেতে পারি?

আনোয়ারা বলল, হ্যাঁ, যা না। এখান থেকে কত কিছু দেখা যায়। কত বড় বড় বাড়ি, গঙ্গা নদী।

আমি বললাম, উঁচু রেলিং। বাচ্চাদের ভয়ের কিছু নেই।

মায়া ছুটে গেল সেদিকে। স্বাতী ফ্রিজ খুলে দুটো চকোলেটের বার দিয়ে এল তার হাতে।

ফিরে এসে বলল, আনোয়ারা, তোমাদের বিয়েতে আমাদের নেমতন্ন করনি, তাতে আমি খুব দুঃখ পেয়েছি। খুব ইচ্ছে ছিল যাওয়ার। বিয়েটা হল কবে?

বিস্ময়ে অনেকখানি, ভুরু তুলে আনয়োরা বলল, বিয়ে? আপনি কী বলছেন ভাবি? আমি আবার বিয়ে করব কোন দুঃখে?

শামীমের সঙ্গে তোমার আবার বিয়ে হয়নি?

এরকম অদ্ভুত কথা কে বলল আপনাদের? কে এমন কথা রটিয়েছে?

এক্ষেত্রে কামাল কিংবা অন্য কারুর নাম বলা ঠিক নয়, তাই কথা ঘুরিয়ে আমি বললাম, তা হলে কি আমার ভুল শুনেছি? শামীম তোমাকে ফিরিয়ে নিতে রাজি হয়েছে।

দপ করে জ্বলে উঠে আনোয়ারা বলল, সে রাজি হয়েছে বলেই আমাকেও রাজি হতে হবে? সে আমাকে তু-তু করে ডাকলেই আমি কুত্তির মতন ছুটে যাব? আমার নিজের কোনও মতামত নেই!

আমি বললাম, স্যরি, আনোয়ারা। আমরা ভুল খবর শুনেছি।

আনোয়ারা আঙুল দেখিয়ে বলল, দ্যাখেন, আমার ওই মেয়ে, তাকে সে পেটে থাকতেই মেরে ফেলতে চেয়েছিল।

স্বাতী প্রায় কেঁপে উঠে বলল, না, না, ও কথা বোলো না। অমন সুন্দর, নিষ্পাপ একটা মেয়ে, তার সম্বন্ধে ওসব কথা এখন ভাবাই যায় না।

আনোয়ারা আর বলল, ঢাকায় আমার গায়ে যখন একদল উল্লুক অ্যাসিড মেরেছিল, তখন সে আমার কোনও খোঁজ-খবর নিয়েছে? সুনীলদা, আমি কারও তোয়াক্কা করি না। আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বাঁচতে পারি তো বাঁচব।

আমার সঙ্গে শামীমের দেখা হয়েছিল দিল্লিতে। তার সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছিল, তোমার সম্পর্কে এখনও তার খুব দুর্বলতা আছে। সে তোমাকে চায়।

আমি কারওর দুর্বলতার ধার ধরি না। আমি চাই সহযোগিতার শক্ত হাত। ইনগ্রিড আপা যেমন তা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

তোমার সঙ্গে কি শামীমের কোনও যোগাযোগই হয়নি? তাহলে এরকম একটা কথা রটল কী করে?

দেখা হয়েছিল একবার। হঠাৎ। একুশে ফেব্রয়ারির সকালে গেছিলাম শহিদ মিনারে। প্রত্যেক বছরই যাওয়া অভ্যাস। ভিড়ের মধ্যে একেবারে মুখোমুখি। আমি মুখ ফিরায়ে নিই নাই। আমার ভয়টাই বা কী লজ্জাই বা কিসের। ওইদিন কারুর সঙ্গে কলহ করিতেও নাই, আমি চুপ করে আছি, সেও চুপ করে চেয়ে রইলো একটুক্ষণ। তার পর বললো, তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছ। অসুখ করেছিল? আমি বললাম, না তো। আমি ঠিকই আছি। আপনে ভালো আছেন? মায়া আমার হাত ধরা, তার দিকে একবার শুধু চেয়ে দেখল। তারপর বলল, আমি তোমার সঙ্গে একদিন

দেখা করতে চাই। আমি বললাম, আমি কালই চিটাগাঙ চলে যাচ্ছি। তারপর ভিড়ের ধাক্কাধাক্কিতে সরে গেলাম। ব্যস, ওই পর্যন্ত। চেনাশুনা কয়েকজন দেখেছিল, তারা কী মনে করেছে জানি না।

শামীম আর তোমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেনি?

আরও একটুকু আছে। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা নাজমা রহমান আসল আমার বাসায়। নাজমাকে চেনেন কি? ভালো গান গায়. সম্পর্কে শামীম সাহেবের ভাতিজি। সে এসে বলল, মিঠু শুধাশুধি রাগ-অভিমান করে দূরে থেকে কী হবে। তুই ফিরে চল। শামীম তোরে চায়। সে তোকে সসম্মানে ফিরায়ে নেবে। তারপর একথা-সেকথা নিয়ে ধানাই পানাই। শেষে কয় কী, মিঠু, একটা কথা তুই আমারে বল। তোর এই মেয়ে, সে কি ধর্ষণের ফল, না তুই স্বেচ্ছায় কারুর সঙ্গে, মানে মানুষের তো ভুল হইতেই পারে। রাগে আমার শরীটা তখন জ্বলতেছিল। আমি তারে বললাম, শোনো আপা, প্রথম কথা, শামীম সাহেবের কাছে ফিরে যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। দ্বিতীয় কথা, ওই প্রশ্নের উত্তর আমি জীবনে কারুর কাছেই দেব না। চিরকাল এটা গোপন থাকবে। কেউ জানবে না। শামীম সাহেবকে বলবেন, এই নিয়া তাঁর আর মাথা ঘামাবার দরকার নাই। সত্যি আমি পরের দিনই চলে যাই চিটাগাঙ। এখন সেখানেই থাকি। সেখানকার মানুষ আমাকে মিঠু রহমান নামে চেনে। আমার অতীত পরিচয় অনেকেই জানে না।

স্বাতী বলল, সত্যি কথা বলছি মিঠু। এই প্রশ্নটা আমার মনেও এসেছে কয়েকবার। মানুষের স্বাভাবিক কৌতূহল। কিন্তু তোমাকে কখনও জিজ্ঞেস করিনি, আর কোনওদিন করবও না।

আনোয়ারা বলল, মানুষের কি এরকম একটা-দুটো সিক্রেট থাকতে পারে না, যা সে নিজের বুকের মধ্যেই রেখে দিতে চায়? আমার মেয়ে, ওইটুকু বয়েস, এর মধ্যেই সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, মা, আমার বাবা কোথায় থাকে? আমি ওপরে আঙুল তুলে বলেছি, আকাশে। আল্লা তোকে পাঠিয়েছেন আমার কাছে। সব মানুষই আল্লার সন্তান। একদিন শুনি কী, ওর বয়েসি, ওর খেলার সাথী লায়লা নামের একটি মেয়েকে ও বলেছে, তোর বাবার নাম কাদির আর আমার বাবার নাম আল্লা... হয়তো বড় হয়ে ও অন্য কিছু বুঝবে, তখন ওর জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে যা বোঝার বুঝুক!

সারা দুপুর আনোয়ারা আর তার মেয়েকে নিয়ে কাটাল আমাদের সঙ্গে। বিকেলে ওদের সেমিনার শিশির মঞ্চে।

স্বাতী আর আমিও শুনতে গেলাম।

তৃতীয় বক্তা আনোয়ারা। ভারতের নানা প্রান্ত আর পাকিস্তান থেকেও এসেছেন প্রতিনিধিরা। তাই অধিকাংশ মহিলাই বললেন, ইংরেজি কিংবা হিন্দি-উর্দুতে। স্পষ্ট উচ্চারণে, নির্ভুল ইংরেজিতে আনোয়ারা ভাষণ দিল দশ-বারো মিনিট। তার বক্তব্য

একেবার স্পষ্ট। নারী-মাংস নিয়ে যে বীভৎস ব্যবসা চলছে ভারতীয় উপমহাদেশে, তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, তা বন্ধ করার দায় যেমন বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারের, তেমনি এ-বিষয়ে মেয়েদেরও সচেতন করতে হবে। অনেক মেয়ে যেমন প্রলোভনের ফাঁদে পা দেয়, তেমনি অনেক মেয়েও নিষ্ঠুর পুরুষদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অসহায় মেয়েদের এই পথে ঠেলে দেয়। এ-বিষয়ে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা আছে।

আনোয়ারা বক্তৃতার পর যে প্রবল হাততালি পড়ল, তার সঙ্গে মিশে গেল আমাদের গর্ববোধ। স্বাতী চোখে রুমাল দিল। তার কোলে বসে আছে মায়া, তার চুলে হাত বুলিয়ে স্বাতী বলল, দেখলি, তোর মা কেমন সুন্দর বলতে পারে। তোকেও এরকম হতে হবে।

আমার এ-কাহিনি শেষ পর্যন্ত মিলনান্তক হল না। মানুষের জীবনে অনেক কিছুই তো ধরাবাঁধা নিয়মে মেলে না। তবে অনেক মানুষের মধ্যে জীবন্ত এই মেয়েটির কাহিনিকে ঠিক বিয়োগান্তকও বলা চলে না। জীবনের নানান উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গিয়ে একজন সাধারণ গৃহবধূ যদি তার নিজস্ব পথ খুঁজে নেওয়ার শক্তি অর্জন করতে পারে, সেটা তো নিছক গল্প-উপন্যাস নয়, তার সত্যমূল্য অপরিসীম।